সংখ্যা-১-১২
CUL-H05280-37-P3642

সাহিত্য

37

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

—:০:—

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

শ্রীসাধন ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।
বৈশাখ হইতে চৈত্র।

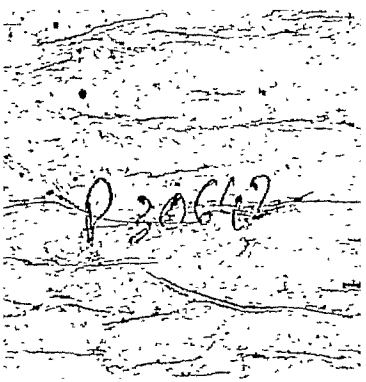

বিষয়	লেখক ও লেখিকার নাম।	পৃষ্ঠা
ছোট গল্প (গল্প)	শ্রীবেণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এফ্ এচ্ এস্	৪৭৯
ছুটী (কবিতা)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি এ	৬২৬
জ		
জনকপুর যাত্রা (ভ্রমণ)	শ্রীমন্নালাল সাধু	৩১
ত		
তিব্বত ও বঙ্গদেশ,	সম্পাদক,	৫৪৫
দ		
দেশের ও দেশের আত্মা,	সম্পাদক	৪৮১
দুঃস্বপ্ন (গল্প)	শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি-এ,	৩৪৪
দেশী খৃষ্টান (গল্প)	শ্রীনলিনী মোহন রায় চৌধুরী বি-এ	৭৫৬
দেহের দান,	শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল্	২৫৩
দ্রৌপদী (কবিতা)	শ্রীভুবন মোহন দাসগুপ্ত কবিশেখর	২৮০
ধ		
ধর্ম্মের গোড়ার কথা,	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ এম-এ,	...
ধোবা নাপিত (গল্প)	রায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর	১৩৮
ন		
নাটকের বিশেষত্ব,	শ্রীহরিপদ ঘোষাল	৭৮৫
নূতন খাতা,	শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৫০
নবসৃষ্টি (কবিতা)	শ্রীপবিত্র প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	২২৮
নিঃস্বজন (কবিতা)	ঃ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৫৬৩
নববধূ (কবিতা)	শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৭১৩
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৮৮৪
নামাবতার হরিদাস (কবিতা)	রায় শ্রীদীননাথ সান্যাল বাহাদুর এম-বি	৩৪৯
প		
পরিত্যক্তা (গল্প)	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ বি-এ	৩৮৩
পুস্তক সমালোচনা,	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ	১৪৫
পাখীর কথা,	সমালোচনা সম্পাদক	৪৭১
পুস্তককীট,	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত	৫৩৯

বিষয়	লেখক ও লেখিকাগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
প্রাচীন ও নবীন কবির প্রতি (কবিতা)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ	২৬১
প্রেমের জয় (গল্প)	শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী	৫৮৪, ৫৯২
পিতৃ-স্মৃতি (কবিতা)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ	৫২৬
প্রেমের নিরিখ (গল্প)	শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি-এ	৩৪
প্রেমিকের নিবেদন (কবিতা)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ	৯৩১
প্রভাত (কবিতা)	শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ	৪৩
প্রদীপ ও পতঙ্গ (কবিতা)	শ্রীরাজকুমার সেনগুপ্ত	১২৯
প্রিয়ার রূপ (কবিতা)	স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রকুমার রক্ষিত	১১১
প্রেমের স্বরূপ (কবিতা)	শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়	৭৫১
পূজা (কবিতা)	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৭৩৩
প্রকৃতির প্রতি (কবিতা)	স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত	৬১৩
ফ		
ফুলেট (কবিতা)	আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ	৪৬৪
ফুলের মামলা,	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সচিত্র)	৫৬৮
ব		
বাঙ্গালীর বল (সমালোচনা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই	৬৯৮
বাঙ্গালার জাতি-বিজ্ঞানের কয়েকটী গোড়ার কথা,	শ্রীশিশিরকুমার হর	
বাঈরাও ও মস্তানী,	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-আর-এস	৩৭৪
বন্দিনী (কবিতা)	পূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৩৮
বিদেশী গল্প (উপকথা)		৬৯।১০৫
বিজয় সেন দেবের তাম্রশাসন,	শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম-এ	
বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী,	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৯
বিজয় সেন দেবের তাম্রশাসন ও বাঙ্গালার সেনরাজবংশের অভ্যুদয়	শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম-এ	৩৬৮
বিবর্ত্তন বাদ,	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	
ব্রাহ্মণ (কবিতা)	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২১
বলিদান (গল্প)	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ বি-এ,	৫৪৯
বঙ্কিমচন্দ্র ও ইংরাজ,	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, এফ-এচ-এস,	৬৫২

বিষয়	লেখক ও লেখিকাগণের নাম।		পৃষ্ঠা
বৃন্দাবন (কবিতা)	শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন	...	৭০২
বোম্বাই ও গুলিস্তাঁ,	শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী	...	৮৪৭
বিদায় কালে (কবিতা)	স্বর্গীয় জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	...	১৫৬
বরষার অভিরেক (কবিতা)	শ্রীঅতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৭৪
ব্রহ্মের স্বরূপ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-আর-এস	...	২৮২
বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব,	৺ অক্ষয়চন্দ্র সরকার	...	৪৫৬

ভ

ভগ্ন বিগ্রহ (কবিতা)	স্বর্গীয় জীবেন্দ্র কুমার দত্ত	...	১৭৫
ভাবার সাড়ে ছত্রিশ ভাজা,	শ্রী—	...	২২০
ভক্ত সাধক ও কবি,	স্বর্গীয় জীবেন্দ্র কুমার দত্ত	...	৩৭১
ভাবসাধক দ্বিজেন্দ্রলাল,	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	...	৬২৪, ৬৯২
ভারত ইতিহাসের উপাদান,	শ্রীহরিপদ দোষাল	...	৪২৫
ভক্তের নিবেদন (কবিতা)	শ্রীভুবন মোহন দাসগুপ্ত কবিশেখর	...	৫২৮
ভারত-ইতিহাসে পাশ্চাত্য অভিমত		...	২৮৩
ভারতীয় নাটকে গ্রীকপ্রভাব,	শ্রীহরিপদ ঘোষাল	...	৬২৫
ভীরু (কবিতা)	শ্রীভুবন মোহন দাসগুপ্ত কবিশেখর	...	৬৮

ম

মধ্যযুগে প্রাচ্য ভারতে তক্ষণ শিল্প,	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী	...	২৯৮
মিলন (কবিতা)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ	...	২৭১
মিথ্যা অভিযোগ (আলোচনা)	শ্রীমতী প্রফুল্লচি দেবী	...	২৭৩
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা,	সম্পাদক	...	৬১৫
মুক্ত (কবিতা)	স্বর্গীয় জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	...	৪৩২
মা (কবিতা)	শ্রীযোগেশচন্দ্র লাহা এম-এ, বি-এল	...	৬৩৮
মন্থনে (কবিতা)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ	...	৭৩৪
মাস্টার (গল্প)	শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ বি-এ	...	৭৩৫
মিলন (গল্প)	ঐ	...	৭৮৭
মনের মত (গল্প)	শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	...	৯০২
মৃত্যু (কবিতা)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি এ	...	৯৫২
মহিষমর্দ্দিনী (কবিতা)	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৯২৫

বিষয়	লেখক ও লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
মর্ম্মোচ্ছ্বাস (কবিতা)	৺জীবেন্দ্র কুমার দত্ত	৮০২
ঋণের আকাঙ্ক্ষা রাখি	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ	৮৮৯
রুশিয়ায় বিপ্লববাদ	শ্রীদীনেন্দ্রকুমারি রায়	৩৪৯
রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি (প্রতিবাদ)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	১১৫
ঐ	মহামহোপাধ্যায় শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ	৭১৯
রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ	প্রবন্ধের ভুল সংশোধন	সম্পাদক ৮৮৭
রাজা রামমোহন রায়	শ্রীসুরঞ্জন দত্ত	৮৬৫
রাণীর কবর (গল্প)	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য	৪৭৬
রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (সমালোচনা)	শ্রীরাজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ	২০৯
রাজপুতানার উপকথা		১৪২
রাম চরিত্রের সমালোচক	শ্রীসাহিত্যি	৩৮৮
ল		
লীলা-কৌতুক (কবিতা)	স্বর্গীয় জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৫৬
শ		
শিবাজীর নৌবহর	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, পি আর এস	৮৭৮
শেষের পথে (কবিতা)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৯৫৪
শ্যামা পূজায় (কবিতা)	স্বর্গীয় জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৫৯১
শেখসলে উদ্দিন নামী	শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী	৩২১
শোভাতর (কবিতা)	স্বর্গীয় জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৪১১
শেষ দেখা (গল্প)	রায় শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক বাহাদুর	৮৬৫
শ্রীদুর্গা	সম্পাদক	৪৪৮
শ্রীরাম (কবিতা)	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৬৮
শিশু পণ্ডিত (গল্প)	শ্রীসতীন্দ্রচরণ রায়	৯৫৩
শিবরাত্রির শলিতা (কবিতা)	৺জীবেন্দ্র কুমার দত্ত	৮৯৫
স		
সহস্র ধারা দর্শনে (কবিতা)	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৯২১
স্বর্গীয় বড়াল কবি	শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ	১০

বিষয়	লেখক ও লেখিকাগণের নাম।	পৃষ্ঠা
স্বামী বিবেকানন্দ মহামহোপাধ্যায় শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ		২৩, ১১৯, ১৮৯, ২৫৬
সিন্ধু ও বিন্দু (কবিতা)	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮০
সম্রাজ্ঞ ও স্মৃতি,	শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	৯৮
স্মৃতিপূজা,	শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন,	৫৫৯
সমাজপতির পত্র,	শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী	৬১৮
স্বামী বিবেকানন্দ (প্রতিবাদ)	শ্রীমধুসূদন সেন	২৭৬
সহযোগী সাহিত্য,	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	২৯৯
স্মৃতির সাধনা (কবিতা)	স্বর্গীয় জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩০৪
স্মৃতি ও সম্বন্ধ,	শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	৩৪৩, ৯১৩
সদালাপ—দেবীচৌধুরাণী,	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, এফ,এস,এফ	৪১৩
সঙ্গিহীন (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	৪৫৫
সখীর প্রতি শ্রীরাধিকা (কবিতা)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৬৪৬
সিঁথির সিন্দুর (গল্প)	শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ	৬৭৮
স্মৃতিস্তম্ভ (গল্প)	শ্রীআশুতোষ গাঙ্গুলী (৬৯৭)	৬৯৯
সভ্যতা ও ভারতীয়তা,	শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, বি, এল্	৭৯৯
সিন্দুর কৌটা (সমালোচনা)	শ্রীমতী নাহারবালা দেবী	৮১৯
সপত্নী (গল্প)	শ্রীমণিমৃণালিনী দেবী	৮৩৭
হেমন্ত (কবিতা)	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৪৯
হিন্দু-বিধবা (কবিতা)	শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস	৯৩০
হে মোর প্রিয় (কবিতা)	শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী	৮৩৩

ধর্ম্মের গোড়ার কথা।

ধর্ম্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোচর জ্ঞানের পরপারের এবং নয়নের পরপারের বিষয়ে চিন্তা-বিচার বিধিব্যবস্থা মানবজীবনের প্রধান কাজ। নানা দিক দিয়া নানাপ্রকারে ধর্ম্মের আলোচনা হইতে পারে। ধার্ম্মিকের কাছে ধর্ম্ম জীবনের প্রধান অবলম্বন, মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়। ধর্ম্মের কথা ধার্ম্মিকের কাছে জীবনের সার কথা। তিনি জীবনযাত্রার হিসাবে ধর্ম্মের আলোচনা করেন। দার্শনিকের আলোচ্য ধর্ম্মের মর্ম্মকথা সত্য কি মিথ্যা, হিতকর কি অহিতকর। আমরা দার্শনিকের এবং আনুষ্ঠানিকের ধর্ম্মালোচনারীতির সহিতই সুপরিচিত। কিন্তু কিছু দিন হয় পাশ্চাত্য জগতে আর এক রীতিতে ধর্ম্মকথা আলোচিত হইতেছে; এই রীতি ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক রীতি। ইতিহাসের কাজ, সুরু হইতে ধর্ম্মসম্পর্কীয় সকল তথ্য নিরূপণ করিয়া তাহা সময়ের হিসাবে পরপর সাজাইয়া যাওয়া। এই রীতিতে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে ধর্ম্মের ইতিহাসের বিভিন্ন ধারা পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞানের কাজ, ইতিহাসের বিভিন্ন ধারার সমন্বয়-সাধন এবং যে নীতির দ্বারা সকল ধারা নিয়মিত হয়, তাহার নিরূপণ। অন্ত হিসাবেও ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনার আবার দুই প্রকার রীতি আছে। এক রীতিতে অপরের ভাবের এবং অনুভবের সহিত নিজের ভাবের এবং অনুভবের তুলনা করিয়া তত্ত্ব নিরূপণ। এই রীতিকে অন্তর্মুখী রীতি বলে (subjective method)। এই রীতি দার্শনিকের অবলম্বনীয়। আর এক রীতিতে নিজের ভাব এবং অনুভব একেবারে চাপিয়া রাখিয়া অপর লোকের, অপর জাতির ভাব, অনুভব, এবং অনুষ্ঠান বিচার করিয়া এই প্রকার বাহ্য প্রমাণপুঞ্জ যে সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়, অবিচলিতভাবে সেই দিকে অগ্রসর হওয়া। এই বহির্মুখী রীতি (objective method) মানব বিজ্ঞানসেবকের অবলম্বনীয়। এই রীতিতে অনুসন্ধান করিয়া ধর্ম্মের গোড়ার কথা যদি খুঁজিয়া পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে

প্রকারে ধর্ম্ম বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার বা নীতি যদি ধরা যায়, তবে সেই জ্ঞান যে মানুষের কল্যাণ সাধন করিবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু তাহা এখনও অনেক দূরের কথা। এই বিপুল পৃথিবীর শত সহস্র জাতির মধ্যে শত সহস্র প্রকারের ধর্ম্মমতের অভ্যুদয় হইয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে সেই সকলগুলির ইতিবৃত্ত সম্যক্ আলোচিত হইয়া গেলে তবে সকল গুলির সমন্বয়ের সময় আসিবে। সে দিন অনেক দূরে। এখন সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া গবেষকগণের ভূমে-জলের এক এক দেশের ধর্ম্মের ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করাই কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মের গোড়ার কথা সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্যের বা সিদ্ধান্তের অবতারণা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বৈজ্ঞানিকগণ ধর্ম্মের গোড়া সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। কেন না এই সকল মত কতক পরিমাণে একদেশদৃষ্টিমূলক হইলেও বিলক্ষণ শিক্ষাপ্রদ।

(১) এই সকল মতের মধ্যে সময় হিসাবে সর্ব্ব প্রথম সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত মেক্সমূলরের মত। মেক্সমূলর ঋগ্বেদ অনুশীলন করিয়া য়ুরোপের গ্রীক, রোমক, জর্ম্মণ প্রভৃতি জাতির ভাষা এবং প্রাচীন ধর্ম্ম সংস্কৃত ভাষার এবং ঋগ্বেদের ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য চমৎকার-জনক নৈসর্গিক ব্যাপার এবং জন্তুবিশেষকে দেবতারূপে কল্পনা ধর্ম্মের গোড়া। যথা অগ্নি, সোম, ঝড়, বায়ু, আকাশ প্রভৃতিকে দেবতারূপে কল্পনা; এবং পৃথিবী, উষা, বাণী, সরস্বতী নদী প্রভৃতিকে দেবীরূপে কল্পনা। ঋগ্বেদের অধিকাংশ দেবদেবী যে এই নৈসর্গিক ব্যাপার বা বস্তুমূলক, তাহা বেদমন্ত্র পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যব্যাপাররূপি-দেবতা হইতেই ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অশরীরী আত্মার এবং দেবদেবীর কল্পনা, এবং অশরীরী আত্মার এবং দেবদেবীর কল্পনা হইতেই একদিকে পরমাত্মার এবং আর একদিকে দেবাদিদেবের ধারণার অভ্যুদয়। বৈদিক সাহিত্যে ধর্ম্মের ক্রমগতির আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যায়। য়ুরোপের এবং এশিয়ার প্রাচীন সভ্যজাতিনিচয়ের সাহিত্য এবং ইতিহাস-আলোচনাপরায়ণ পণ্ডিত মাত্রই এক সময় এই মতাবলম্বী ছিলেন। এই মতকে নিসর্গবাদ (naturism) বলা যাইতে পারে।

(২) মানব বিজ্ঞানবিদ্‌গণের অগ্রণী টাইলর (Sir Edward Burnett

Tylor) পৃথিবীর নানাদেশের অসভ্য জাতিনিচয়ের ধর্ম্মের বিবরণ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য ব্যাপারবিশেষকে দেবতারূপে কল্পনা ধর্ম্মের মূল হইতে পারে না ; ধর্ম্মের মূলে অশরীরী জীবাত্মায় (soul) প্রেতাত্মায় (ghost) এবং অশরীরী ভূতপ্রেতে (spirits) বিশ্বাস বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শিক্ষাদীক্ষাহীন অসভ্যের পক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চমৎকারজনক নৈসর্গিক ব্যাপারকে মানুষের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন প্রাণী বা দেবতারূপে কল্পনা করা যত সহজ, অশরীরী প্রাণীর বা পদার্থের কল্পনা করা কি তত সহজ? এই প্রশ্নের উত্তরে টাইলর বলেন, অসভ্য মানুষ ঘুমের ঘোরে বা জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নে যখন কোন অনুপস্থিত বা মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে পায়, তখন তাহার দেহ ছাড়িয়া বিচরণ করিতে পারে বা দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয় না, এমন অশরীরী পদার্থে বা আত্মায় বিশ্বাস জন্মে। এই বিশ্বাসের ফলে ক্রমশ গাছ পালা, পশুপক্ষী, পাহাড় পর্ব্বতবাসী ভূতপ্রেতেও (Spirits) বিশ্বাস হয়। এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের গোড়া। এই বিশ্বাস ফুটিয়া ক্রমশঃ ঈশ্বরে বিশ্বাসে পরিণত হয়। সুপ্রসিদ্ধ হার্বার্ট স্পেন্সারের মতও অনেকটা এই প্রকার। টাইলরের মতকে প্রেতবাদ (animisin) বলে। প্রেতবাদ নৃতত্ত্বসেবক-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

(৩) এণ্ড্রুলেঙ্গ নামক ইংরেজপণ্ডিত বলেন, খুব অসভ্য জাতির মধ্যে যেমন ভূতপ্রেতে বিশ্বাস দেখা যায়, তেমনি একপ্রকার ঈশ্বরে বিশ্বাসও দেখা যায়। কোন না কোনরূপে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, এমন জাতিই দেখা যায় না। সুতরাং ঈশ্বরে বিশ্বাসটাকে ভূতপ্রেতে বিশ্বাসের পরিণাম মনে না করিয়া, ভূতপ্রেতে বিশ্বাসকে ঈশ্বরে বিশ্বাসের বিকার মনে করাই সঙ্গত। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শিক্ষাদীক্ষাহীন অসভ্য মানুষ ঈশ্বরধারণায় পঁহুছিল কেমন করিয়া? এণ্ড্রুলেঙ্গের উত্তর—ঈশ্বর আছেন একথা যখন নিশ্চিত, তখন ঈশ্বর স্বয়ংই মানবের মনে কোন প্রকারে ঈশ্বর ধারণার বীজ নিহিত করিয়াছেন এরূপ মনে করাই সঙ্গত। বলা বাহুল্য এই মত বৈজ্ঞানিক সমাজে আদর লাভ করে নাই। তবে আজকালকার একজন প্রধান নৃতত্ত্ববিৎ, পাদ্রি শ্মিড্‌ট (Father Schmidt) এই মত স্বীকার করেন।

(৪) এযাবৎ উল্লিখিত মতগুলির একটি সাধারণ লক্ষণ এই, যে পদার্থের বিশ্বাস ধর্ম্মের গোড়ায় বিদ্যমান, তাহা একই হউক আর অনেকই হউক, তাহা ব্যক্তিরূপে কল্পিত। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে ব্যক্তিরূপে কল্পিত শক্তির

বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটি অব্যক্ত শক্তিতে বিশ্বাসও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জবাসী মেলানেসীয়গণের মধ্যে এই অব্যক্ত শক্তির নাম "মানা" (mana)। এই শক্তি জড় পদার্থের সাধারণ শক্তি বা নৈসর্গিক শক্তি হইতে পৃথক্, ইহা একপ্রকার অতিপ্রাকৃত শক্তি। কিন্তু ইহা নৈসর্গিক শক্তিরই প্রকট হয়। মানুষের বিশেষ শক্তি বা গুণ এই 'মানা'মূলক। এই 'মানা' কোন পদার্থেই স্থিরভাবে বিদ্যমান নাই, কিন্তু সকল পদার্থেই সঞ্চারিত হইতে পারে। মেলানেসীয়গণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য এই 'মানা' লাভ করা বা 'মানা'কে উপাসকের হিতে নিয়োগ করা। উত্তর আমেরিকাবাসী ইরোকুস (Iroquois) জাতিনিচয় এই অব্যক্ত শক্তিকে 'ওরেণ্ডা' (orenda) বলে। যে সকল পদার্থকে জীব, আত্মা বা প্রেত বলা হয়, 'ওরেণ্ডা' তাহা হইতে পৃথক্। 'ওরেণ্ডা' অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বভূতে সর্ব্ববস্তুতেই আছে এবং যাহা কিছু ঘটে, তাহা 'ওরেণ্ডা'রই বলে। বাহ্য পদার্থের 'ওরেণ্ডা'র সহিত মানুষের 'ওরেণ্ডা'র সর্ব্বদাই যেন লড়াই চলিতেছে। অপরাপর বস্তুতে যে 'ওরেণ্ডা' আছে তাহার সহায়তায় স্বীয় মঙ্গল সাধনের বা অমঙ্গল দূর করণের জন্য যে সকল ক্রিয়াকলাপ করা হয় বা মন্ত্র তন্ত্র পড়া হয়, তাহাই ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই অব্যক্ত শক্তি বিভিন্ন জাতীয় উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীর নিকট বিভিন্ন নামে পরিচিত। এলগঙ্কুইন (Algonquain) শ্রেণীর জাতিনিচয় এই শক্তিকে বলে মানিটো (manito) সিউয়ান (Sionan) শ্রেণীর জাতিনিচয় এই শক্তির নাম দিয়াছে 'ওকোণ্ডা' (wokanda) 'মানা,' 'ওরেণ্ডা,' 'ওকোণ্ডা'র পরিচয় পাইয়া কোন কোন নৃতত্ত্ববিৎ মনে করেন, মানুষ আদৌ 'মানা' বা 'ওরেণ্ডা' অর্থাৎ অব্যক্ত শক্তির ধারণা করিয়া পরে প্রেতবাদে (animism) অর্থাৎ ব্যক্তিরূপী অশরীরী পদার্থনিচয়ের ধারণায় উপনীত হইয়াছে। 'মানা' বা 'ওরেণ্ডা'র ধারণাই ধর্ম্মের গোড়া।

(৫) ডুর্খেম প্রমুখ সমাজবাদীরা (sociological school) বলেন, এই সকল মতানুসারে ধর্ম্মের গোড়ায় কল্পনা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কিন্তু যদি কল্পনা বা ভ্রান্তি ছাড়া ধর্ম্মের গোড়ায় কোন সত্য না থাকিত, তবে কখনই তাহার এমন অপ্রতিহত প্রভাব হইত না। এখন জিজ্ঞাস্য, ধর্ম্মের গোড়ার এই সত্য পদার্থ কি? সমাজবাদীরা বলেন, সমাজের বলই ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ সত্য পদার্থ। কোন ভাব বা ধারণা যখন সমাজের জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমানভাবে অনুভূত হয়, তখনই তাহা প্রবল হইয়া সমাজভুক্ত

সকলকে বশীভূত করিতে পারে। সমাজের অনুভূতি ধর্ম্মের ভিত্তি আমাদের দেশের একটা প্রবাদ আছে, "পাঁচজন পরমেশ্বর" অর্থাৎ পাঁচজনের বা জনসাধারণের যাহা অভিমত, তাহাই ঈশ্বরের আদেশতুল্য। লাটিন ভাষায় কথা আছে, vox populi vox dei, 'লোকমতই ঈশ্বরের বাণী।' এই সকল প্রবচনকে সমাজবাদিগণের ধর্ম্মতত্ত্বের মূল সূত্র বলা যাইতে পারে। ডুর্খেম বলেন, 'ঈশ্বর রূপকচ্ছলে সমাজের নামান্তর মাত্র (God is only a figurative expression of society); সমাজ ছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন দরকার নাই। যে যুক্তি প্রমাণের উপর ডুর্খেম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এখানে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

ঐতিহাসিক রীতিতে ধর্ম্মের গোড়ার কথা খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইয়া ডুর্খেম অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত 'টোটেম' তন্ত্রকে ধর্ম্মের শৈশব অবস্থার নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। 'টোটেম' শব্দটি আমেরিকার ওজিবে (ojibway) জাতির মধ্যে চলন ছিল। যে ইতর জন্তু, উদ্ভিদ বা অপর কোন পদার্থের নামে এক একটী জাতির (tribes) অন্তর্গত বিভিন্ন গোত্রের (clans) বা কুলের নাম করণ করা হয়, তাহাকে 'টোটেম' বলে। পৃথিবীর প্রায় সকল অসভ্য জাতির মধ্যে, ছোটনাগপুরে, সাঁওতাল, মুণ্ডা ও-রাঁও প্রভৃতি জাতির মধ্যেও 'টোটেম' তন্ত্র প্রচলিত আছে। 'টোটেম'-পন্থি জাতির স্বগোত্রে অর্থাৎ নিজের 'টোটেম' গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। যে জন্তু বা উদ্ভিদ বা পদার্থ যে গোত্রের 'টোটেম', সেই গোত্রের লোকেরা সেই টোটেমের অর্থাৎ সেই শ্রেণীর জন্তু বা উদ্ভিদের অনিষ্ট বা অপচয় করে না, অনেক স্থলে তাহার পূজা করে। 'টোটেম' গোত্রের লোকেরা আপনাদিগকে একই পিতৃপুরুষের বংশোদ্ভব মনে করে, এবং কোন-কোন স্থলে টোটেমের বংশোদ্ভবও মনে করে। পৃথিবীর নানাদেশের নানা অসভ্য জাতির মধ্যে নানা আকারে টোটেম তন্ত্র প্রচলিত দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত 'টোটেম' তন্ত্র একটু অন্য রকমের। সেখানে কোন এক 'টোটেম' গোত্রের লোকের মধ্যে যে জ্ঞাতিত্ব আছে, তাহা ইহারা সকলে একই পূর্ব্বপুরুষের সন্তান এই প্রকার বিশ্বাসমূলক নহে; এই জ্ঞাতিত্বের কারণ তাহাদের সকলের একই গোত্র নাম। 'টোটেম' জন্তু বা উদ্ভিদ বা বস্তুর নামে অবশ্যই গোত্রের নাম। এই ঐক্য গোত্রের একতার বন্ধনসূত্র। 'টোটেম' হইতে গোত্রের শুধু নামকরণ

হয় না, টোটেমের চিত্র গোত্রের লাঞ্ছনরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং টোটেমের অন্তর্গত নরনারীর গাত্রেও অঙ্কিত হয় (tatoo)। টোটেমের চিত্র বা প্রতিকৃতি, টোটেম শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদ, এবং 'টোটেম' গোত্রীয় নরনারী এই সকলই 'টোটেম'পন্থীর শ্রদ্ধার বস্তু। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধার বস্তু টোটেমের চিত্র; তারপর 'টোটেম' শ্রেণীর প্রাণী। ডুর্খেম বলেন, টোটেমের প্রতিকৃতি বা প্রাণী বা মানুষ 'টোটেম'পন্থীর প্রকৃত শ্রদ্ধার বস্তু নহে, 'টোটে'মপন্থীর প্রকৃত শ্রদ্ধার বস্তু, এই সকলের অন্তর্নিহিত 'মানা' বা 'ওরেণ্ডা'। যে সকল জাতির মধ্যে এখন 'মানা', 'ওরেণ্ডা' বা 'ওকোণ্ডা'র ধারণা পরিস্ফুট দেখা যায়, তাহারা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণের অপেক্ষা সভ্যতার হিসাবে অধিকতর উন্নত। 'মানা' বা 'ওরেণ্ডার' বীজই টোটেমতন্ত্রের সার তথ্য। কিন্তু টোটেমের অন্তর্নিহিত 'মানা' (totemic principle) গোত্রের সকল নরনারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে কেমন করিয়া? ডুর্খেম এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, টোটেমের প্রতিকৃতি যেমন টোটেমের অন্তর্নিহিত ভাবের চিহ্ন, তেমনি গোত্রেরও চিহ্ন। সভ্যতার সর্ব্বনিম্ন স্তরবর্ত্তী জাতির সমাজ গোত্রে সীমাবদ্ধ। গোত্রের জনসমষ্টি টোটেমের যাহা সার ভাব, তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করে বলিয়াই ব্যক্তিবিশেষের কাছে তাহা ভয়ভক্তির বস্তু। গোত্র বা সমাজ আদিম 'টোটেম'তন্ত্রীর ঈশ্বর।

(৬) সুপ্রসিদ্ধ 'গোল্ডেন বাউ' (Golden Bough) নামক গ্রন্থপ্রণেতা স্যার জেম্‌স্ ফ্রেজারের মতে অতিপ্রাকৃতের ধারণা ধর্ম্মের গোড়ার কথা নহে। ধর্ম্মের গোড়ার কথা ম্যাজিক (magic) অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়কে বশীকরণার্থ অনুষ্ঠিত ক্রিয়া-কলাপ। ম্যাজিক অসভ্যের বিজ্ঞান। আদৌ মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়কে বশীকরণার্থ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিল; পরে ক্রমশঃ অতি প্রাকৃত ব্যক্তির বা দেবগণের ধারণা করিতে সমর্থ হইয়া তাহাদের উপাসনা আরম্ভ করিল। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু অসভ্য সমাজে বশীকরণ কর্ম্ম এবং উপাসনা (magic and religion) অবিচ্ছিন্নভাবে একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের সংস্রবশূন্য বশীকরণ কর্ম্ম কোথাও দেখা যায় না।

আমরা কতকগুলি মতবাদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। তৎসম্বন্ধে রাশি রাশি পুস্তক এবং অসংখ্য সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এই সকল বিষয় বড় বেশী আলোচিত হয় নাই; এবং আমিও যে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম, এমন মনে হয়

না। প্রবন্ধের শেষ ভাগে কয়েকখানি প্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম দিলাম। যাঁহারা ধর্ম্মের উৎপত্তির এবং পরিণতির কথা ইতিহাসের এলাকাধীন মনে করেন না, তাঁহাদের অবশ্য এদিকে আসিবার কোন দরকার নাই। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভব মনে করেন, তাঁহারা এজন্য পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত হইলে খুব ভাল হয়। কারণ ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ইতিহাসের যেমন উপাদান আছে, এমন আর কোথাও নাই। উপরে যে সকল মতামতের পরিচয় দেওয়া হইল, তন্মধ্যে একটি বই আর সকলগুলিই এখনকার অসভ্য জাতির ধর্ম্মের বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সকল বিবরণ যে কতদূর ঠিক, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। অসভ্যেরা ধর্ম্মব্যাখ্যায় বা বিচারতর্কে অভ্যস্ত নয় এবং গুহ্য কথা প্রকাশ করিতেও প্রস্তুত নয়। সুশিক্ষিত বিবরণ সংগ্রাহকের পক্ষে নিজের ভাব একেবারে চাপিয়া রাখিয়া অসভ্যের হিসাবে অসভ্যের ভাব ধারণা করাও খুবই কঠিন। অসভ্যের ভাব এবং ভাষা দুই অপরিস্ফুট। তাহার প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করা বহুদর্শী পর্য্যবেক্ষকের পক্ষেও বোধ হয় সময় সময় অসাধ্য ব্যাপার। হাওইট্ (Howitt) স্পেন্সার (Spencer) গিলেন (Gillen), এবং ষ্ট্রেহলাও (Strehlow) অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণের ধর্ম্ম কর্ম্মের এবং আচার ব্যবহারের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহা অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতেরা মানবজাতির আদিম অবস্থাসম্বন্ধে নানামত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু হাওইট প্রমুখ লেখকগণের বিবরণ কতটা নির্ভরযোগ্য, সেই বিষয়ে কোন কোন প্রবীণ নৃতত্ত্ববিৎ বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। * প্রমাণের হিসাবে অসভ্য জাতির আচার ব্যবহারের পরের লিখিত বিবরণের অপেক্ষা সভ্যজাতির সাহিত্যে নিবদ্ধ স্বজাতির আচার ব্যবহারের ধ্যান এবং ধারণার বিবরণ অধিকতর নির্ভরযোগ্য। সভ্যতার গোড়ায় যেমন অসভ্যতা ছিল, সভ্যতার অঙ্গে অঙ্গেও তেমনি অসভ্যতার চিহ্ন (survivals) জড়ান আছে। সভ্যতার সঙ্গে জড়িত অসভ্যতার কথাকে লোকবিদ্যা (folk-lore) বলে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বাইবেল হইতে এবং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য হইতে সভ্যতার গোড়ার খবর সংগ্রহ করিতেছেন। এই সকল উপাদানের সহিত অসভ্য জাতিনিচয়ের আচারবিচারের বিবরণ

* F. S. Hartland, Presidential Address, Section I: *Transactions of the Third International Congress for the History of Religions*, Oxford, 1908, Vol. I p. 23-24; A. A. Golden Wiser, *American Anthropologist*, 1915, P. 723.

তুলনায় আলোচনা করিলে অসভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা যাইতে পারিবে। সাহিত্যে নিবদ্ধ সভ্যতার এবং অসভ্যতার ইতিহাসের উপাদান ভারতবর্ষে যত আছে, পৃথিবীর আর কোথাও তত নাই। আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য ধর্ম্মের ইতিহাসের উপাদানের অক্ষয় ভাণ্ডার। ইহা ছাড়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে শাস্ত্রবহির্ভূত নানাপ্রকার লোকাচার প্রচলিত আছে। এই সকল লোকাচারের বিবরণ সংগৃহীত হইলে বৈজ্ঞানিকের কাছে আর এক বিপুল ভাণ্ডার খুলিয়া দিতে পারা যাইবে। ঐতিহাসিক প্রমাণ বিচার রীতি এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকরণ রীতি দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে এদেশী লোক এই ক্ষেত্রে যতটা সফলতা আশা করিতে পারেন, বিদেশীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং ধর্ম্মের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন এবং সেই সূত্রে মানব জাতিকে উপকৃত করিবার বিশেষ সুযোগ ভারতবাসী অনুসন্ধানকারীদিগের রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব বিজ্ঞানে এম, এ পরীক্ষার যে পাঠ্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মানব বিজ্ঞানের হিসাবে হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাস অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মের ইতিহাসের আলোচনার ব্যবস্থাও আছেই। যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহিত্যের এবং ইতিহাসের সেবায় রত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতেও এই বিভাগের জন্য কর্ম্মী চাই।

এদেশে এখন ইতিহাসলেখকের অভাব নাই। কিন্তু সত্যের খাতিরে একথাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, আমাদের ইতিহাস সেবা যে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাহার কারণ (১) আলস্য বা সুযোগের অভাববশতঃ আমরা অনেক সময় নিঃশেষে সকল প্রমাণ আহরণ করিয়া লিখিতে বসিতে পারি না; (২) সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই অনেক সময় পুরাকাল সম্বন্ধে যে কিছু খবর পাই, তাহা আমরা ঐতিহাসিক বিবরণের সামিল করিয়া লই; (৩) বৈজ্ঞানিক রীতিতে সুপরীক্ষিত প্রমাণ অনুসারী সিদ্ধান্ত না করিয়া অনেক সময় গোড়াতেই একটা কিছু সিদ্ধান্ত মনে মনে ঠিক করিয়া লইয়া যেন তেন প্রকারেণ প্রাপ্ত প্রমাণগুলিকে তাহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া দিতে চেষ্টা করি। যদি ঐহিক ব্যাপারের ইতিহাস লিখিবার বেলায়ই এই সকল কারণে এত গোল উপস্থিত হইতে পারে, ধর্ম্মের ইতিহাস সঙ্কলনের বেলা বিশেষ সতর্ক

না হইলে গোল যে অনেক বেশী হইবে, একথা বলাই বাহুল্য। ইহা স্মরণ রাখিয়া যদি অনুসন্ধানকার্য্যে অগ্রসর হওয়া যায়, তবে অবশ্যই সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। নরবিজ্ঞান এখনও জড়বিজ্ঞানের তুল্য মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু নরবিজ্ঞানের রীতিগত আলোচনা বেশীদিন যাবৎ আরম্ভ হয় নাই। জড়শক্তির ন্যায় নরের ভাগ্যচক্রও অলঙ্ঘনীয় নিয়মের দ্বারা চালিত হইতেছে। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে জড়বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে মানুষ জড়শক্তিকে যেমন খেলার পুতুলে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে, নরবিজ্ঞানের আলোচনার ফলে নরের ভাগ্যচক্রকেও হয়ত তেমনি অনেক ঘুরাইতে শিখিতে পারিব। ধর্ম্ম মানুষের সভ্যতার প্রাণ এবং ধর্ম্মতত্ত্ব নৃতত্ত্ব বিদ্যার প্রধান বিভাগ। এত সুযোগ সুবিধা থাকিতেও আমরা ভারতবাসী যদি এই বিদ্যার আলোচনায় যথারীতি প্রবৃত্ত না হই, তবে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। এই প্রবন্ধে যে সকল মতের পরিচয় দেওয়া হইল, তাহা দেখিয়া অনেকে বলিতে পারেন, বৈজ্ঞানিক আলোচনার ফলে এ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, ধর্ম্মের মূলে একটা মস্ত ভুল আছে। কিন্তু গোড়ায় বলিয়াছি, এই সকল মত অনেকটা একদেশ-দৃষ্টিমূলক। এই সকল মতকে সার সত্য বলিয়া গণ্য না করিয়া কতকগুলি প্রমাণের বন্ধনসূত্ররূপে গণ্য করাই সঙ্গত। এই হিসাবে এই মতগুলি বিশেষ মূল্যবান্। সত্য এখনও অনেক দূরে। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"; সেই সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক রীতিরূপ মহাযান আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

---

১. কয়েকখানি পুস্তকের নাম—Tylor, *Primitive Culture* (4th Edition); Frazer, *The Golden Bough* (3rd edition); Andrew Lang, *The Making of Religion*—*Myth Ritual and Religion*: Marett, *The Threshold of Religion* (2nd Edition); *Psychology and Folk-lore*; Durkheim, *The Elementary forms of the Religious life* (English translation by Swan); Miss Harrison, *Prolegomena to Greek Religion*, *Thesis a study of the social origins of Greek Religion*; Gilbert Murray, *Four stages of Greek Religion* এই সকল পুস্তকেই অন্যান্য আবশ্যকীয় পুস্তকের এবং সন্দর্ভের ঠিকানা পাওয়া যাইবে।

স্বর্গীয় কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল।

(মৃত্যু ৪ঠা আষাঢ় ১৩২৬)

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদভবনে শোকসভায় পঠিত।)

দেখিতে দেখিতে আজ ঠিক তিন মাস হইয়া গেল, আমরা অক্ষয়কুমারকে হারাইয়াছি। আঘাতটা অকস্মাৎ আসে নাই—কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন—মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে ভ্রমক্রমে সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু তবু পুরী হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইয়াছে সংবাদ পাইয়া, যে দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিলাম, পূর্ব্বদিন রাত্রে তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন; সে দিন সেই দুঃসংবাদ যেন নিতান্তই অতর্কিত ভাবে আসিয়া প্রাণে লাগিয়াছিল। পূর্ব্বদিন যাইলে দেখা হইত—এক দিনের বিলম্বে তাঁহার সহিত এ জীবনে দেখা হইবার সম্ভাবনা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এ কথা মন যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না—প্রাণের মধ্যে তাঁহারই কথার প্রতিধ্বনি উঠিতেছিল—

"এই কি মরণ?
এত দ্রুত—সহসা এমন!
চিরতরে ছাড়াছাড়ি, দেহে প্রাণে কাড়াকাড়ি,
নাই তার কোন আয়োজন!"

কিন্তু অক্ষয়কুমারের পুত্রের অশৌচবেশ—তাঁহার অনুজের শোককাতর মলিন মুখ দেখিয়া, ক্ষণকাল পূর্ব্বে বন্ধুবর রসময় বাবুর মুখে যে কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বিশ্বাস করিতেই হইল—অক্ষয়কুমার সত্য সত্যই আমাদের চিরতরে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। পত্নীহারা কবি গৃহের ফেরে ভিটা ছাড়া হইয়া শেষে এক নূতন পল্লীর ভাড়া-বাড়ীতে দুদিনের জন্য আসিয়া জীবন মধ্যাহ্নে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সপ্তাহদ্বয় মাত্র পূর্ব্বে তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত পুরীধামে সীমাহীন সিন্ধুর আকুল কল্লোলে অনন্তের আহ্বান শুনিতে শুনিতে

মহাযাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ভাগ্যনিয়ন্তা যেন তাঁহার শেষ শ্বাসটুকু রুদ্ধ করিয়া, যেখানকার আকাশে বাতাসে তাঁহার লোকান্তরিতা পত্নীর প্রাণবায়ু মিশিয়াছিল, সেই কলিকাতায় সেটুকু ত্যাগ করাইবার জন্য তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বক্ষণে অক্ষয়কুমার সেই ভাবটাই দেখাইয়াছিলেন, যেন কোনও মুক্তাত্মার ছায়াকায় তাঁহার মরণাহত নয়নপথে আসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে—তিনি যেন সেই ছায়ামূর্ত্তিকে একটু অপেক্ষা করিবার জন্য বারে বারে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। বহুবর্ষ পূর্ব্বে তিনি তাঁহার মৃতপত্নীকে উদ্দেশ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন।—

"সে সময়ে দিও দেখা।
নয়নে যখন ঘনাবে মরণ,
ধরণী হইবে ধূসর বরণ;
নয়নের তলে অতীত জীবন
স্বপনের সম লেখা!

* * * * *

অতি নিরুপায়, কোথা ছিল পড়ি'—
আজীবন স্মৃতি আসে হায় কবি।
প্রতি দিনে দিনে রহিয়াছে ভরি
কি গাঢ় কলঙ্ক দাগ।
নিজ পাপে তাপে অদৃষ্ট গড়িয়া
দেহ হতে আমি যাই বাহিরিয়া—
সে সময়ে কাছে দাঁড়াবে কি, প্রিয়া,
লয়ে চির অনুরাগ?"

বুঝি বা অক্ষয়কুমারের ইহজীবনের শেষ নিমেষপাতের সময় তাঁহার বহু দিনের হৃদয়ে পোষিত সেই সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। অন্ততঃ সেই বিশ্বাসকে পাথেয় লইয়া অক্ষয়কুমার যে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন, সেই চিন্তাতে মনে একটু সন্তোষ আসে। কারণ অক্ষয়কুমারের মনের অনেক সাধই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে—সংসারী মানুষের সাধও বটে, কবির সাধও বটে। সকল সাধ কাহারই পূর্ণ হয় না—কিন্তু অক্ষয়কুমারের সেই সাধগুলি পূর্ণ হইতে হইতেও অপূর্ণ রহিয়া

গিয়াছে—প্রবল ইচ্ছা থাকিতেও—উপায় থাকিতেও—তিনি যে সেগুলি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

এই কলিকাতায় চোরবাগানে অক্ষয়কুমারের যে পৈতৃক বসতবাটী ছিল, সেখানি নূতন রাজপথ Central Avenueএর কুক্ষিগত হইয়াছিল। অক্ষয়-কুমার প্রথমে সেই প্রাণপ্রিয় বাস্তুভিটাটুকু রাস্তার গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টায়, পরে তাহাতে বিফল হইয়া বাড়ীটার উচিত মূল্য পাইবার জন্য মোকদ্দমার তদ্বির করিতে এবং তাঁহার গৃহ-হারা পরিবারবর্গকে আশ্রয় দিবার উপযোগী অন্য একখানি বাড়ী কিনিবার জন্য, বিগত দুই বর্ষাধিককাল ব্যতিব্যস্তভাবে কাটাইয়া-ছিলেন। সেই সময়ে জীবন ধারণের জন্য যাহা না করিলে নয়, তাহা ব্যতীত অপর কিছু করিবার তাঁহার অবসরই ছিল না। দুর্ভাবনায় ও অতিরিক্ত শ্রমে তিনি স্বাস্থ্য হারাইয়াছিলেন, কিন্তু মোকদ্দমায় হারিয়া গিয়া আপীলের উদ্যোগ করিতে তখন তিনি এতই ব্যস্ত, পূজার ছুটীতে কয়েক দিন বিশ্রাম লাভের জন্য ময়ূরভঞ্জে যাইবার কথা দিয়াও, তিনি যাইতে পারিলেন না। সেই আপীলের বিড়ম্বনা আর তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই, কিছুদিন পরেই অধিকতর ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ বাস্তুভিটা ছাড়া হইয়া অক্ষয়কুমার প্রাণে একটা দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন। যে সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন—তাহার নিদান-তত্ত্ব যাহাই হউক, উক্ত মনঃকষ্টই যে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের অব্যবহিতপূর্ব্ব কারণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভাড়া-বাড়ীতে যাইতে তাঁহার ও তাঁহার জননীর একান্ত ইচ্ছা ছিল না, সেই কারণে একখানি বসতবাটী কিনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন—কিন্তু কোনও বাটীই তাঁহার ঠিক মনোমত হয় নাই। ফলে বাটী কিনিবার অর্থ থাকিতেও তিনি তাঁহার বৃদ্ধা জননী এবং অনুজ ও অনুজগণকে ভাড়া বাটীতে রাখিয়াই ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন।

ইহা ত গেল সাংসারিক নৈরাশ্যের কথা, অক্ষয়কুমারের কবিজীবনেও কয়েকটী বিষয়ে অতৃপ্তি রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার "কনকাঞ্জলি" কাব্যের তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হইয়া বহু দিন পড়িয়া আছে। প্রবল ইচ্ছা থাকিতেও তিনি উহা প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, তিনি কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়া ঐ গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখাইয়া লইবার আশায় উহা প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন

না। তিনি তিন জন খ্যাতনামা সুধী সাহিত্যিককে দিয়া তাঁহার "প্রদীপ", "শঙ্খ" ও "এষা" কাব্য তিনখানির ভূমিকা লিখাইয়া লইয়াছিলেন—কিন্তু "কনকাঞ্জলি" কাব্যের ভূমিকা লিখাইবার লোক স্থির করিতে পারিতে-ছিলেন না। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তকে বিশেষজ্ঞের লিখিত ভূমিকার সার্থকতা বুঝা যায়, নবীন লেখকের গ্রন্থে প্রবীণ সাহিত্যিকের লিখিত ভূমিকা প্রশংসাপত্রের কাজ করিতে পারে, কিন্তু অক্ষয়কুমারের কনকাঞ্জলির সেরূপ ভূমিকার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। এক দিন তাঁহাকে সে কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, তিনি তাহা বুঝিলেন না—অপরের দেখাদেখি পরকে দিয়া ভূমিকা লিখাইবার তাঁহার তখন একটা ঝোঁক চাপিয়াছিল। ফলে দুই বৎসরের পূর্ব্বের ছাপা কনকাঞ্জলির তৃতীয় সংস্করণ অপ্রকাশিত অবস্থাতেই রহিয়া গেল—কবির জীবিতকালে লোক-লোচনে আসিল না। কবিতাগুলির তিনি বহু যত্নে পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জন করিয়া-ছিলেন। শুনিলাম শেষে তিনি জনৈক বিখ্যাত বাগ্মী ও ঐতিহাসিককে কনকাঞ্জলির ভূমিকা লিখিয়া দিতে প্রতিশ্রুত করাইয়াছিলেন—কবির মৃত্যুর পূর্ব্বে হয় ত সে ভূমিকা লেখাও হইয়াছিল—কবির নিকটে তাহা পৌঁছায় নাই। আশা করি, সেই ভূমিকার সহযোগে কনকাঞ্জলির তৃতীয় সংস্করণ অচিরে প্রকাশিত হইবে।

এই ভূমিকা লিখাইবার আগ্রহ যে শেষ দশায় অক্ষয়কুমারের মনে যেন একটা দুর্ব্বলতায় দাঁড়াইয়াছিল, তাহা আরও দুই একটী ঘটনায় জানিতে পারিয়াছিলাম। অক্ষয়কুমার 'ওমারখায়াম' কাব্যের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। অনুবাদ তাঁহার কবিত্বপ্রতিভার যোগ্যই হইয়াছিল। সে পুস্তকখানি তিনি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অনুমান পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সেই পুস্তকখানি মুদ্রিত করিবার কথা বলিলে, তিনি এই নগণ্য লেখককে উহার একটী ভূমিকা লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমি সেই গৌরব গ্রহণের অযোগ্যতা জানাইলে তিনি আমার আপত্তির আন্তরিকতা বুঝিয়া সে বিষয়ে আর আমাকে অনুরোধ করেন নাই। আর একবার আমার লিখিত তাঁহার 'শঙ্খ' কাব্যের যে সমালোচনা ১৩১৭ সালের সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাই 'শঙ্খে'র ভূমিকা স্বরূপ ছাপাইবার কথা বলিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেই বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটী সুন্দর অনুবন্ধ 'শঙ্খে'র দ্বিতীয় সংস্করণে সংযুক্ত হইয়াছিল।

তাহার উপর আর একটী ভূমিকা অশোভন হইবে বলিলে, তিনি যুক্তি দেখাইয়াছিলেন—দুইটী ভূমিকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস হইবে—দ্বিতীয় ভূমিকাটীতে 'শঙ্খে'র কবিতাগুলির মধ্যে যে একটী ভাবের শৃঙ্খলা আছে, তাহা বুঝিবার সহায়তা করিবে। সেই শৃঙ্খলার খেই তিনিই আমাকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন—আমি কেবল সূতা টানিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার যুক্তি শুনিয়াও আমি দুইটী ভূমিকার সার্থকতা স্বীকার না করিলে তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন বুঝিয়া আমি তাঁহার বাসনার প্রতিকূলে আর কোনও কথা বলি নাই। 'কনকাঞ্জলি'র নূতন সংস্করণ ও 'ওমারখায়াম'র বঙ্গানুবাদ কবির জীবনান্তের পূর্ব্বে প্রকাশিত না হওয়ায় কবির নিজের মনেই একটা ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে, অপর কোনও স্থায়ী ক্ষতি হয় নাই, কারণ ভবিষ্যতে সে গুলি প্রকাশিত হইতে পারিবে। কিন্তু অক্ষয়কুমার 'চণ্ডীদাস' নামে যে একখানি নাটক লিখিতেছিলেন, তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া যাওয়াতে বঙ্গীয় রঙ্গভারতীর যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। অনুমান তিন বর্ষ পূর্ব্বে অক্ষয়কুমার ঐ নাটকখানির প্রথম তিন অঙ্ক লিখিয়াছিলেন। সেই সময়ে একদিন উহা পড়িয়া শুনাইয়া তিনি আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিয়াছিলাম—চমৎকার হইয়াছে—কাব্যাংশ খুব ভালই লেখা হইতেছে।" তিনি স্মিতমাণভাবে বলিয়াছিলেন, তাহা হইলে কি হইবে, উহা সহজে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে—বিপিনবাবু বলিয়াছেন, উহাতে চণ্ডীদাসের প্রেমিক ভাবটা ফুটিয়াছে, কিন্তু সাধক ভাবটা ফোটে নাই। নাটকখানি লিখিয়াই অক্ষয়কুমার উহা মহামনস্বী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইয়া আসেন। বিপিনবাবু কিছুদিন পূর্ব্বে অক্ষয়কুমারের 'এষা' কাব্যের একটী বিস্তারিত ও মনোজ্ঞ সমালোচনা লিখিয়া স্বকীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। সেই সূত্রে বিপিনবাবুর সহিত অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয়। অল্পদিনের সাহচর্য্যেই বিপিনবাবুর প্রতি অক্ষয়কুমারের শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। অক্ষয়কুমার যে সময়ে 'চণ্ডীদাস' নাটক রচনা করিতেছিলেন, সে সময়ে বিপিনবাবু কলিকাতা হইতে দূরান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। অক্ষয়কুমার একটী ছুটী উপলক্ষ্যে দুই দিন আফিস কামাই করিয়া ঐ নাটকখানি বিপিনবাবুকে শুনাইয়া আসেন—বিপিনবাবুর অভিমত জানিবার জন্য তখন তাঁহার এতই আগ্রহ। বিপিনবাবুর মন্তব্য অক্ষয়কুমারের মুখে শুনিয়া আমি

তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, তাঁহার 'চণ্ডীদাস' সাধক না হইলেও সুন্দর হইয়াছে—সেই প্রেমিক চণ্ডীদাসই তাঁহার কবিত্বের সুনাম রাখিতে পারিবে—তিনি নাটকখানি শেষ করিয়া ফেলুন। তিনি শেষ দুই অঙ্কে চণ্ডীদাসের সাধক ভাবটা ফুটাইবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু প্রথম তিন অঙ্ক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আর হাত না দেওয়াই ভাল। অক্ষয়কুমার সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না—বিপিনবাবুর আদেশ তখন অক্ষয়কুমারের নিকট যেন গুরুর আদেশ! তিনি প্রেমিক চণ্ডীদাসকে ভাঙ্গিয়া সাধক চণ্ডীদাসরূপে পরিণত করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু সাধক গড়িয়া তুলিবার সাধনা বোধ হয় তৎকালে তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হইল না। ফলে যে নাটক তখন তিন সপ্তাহে সমাপ্ত হইয়া যাইত, তাহা তিন বৎসরেও শেষ হইল না—শেষ দুই বৎসর মোকদ্দমার দুর্ভাবনায় ও রোগশয্যায় কবি কাটাইয়াছিলেন। পীড়িতাবস্থায় নাটকখানি শেষ করিবার জন্য তিনি অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছিলেন—তিনি চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের আদ্‌রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু গড়িবা তোলা তখন তাঁহার কায়িক ও মানসিক উভয় শক্তিরই অতীত। এইরূপ দুর্ব্বিপাকে বঙ্গবাণী শ্রেষ্ঠ কবিত্বের নিদর্শন একখানি উচ্চাঙ্গের নাট্যকাব্য হারাইলেন—সুসম্পূর্ণ হইলে অক্ষয়কুমারের "চণ্ডীদাস" রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী'র পার্শ্বে স্থান পাইতে পারিত। যাহা হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে অনুশোচনা নিষ্ফল। এক্ষণে যাহাতে অক্ষয়কুমারের সেই নাটকখানির যে তিন অঙ্ক তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার গুণগ্রাহিগণের সচেষ্ট হওয়া উচিত—প্রকাশিত হইলে সেই অসমাপ্ত নাটকই রসজ্ঞগণের যথেষ্ট আনন্দ বিধান করিতে পারিবে।

এই অসম্পূর্ণতার কথার সঙ্গে একটী সু-খবর পাইয়াছিলাম। অক্ষয়কুমার, তাঁহার গ্রন্থাবলীতে যে সকল কবিতা প্রকাশিত হয় নাই, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া একখানি নূতন খণ্ডকাব্য প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার সেই শেষ গ্রন্থখানির নাম দিয়া গিয়াছেন—'পাঠ' এবং মৃত্যুর দুই তিন দিন মাত্র পূর্ব্বে তিনি তাঁহার অনুজপ্রতিম কবিভ্রাতা শ্রীযুক্ত রসময় লাহা মহাশয়ের উপর ঐ গ্রন্থের কবিতাগুলি সাজাইয়া দিবার সম্পাদনের ভার দিয়া গিয়াছেন। যোগ্য পাত্রেই সেই ভার ন্যস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন ভাবি, কবি নিজে সেই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া যাইলে কবিতাগুলিকে কতভাবে সাজাইতেন—কতবার ভাঙ্গিতেন গড়িতেন—মুদ্রণকালেও কত পরিবর্ত্তন, পরিশোধন, পর্য্যায়ের

ব্যতিক্রম করিতেন, তখন বুঝিতে পারি কত নিরুপায় হইয়াই তিনি সেই ভার অপরের উপর দিয়া গিয়াছেন। সেই চিন্তায় অক্ষয়কুমারের নূতন পুস্তকখানির অস্তিত্বের সুসংবাদ পাইয়াও বিষাদে মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

কোনও কোনও কবি অবাধে অজস্র লিখিয়া সে রচনার পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। অক্ষয়কুমার সেরূপ ধাতুর কবি ছিলেন না। তিনি বহু চিন্তার পর অল্পই লিখিতেন এবং সে লেখাও যতক্ষণ ঠিক্ তাঁহার মতঃপূত না হইত, ততক্ষণ তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিমার্জ্জন করিতেন। দ্রুত রচনা এবং প্রথম উদ্যমেই অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে রচনা করিবার শক্তি নিশ্চয় প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই লক্ষণ দেখিয়া কবিত্বের বিচার হয় না— রচনার অনন্য সাধারণ উৎকৃষ্টতা দেখিয়াই কবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়— কবি সেই রচনা প্রথম উদ্যমে এক ঘণ্টায় লিখিয়াছিলেন কি বহু পরিবর্ত্তনের পর এক বৎসরে শেষ করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা দেখিতে যায় না। অক্ষয়-কুমার ভাবপ্রধান কবি ছিলেন—তিনি অত্যল্প কথায় গভীরতম ভাব প্রকাশ করিতেন। তাঁহাকে বিশেষ নির্ব্বাচন করিয়া শব্দ চয়ন করিতে হইত। সঙ্গীতসাধকের নিকট যেমন নাদ—ব্রহ্মস্বরূপ—অক্ষয়কুমারের নিকট তেমনি বাণী আরাধনার বস্তু ছিল। বাক্যের অসাধক প্রয়োগ তিনি কবির অমার্জ্জনীয় অপরাধ ভাবিতেন। তাঁহার মত কথার সদ্ব্যবহার অতি অল্প কবিই করিয়া থাকেন। শব্দসঙ্গীতের উপর, ছন্দের স্বচ্ছন্দ গতির ও মিলের পারিপাট্যের উপর, ভাষার সহিত ভাবের সামঞ্জস্যের উপর তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ভাষার শৈথিল্য ও বাহুল্য এবং ভাবের জড়তা তিনি একেবারে পছন্দ করিতেন না। যতক্ষণ না তাঁহার রচনা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ এবং হীরকের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, ততক্ষণ তিনি উহার পরিবর্ত্তন করিতেন এবং সেই চেষ্টার লক্ষণ চেষ্টার নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার কাব্যগুরু কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। বিহারীলালের মত অক্ষয়কুমারও তাঁহার কবিতাকে কোনও দিন ক্রীড়ার সামগ্রী বা অবসরকালে চিত্তবিনোদনের উপায়স্বরূপ বিবেচনা করিতেন না। কবিতা তাঁহার পরমযত্নের অতি মূল্যবান বস্তু ছিল। যাহা তাহা করিয়া তিনি কবিতা রচনা করিতেন না এবং বিশেষ নির্ব্বাচন না করিয়া কোনও কবিতা ছাপাইতেন না। সেই কারণে তাঁহার গ্রন্থাবলীতে আবর্জ্জনা নাই বলিলেই হয়।

তাঁহার "ভুল" নামক প্রথম কাব্যগ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ বহুবর্ষ পূর্ব্বে

নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। উহার পুনর্মুদ্রণ করিবার জন্য অনেক দিন ধরিয়া তিনি ইচ্ছুক ছিলেন।—কিন্তু কাঁচা হাতের লেখা তাঁহার পাকা চোখে ঠিক মনোমত হইতেছিল না—উহা পরিমার্জ্জন না করিয়া ছাপাইতে তাঁহার মন উঠিতেছিল না, অথচ সংশোধন করিতে গিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, কৈশোর-যৌবনের আবেগ উচ্ছ্বাস—প্রৌঢ়বার্দ্ধক্যের শৈত্যসংযমে ঢাকিলে সে কবিতার স্বরূপ রক্ষা করা কঠিন। সেই সংশয়ে পড়িয়া "ভুলে"র দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁহার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হইল না।

তিনি বিশেষ বিচার না করিয়া তাঁহার কাব্যগ্রন্থে কোনও কবিতাকে স্থান দিতেন না এবং অশেষ ক্লেশ স্বীকার না করিয়া কোনও গ্রন্থ ছাপাইতেন না। তিনি নিজে অতি যত্নের সহিত প্রুফ দেখিতেন—সেই কর্ম্মে পারদর্শী বন্ধুদিগের দ্বারা উহা সংশোধন করাইয়া লইতেন এবং শেষে তাঁহার সোদরাধিক সুহৃৎ পণ্ডিতবর ৺ভূদেবচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে দিয়া একবার দেখাইয়া না লইলে তাহার প্রুফ দেখা মনঃপূতই হইত না। সেই কারণে তাঁহার গ্রন্থাবলী নির্ভুল হইয়া প্রকাশিত হইত।

কবিতা তাঁহার অবসরের ক্রীড়নক ছিল না—কবিতাকে তিনি প্রাণস্বরূপ ভাবিতেন বলিয়াই কবিতা রচনায় ও প্রকাশে তিনি অত যত্ন লইতেন। তাঁহার কাব্যগুরু বিহারীলালের বিয়োগ-গাথায় তিনি লিখিয়াছিলেন—

"বুঝিয়াছি গুরো, কত তুচ্ছ যশ,
কিরূপা কবিতা—কত সুধারস,
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী!
পূত মস্ততায় মুগ্ধ দিক্ দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী।
"বুঝিয়াছি গুরো, কোথা সুখ মিলে
আপনার হৃদে আপনি মরিলে!
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্মপর।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যে হেরিলে
পারে লোটে চরাচর।
"বুঝিয়াছি গুরো কিবা শ্রেয় ভবে—

কি যোগ মত্ততা কবিত্ব-সৌরভে!
সুখদুখাতীত কি বাঁশরী রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি!
মন অন্ধ-মান-সার হয় হবে—
তুমি চির স্বপ্নে জাগি!"

কাব্যগুরুর উক্ত উচ্চাদর্শ, কঠিন জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলিয়া ভাগ্যবিধাতা হয় ত সকল বিষয়ে তাঁহাকে নিজজীবনে প্রতিফলিত করিতে দেন নাই; কিন্তু বিহারী-লালের কবিতার যে সুধারস, গবীয়সী ভাষা, সৌন্দর্য্য-স্তোতনা, কবিত্ব সৌরভ ও বাঁশরী-রব বাণীসাধনায় একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া অক্ষয়কুমার গুরুবন্দনা করিয়াছিলেন—তাহা যে তিনি ঐকান্তিক সাধনায় আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সকল কাব্য গ্রন্থেই উজ্জ্বলে মধুরে পরিস্ফুট।

কবির হৃদয় লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অপর অনেক বিষয়েই প্রতিকূল অবস্থায় থাকিয়া তাঁহাকে বাণী সাধনা করিতে হইয়াছিল। লোকে বলিয়া থাকে নগনদীসাগরকান্তারাদি স্বভাব-শোভার মধ্যে শৈশব বাল্য অতিবাহিত হইলে কবিত্বের উন্মেষে সহায়তা করে,—অক্ষয়কুমারের অদৃষ্ট বহিঃপ্রকৃতির সে সহায়তা লাভ ঘটে নাই। তাঁহার শৈশব বাল্য পল্লীজননীর শ্যামল অঙ্কে লালিত হয় নাই—তিনি এই ধূলিধূসর জনাকীর্ণ কলিকাতা সহরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চোরবাগানের একটা সঙ্কীর্ণতম গলির মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট অট্টালিকাশ্রেণীর প্রান্তভাগে তাঁহার পৈত্রিক বাসভবন ছিল। সেই খানেই শীতের সন্ধ্যায় ধূমাচ্ছন্ন আকাশ, বর্ষার প্রভাত কর্দ্দম-পিচ্ছিল রাজপথ দেখিতে দেখিতে এবং বাটীর পশ্চাতের বস্তির কলহ কোলাহল শুনিতে শুনিতেই তাঁহার শৈশব-বাল্য কৈশোর কাটিয়া যায়।

সহরের মধ্যে বাস করিয়াও কিন্তু তিনি তাঁহার বিধিদত্ত কবির হৃদয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন—সুন্দরের প্রতি অনুরাগ, ভাবুকতা, আবেগ, ঔদার্য্য চিরদিনই তাঁহার অন্তরে আধিপত্য করিত। তাঁহার গৃহের পরিচ্ছন্নতায়, সামান্য আসবাব পত্রের ও পাঠ্য পুস্তকাদির সংস্করণ নির্ব্বাচনে, লিখিবার ও পড়িবার সরঞ্জামের সুদৃশ্যতায় ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের খুঁটি-নাটিতে তাঁহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য বোধ প্রকট হইত। সহরের বাহিরে যাইয়া স্বভাবসুষমাদর্শনের আগ্রহে বিশেষতঃ বারে বারে পুরীতে গিয়া সমুদ্র দর্শনের ব্যগ্রতায় তাঁহার মনের উপর প্রাকৃতিক দৃশ্যের আকর্ষণ প্রকাশ পাইত। প্রকৃতির সহিত সহানুভূতি ও স্বভাব

সৌন্দর্য্যের প্রভাব তাঁহার হৃদয়ে কত প্রবল ছিল,, তাহা হিমালয় ও সাগর-দর্শন করিয়া আসিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তুষারকিরীটী হিমাদ্রির বিরাট গম্ভীর শোভা দেখিয়া তিনি স্ত্রীবিয়োগের ব্যথা হইতে আত্মবিস্মৃতি-প্রথমোল্লাস উপভোগ করেন এবং পরে মহাসাগরের মহাদৃশ্য তাঁহাকে সেই শোকজয়ে সহায়তা করে। উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল নীলাম্বুর অতল সলিলবিস্তার দেখিতে দেখিতে শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার মানস-নয়নে অনন্ত বিশ্বের সহিত তুলনায় মানব কতই ক্ষুদ্র এবং তাহার সুখ দুঃখ, জীবন মরণ কত তুচ্ছ, সেই সত্য প্রতিভাত হয়। পুরীধামের সাগরসৈকত হইতে যেখানে অনন্ত আকাশ অসীম সাগরের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া কবি তাঁহার অন্তরের প্রকৃত অনুভূতির প্রতিধ্বনি করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন—

"ওই দূর—চক্রবালে
রহস্যের অন্তরালে
আভাসে প্রকাশ পায় সে আদিকিরণ!
কোথা—তুমি বিশ্বস্বামী!
কোথা—ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি!
কত তুচ্ছ সুখ দুঃখ, জীবন মরণ!"

অক্ষয়কুমার জীবনোপায়ের জন্য যে কর্ম্ম করিতেন, তাহাও কবিত্ববিকাশের অনুকূল ছিল না। তিনি কোনও জীবন বীমা আফিসে বুক কিপারের কর্ম্ম করিতেন। যদিও সেইরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার পক্ষে সাধককবি রাম প্রসাদের উচ্চ নজির আছে, তথাপি বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের সময় যখন অক্ষয়কুমার ক্লান্তদেহে বাটীতে ফিরিতেন, তখন তাঁহার বিশুষ্ক মুখের চিন্তাক্লিষ্ট উদ্বিগ্নভাব দেখিলে মনে হইত, সংসারে এত কর্ম্ম থাকিতে অক্ষয়কুমারের অদৃষ্টে তেমন কর্ম্ম জুটিল কেন? তিনি নিজেও সেই আক্ষেপ কবিতা বহুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন—

"পঞ্চদশ বর্ষ গত!
কে জানে এমন বিধির লিখন—
দাসত্বে হইব রত!
এত খচনচ এ জমা খরচ
হিসাব নিকাশ দায়,

ব্যাজে খতীয়ানে কলঙ্কিত প্রাণে—
জীবন যাপিব হায়!"

ইহার উপর মধ্যে মধ্যে তাঁহার পেটে একটা কঠিন ব্যথা ধরিয়া তাঁহাকে কখনও কখনও দুই তিন দিন দারুণ যাতনায় অস্থির করিয়া রাখিত। সেই বেদনার যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে না পাইতে তিনি যখন আফিসে হিসাব মিলাইতে যাইতেন, তখন তাঁহার মুখে কে যেন একটা বিরক্তির ছাপ মারিয়া দিত। সেরূপ অশান্তির অবস্থাতেও কিন্তু তিনি তাঁহার করিজন-সুলভ উদার সৌজন্য হারাইতেন না। সে সময়েও কোনও বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলে চকিতে তাঁহার বিষণ্ণ আনন প্রসন্ন হইয়া উঠিত এবং তিনি তাঁহার সকল দুর্ভাবনা ও শ্রান্তি ভুলিয়া গিয়া সদালাপে তন্ময় হইয়া যাইতেন। যাহারা অক্ষয়কুমারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, অমন অমায়িক সদালাপী অকপট হিতৈষী বন্ধু সহজে দেখা যায় না। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ সহজাত জ্ঞান ছিল এবং সংসারের অভিজ্ঞতার বিষয়বুদ্ধিও প্রখর হইয়াছিল। সেই কারণে বিপদে পড়িলে অনেকেই তাঁহার নিকট পরামর্শ ও সাহায্য লইতে যাইত। তিনি কোনও বন্ধুর উপকারে আসিলে যেন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। আবার নিজে কাহারও নিকট কোনও উপকার পাইলে তাঁহার মত প্রাণ খুলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে অপর কাহাকেও বুঝি দেখি নাই। তিনি তাঁহার নিজের ক্ষমতা অক্ষমতা নিজে যেমন বুঝিতেন, অপর কেহ বোধ হয় ততটা বুঝিত না। কিন্তু তবু যদি কেহ তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসাটুকু তাঁহাকে জানাইত, তাহাতেই তিনি যেন কৃতজ্ঞতায় গলিয়া যাইতেন। তিনি যেমন অপরের কেবল গুণটুকু ধরিয়াই, অকপটে প্রশংসা করিতে পারিতেন, তেমনি নিজের সুখ্যাতিও সরল প্রীতিতে গ্রহণ করিতে পারিতেন—সেই সন্তোষ লাভে তাঁহার মনে অহমিকার কণামাত্রও কখনও স্পর্শ করিত বলিয়া বোধ হইত না। তিনি প্রফুল্লবদনে বিনয়নম্র ভাবেই তাহা গ্রহণ করিতেন। কখনও কখনও হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে, প্রশংসাকারী বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে তাঁহার পদধূলি লইতেন—বয়ঃকনিষ্ঠ বা সমবয়স্ক হইলে তাঁহাকে বাহুপাশে বাঁধিতেন। প্রশংসাগ্রহণের এমন সরল ও শোভন ভাব অল্প লোকেরই দেখিয়াছি।

এ সংসারে গুণের আদর সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সুখের বিষয় অক্ষয়কুমার সে বিষয়ে ভাগ্যবান্ ছিলেন। তিনি সুকবি বলিয়া সাহিত্যসংসারে

P30642

যশস্বী হইয়াছিলেন এবং নিজেও শেষ জীবনে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় সে বিষয়ে তাঁহার মনে যে সংশয় ছিল, শেষ দশায় তাহা কাটিয়া গিয়াছিল। কনকাঞ্জলির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ১৩০৪ সালে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আজ সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে 'কনকাঞ্জলি'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালী কবির সুনাম বা সমালোচনা কর্ণবিনোদন মাত্র।" তাহার এক যুগ পরে প্রথমে "শঙ্খ" এবং শেষে "এষা" প্রকাশিত হইলে অক্ষয়কুমারের সেরূপ পরিতাপের আর কারণ ছিল না। তিন বৎসরের মধ্যেই "শঙ্খে"র এবং বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে "এষা"র দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছিল। বাঙ্গালা কবিতাপুস্তকের পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে।

"প্রদীপ" কাব্যের 'উপহার' কবিতায় তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"গীত অবশেষে নিশ্বসিল কবি—
বল কি গাহিব আর—
মরমের কথা ফুটিল না ভাষে
বাজিল না হৃদি তার!"

পরবর্ত্তী কালে কবির সেরূপ নৈরাশ্যের বা আত্মগ্লানির কোনও হেতু ছিল না। কারণ তাঁহার অপরাপর কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অন্ততঃ "এষা"র চিত্র যে তাঁহার মনের মত হইয়াই সমুজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেও বুঝিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় কাব্যরসজ্ঞগণ উচ্চকণ্ঠে উহার জয়গান করিয়া, উহা যে সমবেদনায় পাঠকের প্রাণের তারে সাড়া তুলিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

এ যুগের প্রধানতম কবি রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ে বাঙ্গালার যে প্লাবন আসিয়াছে, তাহা যখন কালস্রোতে অপসৃত হইবে, তখন সেই বিপরীত টানের প্রতিকূলে অক্ষয়কুমারের কবিতা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি না, সেই সুদূর ভবিষ্যতের প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। সে প্রশ্নের উত্তর কালগর্ভে নিহিত। তবে যখন স্মরণ করি, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ওতপ্রোত এই গীতি-কবিতার যুগে অক্ষয়কুমার স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া তাঁহার কবিত্বের সুষমা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তখন মনে হয় তাঁহার রচনা কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে না—অন্ততঃ তাঁহার "এষা" যে অনন্যসাধারণ বিশেষত্বগুণে কালজয়ী হইবে, সে আশা দুরাশা বলিয়া বোধ হয় না।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের মৃত মহাত্মগণের স্মারক কবিতা পুস্তক "তর্পণ" প্রকাশের পর, বঙ্গসমাজের ও বঙ্গ-সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন জীবিতব্যক্তির উদ্দেশে এক একটী চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়া "দর্শক" পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সেই সময়ে অক্ষয়কুমারের উপরও একটী সনেট্ লিখিয়া উক্ত দর্শকপত্রে প্রকাশ করি। তাঁহার যাহা প্রাপ্য, মনের অটল বিশ্বাসে তাহাই লিখিয়াছিলাম; অযথা স্তুতিবাদ করি নাই—তবুও বন্ধুর গুণবন্দনায় মনে যেন সে সময়ে একটা কুণ্ঠা অনুভব করিয়াছিলাম। এখন তিনি ইহলোকে নাই—আজ আমার মন হইতে সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ মুছিয়া ফেলিয়া, সেই কবিতাটীর পুনরাবৃত্তি করিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছি—

আসিলে বাণীর দ্বারে কম্পিত চরণে,
পূজিতে মায়ের দু'টী-চরণ রাতুল;
পাছে উষা-ঘোরে কিছু হ'য়ে থাকে 'ভুল',
সুগন্ধি 'প্রদীপ' জ্বালি, সপুষ্প চন্দনে,
'কনক অঞ্জলি' দিয়া বাজালে সঘনে,
শুভ 'শঙ্খ'—ধ্বনি যার অব্যক্ত আকুল,
হৃদয়ের রক্তনদী প্লাবিয়া দুকুল,
মূর্ত্ত করি দিলা 'এষা' তোমার স্মরণে।

পূজা সাঙ্গ প্রায় এবে, সন্ধ্যা নেমে আসে,
ষড়ঋতু মুখরিত স্তবে—গীতিরবে,
হেব সখা কি তৃপ্তিতে দেবীমূর্ত্তি হাসে!
বিমল, সরস, ফুটপ্রসূন যে সবে
পূজিলে বাণীরে, তা'র মন্দার সুবাসে
শ্রীমন্দির আমোদিত-আনন্দে—গৌরবে।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিবা পূর্ব্বে তাঁহার গুরু ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনচরিত পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে, ইহাঁর পূর্ব্ব-জন্মের বহু তপস্যা সঞ্চিত ছিল। বাল্যাবধিই ভগবদ্বিষয়ে তাঁহার একটা প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়। বিশেষতঃ "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভি-জায়তে"—পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতা, শুচিশীলা সাধ্বী মাতা, প্রাক্তন পুণ্যফলেই লাভ করিয়াছিলেন। গৃহে দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—ভক্তিসহকারে তদীয় পূজার্চ্চা হইত। সাধু সন্ন্যাসীর একটা আড্ডা—তাহার বাড়ীর নিকটে জনৈক ভক্ত গৃহস্থের অতিথিশালায় ছিল—তিনি ঐ স্থানে গিয়া সতত সাধুসঙ্গ করিতেন। লেখা পড়া না শিখিলেও স্মরণশক্তি দেখা যায় বেশ ছিল—সাধুদের মুখে যে সকল শাস্ত্রকথা * ও যাত্রা ইত্যাদিতে যে সব গান শুনিয়াছেন, তত্তাবৎ যথেষ্ট মনে রাখিয়াছিলেন।

তারপর ভাগ্যক্রমে ভ্রাতার সঙ্গে ৺ কালীমন্দিরের সেবার সহকারী হইলেন। প্রাণটি প্রাক্তন সুকৃতিবশতঃ সরল ছিল—লেখাপড়ার—বিশেষতঃ এ যুগের পাশ্চাত্যগন্ধি শিক্ষার দ্বারা চিত্তবৃত্তি বিকৃত হয় নাই। তাই অনন্যমনা হইয়া জগন্মাতার অর্চ্চনা করিতে পারিয়াছিলেন। ফল শীঘ্রই ফলিল—ভগবৎসাক্ষাৎ-কারের জন্য ব্যাকুলতা আসিল। শ্রীভগবানে চিত্তের প্রগাঢ় অভিনিবেশ হইলে যাহা হয়, তাহা আমরা ধ্রুবচরিত্রে দেখিতে পাই। এখানেও সাধনপথের প্রদর্শক গুরু উত্তরসাধক 'তোতাপুরী' 'ব্রাহ্মণী'—ইত্যাদি জুটিতে লাগিলেন।

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ। * * * আমি মূর্খোত্তম।

একজন ভক্ত। তা হ'লে আপনার মুখ থেকে যে বেদান্ত—তা ছাড়া আরো কত কি—বেরোয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) কিন্তু ছেলে বেলায় যাহাদের ওখানে (কামার পুকুরে) সাধুরা যা পড়তে বুঝতে পারতাম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪র্থ ভাগ—৯২ পৃষ্ঠা।

সাধনার সনাতনপদ্ধতিতে কাজ করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিলেন, তাহাতে সনাতন ধর্ম্মসাধনের উপায়গুলির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইল। যখন নিরাকারোপাসনা ও সনাতন সাধনপথ অসার বলিয়া পৃষ্টান ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় হিন্দু-সমাজের উপর আঘাত করিতেছিলেন, তখন এই রামকৃষ্ণ পরমহংসের অভ্যুদয় সমাজের কল্যাণার্থেই ঘটিয়াছিল। তাঁহার অহর্নিশ অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে মনোনিবেশ—ভগবদ্বিষয়িণী কথা ভিন্ন অন্যপ্রসঙ্গে পরাঙ্মুখতা, কামিনী ও কাঞ্চনে অনাসক্তি, বালকের ন্যায় সরলতা, ইত্যাদি অনন্যসাধারণ অবস্থা দেখিয়া হিন্দুর ত কথাই নাই, যাঁহারা সনাতনপথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন—অনেকে পুনশ্চ এ পথে ফিরিয়া আসিলেন।

রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতেও নানা সাধু সন্ন্যাসী সজ্জনের সমাগম হইত; তাঁহাদের কাছ হইতেও নানাতত্ত্ব তিনি জ্ঞাত হইতেন। এইরূপ বাল্যে ও সাধনাবস্থায় সাধুসঙ্গ এবং গুরু ও উত্তর সাধকের নিকট হইতে তিনি অধ্যাত্ম জ্ঞান আহরণপূর্ব্বক নিজের সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা ঐগুলি সংযত করিয়া সরল ভাষায় যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহা অতি অমূল্য জিনিষ—এ সকল দ্বারাও হিন্দুসাধারণের অতিশয় উপকার সাধিত হইয়াছে।

তাঁহার কাছে আসিয়া যাঁহারা উপকৃত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এমনও দুএকজন ছিলেন, যাঁহারা ঈদৃশ অপর কোনও সাধু মহাত্মা দেখেন নাই বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে 'অবতার' বলিয়া খ্যাপিত করিতে লাগিলেন। ৺ রামচন্দ্রদত্ত মহাশয় তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন। এতদ্দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের অনিষ্ট সাধিত হইল। বালকের ন্যায় সরলস্বভাব পরমহংস অনবরত এই "অবতার" ভাবে সংস্থিত হইয়া পরিশেষে নিজেকে যেন তাহাই মনে করিতেন—শেষ অবস্থার যে সকল কথোপকথন "কথামৃত" প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা হইতে (ভক্তের অত্যুক্তি পদ বর্জ্জন করিলেও) আমরা যেন ইহাই দেখিতে পাই। শ্রীশ্রীজগদম্বার একান্ত নির্ভরশীল ভক্ত ও সাধক রামকৃষ্ণদেব বার বছর আন্দাজ অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা এই "অবতার" সাজিয়া দ্রুত ক্ষয়িত হইতে লাগিল—পরিশেষে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বৎসরাধিককাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

কেবল যে তাঁহার নিজের অনিষ্ট হইল এমন নহে, তাঁহার সাধনার জীবনে যে সদ্দৃষ্টান্ত সমাজের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিল—শেষে, কতকটা 'অবতার' বলিয়াই হউক, বা পীড়াগ্রস্ত বলিয়াই হউক, তিনি তাঁহার পূর্ব্বজীবনের আদর্শানু-

বাণী জীবনযাপন করিতে পারেন নাই—ইহাতে সন্ন্যাস বা অবধূত আশ্রমের সমুন্নত ভাবের কিছুটা খর্ব্ব হইল—তাহাতে সমাজেরও কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইল।* তবে এটা বরং অতি সামান্য, কিন্তু এই 'অবতার'বাদের দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া কতস্থানে যে কত 'অবতার' দেখা দিতে লাগিলেন—এবং কত উদ্ভট আচরণ ও উপদেশ দ্বারা যে সমাজের কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা যাহারা পূর্ব্ববঙ্গের কোনও অবতারবিশেষের কথা সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁহাদের অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পরন্তু পরমহংস রামকৃষ্ণের 'অবতারবাদ'টা প্রথমতঃ তেমন জমাট বাঁধে নাই। ভক্ত-রামচন্দ্র-কৃত জীবনচরিত অথবা অক্ষয়কুমার সেন-রচিত কাব্যে অবতারবাদের কথা থাকিলেও সাধারণে ঐ কথা শিষ্যের গুরুস্তুতি মাত্র মনে করিয়াছিল। এই অবতার-বাদের অবতারণা দেখিয়াই বোধ হয়, রামচন্দ্র দত্ত-কৃত জীবনচরিতখানি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ছাপাইবার জন্য নিয়াও তাহা প্রকাশিত করিতে নিরস্ত হন।

কিন্তু যখন স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম্ম-সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়া হঠাৎ লোকসমক্ষে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িলেন, তখন রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ অবাধে মনের সাধে গুরুর মহিমা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও তখন নানা কাহিনী প্রচারিত হইতে লাগিল।

এতক্ষণে আমরা আমাদের প্রবন্ধের নায়কের নিকটে উপস্থিত হইলাম। স্বামী বিবেকানন্দ একজন অতি বড় লোক। অকস্মাৎ হইলেও যখন আমরা তাঁহার প্রথম বার্ত্তা পাইলাম—চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিলাম—তখনই বুঝিলাম, এ ব্যক্তি যে-সে লোক নহেন। অদম্য সাহস, দৃঢ় অধ্যবসায়, ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় ও দর্শন শাস্ত্রে প্রগাঢ় অধিকার, অসামান্য বাগ্মিতা, ইত্যাদি এই এক ব্যাপারেই সূচিত হইয়া পড়িল। বিশাল চীন সাম্রাজ্যকে পরাভূত করিয়া ক্ষুদ্র জাপান যেমন সহসা আমাদের নিকটে এক পরাক্রান্ত রাজ্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল—বিবেকানন্দও, যে পাশ্চাত্য ভূভাগ হইতে মিশনারীরা আসিয়া এ দেশের সনাতন ধর্ম্মের নিন্দাবাদপূর্ব্বক

* যথা, স্ত্রীর সেবা গ্রহণ—
শ্রীরামকৃষ্ণ। * * আমার নাগ (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায় হাত বুলায়ে দেয় * *।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৪র্থ ভাগ ৯০ পৃষ্ঠা।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন—সেই পাশ্চাত্য দেশে গিয়া সমগ্র সভ্যজগতের নানা ধর্ম্মাবলম্বীর সমবেত ধর্ম্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়া বিজয়মাল্যে বিভূষিত হইয়া আমাদের নিকটে এক অতি মহান্ পুরুষসিংহরূপে আবির্ভূত হইলেন। সমগ্র ভারতে তাঁহার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল—নানাদিদেশ হইতে তাঁহার নিকটে অভিনন্দনপত্র প্রেরিত হইল। তারপর জাপান যেমন রুষিয়াকে পরাভূত করিয়া সমধিক গৌরবান্বিত হইল—বিবেকানন্দও আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার তথা অনেক শ্বেতকায় নরনারীর গুরুরূপে পূজা লাভ করিয়া বরেণ্য হইলেন। তখন এ দেশের লোক তাঁহাকে সমধিক আদরের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ভারতবর্ষের যে যে স্থানে উপস্থিত হইলেন, সর্ব্বত্রই রাজোচিত অভ্যর্থনা লাভে আপ্যায়িত হইলেন। জাপানের গৌরবে যেমন সমগ্র এশিয়া গৌরব বোধ করিয়াছে—বিবেকানন্দের বিজয়লাভে তেমনি ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের সমুদয় হিন্দু গৌরবানুভব করিয়াছে। তারপর জাপান সম্বন্ধে যাহা, বিবেকানন্দসম্বন্ধেও তাহাই—অন্ততঃ সনাতন ধর্ম্মবিশ্ববাসীর কাছে ঘটিয়াছে। জাপানের গৌরবে আমরা যতই স্ফীতবক্ষা হই না কেন—এখন দেখা গেল এটা এক পাশ্চাত্যের একান্ত অনুকরণে গঠিত—প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা-বিবর্জ্জিত—চাকচিক্যময় সভ্যতা, পরিণামে যে কি হইবে, তাহা ভগবান্ই জানেন; জাপানীরা আপনাদের স্বার্থমাত্র ষোলআনা বুঝে—এশিয়াবাসীরা উঠিয়া দাঁড়াক, এমন কল্পনা আপাততঃ উহাদের মধ্যে মোটেই দেখা যাইতেছে না। এই যুদ্ধের সময় যে সকল মাল জাপান ভারতবর্ষে চালাইয়াছে—তাহাতেই এরা কতদূর প্রবঞ্চক দেখা গিয়াছে এবং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি।

প্রোজ্জ্বল মযূখমণ্ডিত মার্ত্তণ্ডের বিম্বে আপাতদৃষ্টিতে রশ্মিচ্ছটা ব্যতিরেকে অপর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না—পরন্তু কোনও ক্রমে কিরণমালা অপসৃত হইলে যেমন তাহাতে উৎপাতসূচক ভীষণ কৃষ্ণগহ্বররাজি লক্ষিত হয়—সেইরূপ স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যদিগ্‌বিজয় করিয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ক্রমশঃ যখন তাহা হইতে বিজয়শ্রীর আবরণ সরিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহাকে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইলাম, তখন তাঁহার ভিতরকার ভাব আমরা অনেকটা ধরিতে পারিলাম, বুঝিলাম সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর লণ্ডভাঘাতই যেন ইঁহার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়। কথাটা ক্রমশঃ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ ধরা যাউক, বিবেকানন্দের সন্ন্যাসগ্রহণ। * অর্থাৎ তিনি যে নামে † নিজেকে জগদ্বিখ্যাত করিয়াছেন—সেই নামের তিনি কতটা অধিকারী। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস হইতে সন্ন্যাসে দীক্ষালাভ করেন। সেই দীক্ষার ইতিহাসটুকু এই—

"এই সময়ে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রাদি কয়েকজন যুবক ভক্তকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? তাঁহারা তাঁহার বাক্যে অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ পল্লীমধ্যে ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তিনি এতদ্দর্শনে বুঝিলেন—তাঁহারা প্রকৃতই বৈরাগ্যবান্ ও নিরহঙ্কার এবং অতিশয় সৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বহস্তে গেরুয়া প্রদান ও সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।"

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু—কৃত "স্বামী বিবেকানন্দ" ১ম খণ্ড ১৩৯ পৃঃ। এই সময়ে অর্থাৎ মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে যখন পরমহংস ক্যান্সার রোগে পীড়িত

* প্রসঙ্গতঃ একদিন স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলাপ হয়—(বৈশাখ ১৩২৩; হাওড়ার শঙ্কর মঠের শ্রীযুক্ত পরমানন্দপুরী মহারাজও সেখানে ছিলেন)। স্যার গুরুদাস বলিয়াছিলেন, যখন বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন, তখন কেহ কেহ [স্যার গুরুদাস নাম বলিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা খুব স্পষ্টরূপে মনে না থাকায় উল্লেখ করিলাম না] আসিয়া তাঁহাকে বিবেকানন্দের অভিনন্দনসভায় সভাপতিত্বের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন "আপনারা যদি 'স্বামী বিবেকানন্দ' না বলিয়া 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত' বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন দেন, তা হ'লে আমি সভাপতি হইতে পারি।" যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাব গতিক বুঝিয়া সরিয়া পড়েন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা সতর্ক সাবধান—তাঁহারা পূর্ব্বাবধিই বিবেকানন্দের পরিচয় পাইয়াছিলেন।

† এই নাম সম্বন্ধেও বেশ বহস্য আছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু এন-এ, বি-এল, প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দ" (২য়খণ্ড সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠায়) আছে—"তাঁহার যে বিবেকানন্দ নাম হইয়াছিল, তাহা তাঁহার গুরুভাইয়েরা কেহ জানিতেন না—কারণ স্বামিজী আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি পরিচিত লোকদের হাত এড়াইবার জন্য অনেকবার নিজনাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কখনও নিজকে 'বিবিদিষানন্দ' কখনও 'সচ্চিদানন্দ' কখনও বা অন্য কিছু বলিয়া পরিচয় দিতেন। অবশেষে খেতড়ীর রাজার একান্ত অনুরোধে বিবেকানন্দ নামই বজায় রাখিয়াছিলেন।" ইহাদ্বারা যেন বোধ হয় 'বিবেকানন্দ' এই নাম শ্রীরামকৃষ্ণপ্রদত্ত নহে। অপিচ ইহা হইতে বিবেকানন্দের প্রকৃতিরও অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

হইয়া কাশীপুর বাগানে অবস্থিত; তিনি তখন 'অবতার'। সুতরাং তাঁহার কার্য্যের উপর কার কি বলিবার সাধ্য! পরন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা 'অবতারত্বে' আস্থাবান্ নহি—অপিচ ঈদৃশ উদ্ভট অনুষ্ঠান দ্বারা সমাজের অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে। বিবেকানন্দ কায়স্থসন্তান; কায়স্থেরা শূদ্র—'সৎশূদ্র'; ইদানীং ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীদার—কিন্তু সেই দাবি কতটা বিচারসহ বলিতে পারি না। * বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের পরেই উপনয়নের বাড়াবাড়ি হইয়াছে—কিন্তু স্বধর্ম্মে প্রকৃত আস্থাবান্ অতি কম কায়স্থই ঐ দলভুক্ত হইয়াছেন। † সে যাহা হউক, উপনয়নাদি সংস্কার নাই, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম নাই, তথাপি 'সন্ন্যাস' ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গেলেন! 'অধিকারী' 'অনধিকার' বিচার, সন্ন্যাস দীক্ষার শাস্ত্রানুযায়ী পদ্ধতি, ইত্যাদির কথা নাই তুলিলাম। রামকৃষ্ণ একদিন ভিক্ষাটা দেখিয়াই 'বৈরাগ্যবান্' 'নিরহঙ্কার' স্থির করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনি তো স্বয়ং নিজনাম রামকৃষ্ণ পরিত্যাগ করেন নাই—অথচ সন্ন্যাসীর ন্যায় গেরুয়া কাপড়ও পরিধান করেন নাই—কেন না ইহাতে 'অভিমান' হয়। (রামচন্দ্র দত্তকৃত পরমহংস দেবের জীবন বৃত্তান্ত—৩য় সংস্করণ ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বিবেকানন্দ, 'স্বামীজি' সাজিয়া গেরুয়া পরিয়া রাজারাজড়ার মাথায় পা দেওয়া তো অল্প কথা, ব্রাহ্মণকে পর্য্যন্ত শিষ্য করিয়া, তাঁহার দ্বারা পদসেবা করাইয়াছেন। (দৃষ্টান্ত 'স্বামিশিষ্য সংবাদ' প্রণেতা)। * তারপর জাতি-

---

* নিষ্টার নিবেদিতার লিখিত স্বামীজির সহিত ভ্রমণকাহিনীতে আছে "। * বর্ত্তমান বাঙ্গালী কায়স্থেরা যে প্রাক্ মৌর্য্য ক্ষত্রিয়জাতির বংশধর, এ সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। (স্বামী বিবেকানন্দ ৮৩৭পৃঃ) অপিচ কোন মিত্রগৃহিণী স্বীয় পত্রে 'দাসী' লেখায় আপত্তি করিয়া তিনি তাঁহাকে ক্ষত্রিয়া বলিয়া 'দেবী' লিখিতে উপদেশ করিয়াছিলেন।

(স্বামীজির পত্রাবলী ১ম ভাগ ৪পৃষ্ঠা।

† মণিপুরী, কাছাড়ী, কোচ, তিপ্‌রা প্রভৃতি অনেক জাতিই "উপবীতধারী" ক্ষত্রিয় সাজিয়াছে—ইহাতে 'ক্ষত্রিয়ত্ব' খ্যাপনপূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ তেমন গৌরবজনকও রহে নাই। বুদ্ধিমান্ কায়স্থগণ অবশ্যই এইটুকু বুঝিয়াছেন—তাই উপনয়নান্দোলন এখন মন্দবেগ হইয়া পড়িয়াছে।

* এই বিষয় তিনি তাঁহার কোনও ভক্ত আমেরিকান স্ত্রীলোককে লিখিয়াছিলেন—"আর প্রিয়ম—এই পা দু'খানা বোধ হয় শ'খানেক রাজবংশীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধোয়ান মুছান হইয়াছে ও পূজা পাইয়াছে" (স্বামী বিবেকানন্দ চতুর্থ ভাগ ৭৪৩ পৃষ্ঠা)। "একলা আহারাদির পর শরৎবাবু (শিষ্য চক্রবর্ত্তী) তাঁহার (গুরু স্বামীজির) পদসেবা করিতেছিলেন।" ঐ ৯০০ পৃষ্ঠা [ভবিষ্যতে ঐ 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ 'বিঃ' অক্ষর দ্বারা সূচিত হইবে।]

ভেদটা যে একটা কাল্পনিক, এটা কেবল মুখেই বলিয়াছেন, তাহা নহে, যদৃচ্ছাক্রমে যাকে তাকে উপনয়ন প্রদানপূর্ব্বক 'দ্বিজ' বানাইয়াছেন। নীলাম্বর বাবুর বাগানে শিষ্যদ্বারা অনেকগুলি পৈতার যোগাড় করিয়া বলিলেন—"* * * আজ ঠাকুরের (অর্থাৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের) জন্ম দিন। যে সব ভক্ত আজ এখানে আস্‌বে, তাদের সকলকেই আজ পৈতে পরিয়ে দিতে হবে। দ্বিজাতি মাত্রেরই উপনয়নসংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। এরা সব ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত সংস্কার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রে বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই আবার উপনয়নসংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। * * *" তারপর এ ভাবে পৈতা পরা হইলে, বলিলেন—"কালে দেশের সকলকেই ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নাই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই।" ইত্যাদি (বিঃ ৮০৪—৫ পৃষ্ঠা) আর ব্রাহ্মণদের প্রতি স্বামীজির কি অগাধ প্রেম! তাঁহার অভিধানে "ব্রাহ্মণ" শব্দ "দুষ্ট পুরুত" দ্বারা অভিহিত। স্বামীজি এই 'দুষ্ট পুরুত'দের সম্বন্ধে বলিতেছেন—"এস মানুষ হও। প্রথমে 'দুষ্টপুরুত'গুলোকে দূর কোরে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন ভাল কথা শুন্‌বে না—তাদের হৃদয় শূন্যময়, তারও কখন প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে তাদের জন্ম; আগে তাদের নির্ম্মূল কর। এস মানুষ হও।" মান্দ্রাজী বন্ধুদের নিকটে লিখিত ইংরেজী পত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ (পত্রাবলী নং ৩—প্রথম ভাগ ১৬পৃষ্ঠা) "দুষ্ট পুরুত'গুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল? তাতেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্চে।" ঐ নং (৮) মান্দ্রাজি শিষ্যের নিকট লিখিত ইংরেজী পত্রের অনুবাদ। ৪৯ পৃষ্ঠা।

"আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন দুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন। পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে।" ইত্যাদি মান্দ্রাজীদের প্রতি। ঐ নং ২১—৬৪ পৃঃ অলমতিবিস্তরেণ। (ক্রমশঃ)

---

* বিবেকানন্দের এই ব্রাহ্মণদ্বেষ তদীয় অনুচরবর্গের হৃদয়ে কিরূপ ক্রিয়া করিতেছে, তাহার উদাহরণ দিতেছি। "উপাসনা" পত্রিকায় একজন "পতিত ব্রাহ্মণ" নামক কবিতা এ ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন—(১৩২৫ চৈত্র) "ওরে রে ব্রাহ্মণ তোরা শোন্ ওই প্রলয়ের শেষ অট্টোচ্ছ্বাস!" তৎপর শেষের দিকে আছে—

আষাঢ়।

স্বাগত শ্যামাঙ্গিনী স্বাগত বরষা,
স্বাগত প্রিয়সখি মম হৃদি হরষা!
হেমন্ত নিদাঘ দিনে,
মীন যথা বারিহীনে,
চেয়ে চেয়ে আশাপথ নাহি ছিল ভরসা।
স্বাগত শ্যামাঙ্গিনী স্বাগত বরষা।
লয়ে নীপ কদম্ব শিখী,
দাদুর আর ডাহুকী,
এস, ভুবন অঞ্জন নীল তনু রুচি তমসা!
স্বাগত শ্যামাঙ্গিনী স্বাগত বরষা।
ও মৃদঙ্গ গুরু গুরু,
রবে বক্ষ দুরু দুরু,
অগুরু প্রলেপ যেন দগ্ধ হৃদে সহসা।
স্বাগত শ্যামাঙ্গিনী স্বাগত বরষা।
স্বাগত মায়াময়ী,
স্বাগত ছায়াময়ী!
স্বাগত মম প্রিয়া সিঞ্চন-সরসা।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

"পদাঘাত বাক্যজ্বালা আজ তোর কিরীটের কনকভূষণ।" ইত্যাদি এই 'পদাঘাত ও বাক্যজ্বালা'র প্রমাণার্থেই বোধ হয় ঐ পত্রেই (১৩২৬—মাঘসংখ্যায় 'দুঃখের দানে' ইত্যি-শীর্ষক এই গল্পে নিরীহ ব্রাহ্মণ পোষ্টমাষ্টারের উপর পোষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দ্বারা 'পদাঘাত' দেওয়াইয়া বলান হইয়াছে "এই তোমার উপযুক্ত শাস্তি।" [এই উপাসনার সম্পাদক একজন ব্রাহ্মণ এবং স্বত্বাধিকারী একজন অতি নিষ্ঠাবান্ দেবদ্বিজসেবী ভক্ত বৈষ্ণব!]

জনকপুর যাত্রী। (ভ্রমণ)

আমরা বঙ্গদেশবাসী তীর্থস্থান বলিলে সচরাচর গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ-শ্রীক্ষেত্রাদি স্থান বুঝি। কেহ কেহ বা অযোধ্যা, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, মানস সরোবর ও সেতুবন্ধ রামেশ্বরও দর্শন করিতে যাত্রা করেন। অধুনা জনকপুর আমাদিগের নিকট বিখ্যাত তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত নহে। সুদূর অতীতকালে এই স্থান রাজর্ষি জনকের যজ্ঞধূমে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। ভারতের বহু প্রদেশ হইতে মহাত্মা ঋষিগণ জনক রাজার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতেন। পুণ্যাত্মা জনক রাজা নিয়ত যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিয়া জগন্মাতা লক্ষ্মীস্বরূপা সীতাদেবীকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কন্যারত্নের রূপলাবণ্য ও শুভলক্ষণের কথা শ্রবণ করিয়া কত রাজা মহারাজ এই স্থানে সমাগত হইয়া তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজর্ষি জনকের ধনুকভাঙ্গা পণ। রাজগণ দিব্য হরধনু দেখিয়াই বিস্মিত ও হতাশ হইয়া পলায়ন করিতেন। এই ধনু কেহই তুলিতে পারেন নাই। এমন কি লঙ্কাপতি বিংশতিবাহু দশাননও এই ধনু তুলিতে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে অযোধ্যাপতি দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র এই ধনুক তুলিয়া ইহাতে বাণ যোজনা করিলে, ইহা ভগ্ন হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে জনকপুর যাইতে হইলে বিকালে ২৩৬ মিনিটের সময় হাবড়া ষ্টেশনে দিল্লী প্যাসেঞ্জার ট্রেণে উঠিলে, পরদিন প্রাতে ৭টার সময় মোকামাঘাটে নামিতে হয়। অতঃপর ষ্টীমারে গঙ্গা পার হইয়া সেমেরিয়া ঘাটে গিয়া রেলে চড়িতে হয়। উক্ত ট্রেণে সমস্তিপুর ও দ্বারভাঙ্গা হইয়া বেলা ৩টার সময় জনকপুর রোড ষ্টেশনে যাওয়া যায়। এই ষ্টেশন হইতে জনকপুর ২৬ মাইল। এই ২৬ মাইল রাস্তা পদব্রজে বা গো-গাড়িতে যাইতে হয়; তবে এখানে অশ্বচালিত একারও বন্দোবস্ত আছে। আর জনকপুর রোড ষ্টেশন ছাড়াইয়া জয়নগর ষ্টেশনে নামিলে, সেখান হইতে জনকপুর ১৫ মাইল পথমাত্র; কিন্তু এই পথ অতি কদর্য্য, বনসঙ্কুল ও বিপজ্জনক। আমি জনকপুর রোড ষ্টেশনে নামিয়াই জনকপুর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এই পথ সুরসুন্ত

গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। সুরসুস্ত একটি গণ্ডগ্রাম; ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রদেশের মৃত্তিকা বালুকাময়, ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের মত প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ বিহার প্রদেশে যেরূপ গম, যব, বুট, মটরাদি শস্য জন্মে, এখানেও সেরূপ হয়।

সুরসুস্ত একটি বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ড গ্রাম। এই গ্রামে কয়েক ঘর জমিদারের বাস আছে, এখানে একটি ম্যাট্রিকুলেশন বিদ্যালয় আছে এবং ইহার সংস্রবে একটি ছাত্রাবাস আছে; হাঁসপাতাল ও ডাকঘর আছে। হাঁসপাতালের অবস্থা ভাল নহে; ইহাতে রোগী থাকিবার ব্যবস্থা নাই। গ্রামের বাজার মন্দ নহে। অতঃপর সুরসুস্ত পার হইয়া এক মাইল যাইতে যাইতেই নেপাল রাজ্যের সীমানির্দ্দেশক স্তম্ভসমূহ দেখিতে পাওয়া গেল। এস্থান হইতে জনকপুর অভিমুখে ৬ মাইল গিয়া জলেশ্বর নগর পাওয়া যায়। জলেশ্বর জেলার সদর এই স্থানে; ইহা নেপালরাজ্যের অন্তর্গত। এখানকার বাজার হাট দোকান পত্র দেখিয়া জলেশ্বরকে একটি গণ্ডগ্রাম বলিয়া বোধ হইল। নেপালরাজ্যের শাসন সম্বন্ধে নানাবিষয় জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল হইল। পথি মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে জলেশ্বরের ক্যালেক্টরী ঘর পরিলক্ষিত হইল। ইহা একটি বহু পুরাতন চৌচালা খোলার ঘর; ঘরখানি বহু বৎসরাবধি মেরামত হয় নাই। ইহার নাম মালকাছারি; এখানে একজন সব ডেপুটী ক্যালেক্টর আছেন। তাঁহার পদবী সুবা এবং তাঁহার নাম লছমন প্রসাদ। তিনি ঐ পুরাতন কদাকার চালার এক পাশে একখানি ছোট তক্তা পোষে একখানি ময়লা তোষক পাতিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন; কর্ম্মচারী দুই একজন খাজনা আদায় করিতেছে। লছমনপ্রসাদ বাবু অতি ভদ্রলোক। তিনি আমাদিগকে সমাদরে বসাইলেন ও নেপাল রাজ্যের টাকা দেখাইলেন। আমাদের ৸০ বার আনা দিলে নেপালের এক টাকা পাওয়া যায়। আমরা দুইটি টাকা ক্রয় করিতে চাহিলে, তিনি বিনামূল্যে আমাদিগকে দুইখানি আধুলি দিলেন। তৎপরে আমরা তাঁহার নিকট হইতে দুইখানি নেপালের ডাক টিকিট ক্রয় করিলাম। জলেশ্বরে একটি ডাক ঘর আছে। এ ডাক ঘর হইতে ব্রিটিশ রাজ্যে চিঠিপত্র প্রেরিত হয় না; খাস নেপালের জন্য এ ডাক ঘর স্থাপিত আছে। এখান হইতে ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত হরিলাখি পোষ্ট আফিস আছে; এই পোষ্ট আফিস হইতে পত্রাদি নেপাল রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। ব্রিটিশ রাজের ডাক

টিকিটে নেপালে পত্রাদি প্রেরিত হয়; কিন্তু নেপালের টিকিটে ব্রিটিশরাজ্যে পত্রাদি যায় না। নেপালের ডাকটিকিটেও টাকায় হিন্দিতে লেখা আছে :—

গোর্খা সরকার, গোরকনাথ, পশুপতি, এখানি টিকিটের মূল্য চারি পয়সা। নেপালের এই সীমান্তপ্রদেশে ইংরাজের টাকা পয়সার বেশ চলতি আছে।

তৎপরে আমরা জেল দেখিতে যাই। জেলের ইমারত অতি ক্ষুদ্রাকার; ইহাতে ২০ জন চাপরাশি আছে; ইহাদের প্রত্যেকের বেতন মাসিক ৪৲ টাকা, জেলারের বেতন বার্ষিক ২০০৲ দুই শত টাকা। সম্প্রতি জেলে ৮০ জন কয়েদী ও ৬ জন হাজতী আছে। কয়েদীগণকে দেখিয়া শান্তপ্রকৃতির লোক বলিয়া আমাদের অনুমান হইল। তাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয় না, এবং সাধারণতঃ খোরাকীও পায় না। তাহাদের আত্মীয় স্বজন প্রতিদিন ঘর হইতে খাদ্যাদি আনিয়া বেলা ১টার সময় দিয়া যায়। তবে যে কয়েদির খাদ্য যোগাইবার লোক নাই, সে দৈনিক /০ এক আনা পয়সা সরকার হইতে পায়। জেলারবাবু আমাদিগকে জেল প্রবেশ করিয়া দেখিবার অনুমতি দিতে পারিলেন না। জেলে প্রবেশ করিতে হইলে মুন্সি সহদেবপ্রসাদের অনুমতি লইতে হয়। আমরা তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলাম; কিন্তু তিনি যাই-যাই করিয়া অনেক কাল হরণ করিলেন, আমাদেরও জেলের ভিতর দেখা হইল না। শুনিলাম মুন্সিসাহেব কাছারীতে কাজ করেন, তাঁহার বেতন মাসিক ৩২৲ টাকা।

জেলের অতি নিকটেই একটী খঁড় (পাউণ্ড) আছে, সেখানে কয়েকটি গো ছাগল আবদ্ধ রহিয়াছে। আবদ্ধ পশুদিগের খাদ্যের ব্যবস্থা বঙ্গদেশেরই অনুরূপ, অর্থাৎ খঁড়ের নিকটে ঘাস-খড়ের চিহ্ন মাত্র নাই। নেপালে গরু ও ছাগলে বড় প্রভেদ নাই, গরুর জরিমানা /০ ছাগলের জরিমানাও দুই আনা। মহিষ ও ঘোড়ার জরিমানা ।০ চারি আনা করিয়া।

কাছারীতে একজন হাকিম আছেন, তাঁহার নাম লেফ্‌টেনাণ্ট সিং বাহাদুর। বেবন্দোবস্ত জেলার ডেপুটী কমিশনারের মত তাঁহাকে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়েরই কার্য্য করিতে হয়। তাঁহার বেতন মাসিক ১৫০৲ টাকা। এখানকার কাছারীতে উকিল মোক্তার নাই। এ ব্যবস্থা অতি উত্তম বলিয়া বোধ হইল। আদালতের পার্শ্বে অনেকগুলি মুহুরি বসিয়া আছে, তাহারাই মকোদ্দমার আরজি লিখিয়া দেয় এবং বাদী প্রতিবাদী হাকিমের সম্মুখে আপন আপন উত্তর প্রতি-উত্তর করে। তাহা শুনিয়াই হাকিম সাহেব বিচার নিষ্পন্ন

করেন। তাঁহার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল চলে। আপীল হয় জলেশ্বরের বড় হাকিমের নিকট। অধুনা যিনি বড় হাকিম আছেন, তাঁহার নাম বীরবিক্রম সা; তিনি নেপাল মহারাজের আত্মীয় এবং তাঁহার বেতন স্বরূপ জায়গীর দেওয়া আছে। যদি তাঁহার আদালত হইতেও আপীল করিতে হয়, তবে বাদী প্রতিবাদীকে কাটামুণ্ড রাজধানীতে যাইতে হয়।

জলেশ্বরে একটি হাসপাতাল আছে, তাহাতে ১৫ জন রোগী থাকিতে পারে। এখন এখানে একটিও রোগী নাই; শুনিলাম ধানকাটা শেষ হইলে, রোগী সব এখানে আসিবে। বঙ্গদেশের ন্যায় এই প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। ডাক্তারের নাম শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত গুপ্ত, তাঁহার বেতন মাসিক ৭৫৲ টাকা। তিনি সম্প্রতি ছুটিতে আছেন। দেখিলাম, বৎসরে প্রায় ১৫০০০ রোগী এই হাসপাতাল হইতে ঔষধ লইয়াছে। সমুদায় ঔষধই বিলাতী (ডাক্তারী)। দেশীয় রাজ্যেও দেশীয় ঔষধের বা বৈদ্য চিকিৎসকের আদর নাই। ডাক্তারের বেতন বাদে হাসপাতালের জন্য ১২০০ টাকা বার্ষিক খরচ মঞ্জুর আছে। আমাকে বাঙ্গালী দেখিয়া অস্থায়ী ডাক্তার বাবু আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন।

এখানে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে; দৈনিক বাজার আছে এবং অনেকগুলি দোকান পত্র আছে। সচরাচর ধান, চাল, মুড়ি, চিঁড়ে বুট ভাজা ইত্যাদি যথেষ্ট বিক্রয় হয়। ঢেঁকির কারখানা অনেক ঘরেই আছে। একটি সরকারী কারখানায় দেখিলাম, সোড়া প্রস্তুত হইতেছে। আক্ষেপের বিষয়, এরূপ স্থানেও বিলাতী বস্ত্রাদি আসিয়া দোকান পাট অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ময়রার দোকানে কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে জিলাপিই প্রধান ও সুখাদ্য।

তৎপরে আমরা জলেশ্বরে বিদ্যালয়ের কিরূপ বন্দোবস্ত আছে, অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিলাম, সেখানে কোনরূপ বিদ্যালয়ই নাই। না আছে ইংরাজী শিক্ষার উপায়, না আছে হিন্দী বা নেপালী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা। এমন কি এখানে একটি নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালাও নাই! কাছাড়ি ও কালেক্টরী অফিসের আশে পাশে বৃক্ষমূলে বসিয়া মুহুরিগণ দরখাস্ত, আবজির আদি লিখিতেছে; তাহাদেরই নিকট বসিয়া কতিপয় বালক হিন্দি অক্ষরপরিচয় শিক্ষা করিতেছে। বালকগণ অবশ্য উক্ত মুহুরিগণের আত্মীয়। এইরূপে হিন্দি ভাষায় লিখিতে পড়িতে শিখিলে পর, বালকগণ নেপাল মহারাজের নিকট

চাকুরির জন্য আবেদন করে। অনেকেই কোন না,কোন কর্ম্ম পায়। বিদ্যাশিক্ষার উপায় অতীব সঙ্কীর্ণ; এ বিষয়ে নেপাল মহারাজের মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক।

জলেশ্বরের অধিবাসীর মধ্যে বেহারীর সংখ্যাই অধিক, স্থানে স্থানে কেবল মাত্র কতিপয় নেপালীর বসতি আছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহেরও অবস্থা এইরূপ। দ্বারভাঙ্গা ও মোজাফর পুর হইতে আসিয়া দোকানদারগণ এখানে কারবার খুলিয়াছে। এই সীমান্তপ্রদেশে ইংরাজরাজ্যের কোন লোক কোন অপরাধ করিয়া নেপালরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে, ইংরাজ পুলিশ আর তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় নেপাল সরকারে সংবাদ দিতে হয় ও নেপাল-পুলিশের সাহায্য লইয়া অপরাধীকে ধরিতে হয়। এইরূপ দ্বৈতশাসনের ফলে, অপরাধীদিগের বিশেষ সুবিধা হয়। নেপালরাজ্যের অপরাধী সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা।

জলেশ্বর হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে জনকপুর অবস্থিত। রাস্তাঘাট অতীব জঘন্য; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র নদী আছে, তাহাদের উপর বাঁশের পুল। পুলগুলি মানুষ চলার উপযুক্ত, শকটাদির ভার-সহনক্ষম নহে। একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নদী আছে, তাহার নাম বিন্‌হি। এই নদীর উপরে আদৌ পুল নাই; গো-গাড়ি লইয়া আমরা এই নদীগর্ভে বিষম বিপদে পড়িয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে নেপালরাজ্যের একজন আমিনের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়; এস্থানে তাঁহার যথেষ্ট প্রভুত্ব আছে। তাঁহার আদেশে তিন চারিজন লোক আসিয়া আমাদের গাড়ি পার করিয়া দিল। এই নদী পার হইয়া আরও ৬ মাইল গিয়া আমরা জনকপুরে পৌছিলাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে ছোট ছোট গ্রাম; গ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই বেহারী, দুই চারি ঘর করিয়া নেপালী লোকের বসতি আছে; সকলেই ভাঙ্গা হিন্দিতে কথাবার্ত্তা কহে। রাস্তায় পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে কূপ আছে ও আবগারি দোকান আছে। গ্রামে খেজুর রস ও তালরস পাওয়া যায়; অনেকেই তাড়ী খাইতে অভ্যস্ত।

জনকপুরে তিনটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। শ্রীরামজীকা মন্দির অনেকদিনের পুরাতন। মন্দির মধ্যে শ্রীরামলক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর পাষাণমূর্ত্তি আছে; বিগ্রহ মন্দিরের আশে পাশে, সন্ন্যাসীদিগের থাকিবার গৃহ আছে; পূজাপাঠ যথেষ্ট হইতেছে। বিগ্রহমন্দিরের পার্শ্বে একটি বহুকালের পুরাতন বটবৃক্ষ আছে; ইহাই এখানকার অক্ষয় বটবৃক্ষ। এপ্রদেশের প্রচলিত প্রবাদ এই যে, ১৩ শত

বৎসর পূর্ব্বে লোকে জানিত না যে, রা[illegible] বর্ণিত রাজর্ষি জনকের কোথায় রাজধানী ছিল; সেই স্মরণাতীত পুরাকালে জনকপুরীর কোন চিহ্নই ছিল না। চতুর্ভুজ নামক একজন রামভক্ত সন্ন্যাসী জনকপুরীর সন্ধান করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু বহু আয়াসেও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি এই অক্ষয় বটবৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। একদিবস রজনীযোগে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে কহিতেছেন,—ঐ বৃক্ষতলে তাঁহার বিগ্রহমূর্ত্তি প্রোথিত আছে; এবং তিনি সন্ন্যাসীকে উহা উদ্ধার করিয়া পূজাদির বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দেন। অতঃপর সন্ন্যাসী ঠাকুর বটবৃক্ষতলে মৃত্তিকা খনন করিয়া কএকটি মূর্ত্তি বাহির করিয়া স্থাপনা করেন। সেই সময় এই শ্রীরামচন্দ্রজীর মন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছিল। এই মন্দিরে পূজার বেশ আয়োজন হয় ও প্রতিদিন বহু অতিথিসেবা হইয়া থাকে।

জনকজীর মন্দির অল্পদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা একটি সামান্য মন্দির। সাত হাজার টাকা ব্যয় করিয়া নেপালের মহারাজা ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে পূজা ও অতিথিসেবার বাহুল্য নাই। এখানকার জানকীজীকা মন্দির সর্ব্বপ্রধান। নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া টিকম্‌গড়ের মহারাণী এই প্রকাণ্ড সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে সীতাদেবী একটি নগণ্য দেবালয়ে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। টিকম্‌গড়ের মহারাণী নিঃসন্তান ছিলেন; তিনি জনকপুরে আসিয়া জানকীজীর নিকট মানস করেন যে, যদি তাঁহার পুত্র সন্তান হয়, তবে তিনি নয়লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সীতাজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিলে, তিনি এই সুবৃহৎ মনোরম মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার মধ্যস্থলে বিগ্রহমন্দির, সেখানে প্রতিদিন বাল্মীকিরামায়ণ ও তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ হইতেছে ও ষড়োপোচারে বাদ্যভাণ্ড সহিত রাম সীতার পূজা হইতেছে। বিগ্রহ মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া কিছুদূরে যাত্রিনিবাসোপযোগী বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; এই সকল গৃহও জানকীজীর মন্দিরের সামিল এবং সমুদায় লইয়াই মন্দিরটিকে অতীব বৃহৎ ও সুন্দর দেখায়। যাত্রীনিবাসে অনেক সন্ন্যাসী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

জনকপুরে অনেকগুলি বৃহদাকার সরোবর আছে, যথা বিহার কুণ্ড, পাবন কুণ্ড, গঙ্গাসাগর, ধনুষসাগর ইত্যাদি। এই সকল জলাশয়ের জল অতি কদর্য্য, স্নান-পানের একান্ত অনুপযোগী। শ্রীরামনবমীর সময় এখানে মেলা বসে। তখন

জনকপুরে বহুতীর্থযাত্রীর সমাগম হয়; সে সময় এই সকল জলাশয়ের জল অধিকতর অপরিষ্কার হয়। গৌরধোহা সাগরে রাজা দশরথ চরণ ধৌত করিয়াছিলেন, ইহার জল অতীব জঘন্য। দশরথসর এবং সুধাসরের জল ঐরূপ। বস্তি ছাড়াইয়া কিছুদূরে বিশ্রামসাগর নামক একটি জলাশয় আছে। রাজর্ষি জনক দশরথ রাজাকে এই স্থান বিশ্রামের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার জল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। জনকপুরে অনেকগুলি আম বাগান ও লিচু বাগান আছে। মেলার সময় এই সকল বাগানেই বাজার বসে ও যাত্রিগণ আশ্রয় লয়। উদ্যান ও সরোবরসমূহে পরিবৃত জনকপুরের শোভা সন্দর্শন করিয়া, আদিকবির বচনা আমাদের মনোমধ্যে উদিত হইল;—যথা—

"রামস্তু মুনিশার্দ্দুলমুবাচ সহলক্ষ্মণঃ।
সাধ্বী যজ্ঞসমৃদ্ধির্হি জনকস্য মহাত্মনঃ॥"
বহূনীহ সহস্রাণি নানা দেশনিবাসিনাম্।
ব্রাহ্মণানাং মহাভাগ বেদাধ্যয়নশালিনাম্॥
ঋষিবাটাশ্চ দৃশ্যন্তে শকটীশতসঙ্কুলাঃ।
দেশো বিধীয়তাং ব্রহ্মন্ যত্র বৎস্যামহে বয়ম্॥"

রাজর্ষি জনক শ্রীরামলক্ষ্মণের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্র মুনিকে বলিয়াছিলেন,—

"ইমৌ কুমারৌ ভদ্রংতে দেবতুল্যপরাক্রমৌ।"
গজসিংহগতী বীরৌ শার্দ্দূলবৃষভোপমৌ॥" (রামায়ণ)

জনকপুরের প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিলে, উহা তিন খণ্ড হইয়া যায়। এক খণ্ড আকাশে ও একখণ্ড পাতালে গিয়াছে। অবশিষ্ট তৃতীয় খণ্ড—এই পৃথিবীতে ধনুখাপুরে পতিত হইয়াছিল, এবং সেস্থানে এখনও ইহা বিদ্যমান আছে। ধনুখাপুর গ্রাম জনকপুর হইতে প্রায় ১৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই তৃতীয় ধনুকখণ্ড দর্শন করিবার জন্য রামভক্ত যাত্রিগণ ধনুখাপুর গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট ইহাও এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ভগ্ন ধনু যে তিন খণ্ড হইয়াছিল, বাল্মীকির রামায়ণে এরূপ কোন উল্লেখ নাই, তবে রামায়ণে ধনুর্ভঙ্গের বেশ লোমহর্ষণ বর্ণনা আছে। যথা—

"তদ্ধনুর্ভগ্ন মধ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ।
তস্য শব্দো মহানাসীন্নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ॥

ভূমিকম্পশ্চ সুমহান্ পর্ব্বতস্যেব দীর্য্যতঃ।
নিপেতুশ্চ নরাঃ সর্ব্বে তেন শব্দেন মোহিতাঃ॥"

মহাত্মা তুলসীদাসও ছুইখণ্ড ধনুকের কথা বলিয়াছেন; যথা চৌপাই ঃ—

প্রভু দোউ খণ্ডচাপ মহিডারে দেখি লোগ সব ভয়ে সুখারে।
কৌশিকরূপ পয়োনিধি পাবন প্রেমবারি অবগাহ সুহাবন॥

ধনুকভাঙ্গার পর রাজা দশরথ সসৈন্যে মিথিলা গমন করিলে, ইহার কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, কবিশ্রেষ্ঠ তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"আসসাদ মিথিলাং স বেষ্টয়ন্ পীড়িতোপবন-পাদপাং বলৈঃ।
প্রীতিরোধমসহিষ্ট সা পুরী স্ত্রীব কান্তপরিভোগমায়তম্॥"

(রঘুবংশ)

জনকপুরেও সাধারণ বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় নাই। নেপাল মহারাজের প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্কৃত টোল এখানে আছে। এই টোলে চারিজন অধ্যাপক আছেন। অধ্যাপক মহাশয়গণের বেতন অতি সামান্য। বেদ-অধ্যাপক ও জ্যোতিষ-অধ্যাপক প্রত্যেকে মাসিক ১৫৲ টাকা পান। ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ১৫৲ টাকা ও ব্যাকরণ অধ্যাপক ১০৲ টাকা পান। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মিথিলা নবদ্বীপের সমকক্ষ ছিল, এবং ইহা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের কেন্দ্রস্থল ছিল; এখন সে সব টোল কোথায়? অধ্যাপকগণ ও বিদ্যার্থী সকল এখানে বাসাঘর ও খোরাকী পান। ৬৫ জন বিদ্যার্থী আছে। ছাত্রনিবাস মন্দ নহে; পাহাড়ী ছাত্রের জন্য পাহাড়ী পাচক ও মৈথিলী ছাত্রের জন্য মৈথিলী পাচক নিযুক্ত আছে। ছাত্রগণ দুই সন্ধ্যা ভাত, ডাল ও তরকারী খাইতে পায়। এ ব্যবস্থা বঙ্গদেশের মত। মৈথিলী অক্ষর দেখিতে বাঙ্গালা অক্ষরের মত। ছাত্রদিগের মৈথিলী লেখা দেখিয়া আমাদের বাঙ্গালা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। মৈথিলী বালকগণ হিন্দি অক্ষর পড়িতে পারে না। মিথিলা ও বাঙ্গালাদেশের মধ্যে এই সাদৃশ্য কিরূপে হইল বলিতে পারি না। জ্যোতিষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দামুদর মিশ্র মহাশয়ের সহিত আমাদের অনেকক্ষণ আলাপ পরিচয় হইল। তিনি ছাত্রগণকে সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক দুইখানি গ্রন্থ পড়াইতেছেন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গ্রহগণের যে বক্র গতি হয়, সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা আছে, বা ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ আছে কি না? তিনি শ্লেট পেন্সিল লইয়া এ বিষয় আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন। তিনি

বলিলেন ইহার ব্যাখ্যা তিনি বেশ জানেন, তবে স্মরণ হইতেছে না। আমরা তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আসিবার একঘণ্টা পরে, তিনি সশিষ্যে আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অঙ্ক পাতিয়া ও [illegible]রূপ বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া এ বিষয় আমাদিগকে বুঝাইতে বিশেষরূপে প্রয়াস পাইলেন এবং কতক পরিমাণে সফল হইলেন। তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তের নিম্নলিখিত শ্লোকটির উপর নির্ভর করিলেন,—

"দূরস্থিতঃ স্বশীঘ্রোচ্চাৎ গ্রহঃ শিথিলরশ্মিভিঃ।
সব্যেতরাকৃষ্টতনুঃ ভবেদ্বক্রগতিস্তদা॥"

অর্থাৎ যখন কোন গ্রহ স্বীয় শীঘ্রোচ্চ হইতে দূরে অর্থাৎ তিন রাশি অপেক্ষা অধিক দূরে অবস্থিত থাকে, তখন তাহার রশ্মি শিথিল হওয়াতে উচ্চ দেবতা বাম বা দক্ষিণভাগে তাহাকে আকর্ষণ করেন,—গ্রহ তাঁহার বামদিকে অবস্থিত হইলে, দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ দিকে অবস্থিত হইলে, তাহাকে বাম দিকে আকর্ষণ করেন; এই জন্যই গ্রহের বক্রগতি হইয়া থাকে।

(শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত।)

অতঃপর আমি তাঁহাকে গ্রহদিগের বক্রগতির পাশ্চাত্য সরল ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিলাম; জানিলাম তিনি পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মোটামুটি অবগত আছেন। তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হিন্দি ভাষাতে পাশ্চাত্য জ্যোতিষের কোন গ্রন্থ আছে কি না? কাশী নাগরীপ্রচারিণী সভা হইতে সম্প্রতি জ্যোতির্বিনোদ নামক একখানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে জ্যোতিষের গণিততত্ত্ব নাই; অতএব তাহা অধ্যাপক মহাশয়ের পাঠ করিবার উপযোগী নহে; এই বলিয়া তাঁহার নিকট আমরা বিদায় লইলাম।

জনকপুরের মহান্তমহারাজের নাম শ্রীযুক্ত রামানন্দ স্বামী, ইনি কাশীতে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। মন্দির সকলের আয়ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছুমাত্র দেখিতে হয় না। আগত সন্ন্যাসিগণের পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত, ইনি শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে বাস করেন। মন্দির হইতে প্রতি দিন ৪৩ জন অতিথিকে খাদ্য দেওয়া হয়, প্রাতে ভাত দাল তরকারী ও সন্ধ্যায় পুরী তরকারী। মহান্ত মহারাজজী এই সকলের তত্ত্বাবধান করেন এবং তিনি মাসিক একশত টাকা বেতন পান। নেপালের মহারাজাই মন্দির সকলের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। মন্দিরের কিছু জমিদারী ও ৭।৮টি মৌজা আছে; জমিদারী ও মৌজার আয় এবং যাত্রিপ্রদত্ত প্রণামী বাবদ আয়—সমুদায়ে বার্ষিক

৩০।৩২ হাজার টাকা আয় হয়। একজন ম্যানেজার নিযুক্ত আছেন; তিনিই এই সকল আয় ব্যয়ের হিসাব রাখেন এবং জনকপুরের মেলার সময় সাধারণ যাত্রিগণের বাসাদির বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার বেতন মাসিক একশত টাকা। এখানকার পূজারি পাঠক সকলেরই বেতনের ব্যবস্থা আছে; সে জন্য যাত্রীদিগের উপর অত্যাচার করিয়া কেহই পয়সা আদায় করিবার চেষ্টা করে না।

এখানকার মহন্ত সদাশয় ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি। দেওঘরের সন্দার পাণ্ডা ও অন্যান্য পাণ্ডা, তারকেশ্বরের মহন্ত এবং চন্দ্রনাথের মহন্তগণের বাবুয়ানি কথা সর্ব্বত্র বিখ্যাত; এ স্থানে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম। ইহার প্রধান কারণ এই যে, মহন্ত মহারাজ এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা একেশ্বর কর্ত্তা নহেন। তিনি নেপালের মহারাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন পাইয়া থাকেন। জনকপুরের মেলার বন্দোবস্ত ও আয় সংগ্রহ করিবার জন্য যখন একজন ম্যানেজার নিযুক্ত আছেন, তখন মহন্ত-মহারাজের চরিত্র-স্খালনের পথ অতীব কণ্টকাকীর্ণ। ম্যানেজার সাহেব ও মহন্তের মধ্যে সদ্ভাব নাই। উভয়ে পরস্পরের শত্রু। ইহার ফল মঙ্গলদায়ক। বঙ্গদেশে এবং ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থানে এরূপ ব্যবস্থার কোন উপায় করিতে পারিলে যাত্রিগণের কল্যাণ সাধিত হয়।

মোহন্ত মহারাজের ঘরের পার্শ্বের একটি কুঠারিতে একজন ভদ্র বেদান্তী সন্ন্যাসী বাস করিতেছেন। তাঁহার নিকট বেদান্তবিষয়ক অনেক গ্রন্থ রহিয়াছে। তাঁহার সহিত আমাদের অনেক কথোপকথন হইল। তিনি বঙ্গদেশের ভুবনবিখ্যাত শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বসু মহশয় বেদান্ত-দর্শনের বক্তব্য বিষয় সকল যন্ত্র দ্বারা চাক্ষুষ প্রমাণ করিতেছেন, ইহা ভারতের পক্ষে শুভদায়ক।

জনকপুরে স্বামী শিবানন্দ ভারতী নামক একজন সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। ইনি একজন মাদ্রাজী, বি, এ, পাশ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর উদ্দেশ্য মহৎ। ভারতবর্ষে নানাবিধ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য অনেক লোক নিযুক্ত আছেন, কিন্তু ভারতের সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে বা উক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে কোন লোকেরই উৎসাহ নাই। ভারতের জনসাধারণ সনাতন ধর্ম্মবিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। ভারতের এই অভাব পুরণের জন্য কাশীতে একটি বিদ্যামন্দির স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়া ত মহারাজগণের

সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। এই বিদ্যামন্দিরে ভারতের সন্ন্যাসিগণকে সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং তাঁহাদিগকে উক্ত ধর্ম্মে বক্তৃতা করিতে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে;—যাহাতে তাঁহারা ভারতের নানা পল্লীতে গমন করিয়া জনসাধারণকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে সক্ষম হন। স্বামী শিবানন্দ ভারতী প্রথমে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হরিদ্বারে একটি বিদ্যামন্দির, কলেজ ও গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। অবশেষে তিনি স্থির করিয়াছেন যে, এই বিদ্যা-মন্দির কাশীতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার জন্য দুই লক্ষ টাকার আবশ্যক। ইতিমধ্যেই অনেক রাজা মহারাজা, এই সাধু সঙ্কল্প সাধনের নিমিত্ত টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বেওয়া, পন্না, ইন্দোর, জয়পুর, দ্বারভাঙ্গা, দতিয়া, কাশ্মীর, রসরামপুর, সীলিনা, রাজকোট, টিকমগড় ও যঘানীরের মহারাজা অর্থ সাহায্য করিবেন স্থির করিয়াছেন, আমরাও বলি—স্বামী শিবানন্দ ভারতীর সাধু উদ্দেশ্য স্বরায় সফল হউক।

স্বামী শিবানন্দ ভারতী কিছুদিন ধরিয়া জনকপুরে বাস করিতে-ছেন। পবিত্র জনকপুর তীর্থ স্থানে বিবিধ প্রকার কলুষ ও অত্যাচারের আবির্ভাব হইয়া যাত্রীদিগের কষ্ট ও অসুবিধার কারণ হইয়াছে। এই সকল অত্যাচার কোন উপায়ে দূর করিবার জন্যই ভারতীজী এখানে অবস্থান করিতে-ছেন। প্রায় সকলেই একবাক্যে এখানকার ম্যানেজার সাহেবের অপবাদ করে। যাহা দেখিলাম বা শুনিলাম, সেই সকল লিপিবদ্ধ করিয়া নেপাল মহারাজার নিকট প্রেরণ করিতে, ভারতীজী আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। আমরাও ইহা সমীচীন মনে করিয়া তাহাই করিলাম। ১২।১৩ দিন পরে মহারাজের উত্তর পাইলাম; তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি এ সম্বন্ধে মনোযোগ দিবেন।

এখানে আর একজন বিদ্যার্থী সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নাম স্বামী মঙ্গলগিরি। তাঁহার বয়স ২০ বৎসর, ৬ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৪ বর্ষ বয়সে তিনি বোম্বাই প্রদেশ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বহুদেশ পর্য্যটন ও বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন।

জনকপুরের টোলে অধ্যয়ন করিলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য এখানকার অধ্যা-পকগণের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। মনে মনে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এখানে বাস করিতেছেন বলিয়া আমাদের অনুমান হইল। স্বামী শিবানন্দ ভারতীর সহিত তাঁহার বিশেষরূপ বন্ধুত্ব হইয়াছে; তীর্থ স্থানের কলঙ্ক

দূর করা ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার করা তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্ম। জনকপুরের সন্ন্যাসী পরমহংস বৈদেহীশরণ বিশেষ বিখ্যাত। তিনি হিন্দি গীত রচনা করিতে পারদর্শী। স্থানীয় সকল ব্যক্তিই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। নব লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে সীতাজীর যে মন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছে, সেই মন্দির সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত গান রচনা করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা তিনি ইহা সুমধুর কণ্ঠে গান করেন। যথা—

গীত।

প্রেম বহার।—কজলী।

জনকপুর নৌলখবা মন্দির চম্ চম্ চমকে না।
জগমোহন সাচে জগ মোহে দম দম দমকে না॥
অতর ফুলেল গুলাব অরগজা গম গম গমকে না।
জনকনন্দিনীকে তহঁ ভূষণ ঝম ঝম ঝমকে না॥
সবসে অজব সিংহ দুই সোভে থম থম থমকে না।
উহ ভাখন চাহত হায় সব সে থম থম থমকে না॥
জৈ টিকমগড়কী মহারাণী তম তম তমকে না।
মুরুখ সবকর কারিখ লীহে ধম ধম ধমকে না॥
জহঁ পাবৈ তহঁ কারিখ লবৈ সে কম কমকে না।
পরমহংস তহঁ নিরখত ঠাড়ে হম হম হমকে না॥

শ্রীকৃষ্ণলাল সাধু।

প্রভাত।

আর নাহি রাতি,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গিয়েছে বাতি।
খুলে দিনু বাতায়ন,
দীপের কি প্রয়োজন?
ধূসর আকাশে মলিন তারার পাঁতি,
ভরিল নয়নে উষার কোমল ভাতি।

চাহিনু গগনে,—
নবীন জীবন এল কি ফিরিয়া মনে?
প্রভাত-সমীর এসে
পরশ বুলাল কেশে,—
আশিষের মত কি ছিল তাহার মনে,
ফুলের গন্ধ ছিল না কি তার সনে?

এ যে সেই আলো!
যাহারে দেখেছি, তাহারে লেগেছে ভালো!
যত প্রীতি নীলাকাশে,
তত প্রীতি শ্যাম ঘাসে,
হৃদয়ে ধ'রেছি—হোক্ না কুটিল কালো,
যে হোক্, সে হোক্, সবারে বেসেছি ভালো!

কত ভালবাসি!
নূতন করিয়া দেখি যে ধরার হাসি!
প্রভাত পাখীর গান
মধুর প্রভাতী তান,—
যে গানে আমার বাজায় পরাণে বাঁশী,
আকাশ বাতাস ভাল যে আবার বাসি।

ঘিরি' মায়াজাল
আমার অতীতে ছিল যে প্রভাত কাল,—
আপন করিয়া তারে
লইব গো, একবারে,
বাঁধুক আমারে তাহারি মায়ার জাল,
আমার অতীতে ছিল যে প্রভাত কাল।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় (কবিভূষণ)।

ছোট গল্প লিখিবার কৌশল

ও

সেই নমুনার একটা গল্প।

(বর্ণেট হইতে)

অনেকের ইচ্ছা হয় যে, মাঝে মাঝে 'গল্প লিখি' এবং মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ, ও পুরাণো বন্ধুবান্ধবগণ মাঝে মাঝে গল্প লিখিতে অনুরোধ করেন। সেই জন্য একটা গল্পের স্কেচ্ করা গেল ও গল্পলিখিবার মোটামুটী কৌশলও বলিয়া দেওয়া গেল। (এই রকম উপায়ে ছবি টানা ও টানার কৌশল, কিংবা একটা গান ও গান-গাওয়ার কৌশলও বলিয়া দেওয়া যায়। তবে সেগুলিতে রং, তুলি ও বাদ্য যন্ত্র প্রভৃতির দরকার)।

গল্পের নাম "কাঞ্চন"।

(১)

কৌশল।

কোন ছোট গল্পে কেবল নায়ক ও নায়িকার চেহারা বর্ণনা করিলেই যথেষ্ট। অন্য লোকের চেহারা (যেমন নায়িকার মা, কিংবা নায়কের খুড়া জ্যেঠা প্রভৃতি বর্ণনা করা রুচিবিরুদ্ধ)।

এই গল্পের নায়কের নাম—

অধর দাস।

৪নং চাঁদনি চকে জুতার দোকান। বয়ঃক্রম ২৯। ঈষৎ নীলাভ আল্-পাকা বর্ণের চক্ষু। ঠিক মাঝখানে সিঁতি দ্বারা বিভক্ত হাল্কা কোমল কৃষ্ণবর্ণ কেশ। মুখমণ্ডল গোলাকার, এবং দেখিলেই বোধ হয় সকলকে আপ্যায়িত করিবার জন্য প্রস্তুত। পরিধানে এণ্ডির সুট্। নেক্‌টাই ক্ষীণ বর্ণের, কোন জাঁকজমক নাই। জুতা বাদামী, নিতান্ত নূতন কিংবা পুরাতন

নয়, অথচ সযত্নে ব্রহ্মোদ্বারা পালিস্ করা। ৫ ফুট এগার ইঞ্চি উন্নত দেহ। কোমরের দিকে ঈষৎ স্থূল, অর্থাৎ ছোটলোকের মতো নিতান্ত সরু নহে।

পূর্ব্ব জীবন।

জন্ম মেদিনীপুর জেলায়, থানা গড়বেতা, পিতা হিজলি খালের ভূতপূর্ব্ব জিলাদার ছিলেন। অনাহার, শীতগ্রীষ্মাধিক্য, অভাব, দারিদ্র্য, ভয় ও রোগক্লিষ্ট হইয়া, চাঁদনির একটা জুতার দোকানে মুহুরিগিরি সুরু করে। ক্রমে দোকানদার পরলোকপ্রাপ্ত হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বে অধরকে দোকান সমর্পণ করিয়া স্বর্গ লাভ করেন।

স্বভাব।

সর্ব্বদাই খুসি। খরিদ্দারকে মুগ্ধ করিবার কৌশল অধরের নিজস্ব। বিনীত ভাবে উভয়-কর-সংঘর্ষণ, নত মস্তক—আসুন—কর্ত্তা—অধীনের দোকানে একবার আসুন—আপনার চিরকালের দাস!—এস মা এস!—কচি ছেলের জন্য সস্তা ফুলদার কচি জুতা—আমার সংসারে কেউ নাই মা—এই দোকানই সম্বল—ইত্যাদি করুণ সম্ভাষণে—স্ত্রীপুরুষ ভদ্রলোক স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইতেন।

ভবিষ্যৎ-চিন্তা।

হয়ত এই প্রকারে অধরের জীবন, জুতার দোকানেই কাটিয়া যাইত। কিন্তু যে লোকটা ভবিষ্যতে মানুষের মধ্যে একটা মানুষ হইবে, তাহার কঠিন চিন্তা না হইয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে কেমন একটা অবসাদ—কিম্বা বৈরাগ্য—কিম্বা দুঃখ—কালো-মেঘের মত আত্মার চিদাকাশে ঝুলিয়া পড়িত। সংসার বিকৃত ও বিবর্ণ বলিয়া বোধ হইত। এই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, অধর (আর একটি দোকানদারের কন্যা) সরলাকে পছন্দ করিয়া তাহার মাতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। মেয়েটি দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়—কিন্তু তাহার মাতা, অধরের সম্পত্তি সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া, মোটেই রাজি হইলেন না। অধর কেবল অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সেই অবধি অধর সদাসর্ব্বদা স্বপ্ন দেখিত। যেন জীবনের পথ অতি বিস্তৃত। অদূরে যেন কি একটা প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান—সেটা তাহারই অদৃষ্টের বিধান। হয়ত তাহা অতিশয় রমণীয়, সুন্দর ও তেজঃপূর্ণ। কে জানে—একদিন সেই গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার জীবনের সাধ মিটিবে?

গল্প আরম্ভ।

মরীচিকা।

অতিশয় শীত। পুরাণো খবরের কাগজের বিক্রেতা (জুতা মুড়িবার কাগজ—'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান') প্রায় দশসের কাগজ লইয়া দোকানে উপস্থিত। গোঁফ হীন চাচা, মুখে সিগারেট।

অধর দা—ভাল আছিস্ ত?

অধর। আছিরে আছি। নতুন খবর কি?

চাচা। নতুন ও পুরাণোর তফাৎ বুঝতে পারি না। এই কাগজ-গুলোতে কতক খবর পাবি।

কাগজের বস্তা রাখিয়া চাচা চলিয়া গেল। অধর একখানা 'সণ্ডে ষ্টেটস্‌-ম্যান, লইয়া পাঠ করিতে লাগিল,

একস্থানে দেখিল,—

সংবাদদাতার পত্র—সিল্‌হেট।

"সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র নদীতে বন্যা আসিয়া আসামের একটা গ্রাম একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। একটা মন্দির একেবারে জলসাৎ। ঐ মন্দিরে অনেক ধনসম্পত্তি প্রোথিত ছিল। কেহ কেহ বলে—প্রায় এক লক্ষ টাকার জহরৎ। স্থানটি দুর্গম—ও কুকিদিগের বাসস্থান—সেখানে যাইবার উপায় কেবলমাত্র ডোঙ্গা ছাড়া আর কিছুই নাই"

উচ্ছ্বাস।

তবে আর কি? এই ত সেই ভবিষ্যতের কর্ম্মস্থান! এক লম্ফে দোকান হইতে বাহির হইয়া অধর, জনাকীর্ণ ধর্ম্মতলা রোডে গেল ও ভিড় ঠেলিতে লাগিল। বোধ হইল যেন মানুষের ভিড় তাহাকে আর ভবিষ্যতে ঠেলিতে হইবে না। মোড়ের দোকানে দুই বোতল লেমোনেড কিনিয়া এক নিশ্বাসে পান করিল।

তার ভাবগতিক দেখিয়া রং বিক্রেতা দত্তজা মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—

'অধর, আজ অমন কচ্ছিস্ ক্যানর‍্যা'?

অধর। (সলজ্জভাবে) নমস্কার! আমি একবার আসামে যাব। সেখানে

ব্রহ্মপুত্রগর্ভে লক্ষটাকার রত্নের সন্ধান পাওয়া গেছে। একবার চেষ্টা করা উচিত।

দত্তজা টাক্‌পড়া মসৃণ ও পুরাতন মাথা দোলাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'অমন কাজ করিস্‌নে অধর। অনেক ছেলে তোর মত বর্ম্মা ও ফিজি উপদ্বীপে গিয়ে মারা পড়েছে, কিম্বা অসভ্য বনমানুষ বিয়ে করে' সেখানে বসতি করেছে। এতে দেশের বড় লোকসান হয়।'

অধরের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল—'আমিও নতুন সংসার, নতুন মানুষ নতুন কিছু দেখতে চাই। বনমানুষ কি মানুষ না? তারা কি সভ্যজাতির সঙ্গে মিশবে না? তাদের ভালবাসা কেমন, তাকি আমরা একবার পরখ্‌ করবনা? চির-কালই কি জুতোর দোকানে মাথা গুজে হরি নাম করব? এ জীবন কিসের জন্য?'

দত্তজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) তাত' সত্যি। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রে কুমীরের বড় ভয়, তা জনিস্‌ ত? জুতোতেই লেগে থাক্‌। কাঞ্চন তোদের মত লোকের জন্য না। যে মণিকাঞ্চনের অধিকারী হবে, ভগবান্‌ তার জন্য একটা সুড়ঙ্গপথ ঠিক ক'রে রেখেছেন।

(২)

অধীরতা।

কিন্তু অধরের এ কথা মোটেই পছন্দ হইল না। দিবসে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, রাত্রিকালে তাহা দ্বিগুণভাবে বর্দ্ধিত হইল। সে আসাম যাইবার পথ জানিতে সিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইত। কুকিদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক পুরাতন বহি সংগ্রহ করিত। ব্রহ্মপুত্র নদীর ইতিহাস, সেই তল্লাটের খ্যাতনামা অধি-বাসী—সকলের নাম ধাম—প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া জুতার দোকান অল্পদামে বেচিয়া দিল।

সরলার মা সেই দোকান তিন হাজার টাকায় কিনিয়া লইলেন।

প্রস্থান।

দুই হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া, বাকি একহাজার টাকা সঙ্গে লইয়া বুধবার ত্রয়োদশীর প্রাতে অধরদাস আসামে রওনা হইল। যাইবার সময় কেহই জিজ্ঞাসা করিল না—কেহই চাহিল না—সংসারে তাহার কেহই ছিল না—তবে—

তবে অধরের বোধ হইল যেন সরলা গলির এককোণে দাঁড়াইয়া সজল, সতৃষ্ণ-নয়নে অধরের প্রস্থান লক্ষ্য করিতেছিল।

নোট—(এইটুকুই মার্কামক—ও ইহাতে আরও রং ফলানো যাইতে পারে)

(৩)

অভিনয়।

গন্তব্য স্থানে উপস্থিত!

এ জগৎ নূতন! চাঁদনির জুতার দোকান নহে! কত শাল ও দেবদারু! কত গিরি ও উপত্যকা, কত কণ্টকাকীর্ণ গিরিগহ্বর! গহন বনের ঊর্দ্ধে মাঝে মাঝে মুক্ত আকাশ। অদ্ভুত সুগন্ধিযুক্ত বনবায়ু! অদ্ভুত চেহারার বন্যজাতি! সকলিই সুন্দর, সকলিই স্বাধীনতাময়! সেখানে জলের কল ও গ্যাস লাইটের দৌরাত্ম্য নাই, ট্যাক্স নাই, ভ্যাজালমিশ্রিত জলখাবার নাই, সকলিই বিধির তৈয়ারি খাঁটি। যাহার বলে চরাচর দ্বন্দ্বকোলাহল ও শ্মশানভীতির মধ্য দিয়া সত্যপথে চলিতেছে, সেই মহাশক্তি জগদ্ধাত্রীর আবাসভূম—তাঁরই জ্যোতি বিকীর্ণ।—

নোট—(এই স্থলে পটোত্তলন। ভাল উপন্যাসলেখকগণ আরও সুন্দর করিয়া অঙ্কিত করিবেন)

অধরের বোধ হইল যেন—পুনর্জ্জন্ম! সংসারে সেরা সুখই পুনর্জ্জন্ম! মাতৃ-জঠরে নবজীবন লইয়া আবির্ভাব! অধর মনের আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—হু—উ—উ!—

বোধ হয় এই ধ্বনি সেই দেশের বন্য জাতির আদিম ধ্বনি! সহসা বৃক্ষান্তরাল হইতে কৃষ্ণবর্ণকায় একজন বন্য যুবক আসিয়া অধরের সম্মুখে উপস্থিত।

বন্য যুবক। তুই কি বাঙ্গালী?

অধর। নিশ্চয়। তুই কি?

যুবক। কুকি। আমি ডোঙ্গা বাহি।

অধর। আমার একটা ডোঙ্গা চাই। কত টাকায় বিক্রী কর্‌বি?

যুবক। (হাসিয়া) এখানে টাকা চল্‌তি নাই। তবে দশটা রূপার টাকা দিলে, মালা গেঁথে রাখ্‌ব।

অধর তৎক্ষণাৎ দশ টাকা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'তোর ডোঙ্গার নাম কি ?'

যুবক। দুখানা ডোঙ্গা আছে—একটার নাম 'সোণার তারা'—আর একটার নাম 'সরলা'।

অধর শিহরিয়া উঠিল।

"আচ্ছা আমাকে তোর 'সোণার তারা'ই বিক্রী কর।"

যুবক। "সোণার তারা'তে একটু কুলক্ষণ আছে। তবে তুই যদি অদৃষ্ট বিশ্বাস না করিস্—তবে 'সোণার তারা'ই নে"—

অধর বলিল 'চল্—দেখে আসি'। উভয়ে বহুকালের সখার মত হাত ধরাধরি করিয়া নদীতটে। সেখানে হরিণ ও চিতাবাঘ একঘাটে জলপান করিতেছিল।

উভয় ডোঙ্গা ঘাটে বাঁধা। কি সুন্দর 'সোণার তারা'র ডোঙ্গা! নিখুঁত 'সরলা' একটু প্রস্থে বড় ও ভারি। অধর 'সোণার তারা'তে চড়িয়া বসিল।

যুবক। বহিতে জানিস্।

অধর। না।

যুবক। তবে তোকে শিখিয়ে দিই। তুই যাবি কোথায় ?

অধর। মহাকালীর মন্দিরে।

যুবক। সেত বন্যায় দহিয়া গেছে।

অধর। আমি ভাঙ্গা দেউল নদীগর্ভে অন্বেষণ করব।

যুবক। কেন ?

অধর। তার মধ্যে মণিকাঞ্চন আছে।

যুবক। তা দিয়ে কি করবি ?

অধর। কল্‌কেতায় গিয়ে ওড়াব।

যুবক। আচ্ছা তবে চল্।

যুবক বাহিয়া চলিল। অধর মাঝে মাঝে দাঁড় ও বাঁশ গ্রহণ করিয়া বাহিবার কৌশল শিখিতেছিল।

(৪)

বসতি।

সন্ধ্যাকালে বনের মাঝে একপ্রান্তে ধূম দেখিয়া যুবক বলিল,—'ঐ আমার কুটীর। মহাকালীর ভাঙ্গা মন্দির এখান হ'তে এক ক্রোশ। সেখানেও আমার আত্মীয় আছে, কিন্তু তারা নিতান্ত বন্য।'

অধর। সেখানে সকালে যাব। এখন খাবার কি জোগাড় আছে?

যুবক। এত খাবার এই বনে যে, তোদের মতো ডালভাত খাবার জন্য চুরি চামারি শিখতে হয় না, খাজনা দিতে হয় না। আদায়ও ক'র্ত্তে হয় না। এই দেখ্—

কত রকম বনের ফল! পিয়ার! বন্য-গোধূম, বেল ও চন্দনগন্ধা শাক! কুর্কি যুবক অতিশয় রন্ধনপটু। বিনা তৈলে, বিনা ঘৃতে সেগুলি একঘণ্টার মধ্যে পাক করিয়া শালপত্রে রক্ষা করিল।

'তোরা মাছ পোড়া খাস্'।

অধর। একটু মাষ্টার্ড হ'লে মন্দ হয় না। রাই আছে।

যুবক। আছে।

অধর। হরিণের মাংস?

যুবক। আছে।

অধর। তবে আমি রোষ্ট কট্‌লেট করে ফেলি। তুই শেখ্।

অধরও নিজের গুণপণা দেখাইল।

উভয়ে উভয়ের হাতের অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়া প্রেমে বিভোর!

আহারান্তে উভয় জীবাত্মা সভ্য ও বর্ব্বরজগতের সীমায় বসিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে গান ধরিল।

অধর। (রাগিণী বেহাগ।)

'এ সুখ বসন্তে লো সই!—ইত্যাদি
বোলে পাপিয়া পিউ পিউ—

যুবক। (অজানা রাগিণী)

ওরে আমার শালগাছের মৌমাছি—
তোর হুলে না জানি কত প্রেম।—

অধর। দু'জনের সুর ক্রমে মিল্‌বে। তুই একটু চেষ্টা কর।

যুবক। তুই পিউ' পিউ' কর, আমি মৌমাছির মত 'গুন্' 'গুন্' করি—

যদিও তখন শীত; কিন্তু গানের মহিমায় বসন্ত বিরাজ করিল—একে চাঁদনি রাত্রি—অজানা দেশ—অজানা মানুষ—নূতন জীবন-সখা! কিঞ্চিৎ ভয়, কিঞ্চিৎ মোহ! উভয়ে ঘুমের কোলে।—

(৫)

অন্বেষণ।

'সোণার তারা' একাকী বাহিয়া মহাকালীর ভাঙ্গা মন্দিরের পার্শ্বে অধর উপস্থিত। 'রত্ন ত নদীগর্ভে। ডুব দিয়া বাহির করি কি করিয়া'?

বুক দমিয়া গেল।

এমন সময়ে অদূরে স্বল্প জলে শিলাখণ্ডদ্বয়ের মাঝে স্রোতের বিরুদ্ধে অধরের বোধ হইল দুইখানি উজ্জ্বল শ্যাম কোমল হস্ত, কালো চুলের রাশির আড়ালে সন্তরণরত—।

ক্রমে মুখ দেখিয়া বোধ হইল—মানব বালিকা হঠাৎ সে ডোঙ্গা লক্ষ্য করিয়া অর্দ্ধনগ্ন দেহে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষীণা, সিক্তবসনা, সুঠামযুক্ত অপূর্ব্ব সুন্দর দেহ,—নিতান্ত বালিকা নহে—যুবতী! একখানি ছবি! পাড়ের শ্যাম তরুরাজির পটে, নীল আকাশতলে সে ছবির শোভা অতিশয় মনোহারী!

একবার! উভয়ের দৃষ্টি মিলিল। ভীতা হরিণীর ন্যায় যুবতী ক্ষিপ্রগতিতে বনের মাঝে পলাইয়া অদৃশ্যা হইল।

মুহূর্ত্তেক—অধর অবাক্ ও মুগ্ধ হইয়া বনের দিকে চাহিয়াছিল। ছবির বাস্তব অস্তিত্ব তখন বনের মাঝে নাই। কিন্তু মানসপটে অঙ্কিত। সেই অল্প বহুসংখ্যায় বাহ্য প্রকৃতি দৃশ্যে অবিরাম বিক্ষিপ্ত হইয়া বোধ হইতেছিল যে, সংসার কেবল সেই ছবি। 'ইহাই ত জীবন! আর জীবনে আছে কি ছাই'? 'ইহাই ত রত্ন'! লক্ষটাকার মণিকাঞ্চন ইহার তুলনায় কোন্ ছার?

'এ যুবতী কে? কুকি জাতি ত এত উজ্জ্বলবর্ণা হয় না। হয়ত স্বপ্ন? কিম্বা বনদেবী। কিম্বা অপ্সরা। শুনা গিয়াছে পাহাড় পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বজাতি থাকে। হয়ত তাদেরি কেহ'?

অধর ডোঙ্গা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বনের মধ্যে ছুটিল। আহার ও বিশ্রাম ভুলিয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিল। ক্রমে দিবা দ্বিপ্রহর! ধনুর্ব্বাণ হস্তে অনেক কুকি অধরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তুই কেয়া?'

অধর। পথভ্রান্ত বাঙ্গালী।

কুকি। এখানে কেন?

অধর। রত্নান্বেষণ কচ্ছি।

তাহারা হাসিয়া বলিল 'তুই অনাহারে আছিস্ দেখ্‌ছি, একটু মধু খা।'

তাহারা চলিয়া গেল। অধর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া তাহাদিগের প্রদত্ত মধু পান করিয়া তৃণশয্যায় নিদ্রাভিভূত হইল।

উদয়।

নোট—(নায়িকার উদয় পূর্ণচন্দ্রের মতো হয়। ছোটগল্পে—প্রেমের ছড়াছড়ি রুচি-বিরুদ্ধ। কেবল ইঙ্গিতে মনের ভাব ব্যক্তকরা যুক্তিসিদ্ধ। তবে সভ্য জগতের সাইকলজির সঙ্গে বর্ব্বরভূমের সাইকলজির বিশেষ তফাৎ আছে। এটা যেন মনে থাকে)

কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিল, তা অধর বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় মধ্যে মধ্যে স্বপ্নে যাহাকে দেখিতেছিল, নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিল যে, সেই অপ্সরা তাহার শিয়রে বসিয়া!—

যুবতী হাসিল। 'তুই যতক্ষণ আমাকে অন্বেষণ কচ্ছিলি, আমিও ততক্ষণ পালিয়ে বেড়াচ্ছিলুম।'

অধর। (বিমুগ্ধ) আমাকে পাগল কর্তে সাধ কেন?

যুবতী। ভাল বেসেছি।

অধর। তোর নাম কি?

যুবতী। 'সোণার-তারা'

অধর (চমকিয়া) আমার ডোঙ্গার নামও ত সোণার-তারা।

যুবতী। বুঝতে পেরেছি। আমার ভাই তোকে দিয়েছে। তুই কোন্ দেশের?

অধর। বাংলা।

যুবতী। বুঝতে পেরেছি। আমার মা বাঙ্গালী ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় শালবনিতে বাড়ী! আমার বাপের দুই বৌ। তিনি বাংলা দেশে রেলে কাজ কর্ত্তেন। সেখান হতে মাকে বিয়ে করে নিয়ে আসেন। তাই আমি ও আমার ভাই ভজু দুই জনেই বাংলা জানি।

অধর। বাংলা কথা বনের জল-হাওয়ায় এত মিষ্টি হয়?

যুবতী। হয়। আমাকে যদি পছন্দ করিস্ আমি তোর বৌ হব।

অধরের বুক নিশ্বাসে ভরিয়া গেল। আবার বোধ হইল—স্বপ্ন! 'আমার কি এত সৌভাগ্য হবে'?

যুবতী। সৌভাগ্য? আমার মত কত দাসী, কত বৌ তুই বাংলা দেশে পাবি।

বীণার রজত-তারের ঝঙ্কারের মতো তার সরল কথাগুলি অধরের হৃদয় প্রদেশে আঘাত করিতেছিল। বিবাহ? বৌ? সোণার-তারা আমার জীবন সঙ্গিনী? আমি কোন্ পুণ্য করিয়াছিলাম?

অধর। তোর মতো সুন্দরী ত আমি কখনো দেখি নাই—শুনি নাই—তুই আমার জীবনের ধ্রুবতারা।

অধর বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল—আমার বুকে আয়।

কিন্তু যুবতীর মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল!—

'আমার মার ঐ কুটীর দেখা যাচ্ছে—সেখানে যেও'।

চকিতের ন্যায় সে অদৃশ্যা!

বিকীর্ণ রশ্মিজাল।

ভূতপূর্ব্ব জুতাবিক্রেতা অধর—ও স্বপ্নাক্রান্ত অধর এক জীব নহে। নূতন দেশে, নূতন আকাশে, জলে ও হাওয়ায় জীবাত্মা চট্ করিয়া বদলাইয়া যায়, তাহা কে না জানে?

কুটীরে কিছুই নাই। এক একটা শ্মশানঘাটের পার্শ্বে শূন্য কুটীর থাকে—সেখানে মৃতদাহ করিতে লোক আসে—সেই রকম। একটা মৃণ্ময় কলসী—এক আধখানা মোটা কাপড়—একগাছা দড়ি—একখানা বাঁশের চ্যাটাই। কিন্তু আছে তাহার মধ্যে সোণার তারা—ও তারার মা!

তারা থাকে কি করিয়া? জীবনে কি কোন সাধ নাই? বাসনা নাই?

অধর দেহ হইতে কোট ও নেকটাই খুলিয়া দড়িতে ঝুলাইয়া রাখিল। জননী বলিল—সোণার তারাকে তুই বিয়ে করবি?

অধর। আমি দরিদ্র—তবে বাহু আছে—শক্তি আছে—প্রেম আছে—সেইগুলি অবলম্বন ক'রে আমার সোণার তারা থাক্‌বে।

মা। তুই ত এদেশে থাক্‌বিনে?

অধর। থাক্‌ব।

মা। না, থেকে কাজ নেই। এ জায়গায় বেশী দিন মন টিকিবে না। একে নিয়ে যা। বনের সঙ্গে সহর মিশে যাক্। পূর্ব্বকালের রাজা-রাজড়া মৃগয়া কর্ত্তে বনে আস্‌ত, কিন্তু বেশী দিন থাকৃত না। ভগবান্ বন ভেঙ্গে সহর গড়েছেন, মানুষের একটা নূতন আকার হবে ব'লে।

একদল ফুকি, পুরুষ ও রমণী একত্র হইয়া উভয়ের বিবাহ দিল। কতই সুখের নিশি—কতই সুখের বাসরঘর!

ভজু আসিয়া বলিল,—'ভাই! সোণার তারাকে নিয়ে যাচ্ছিস্! যা—এদেশে চিঠিপত্র আসে না—তারের খবর আসে না—তত্ত্ব আসে না।

(৬)

অন্ত।

রাত্রির তৃতীয় যামে সোণার তারা—তার কোমল বাহু দিয়া স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া বলিল—'চল্—সেই ভাঙ্গা দেউলের মণিকাঞ্চন অন্বেষণ করি'।

অধর দেখিল, তারার মুখ বিষাদে মলিন। কেন?

উভয়ে, জীবনের সেই গভীর রাত্রিকালে—(একই গভীর রাত্রি—একই দিন—রাত্রি দিনের কোন তফাৎ নাই) পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদীতটে গেল।

সোণার তারা বলিল 'নাথ! মণিকাঞ্চন যেখানে আছে, আমি জানি। আমি ডুব দিয়ে তুল্‌ব—তুই আমার হাত ধরে' থাকিস্।'

অধর তাহাকে বুকে করিয়া জলের মাঝে গেল।

'আমি ডুব দিই'।

তারা হাসিয়া বলিল 'না! তুই সন্ধান জানিস্‌নে—দম থাক্‌বে না—আমি চক্ষের নিমেষে তুলে আন্‌ব'।

অধর তাহার বাম বাহু ধরিয়া থাকিল—সোণার তারা জলে ডুব দিল।

ক্রমে জল গভীর—গভীর হইতে আরও গভীর। অধর সাঁতার দিতেছিল। তারার বাহু তার বাহু দৃঢ়মুষ্টিমধ্যে। সেও জলে মগ্ন হইল। এত জল কে জানে?

ক্রমে জ্ঞানশূন্য!

কোথায় কে গিয়াছে, কে জানে? কোথায় লক্ষ টাকার মণিকাঞ্চন? কোথায় অধর? কোথায় সোণার তারা?

বোধ হয় উভয়ে অতীন্দ্রিয় জগতে। সেখানে সভ্যতা নাই, বর্ব্বরতা নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ, আছে; কিন্তু বাস্তব নাই। বুক আছে। সোণার তারা বুকে মিশিয়াছে। কত মাণিক্য, মুক্তা ও জহরৎ! তবে তাহা কত

উভয়ে জলমগ্ন অবস্থায়। সোণার তারা বলিল, 'নাথ এ জগতে থাক্‌বি? না ধরাধামে যাবি?'

(৭)

প্রত্যাবর্ত্তন।

সেই ত সমস্যা! জহরৎ হাতের মধ্যে। সোণার তারা বুকে।

অধর। তোকে নিয়ে পাড়ে উঠ্‌ব। জলের মধ্যে আর বেশীক্ষণ থাকা অসম্ভব!

সোণার তারা। আর তা হয় না! এ জন্মে হয় না। দুজন্মে একত্রে পুনর্জ্জন্ম হয় না। সতী স্বামীর সঙ্গে একত্রে যায়, কিন্তু সংসারে একত্র ফিরিয়া আসে না। আমি জান্‌তুম তোর মন কাঞ্চনের দিকে, সেইজন্য এই দেশে এসেছিলি। আমি জান্‌তুম, তুই সরলাকে ভালবাসিস্, তবে তোর টাকা নেই বলে' বিয়ে কর্ত্তে পারিস্ নি। আমার সাধ মিটেছে। তোর সাধ মেটেনি তোকে পেয়ে আমি সংসার ভুলেছি। কিন্তু তুই পুরুষ। তোর এখনও দশটা সংসার কর্ত্তে হবে। আয় তোকে আমার প্রাণ দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে শেষ বরণ করি

(নোট—এখানে আরও ড্রামাটিক করা যায়, তবে নিপুণ হাত চাই, আমার মতো খেলো উপন্যাসলেখকের কাজ নয়)

ফলে অধরের জীবনে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ১লা এপ্রিল প্রাতঃকালে দেখা গেল অধর মস্তক মুণ্ডিত করিয়া ও গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া চাঁদনির মোড়ে দাঁড়াইয়া।

দত্তজা মহাশয়। ওকে অধর নাকি?

অধর। হ্যাঁ, দাদা।

দত্তজা। ব্যাপার খানা কি?

অধর তাহার জীবনের অপূর্ব্ব ঘটনা বর্ণনা করিল। দত্তজা একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—

'তোকে কামরূপের কোন যুবতী যাদু করে ছিল। যাহোক্ কল্‌কেতায় ফিরে এসেছিস্ এই ঢের। তবে তোর বাকি টাকায় একটা লেমোনেডের দোকান খুলে ফেল্।'

অধর গম্ভীর ভাবে বলিল,—'তুমি ভুল কর্‌ছ দাদা আমার সঙ্গে লক্ষ টাকার জহরাৎ হুবহু বর্ত্তমান! এই দেখ!'

মজ্জা দেখিয়া অবাক্! সংসারে কত যে আশ্চর্য্য ঘটনা হয়, তার মধ্যে এটা খুব আশ্চর্য্য। তুই সরলার মাকে গিয়ে দেখা—তার দর্পচূর্ণ করগে।

অধর কিন্তু দর্পচূর্ণ করিল না। সরলার মাতাকে ধনরত্ন দেখাইয়া বলিল 'যদি সরলা বিয়ে কর্ত্তে রাজি হয়, তবে আমি রাজি'।

মর্য্যাল।

আসল কথা যুবাপুরুষের বিবাহ করিবার সাধ মিটে না, তাই অন্তকাল সেই আশায় ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়ায়। গলির মাঝে সরলা অধরকে বিদেশে যাইতে দেখিয়া তপস্যা করিতে বসিয়াছিল। তাই যখন সরলার সঙ্গে অধরের বিবাহ হইল, তখন সে বাসর ঘরে অধরের কাণে কাণে বলিল—আমিই তোমার সেই দাসী 'সোণার তারা'। তুমি বনে গিয়েছিলে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলুম। তুমি যদি 'সোণার তারা' ডোঙ্গায় না গিয়া 'সরলার' ডোঙ্গায় উঠিয়া বসিতে, তবে তোমার সঙ্গে জলে ডুব দিতুম না।

অধর। তবে আমার মাথা মুড়ল কে?

সরলা। স্বামীর মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "মাথা খারাপ দেখে ডাক্তার ডেকেছিলুম।"

সুরেন্দ্র।

লীলা-কৌতুক।

বুঝি না তোমার লীলা, লীলাময় প্রাণাধার!
ভাবি এক, হয় আর, অতীত যা' ভাবনার!
খুঁজিতে সুখের হাসি ঝরে দুখে আঁখিজল!
অশ্রুর মাঝারে ফুটে একি হাসি নিরমল!
যেথা রাখি আশা নাথ, নিরাশার ব্যথা পাই,
নিরাশা যা' মনে হয়; হেরি শেষে আশা তাই!
আঁধারে আলোর মেলা, আলোক আঁধারময়,
হৃদয়ে বাহিরে পাই পলে পলে পরিচয়!
জীবন ঘুমায়ে রয় মরণের কোলে হায়,
মরণ জীবন বুকে পুলকে লুটাতে চায়!
ঝরিতেই ফুটে ফুল, থামিতেই জাগে গান,
নূতন জনম-ধারা বহি আনে অবসান!
এ কি লীলা, এ কি খেলা, হে কৌতুকী রসরাজ!
অবুঝ পরাণ মোর বড় যে ব্যাকুল আজ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কোন্ পথে? (রাজনীতি)

আমাদের দেশে একটি আকাঙ্ক্ষা ও একটি চিন্তা অনেক দিন হইতে ছায়ার মত প্রতিভাত হইতেছিল; তাহা এখন ধীরে ধীরে কায়া পরিগ্রহ করিয়াছে। সে আকাঙ্ক্ষা—স্বরাজ। সে চিন্তা স্বরাজলাভের উপায়। তাহা কাল্পনিক নহে, স্বাভাবিক;—যেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ আন্তরিক। তজ্জন্য তাহা ক্রমেই অধিকসংখ্যক লোকের চিত্তক্ষেত্রে অধিকার বিস্তার করিতেছে।

স্বরাজ কি, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু প্রচলিত শাসনব্যবস্থা যে আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ নহে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ অল্প। স্বরাজলাভের উপায় কি, তৎসম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কিন্তু সংসারত্যাগী বিষয়বিরাগীর উদ্বেগহীন উদাসীনতা যে উপায় নহে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ নাই। সুতরাং রাজনীতিক আন্দোলন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আন্তরিকতা লাভ করিয়াছে; আলোচনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুখরতা প্রাপ্ত হইয়াছে; মতভেদের মূলও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

দেশকালপাত্র মানবচিন্তার ও মানবকার্য্যের প্রকৃত নিয়ামক। তাহার প্রভাব অতিক্রম করা অসম্ভব। এক সময়ে তাহার প্রভাবে লোকে আত্মতৃপ্ত ছিল। এখন আবার তাহার প্রভাবেই এক অপরিতৃপ্ত স্বরাজ-লালসা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহা একশ্রেণীর লোককে স্বপ্ন-লোকের দিকে, আর এক শ্রেণীর লোককে বাস্তব-লোকের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে দলাদলি অনিবার্য্য; গালাগালি অনিবার্য্য নহে। সুতরাং ধীরভাবে আলোচনার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

যাঁহারা স্বপ্ন-লোক অপেক্ষা বাস্তব-লোকের অধিক অনুরাগী, তাঁহারা যুক্তি-মার্গ, শান্তি-মার্গ, অহিংসা-মার্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারাও দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কাহারও মতে স্বরাজ "আত্ম-শাসন"; কাহারও মতে তাহা কেবল "আত্ম-শোধন।" উভয় মতের লোকেই দেশ-শাসনে দেশের লোকের অধিক অধিকার লাভের পক্ষপাতী;—কেহই দেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর নহেন। সে ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, কাহারা করিবে,

এবং তাহার দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া, দেশের লোকে দেশের শাসন-কার্য্যে কত-দূর অধিকার লাভের দাবী করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে উভয় দলই তুল্যভাবে নীরব। ইঁহাদের স্বরাজ একটি পারিভাষিক শব্দ; তাহার অর্থ—পররাজের শাসনাধীন স্বরাজ, অথবা স্বরাজপ্রভাবপুষ্ট পররাজ। ইংরাজ শাসন বজায় রাখিয়া, ইংরাজ সহযোগে দেশের শাসন কার্য্যে অধিক অধিকার লাভই প্রকৃত লক্ষ্য। কেহ ক্রমে ক্রমে, কেহ এখনই তাহা লাভ করিবার জন্য লালায়িত।

তাহা লাভ করিবার উপায় কি, তৎসম্বন্ধে যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ। তাহা কাহারও মতে "সহ-যোগ"; কাহারও মতে "অ-সহযোগ।" এই দুইটি বিপরীত অর্থ-দ্যোতক কথা ফলিতার্থে বিপরীত আকাঙ্ক্ষা-দ্যোতক নহে। দেশকালপাত্র অনুসারে যাহা যুক্তিযুক্তরূপে আশা করা যাইতে পারে, তাহা অধিক অধিকার। তাহা লাভ করিতে হইলে, ইংরাজ-সহযোগ আবশ্যক। কেহ প্রজার সহযোগবলে ইংরাজ সহযোগ লাভ করিবার জন্য, কেহ প্রজার অসহযোগবলে ইংরাজ সহ-যোগ আদায় করিবার জন্য, আন্দোলনে বদ্ধপরিকর। অসহযোগবাদিগণের চরম লক্ষ্য অ-সহযোগ নহে;—সহযোগ লাভের জন্য অ-সহযোগ। সুতরাং সহযোগবাদিগণ অ-পরোক্ষ ভাবে, এবং অ-সহযোগবাদিগণ পরোক্ষ ভাবে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর।

অ-পরোক্ষ ভাব দ্বিধাশূন্য; পরোক্ষভাব সেরূপ নহে। অসহযোগ বলে শাসনশক্তিকে পঙ্গু করিয়া অধিক অধিকার দানে বাধ্য করিতে হইলে, দেশের যে সকল লোকের সহযোগবলে শাসন-যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে, তাহাদিগকে বিগড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা নানাকারণে অসম্ভব। সুতরাং পঙ্গু করিবার আশা ত্যাগ করিয়া, ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার আশায়, বিবিধ উপ-দ্রব সৃষ্টি আবশ্যক। কিন্তু তাহাও সহজসাধ্য বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। এই কারণে, অসহযোগের সমস্ত কার্য্য প্রণালী এখনও সুনির্দ্দিষ্ট হইতে পারে নাই। "ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে নৈতিক অধঃপতন প্রতারণা অত্যাচার এবং শ্বেতাঙ্গের প্রভাব বোষিত হইয়া থাকে, তাহা দূর করাই অসহযোগের উদ্দেশ্য।" ইহাই এখন পর্য্যন্ত শেষ সুসংশোধিত ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচারিত হই-তেছে। দূর করিবে কে,—আমরা। দূর করিব কি,—ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রের নৈতিক অধঃপতন, প্রতারণা, অত্যাচার এবং শ্বেতাঙ্গ-প্রভাব। যাহাদের সহযোগে শাসনযন্ত্র চলিতেছে, তাহারা অসহযোগ করিল না; বাহি-

রের লোকের অসহযোগে এই কার্য্যগুলি কিরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন না। ভাবে বোধ হয়, আমরা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিলেই, হইতে পারে। এই জন্য স্বরাজ আত্ম-শাসন নহে; আত্ম-শোধন। মানুষের মত মানুষ হইতে পারিলে, সহযোগবলেও কাম্যফল লাভ করা যাইতে পারে। অসহযোগবলে তাহা লাভ করা বরং অপেক্ষাকৃত কঠিন। কিঞ্চিৎ বিদ্বেষের প্রক্ষেপ ভিন্ন অসহযোগের পুটপাক সম্যক্ বীর্য্যলাভ করিতে পারে না। মুখের কথা যাহাই হউক, প্রয়োগকালে অসহযোগের অহিংসাত্মক প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন। অল্পদিনের মধ্যে তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শাসন-ব্যবস্থার পাপ-ক্ষালন করিতে হইলে, রসা-মাজার সংঘর্ষ অনিবার্য্য। তাহাতে অগ্ন্যুৎপাত হওয়াই স্বাভাবিক। সহযোগবাদী এবং অসহযোগবাদী এখনও এই তর্কের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছেন না। শাসনকার্য্যের যে সকল পাপ দূর করা অসহযোগের উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে, তাহা এই উপায়ে দূর হইতেছে কি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, সে কথারও আলোচনা হইতেছে না। এই পথই পথ,—মুখে মুখে কেবল এই কথাই অধিকতর দেশব্যাপ্ত হইতেছে। ইহাতে দেশের মধ্যে এক অবুঝ দল পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাহারা আপাততঃ অসহযোগবাদী হইলেও, কার্য্যক্ষেত্রে শান্তিপ্রিয়তার পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেছে না। তাহারা যেখানে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, সেখানেই ধর্ম্মঘট, হরতাল, শান্তিভঙ্গ!

তাহারা দেশকালপাত্রের অনুসরণে অসম্মত,—স্বপ্ন-লোকের অনুগত,—নেতা নহে, নীত,—কিন্তু সকল বিষয়ে নেতৃপুরুষ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবে নীত হইতে অসম্মত। ইহাতে অল্পদিনের মধ্যে যে মতদ্বন্দ্ব অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে স্বরাজের মুখবন্ধ অনিন্দ্য না হইয়া, নিতান্ত অনুবন্ধহীন কলহ-কোলাহলে কলকলায়মান হইয়া উঠিয়াছে। অসহযোগের সহিত অবুঝদলের এইরূপ আংশিক আনুগত্য কত দীর্ঘস্থায়ী হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কারণ, এই অবুঝদলই একদিন সুরেন্দ্রনাথের গাড়ী টানিয়াছিল, বেশান্ত বিবিকে মহাসভার সভাপতির আসনে বসাইয়া দিয়াছিল। ইহাদের মতে, ইহারা ছাড়া, দেশে আর যাহারা আছে, সকলেই সমান অপদার্থ। ইহারা মুক্তিবাদী। ইহাদের কথা,—"লজিক নহে, ম্যাজিক"—যুক্তি নহে, ভেল্‌কী। এই ভেল্‌কীতে ইংরাজ-শাসন ধূলা হইয়া এখনও উড়িয়া যায় নাই; কিন্তু নানা স্থানে দেশের লোক নানাভাবে দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। দেশে যে হাহাকার

উঠিয়াছে, তাহা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সে হাহাকার আর কাহারও নহে,—আমাদের। সেই আমাদিগকে,—দরিদ্র, বিপন্ন, প্রতিকারসাধনে অসমর্থ আমাদিগকে,—এক হস্তে অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে, অপর হস্তে এক কোটী টাকা চাঁদা দিতে, পঁচিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক যোগাইয়া মহাসভার সভ্য হইতে, এবং কুড়ি লক্ষ চরকা ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

এই তিনটি দল অল্পাধিক মাত্রায় গতিশীল। সংখ্যায় অল্প হইলেও, আর একটি সনাতনবাদী দল আছে, সে দল নিতান্ত স্থিতিশীল। সে দলের বিশ্বাস :—সহযোগবাদী এবং অসহযোগবাদী এই উভয় দলই বিলাতী দল, স্বদেশের লোকের দল হইলেও স্বদেশী নহে, বিদেশী,—দলপতিগণ বিলাতফেরত,—বিলাতী ভাবোন্মাদে আত্মহারা। তাঁহাদের পরিচালন-কৌশলে আমাদের দেশের সনাতনধারা মারা যাইবার পথে অগ্রসর হইতেছে কিনা, তাহা সর্ব্বাগ্রে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ, সনাতন ধারা মারা পড়ে,—কি হিন্দু কি মুসলমান,—কেহই এখনও তাহা ইচ্ছা করেন না। স্বরাজ যত বড় হউক না কেন, স্বজাতি-স্বধর্ম্ম তাহা অপেক্ষা অনেক বড়,—একথা অস্বীকার করিতে হিন্দু মুসলমান এখনও প্রস্তুত হয় নাই। যখন হইবে, তখন একাকার। এখন তাড়াতাড়ি তত বড় ত্যাগস্বীকার করিতে আহ্বান করিলে, হিন্দুমুসলমান উভয়েই দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে :—হিন্দু বলিবে "ছি"! মুসলমান বলিবে "তোবা"!

ইংরাজী শিক্ষা যাহা করিতে পারে নাই, বিলাতফেরত দলের আদর্শ তাহা করিয়াছে ;—ভারতবর্ষে এক নবযুগ টানিয়া আনিয়াছে,—বিলাতফেরতদলকে তাহার যুগাবতারপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দিয়াছে ; এবং বিলাতী স্বদেশ প্রীতির ধারণায় স্বদেশী স্বজাতিপ্রীতি—স্বধর্ম্ম-প্রীতিকে খাটো করিয়া দিয়াছে। আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের শক্তি সঞ্চিত হয় নাই। এই অদৃষ্টবিড়ম্বনায় অসন্তোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। প্রচলিত শাসনব্যবস্থার ভ্রম-ত্রুটি অত্যাচার অবিচার, জীবনসমস্যার জটিলতাপূর্ণ অভাব অভিযোগের সহিত মিলিত হইয়া, জনসমাজকে এতদূর বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে যে, যিনিই নেতৃত্ব করিতে অগ্রসর হইতেছেন, তিনি কে, তাহার অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া, লোকে তাঁহারই কণ্ঠলগ্ন হইতেছে। দলপতিগণ এইরূপে জনশক্তির সহযোগ লাভ করিয়া, যেরূপ রাজনীতিক আন্দোলনের আমদানী করিতেছেন, তাহা স্বদেশী নহে, বিদেশী, দেশকালপাত্রের সহিত সামঞ্জস্যশূন্য উচ্ছৃঙ্খল স্বরাজ-সাধনা, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব অভিনব ভাববিপ্লব।

স্থিতিশীল দল এইরূপ হেতুবাদে এই শ্রেণীর স্বরাজসাধনায় আস্থাস্থাপন করিতে অসম্মত। একজন স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—যে দিন ইহাদের "স্বরাজ" সত্য সত্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সে দিন তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিবেন! কথা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইবার আশঙ্কা নাই, তথাপি ইহা উড়াইয়া দিবার কথা নহে। ইহা দেশের একশ্রেণীর লোকের মনের ভাবের অতিরঞ্জিত অভিব্যক্তি। তাহা দেশের লোকের বিরুদ্ধে অসন্দিগ্ধ অপবাদ,—দেশের লোকের কর্ত্তব্যপরায়ণতার ও ন্যায়নিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ। যাঁহারা গতিশীল, স্বরাজ-লোলুপ অবুঝদল, তাঁহারাও কিন্তু দেশের লোকের কর্ত্তব্যপরায়ণতায় ও ন্যায়নিষ্ঠায় এইরূপ আস্থাশূন্য; এবং পরস্পরের নিন্দাকুৎসা-রটনায় পঞ্চমুখ। ইহাদের মনসবদারীর উমেদারী সফল হইলে, দেশের মঙ্গল হইবে না বলিয়া, স্থিতিশীলদল আশঙ্কা প্রকাশ করিলে, তাঁহাদিগের তজ্জন্য অধিক তিরস্কার করা যায় না। কিন্তু স্থিতিশীল দলের প্রাধান্যের দিন চলিয়া গিয়াছে। যাঁহারা এখনও এই দলের জীর্ণ ধ্বজা ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও জিগমিষা দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে,—মতের সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ-প্রভুত্ব আবশ্যক;—আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই আবশ্যক,—আমাদের কল্যাণের জন্যও আবশ্যক,—এমন কথা স্থিতিশীলদলও সাহস করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। ইহার বক্তা শ্রোতা দুর্ল্লভ। যিনি অভিনব স্বরাজ-সাধনার প্রধান পথপ্রদর্শক, তিনিই কেবল একথা দৃঢ় স্বরে ব্যক্ত করিয়াছেন,—কিন্তু তাঁহার নামের ঘন ঘন জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁহার এই কথা লোকে ডুবাইয়া দিয়া ইংরাজ নাম এবং ইংরাজশাসন ঘৃণাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে। অবুঝদল এ বিষয়ে অবিসংবাদিত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে। কারণ, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক, তাহারা উত্তেজনাপূর্ণ বাচালতার পক্ষপাতী; সুতরাং অতি অল্প আয়াসেই তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে,—আমরা অসহযোগ প্রয়োগ করিবামাত্র ইংরাজশাসনশৃঙ্খলা আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে;—তখন আর পর-রাজ নহে; একেবারে স্বরাজ—ইংরাজসম্পর্কশূন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।

আমাদের দেশ বহু পুরাতন সভ্যদেশ। সেসভ্য তার মূলশক্তি অ-সহযোগ;—আর্য্যে-অনার্য্যে অ-সহযোগ,—হিন্দু-মুসলমানে অ-সহযোগ;—ব্রাহ্মণে অব্রাহ্মণে অ-সহযোগ;—বর্ণে বর্ণে অ-সহযোগ। ইহাই সনাতন ব্যবস্থা। অনার্য্য-সহযোগে আর্য্য অনার্য্য হইয়া না যায়, তজ্জন্য আর্য্যে অনার্য্যে অ-সহযোগ,

মুসলমান-সহযোগে হিন্দু, হিন্দু-সহযোগে মুসলমান, স্বধর্ম্ম-বিচ্যুত না হয়, তজ্জন্য হিন্দু-মুসলমানে অ-সহযোগ। এই একমাত্র কারণে, ব্রাহ্মণে অব্রাহ্মণে, বর্ণে বর্ণে, অ-সহযোগ। ইহা কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ নহে; ইহা কেবল স্বধর্ম্ম-রক্ষক আত্ম-যোগ। ইহা স্বরাজলাভের পক্ষে অন্তরায় নহে। যখন স্বরাজ ছিল, তখনও ইহা বর্ত্তমান ছিল; বরং অনেক বিষয়ে দৃঢ়তর ছিল; কারণ, ইহা কেবল বৈবাহিক আদান-প্রদানে, সামাজিক পান-ভোজনে, স্বধর্ম্মসাধক ব্যবস্থা-পালনে, ক্বচিৎ, বর্ণানুগত বৃত্তি-নির্ব্বাচনে সীমাবদ্ধ। ইহার পরিবর্ত্তনসাধনে স্থিতিশীল দলের যতই আপত্তি থাকুক, গতিশীল দলের আপত্তি নাই। তাঁহাদের দৃষ্টান্তই বরং ধীরে ধীরে বহু বিষয়ে পরিবর্ত্তনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা খাঁটি স্বদেশী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুমুসলমান, তাঁহারাও যে বিলাতী দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেছেন না, ইহাতেই যুগান্তরের সূত্রপাত হইয়াছে। স্বরাজ আসুক বা না আসুক, স্বধর্ম্ম ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে অ-সহযোগ চালাইতে হইলে, সমাজনীতিক্ষেত্রের সনাতন অ-সহযোগ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা আমাদের দেশের পক্ষে নূতন। পুরা-কালে আমাদের দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে কেহ কখন অ-সহযোগের বিনিয়োগ করিবার চেষ্টা করে নাই। কারণ, সে ক্ষেত্রে জনসাধারণের অ-সহযোগ লোকস্থিতির পক্ষে অ-সহযোগ; রাজশক্তির বিরুদ্ধে অপরিতৃপ্ত অভিযোগ; রাজভক্তির পক্ষে মারাত্মক সংক্রামক রোগ। রাজা সুযোগমত মুষ্টিযোগ প্রয়োগে মনোযোগ দিতে পারিলে, কর্ম্মভোগ;—না পারিলে, অরাজকতার অনিবার্য্য গোলযোগ। জয় হউক, বা পরাজয় হউক, ইহা একাকারের পক্ষে মাহেন্দ্র যোগ।

স্বধর্ম্ম-রক্ষক সনাতন অ-সহযোগ কাহারও সহযোগের উপর নির্ভর করে না। রাজনীতিক্ষেত্রের অ-সহযোগ সেরূপ নহে। তাহা সকল শ্রেণীর সকল লোকের সম্পূর্ণ সহযোগের উপর নির্ভর করে। এই সর্ব্ব-সহযোগ আগে, তাহার পরে, তাহারই সাহায্যে, রাজশক্তির বিরুদ্ধে অ-সহযোগ। সুতরাং সর্ব্ব-সহযোগ ঘটাইয়া তুলিতে না পারিলে, সম্পূর্ণ অ-সহযোগ অসম্ভব, তাহা ঘটাইতে হইলেই, অনেক সনাতন ব্যবস্থা শিথিল করিয়া লইতে হইবে।

যে পথে মানব-সভ্যতা উন্নতি লাভ করিয়াছে, সে পথ চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতার পুণ্য পথ। সে পথ সর্ব্বাগ্রে রুদ্ধ করিতে হইবে। তাহা সহজে

সাধিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, ধর্ম্মঘট করিয়া সাধিত করিতে হইবে। কেহ যদি অ-সহযোগ মানিতে ইতস্ততঃ করে,—গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে অসম্মত হয়,—চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হয়,—তাহার বিরুদ্ধে অ-সহযোগ প্রয়োগ করিতে হইবে। রাজশক্তি আপাততঃ হাতে না থাকায়, সমাজ-শক্তির শরণাপন্ন হইতে হইবে, ছত্রিশ জাতির সমবেত শক্তিতে ব্যক্তিগত চিন্তার ও কার্য্যের গতিরোধ করিতে হইবে। ইংরাজরাজ যদি চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতাকে গণ্ডীবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে কোনরূপ বিধি-ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তনের আয়োজন করেন, তাহার সুতীব্র প্রতিবাদের জন্য যথাসাধ্য কোলাহল করা যাঁহাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য পবিত্র ব্রত, তাঁহারিগকেই স্বরাজের দল বাঁধিয়া, তাঁহাদের সহিত যোগদানে অসম্মত ব্যক্তির চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতা লুপ্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে, এবং তাহাকে একটি প্রশংসনীয় পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত করিতে হইবে! ইহার বিরুদ্ধে মহাত্মার সতর্কতাপূর্ণ শাসনবাণী নানা স্থানে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে;—কেহ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। এই কারণে, বিচারবুদ্ধি সমাদর লাভ করিতেছে না, ভিন্ন মত আলোচিত হইতে পারিতেছে না;—কেহ সেরূপ সাহস প্রকাশ করিলে, তাহার ভাগ্যে নিন্দা, কুৎসা, অপমান, নির্য্যাতন! এইরূপে যে স্বরাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা হইতেছে, তাহা মাথা তুলিতে পারিলে, দেশের লোকের পক্ষেও অ-সহযোগ অসহ-যোগ হইবে। অল্পদিনের মধ্যে যাঁহাদিগের পক্ষে ইহা অসহ-যোগ হইয়াছে; তাঁহারা একে একে দল ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন।

যে ভাবেই হউক, সকল লোকের সম্পূর্ণ সহযোগ ঘটাইয়া, তাহার সাহায্যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে অ-সহযোগ খাটাইয়া, তাহাকে পঙ্গু করিয়া তাহার নিকট হইতে স্বরাজ আদায় করিয়া লইতে হইলেও, আমাদের মধ্যে যে সনাতন অ-সহযোগ প্রচলিত আছে, তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। মুখে বলা যাইতে পারে,—তাহা অনাবশ্যক। কাজের বেলা তাহা বলা চলিবে না। ইহার মধ্যেই মূল শিথিল করিতে হইয়াছে। অস্পৃশ্য জাতির গলা ধরিয়া উচ্চবর্ণের বালকগণের ভাই ভাই করিবার অভিনয়ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ছাড়িতে হইবেই,—"ছুঁৎমার্গ" ছাড়িতে হইবে,—"হাড়ি-ধর্ম্ম" ছাড়িতে হইবে,—যাহার নাম "স্বধর্ম্ম" এবং যাহাতে থাকিয়া "নিধনলাভও শ্রেয়ঃ" বলিয়া চিরপরিচিত,—তাহাকেও অবশেষে ছাড়িতে হইবে। এ কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার

জন্য ক্রমে সকলকেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে,—"যত দিন মুচি-মুদ্দাফরাসের সঙ্গে একত্র পান-ভোজন করিতে না পারিতেছ, ততদিন স্বরাজ পাইবে না।" সুতরাং আট মাসের মধ্যে স্বরাজ পাইতে হইলে, তৎপূর্ব্বে—এখনই—এ কাজটা সুসম্পন্ন করিতে হইবে! কারণ মহাত্মার মহাবাক্যানুসারে ইহাই আগে,—তাহার পরে স্বরাজ, এইরূপ একটি কথা প্রচারিত হইয়াছিল। এখন মহাত্মা বলিতেছেন—না ততদূর যাইতে হইবে না,—তবে "ছুঁৎমার্গ" ছাড়িতেই হইবে।

ইহা এই নবযুগের মহাপুরুষের মহাবাক্য হইলেও, স্বদেশী নহে,—বিদেশী, আমাদের দেশকালপাত্রের সহিত সামঞ্জস্যহীন। মহাত্মা কিন্তু বৃথা চীৎকার করিতেছেন। লোকে এ কথাটা চাপা দিবার জন্যই চেষ্টা করিবে; কেহ ইহা মানিয়া লইতে সম্মত হইবে না। হিন্দু ইহা মানিতে পারে না; মুসলমানও ইহা মানিতে পারে না,—শূকর-মাংসলোলুপ মুচি-মুদ্দাফরাস উভয়ের পক্ষেই সমান অস্পৃশ্য। মহাত্মা ইহার পুনরুক্তি করিলে, নেতৃ-নীতের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া পড়িবে। তাঁহার নাম যাঁহাদিগের সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের জয়ধ্বনি, তাঁহাদের কণ্ঠে সেই জয়ধ্বনি—এই কারণে—বাধ বাধ ঠেকিবে, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অবসাদ জড়িত হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশ যে এখনও সম্পূর্ণ মাত্রায় বিলাতীমত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে নাই, ইহা তাহারই পরিচয়স্থল। সুতরাং বিলাতী প্রণালীতে স্বরাজ লাভের চেষ্টা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইবে, প্রথম প্রবল উচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইবামাত্র, বিচারবুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে,—অসম্ভবের আশা ত্যাগ করিয়া, যাহা সম্ভব, লোকে আবার তাহারই জন্য ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিবে।

এখানে বেশী দিন ভেল্‌কী খাটিবে না;—শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক,—পরিণামে যুক্তি আসিয়া ভেল্‌কীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবে। এখনই অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—সত্য সত্যই কি এতদূর একাকার আবশ্যক? হয় মহাত্মাকে এরূপ উপদেশের প্রত্যাহার করিতে হইবে, না হয়, দেশের লোককে বিলাতীদল ছাড়িয়া, স্বতন্ত্র এক স্বদেশী দল গঠিত করিয়া, সময় থাকিতে বালকগণকে সতর্ক করিতে হইবে। নচেৎ চীনাম্যান যেমন একদিনে টিকি কাটিয়া, স্বাধীনতা-প্রিয়তার অভ্রান্ত পরিচয় প্রদান করিয়া, জগদ্বাসীকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল, ভারতযুবকদলও সেইরূপ একদিনে জাতিধর্ম্মের বাধাবন্ধ টুটাইয়া, স্বরাজলাভের অশ্বমেধের অশ্ববর ছুটাইয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। যুবকদল স্বাধীনতা-প্রিয়তার অনেক

পরিচয় প্রদান করিয়াছে। যে দেশে "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ!" মূলমন্ত্র;—যে দেশে পিতৃসত্য পালনার্থ স্বার্থত্যাগ মূল আদর্শ,—সে দেশের যুবকগণ যখন বিলাতীমন্ত্রে দীক্ষিত বিলাতফেরত-নেতার মুখের কথামাত্রে পিতৃদ্রোহী হইয়া, বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তখন জাতিধর্ম্মের মায়া-মোহ কতক্ষণ তাহাদিগকে পুরাতনের জীর্ণ খুঁটার সহিত বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে? বিলাত-ফেরতদলের নেতৃত্বে আমাদের দেশে যে ইহ-সর্ব্বস্ব বিলাতী আকাঙ্ক্ষার আমদানী হইয়াছে, তাহার প্রতিযোগিতায় আমাদের পর-সর্ব্বস্ব পুরাতন আকাঙ্ক্ষার রপ্তানী অনিবার্য্য। অ-সহযোগ নীতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে, আপোশ-বন্দোবস্ত চলিবে না। যে টিকি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে, তাহাকে সমূলে কাটিয়া ফেলিতেই হইবে। এত করিয়া যদি সত্য সত্যই স্বরাজ পাওয়া যায়, আমরা থাকিয়া, তাহা লাভ করিতে পারিব না। আত্ম-ত্যাগ সহজ, আত্ম-বিস্মৃতি বড় কঠিন, বুঝি বা অসম্ভব।

যেমন আছি, সেইরূপ থাকিয়া, স্বরাজ লাভের উপায়—সহযোগ। অসহযোগের পথ তাহা হইতে পৃথক্। তাহা নিশিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম, তাহার যাত্রা-নিশানের প্রকৃত লাঞ্ছন চরকা নহে,—সর্ব্বত্যাগ। ছাড়িতে হইবে,—অকাতরে ছাড়িতে হইবে। বিদ্যালয় ছাড়া, ব্যবসায়-বিশেষ ছাড়া, স্ব-বৃত্তি ছাড়া অল্প কথা,—পিতৃপুরুষের পুণ্যপরিচয়ের মান সম্ভ্রম ছাড়িয়া, জন-সমুদ্রে নামিয়া পড়িতে হইবে। তাহার পর? সে প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের গুপ্ত কক্ষে সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা যাহা কিছু ছাড়িয়াছেন, কাহারও মুখেই আত্ম-তৃপ্তির স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই;—কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় বেদনাক্লিষ্ট অসহকষ্ট তুষ্টনেত্রে রুষ্টদৃষ্টি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে; ফিরিবার পথে লজ্জা, চলিবার পথে অন্ধতা আনয়ন করিয়া, সংকীর্ণতার কূপের মধ্যে পাতিত করিবার আয়োজন করিতেছে। যাহাদের পিতৃপরিচয় নাই, অতীতের অবদান নাই, পশ্চাতে কেবল অকীর্ত্তিকর বর্ব্বরতা তাহাদের আদর্শের অনুগামী হইয়া, আমাদের পিতৃপরিচয়বিসর্জ্জন অভূতপূর্ব্ব আত্ম-বিসর্জ্জন। অ-সহযোগের পথে এই আত্ম-বিসর্জ্জন অনিবার্য্য। কিন্তু ভারতবর্ষ এখনও এত বড় আত্মবিসর্জ্জনের তীব্র তেজ সহ্য করিবার উপযুক্ত হৃদয়বল সঞ্চয় করিতে পারে নাই। তাহার জন্য আরও আত্ম-শোধন,—আরও সাধনবল আবশ্যক।

প্রচলিত শাসন-পদ্ধতিকে পঙ্গু করিয়া, তাহাকে স্বরাজ দানে বাধ্য করাই অ-সহযোগের উদ্দেশ্য। শাসন-যন্ত্র চালাইবার জন্য আমাদের সহযোগ আবশ্যক।

অচেৎ, অল্পসংখ্যক ইংরাজের পক্ষে ভারতবর্ষের মত এত বড় দেশের শাসন-যন্ত্র পরিচালন করা নিতান্তই অসম্ভব। সুতরাং আমরা অ-সহযোগ খাটাইতে পারিলেই, সে শাসন-যন্ত্র অচল হইয়া পড়িবে। পর-রাজ যে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার কারণ আমাদের দুর্ব্বলতা নহে, সরলতা;—চরিত্রদোষ নহে, চরিত্রগুণ। আমাদের অধ্যবসায়, আমাদের অকুতোভয়তা, আমাদের প্রভুভক্তি, পররাজ সংস্থাপনে এবং পরশাসনযন্ত্র-পরিচালনে সহায়তাসাধন না করিলে, অসম্ভব সম্ভব হইত না। আমরা এখন সেই সহযোগ পরিত্যাগ করিলেই পররাজ-শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া পড়িবে। ইহাই অ-সহযোগনীতির দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

আমাদের দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকের সহযোগেই ইংরাজরাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, আধিপত্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সকল লোকের সম্পূর্ণ অসহযোগ ভিন্ন তাহা অচল হইতে পারে না। অতি অল্পলোকের সহযোগ থাকিলেই যথেষ্ট। তাহার অভাব ঘটাইতে পারা কি সম্ভব? প্রবলপরাক্রান্ত সামন্তরাজগণ আছেন,—ইংরাজপৃষ্ঠপুষ্ট জমিদারদল আছেন,—ইংরাজবাণিজ্যলিপ্ত সওদাগরগণ আছেন,—ইংরাজ-রিরংসাদৃষ্ট ফিরিঙ্গিদল আছেন,—ইহাদের সহযোগেই শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইতে পারিবে। আমাদের অসহযোগ এই কারণে আংশিক অ-সহযোগ হইবে। তাহা যতই সুদৃঢ় হউক, ইংরাজ তাড়াইবার বা পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যসাধনে মূল্যহীন। কেবল অবস্থাবিশেষেই আংশিক অ-সহযোগ প্রচলিত রাজশক্তিকে পঙ্গু করিবার আশা করিতে পারে। তাহাতে কিন্তু পর-সহযোগ আবশ্যক।

মীরজাফর আগে গুপ্ত সন্ধিবন্ধনে ইংরাজ-সহযোগ স্থির করিয়া লইয়া,—পরে—সেই পর-সহযোগের ভরসায়,—সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে অ-সহযোগ খাটাইয়াছিলেন। ফলে স্বরাজ আসিল না; পররাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল; ইতিহাসে মীরজাফরের নাম হইল—"ক্লাইবের গর্দ্দভ,"—স্নেহানুপালিত, ইঙ্গিতানুচালিত, তৃণোদকপুষ্ট, ভারবহনক্লিষ্ট, দুরদৃষ্ট গর্দ্দভ।

এবারও দুষ্টলোকে একটি পর-সহযোগের গুজব রটাইয়া দিয়াছে। তাহা কাবুলী গুজব;—কাবুলী মেওয়ার মত ভারতবর্ষের হাটে বাজারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই গুজবের মূল কি, এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার রহস্যভেদ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাই যে অধিকাংশ নিরক্ষর মুসলমানকে নাচাইয়া তুলিয়া থাকিবে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যদি কাবুল

আসে, আমরা কি করিব,—রাজা প্রজা অনেকেই গম্ভীরভাবে তাহার আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন। ইচ্ছা থাকিলেও কাবুলের পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা সম্ভব কি না, সাধারণ জনসমাজ তাহা চিন্তা করিতে অসম্মত। কাবুল আসিতেছে, এই সময়ে অ-সহযোগ চালাইতে পারিলেই বাস্,—ইহাই জন সাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতেছে।

নিরক্ষর লোকের স্বাভাবিক সরল বিশ্বাস এইরূপে এক লুব্ধাশ্বাসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। অ-সহযোগনীতির মূল প্রবর্ত্তকগণ দৃঢ়স্বরে মুক্তকণ্ঠে এই বিশ্বাস দূর করিবার জন্য চেষ্টা না করায়, জনসমাজ এই গুজবকে গুজব বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছে না। যে সন্তান-সেনা মুক্তিমন্ত্র প্রচারের অগ্রদূত, তাহাদের মুখে মুখে ইহা লতাপল্লবে সঞ্জীবিত হইতেছে। ইহার গতিরোধের জন্য মুষ্টিযোগ প্রয়োগের ব্যবস্থা হইলে, গোলযোগ ঘটিত;—আবার শিশুপালবধের অভিনয় ফিরিয়া আসিত,—রাজা প্রজা কাহারও কল্যাণ হইত না। অবুঝ-দলের মতে এই সহিষ্ণুতা শক্তিশালীর সহিষ্ণুতা নহে;—ইহা শক্তিহীনের দুর্ব্বলতা;—ইংরাজ শাসনের নাভিশ্বাস! কেহ কেহ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায়, ভবিষ্যদ্বক্তার আসন অধিকার করিয়া, একরূপ প্রকাশ্যভাবেই ইংরাজ শাসনের গঙ্গাযাত্রার দিন তারিখ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া দিতেছেন,—বহুলোকে তাহাই আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে!

অ-সহযোগ অবলম্বন করিতে হইলে, অনেক বিষয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে; প্রয়োজন মত বিচারবুদ্ধিরও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। এত ত্যাগস্বীকার করিয়া, যদি কিছু পাওয়া যায়, তাহা কি এবং কেমন, তাহা কিন্তু অধ্রুব!

ধ্রুব কি? আমরা আমরা, ইহাই একমাত্র ধ্রুব সত্য। আমরা আমরা থাকিয়া, যে পথে সভ্যসমাজে মাথা তুলিয়া চলিতে পারি, বিধিদত্ত জন্মগত অধিকার উপভোগ করিতে পারি, সেই পথই পথ। সেই পথে চলিবার জন্য আগে আমাদিগকে "আমরা" হইতে হইবে। তাহার পর, যাহা কিছু আমাদের পক্ষে ভাল, তাহার সহিত সহযোগ;—যাহা কিছু আমাদের পক্ষে মন্দ, তাহার সহিত অ-সহযোগ।

দেশ জাগিয়াছে। বহুযুগের বহু ঘটনায় দেশের লোকের মানসিক স্বাস্থ্য যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে জাগরণই যথেষ্ট নহে,—স্বাস্থ্য লাভও আবশ্যক। জ্ঞানের পথ ভিন্ন অজ্ঞানের পথে তাহা সাধিত হইতে পারে না।

শিল্পবাণিজ্যের ক্রমোন্নতির পরিবর্ত্তে যে অধোগতি ঘটিয়াছে, তাহা নিতান্ত অনায়াসে দূর হইতে পারে না। তাহার জন্য যথাযোগ্য পথে প্রাণপণ চেষ্টা আবশ্যক। শাসন-ব্যবস্থার পূর্ব্বাবস্থা যেরূপ ছিল, তাহার কিছু কিছু সংস্কার সাধিত হইয়াছে; কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট নহে;—আরও সংস্কার আবশ্যক। এই সকল অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে হইলে, দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন আবশ্যক। নিন্দাকুৎসায় অপমানে নির্য্যাতনে দেশমান্য ব্যক্তিগণকে দেশের লোকের নিকট ঘৃণার পাত্র করিয়া তুলিতে থাকিলে, প্রজা জমিদারে মনোমালিন্য জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে থাকিলে, এই জাগরণ কল্যাণদায়ক না হইয়া, অকল্যাণদায়ক হইবে। ভাঙ্গা ঘরের আর ভাঙ্গার সামগ্রী কি আছে? এখন ভাঙ্গা ঘরকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহাকে আমাদের দেশকালপাত্রোপযোগী করিয়াই গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ, আমরা আমরা,—ভারতবর্ষ ইউরোপ নহে। আমরাও সাহেব বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারি না। রাজনীতিক অধিকারই সর্ব্বস্ব নহে,—আমাদের আরও অনেক অধিকার আছে, যাহা সভ্য-সমাজে আর কাহারও নাই। তাহাকে রক্ষা করিয়াই আমাদিগকে রাজনীতিক আন্দোলন চালাইতে হইবে। আত্মবোধ, আত্মশক্তির উন্মেষ, আত্মশক্তির সঞ্চয় ও রক্ষাকার্য্য আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য; তাহার জন্যই রাজনীতিক অধিক অধিকার আবশ্যক। নচেৎ নিজস্ব হারাইয়া, পরস্ব কাড়িয়া লইয়া কেবল রাজনীতিক অধিকার লাভ, আমাদের দেশকালপাত্রের পক্ষে লাভ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অন্ধকার নহে, আলোক,—আরও অধিক আলোক। বিদেশী নহে, স্বদেশী,—আরও অধিক স্বদেশী। সংহার নহে, সংস্কার,—আরও অধিক সংস্কার। যিনি তাহা আনিয়া দিতে পারিবেন, তিনিই যথার্থ দেশবন্ধু;—স্বপ্নে নহে, শৌর্য্যে,—বৈরাগ্যে নহে, বীর্য্যে,—কথায় নহে, কার্য্যে।—

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বিদেশী গল্প।

(সুইডিস উপকথা।)

সাগরের সয়তান।

(১)

এক কর্ম্মকারের এক পুত্র ছিল। ছেলেটির শরীরে যেমন জোর, মনেও তেমনি সাহস। অসাধ্য সাধন করিবার দিকে তাহার উৎসাহটাও খুব বেশী। ইহার উপর উপসর্গ—ছেলেটির রাক্ষসের মত ক্ষুধা। তাহাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে কর্ম্মকার বড়ই টানাটানিতে পড়িল। তখন কামার একদিন মনে মনে ঠিক করিল, সে আর ছেলের খোরাক কিছুতেই যোগাইবে না। তাই সে সাজিয়া গুজিয়া রাজবাড়ীতে গেল। রাজবাড়ীর প্রকাণ্ড পাকশালায় যেখানে প্রধান সূপকার বা সরদার পাচক ছিল, সেখানে গিয়া তাঁহাকে বলিল—"হাঁ গা মশাই, আপনাদের এখানে একজন চাকরের দরকার আছে?"

সরদার সূপকার বলিল "চাকরের দরকার?—আছে বৈ কি। আমি ত একজন চাকর খুঁজিতেছি। তা তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিও, সে যত শীঘ্র আসে, ততই ভাল।"

কামার এই কথা শুনিয়া খুব আহ্লাদিত হইয়া চলিয়া গেল। পথে সে আপন মনে বলিতে বলিতে গেল, "রাজবাড়ীতে আমার ছেলে দুই বেলা খুব পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে।" বাড়ী আসিয়া কর্ম্মকার ছেলেকে সব কথা খুলিয়া বলিল। বাপের কথা শুনিয়া ছেলে বলিল—"আমার রাজবাড়ী যাইবার আগে আমাকে তিনখানি তলোয়ার গড়িয়া দিতে হইবে। তিনখানি তলোয়ার তিন রকম ওজনের হইবে। প্রথম খানি হইবে আধমণ, দ্বিতীয় খানি হইবে একমণ, আর তৃতীয় খানি হইবে দুই মণ। তাহা ছাড়া আমাকে তিনটি জামাও দিতে হইবে। আমি যেমন বলিলাম, আমাকে ঠিক ঠিক সেই রকম গুছাইয়া দেও। দেখিবে তোমার আশীর্ব্বাদের জোরে শীঘ্র আমি এমন বড়লোক হইব যে, তোমাকে আর অন্নের জন্য লোহা ঠুকাইতে হইবে না।" তরবার তৈয়ার করিবার জন্য লোহা ও ইস্পাৎ জোগাড় করিতে কামারকে কিছু খাটুনি পোহাইতে হইল; কিন্তু ছেলের উৎসাহভঙ্গ করিতে তাহার মন সরিল না। সে তরবার গড়িতে লাগিল। ছেলের কথামত তরবারি গড়া শেষ হইলে সে ছেলেকে

তৃতীয় তরবারির ওজনটা দশ সের কম হইয়াছে। তুই মণের জায়গায় তরবার ওজনে পৌনে তুই মণ দাঁড়াইয়াছে। কাজ করিবার সময় হাপরে দশ সের লোহা গলিয়া গিয়াছে। ছেলেটি সেই নূতন তিনখান তরবার ও তিনটা জামা লইয়া একটা কবরের পাথরের নীচে লুকাইয়া রাখিল। তারপর সে রাজবাড়ী গিয়া রাজার পাকশালে চাকরী লইল।

ঐ সময় রাজা রাজধানী ছাড়িয়া জাহাজে চড়িয়া সাগর-বিহারে গিয়াছিলেন। একদিন হঠাৎ ভয়ানক ঝড় উঠিয়া রাজার সেই প্রকাণ্ড জাহাজ ডুবু-ডুবু হইল। সাগরের তিনটা সয়তান মায়াবলে ঐ ঝড় তুলিয়াছিল। রাজার ঘোর বিপদ দেখিয়াও তাহারা ঝড় থামাইতে চাহিল না। তাহারা সমুদ্র থেকে গর্জ্জিয়া শাসাইয়া রাজাকে বলিল,—"রাজপুরীতে যে তিন রাজকন্যা আছে, আমাদের তিনজনের হাতে যদি তাহাদের তিনজনকে সঁপিয়া দিতে রাজী হও,—আর শপথ করিয়া সে কথা বল, তবেই রক্ষা, নচেৎ তোমাকে সমুদ্রজলে ডুবাইয়া মারিব।" রাজা কি করেন, প্রাণের দায় বড় দায়। সাগরের সয়তানদের পাল্লায় পড়িয়া তাহাদিগকে মেয়ে দিতে রাজী হইলেন। ঝড় থামিলে, সমুদ্র স্থির হইল, প্রাণ বাঁচিল।

রাজা রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিবার পর, দেশময় ঢেটরা পিটাইয়া এই কথাটা ঘোষণা করিয়া দিলেন, যদি কোন বীরপুরুষ সয়তানদের হাত হইতে রাজকন্যাদের বাঁচাইতে পারেন, তাঁহাকে তিনি অর্দ্ধেক রাজত্ব আর এক রাজকন্যা দিবেন। সকলেই এই কথা শুনিল; কিন্তু একটা দরজী ছাড়া আর কেউ এই কাজে আগু হইল না। সয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ, সামান্য কথা নয়-ত?

দেখিতে দেখিতে রাজকন্যাদিগকে সয়তানের হাতে সঁপিয়া দিবার দিন আসিল। রাজ্যময় হাহাকার উঠিল। সকলেই কাঁদিতে লাগিল। রাজারাণী শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। কিন্তু উপায় নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে রাজার মত সমারোহে দাসদাসী সঙ্গে দিয়া, রাজারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বড় রাজকুমারীকে পুরীর বাহির করিয়া দিলেন। রাজকুমারীর বিদায়-যাত্রা দেখিবার জন্য সহর ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়াছিল। তাহারা রাজকন্যার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ধার পর্য্যন্ত গেল।

একে একে সব লোক চলিয়া গেলে, সমুদ্রের ধারে রহিলেন—সেই রাজকন্যা আর তাঁহার রক্ষক বীর সেই দরজী। রাজকন্যা জলের কিনারায় বালির উপর বসিয়া দুই জানুর ভিতর মুখ লুকাইয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে, কামারের ছেলে সেই শা-জোয়ান যুবাও ঐ ঘোষণাটা শুনিয়াছিল। সে সরদার সূপকারের কাছে গিয়া বলিল, আমি একবারটি সহরে বেড়াইয়া আমোদ করিয়া আসিতে চাই, আপনি ছুটী দেন ত যাই। সরদার সূপকার কামারের ছেলেকে বেড়াইতে ছুটী দিল। কিন্তু বলিল "দেখিও বাপু যেন খুব বিলম্ব করিও না।" ছুটী পাইয়াই কর্ম্মকার পুত্র, সেপানে তবোয়াল ক'খানা লুকান ছিল, সেপানে ছুটিয়া গেল, আর সব তরবারি মধ্যে যেখানা খুব হালকা, —সেই আধমণ ওজনের তরোয়াল খানা বাছিয়া লইল, একটা জামা গায়ে দিল। তার পর এক দৌড়ে সাগরের কূলে গিয়া হাজির হইল। সেখানে রাজকন্যার দেখা পাইয়া খুব শিষ্টভাবে মিষ্ট কথায় বলিল—"রাজকন্যা, তুমি একাকিনী এখানে কেন, কি দুঃখে এত কাঁদিতেছ?"

রাজকুমারী বলিলেন,—"হায়, সে বড় দুঃখের কথা, আমার পিতা এই রাজ্যের রাজেশ্বর, মোর বিপদে পড়িয়া আমাকে সয়তানের হাতে সঁপিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাই আমি এখানে এসেছি। এখনই সাগরের সেই ভূতটা আমাকে লইতে আসিবে।—আমি বড় ভয় পাইয়াছি।"

"তোমায় এ বিপদে রক্ষা করিতে পারে, রাজার রাজ্যে কি এমন পুরুষ একজনও নাই?"

রাজনন্দিনী বলিলেন, "আছে, ঐ গাছে একজন দরজী আশ্রয় লইয়াছে, সে আমাকে রক্ষা করিবে বলিয়া পণ করিয়াছে।" যুবা মুখ ফিরাইয়া গাছের দিকে চাহিল এবং দরজী মহাশয় গাছের উপর খুব উঁচু ডালে সওয়ার হইয়াছেন দেখিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর রাজকুমারীকে বলিল,—"রাজকুমারী, তুমি যদি আমার মত নীচেকার মানুষকে, বিশ্বাস কর, আর আমার মাথার চুল চিকাইয়া দিতে রাজি হও, তাহা হইলে আমিই তোমাকে বাঁচাইতে পারি।"

কর্ম্মকারপুত্রের প্রস্তাবটা রাজকুমারীর কাছে খুব স্পর্দ্ধার কথা বলিয়াই বোধ হইল,—রাজার মেয়ে হইয়া সামান্য মানুষের চুল চিকাইয়া দিবে? কিন্তু সঙ্কট আসন্ন, রাজকুমারীকে প্রাণের দায়ে রাজি হইতে হইল। তখন কর্ম্মকার পুত্র বালির উপর শুইয়া রাজকন্যার কোলে মাথা রাখিল। রাজকন্যা তাহার চুল চিকাইয়া দিতে লাগিলেন। গাছের ডগায় ডালে বসিয়া দরজী এই কাণ্ড দেখিতে লাগিল। কিন্তু রাজার মেয়ে তাহার পোষাকের একটা লাল রেশমি ফিতা খুলিয়া লইয়া কর্ম্মকারপুত্রের এক গোছা চুলে যে কখন বাঁধিয়া দিলেন

হঠাৎ সমুদ্রের জল তোলপাড় হইয়া উঠিল, জলে যেন বাণ ডাকিল, তাল প্রমাণ ঢেউ উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর তে-মাথা সাগরিয়া সয়তান ভুস্ করিয়া ভাসিয়া উঠিল। সয়তানটা খন্‌খনে আওয়াজে হাঁক দিয়া বলিল,—"যাকে আমার হাতে সঁপিয়া দিবার কথা, সে রাজকন্যা কই?"

যুবা বলিল "এখানেই আছে, আর একটু কাছে, সরে এস ত, তোমার সঙ্গে দুটা কথা কই।"

সয়তানটা বলিল—"আরে ক্ষুদে বেটা, আমার সঙ্গে ঠাট্টা?"

যুবা বলিল, 'তামাসা হবে কেন? আমি রাজকন্যার জন্য তোর সঙ্গে লড়তে এসেছি।"

এই বলিয়াই কর্ম্মকারপুত্র সাঁই, সাঁই শব্দে সেই আধমনী তলোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে সয়তানটার ঘাড়ে গিয়া পড়িল এবং তলোয়ারের কোপে টকাটক করিয়া তাহার তিনটা মাথা কাটিয়া ফেলিল। মাথা তিনটা গুপ গুপ করিয়া সাগরের জলে পড়িল। সাপদ চুকিয়া গেল।

রাজকুমারী সয়তান ও বীর যুবার লড়াই দেখিতেছিলেন; সয়তানের মাথা গেল দেখিয়া আনন্দে চেঁচাইয়া উঠিলেন :—"আঃ বাঁচিয়া গিয়াছি গো বাঁচিয়া গিয়াছি।" তারপর তিনি সেই অজানা বীরপুরুষটিকে রাজপুরীতে যাইবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, রাজদরবারে যাইলে বীর তাঁহার মহৎ কাজের উপযুক্ত মান ও পুরস্কার পাইবেন। কিন্তু বীর তাঁহার কথায় রাজি হইলেন না। বলিলেন, "রাজকুমারি, তুমি তিলকে তাল করিয়া তুলিতেছ।" এই বলিয়া বীর পাকশালে চলিয়া গেলেন।

দরজী গাছ হইতে নড়ে নাই, সে বিষম ভয়ে ভয়ে যুদ্ধের ফল কি হয় দেখিতেছিল। যখন সঙ্কট কাটিয়া রিজয়ী বীর চলিয়া গেল, তখন সে লাফ দিয়া মাটীতে নামিল, ঝনাৎ করিয়া তলোয়ার খানা খাপ হইতে বাহির করিল, তারপর রাজকন্যাকে ভয় দেখাইয়া শপথ করাইয়া লইল যে, রাজকুমারী রাজপুরীতে গিয়া তাহাকেই বিজয়ীবীর বলিয়া ঘোষণা করিবে। এই কথার পর দুইজনে রাজপুরীতে ফিরিয়া গেল।

রাজকুমারী যখন নিরাপদে রাজপুরীতে ফিরিয়া গেল, তখন পুরীর ভিতর কি আনন্দের রোল উঠিল, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। তখনই রাজার হুকুমে একটা মস্ত ভোজের আয়োজন হইল। রাজা ভোজসভায় বসিয়া দরজীকে নিজের ডাহিন দিকে বসাইলেন। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল,

নূতন খাতা। (প্রবন্ধ)

এখন চারিদিকে নূতন ভাব, নূতন কথা। কালচক্র ঘুরিয়া গিয়া এক নূতন কালরাজ্যে আমাদিগকে আনয়ন করিয়াছে। পুরাতনের পল্লব দল জীর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে—তাহা অতীতের কালগর্ভে নিমগ্ন। নূতন রসের সঞ্চারে আমাদিগকে সঞ্জীবিত হইতে হইবে, নবজীবন লাভ করিয়া আমাদিগকে ফলে পুষ্পে শোভিত হইতে হইবে। আজ তাই শুভ মুহূর্ত্তে নূতন খাতা খুলিলাম। নবীন-ভাব-পল্লবে ইহা পল্লবিত হউক। সিদ্ধিদাতা আমাদিগকে শুভ সিদ্ধি দান করিয়া কৃতার্থ করুন।

চড়কোৎসব।

সময়ের লক্ষণ কাজে ফুটিয়া উঠে। যখন বসন্ত আসে, অমনি ফুলগুলি ফুটিতে থাকে, বন উপবন বিহগের কাকলীতে ভরিয়া উঠে; আবার যেমন শীত আসে, অমনি বৃক্ষসমূহের পল্লবরাশি ঝরিয়া পড়ে। যখন দিন আসে, তখন দিনের সঙ্গে সঙ্গে জাগরণ দেখা দেয়, যখন রাত্রি আসে, সকলে অবসন্ন হইয়া নিদ্রারত হয়। এই রকম কালের লক্ষণ কাজে ফুটিয়া উঠে। এই পৃথিবীতে কালের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাজেরও পরিবর্ত্তন হয়, মানুষের লক্ষণ বদলাইয়া যায়।

এই যে দেশব্যাপী 'চরকা' পূজা দেখা দিয়াছে, ইহাতেও কালপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন কাজের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। চরকা শব্দ চক্রশব্দ হইতে উৎপন্ন। যেমন বর্ষ শেষে কালচক্র ঘুরিয়া গেলে হিন্দুরা চড়কোৎসব পালন করে, এই যুগবর্ষের শেষে চরকাপূজাও সেই চড়কোৎসবের রূপান্তর-মাত্র।

চড়কোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা নীলের উপবাসাদি করে। এই নবীন চরকার উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে তাই দেখা যায়, হরতাল বা উপবাসের ধূম পড়িয়া গেছে। কাজ দেখিয়া আমরা কালের লক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। যেমন চৈত্রমাসের উপবাস ও চড়কপূজার পর নববর্ষের শুভাগমন হয়, এই যুগবর্ষের অন্তে যে এক নবীন শুভ 'মহরৎ' আসিতেছে 'চরকা' পূজা ও হরতাল দ্বারা তাহার পূর্ব্ব সূচনা কেন বলা যায়।

ইংরাজজাতির রাশি—মীন।

যেমন প্রত্যেক লোকের ব্যক্তিগত রাশি আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও এক একটা রাশি আছে। ইংরাজের রাশি বুঝা যায় মীন। জলেই উহাদের জন্ম। এই জলচর জাতি জলের কোলে বিচরণ করিতে পারিলে বেশ থাকে। ভারতে যখন ইহারা প্রথম আসিয়াছিল, তখন বাংলার জলা-জায়গাতে ইহাদের রাজধানী স্থাপন করিয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হইতে ছিল। কিন্তু মাছকে জল থেকে টানিয়া আনিয়া যদি ডাঙ্গায় ছাড়া যায়, যতই তাহাকে সোণার থালাতে রাখা হউক না কেন, সে যেমন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, এক্ষণ ইংরাজেরও সেই দশা হইয়াছে। লর্ড হার্ডিং এক হেঁচ্‌কা দিয়া রাজধানীকে কলিকাতার জলা দেশ হইতে দিল্লীর ডাঙ্গায় যেই লইয়া গেলেন, সেই অবধি রাজ্য যেন ছট্‌ফট করিয়া মরিতেছে। দিল্লী, নবাব-বাদশাহদের সখের সোণার থাল হউক না কেন, মীনজাতি ইংরাজের পক্ষে কিন্তু তাহা বড় 'অপায়া' জায়গা। প্রতিভাবান্ লর্ড কার্জ্জন দিল্লীর সোণার থাল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বাংলার জলাদেশ ছাড়িতে চাহেন নাই। বরঞ্চ যাহাতে ইংরাজ-মীনেরা বাংলার রাজধানীতে অধিকতর রূপে সুখে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারেন, তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য সযত্ন হইয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, এই নবযুগের অভ্যুদয়ে ইংরেজেরা প্রাচীন দিল্লীর মায়া ত্যাগ করিয়া বঙ্গের রাজধানী কলিকাতার জলাদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, নবজীবন লাভ করিবেন। প্রজারঞ্জনরূপ সিন্দূরের শুভ ছাপ দিয়া নূতন খাতার সূত্রপাত করুন, মায়ের আশীর্ব্বাদে ঋদ্ধি ও সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

আয়-ব্যয়ের হিসাব।

নূতন খাতায় জমা-খরচের হিসাব দেখিতে গেলে, গান্ধীজীর 'আইটেম'টি সর্ব্বাপেক্ষা বড় 'আইটেম' বলিয়া সর্ব্বাগ্রে নজরে পড়ে। ইনি আয়ের কোটায় কি ব্যয়ের কোটায় ইহা বলা বড় শক্ত। গান্ধী মহারাজকে আপাততঃ আয়ের কোটায় হাওলাত জমার খাতে উঠান যাইতে পারে। তিনি আমাদিগকে একটি মহৎ বিষয় হাওলাত দিয়া আমাদিগের জাতীয়তা রক্ষা করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন, উহা আর কিছু নয়—চরকা। খরচের কোটাতেও মহাত্মাগান্ধী বড় কম নহেন, প্রচলিত ইউনিভারসিটী প্রথা উঠাইয়া খরচের কোটা [illegible]

উদ্যোগী। ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না, আপাততঃ মনে হয় বর্ত্তমান ইউনিভার্সিটী প্রথা সমূলে নির্ম্মূল করিলে জাতীয়তার খাতায় খরচের কোটা বাড়িয়া গিয়া দেউলিয়া হইতে হইবে।

গাধি ও গান্ধী।

গান্ধী নাম আজ এমনি সর্ব্বজনবিদিত হইয়া পড়িয়াছে যে, সে বিষয় চুপ করিয়া থাকা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর তুলনা দেওয়া যাইতে পারে—গাধিসুত মহারাজ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে। গান্ধী নামের সঙ্গে শুধু গাধি নামেরই সাদৃশ্য, তাহা নহে; কার্য্যতঃও গাধিসুতের সঙ্গে গান্ধীর অনেক বিষয় ঐক্য দেখা যায়। পুরাকালে গাধিসুত বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ব্রহ্মসূত্র গায়ত্রীর উদ্ভাবনপূর্ব্বক ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও আজ বৃটিশরাজের সহিত ঠোকাঠুকি বাধাইয়া চরকা-সূত্রের উদ্ভাবনপূর্ব্বক স্বরাজ লাভের উদ্যোগী হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের এতটা ঝগড়া, সেই ব্রাহ্মণেরা যেমন বিশ্বামিত্র-উদ্ভাবিত গায়ত্রীকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও দেখিব—যে ইংরাজের সঙ্গে গান্ধীর এতটা মনোমালিন্য, সেই গান্ধী-প্রবর্ত্তিত চরকাসূত্রও অচিরে ইংরেজেরা বরণ করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি।

—*—

কবি যারা—ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ—
অসি ধরে' তারা কভু মানবের ধর্ম্ম
করে না প্রচার! ঈশ্বরের গূঢ় মর্ম্ম
সুকোমল কান্তপদে ঢালিয়া পিযুষ
শিখায় জগতে! যাহা পঙ্কিল পরুষ
কঠোর নির্ম্মম—যাহা স্বার্থের পুরীষে
ঘৃণিত দুর্গন্ধময়—যাহা নীচ হেয়—
যাহা প্রবঞ্চনাপূর্ণ—কুটীল দুর্জ্ঞেয়—
কবির তা' পরিত্যজ্য চক্ষের নিমিষে!

কবিতা লিখিলে শুধু হয় নাক' কবি,
কাগজে-কলমে—ধর্ম্ম—সে কেবল ভান,
কবির চরম লক্ষ্য—মুক্তির সোপান
দেখাইয়া দিয়া নরে—আদর্শের ছবি
এঁকে যাওয়া—হয়ে নিজে আদর্শ চরিত্র,
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরম পবিত্র!
স্পষ্ট দিবালোক মত প্রাণখানি তার
হইবে—রবেনা তা'র সম্পর্ক ছায়ায়!

২।১ তাঁতি বাগান লেন ইটালী,
কলিকাতা।

কবিগুণাকর—
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ।

বৈঠকী।

মনে সাধ হয় কত রকমের; পরন্তু সাধ-বাসনা পূর্ণ করিবার যিনি বিধাতা, তিনি যে কখন কখন উল্টা করিয়া বসেন! ভাবিয়াছিলাম বৈশাখের সংখ্যা হইতে আমার লেখা, আমার ভাব একটু অধিক করিয়া দিব। কিন্তু প্রেস কমিটীর সভাপতির আহ্বানে সিমলায় যাইতে হইল; বৈশাখের সংখ্যা বাহির করিতে পক্ষকাল বিলম্ব ঘটিল। এজন্য ত্রুটিচ্যুতি যাহা কিছু তাহা আমার; পাঠক এবং গ্রাহকগণ আমাকে ক্ষমা করিলে আমি কৃতার্থ বোধ করিব।

* * * * *

একটা কথা প্রথমেই বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সাহিত্যে যে সকল সন্দর্ভ-নিবন্ধ বাহির হইতেছে, যে সকল সন্দর্ভ-প্রবন্ধের শেষে লেখকের নাম ছাপা থাকিতেছে, সে সকলের মতামতের জন্য আমি দায়ী নহি; সে সকল মত যে আমার এমন অনুমান করিবার হেতুও পাই না। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা বিরুদ্ধ মতবাদী, তাঁহারা প্রতিবাদ করিতে পারেন, আমরা সাদরে তাহা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করিব। তবে প্রতিবাদে গালি-গালাজ থাকিলে, ব্যর্থ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বা অসংযত ভাষার প্রয়োগ থাকিলে, হয় তাহা বাদ দিয়া আসল প্রবন্ধটা ছাপিব;—বাদ দিয়া ছাপান না চলিলে, তাহা আর প্রকাশ করিব না।

* * * * *

আসল কথাটা এই, "সাহিত্যের" সাহায্যে আমরা নানা বিষয়ে বিচারের অবতারণা করিতে চাহি। সেই পূর্ব্বেকার উত্তর পক্ষ ও পূর্ব্ব পক্ষ স্থির করিয়া, ধীর স্থির সংযত ভাষায় যাহাতে সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি সম্বন্ধে মূল-তত্ত্ব সকলের বিচার-বিশ্লেষণ এবং আলোচনা চলিতে পারে, আমরা সে পক্ষেই বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। আমরা ভগবান্ রামকৃষ্ণকে অতি মাত্রায় ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং পূজা করিয়া থাকি। আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি; তাঁহার পুরাতন শিষ্যগণের মধ্যে অনেককে ঘনিষ্ঠভাবে চিনি এবং জানি। পক্ষান্তরে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে কিশোরকাল হইতে চিনি এবং জানি।

শ্রীযুত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, দুই পক্ষের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া সন্দর্ভ লিখিতেছেন, তাহার দোষও দেখিতে পারি না। তিনি সুষ্ঠু বিচারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন। ভগবান্ রামকৃষ্ণের শিষ্য-সেবকগণের মধ্যে বিদ্বান্, ধীমান্ এবং পণ্ডিতের অভাব নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিদ্যাবিনোদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউন না, আমরা সোৎসাহে তাঁহাদের কাহারও লিখিত প্রবন্ধ সাহিত্যে ছাপিতে থাকিব।

* * * *

বলেন অনেকে অনেক কথা, কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—ইংরেজী লেখা-পড়ার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়ামীটা যেন মাত্রাধিক্যে বাড়িয়া যাইতেছে। এ গোঁড়ামী যেন কর্ত্তাভজার গোঁড়ামীর মতন,—দল-নিবদ্ধ বা ব্যক্তিগতভাব-নিবদ্ধ। ভগবান্ রামকৃষ্ণ একটা অভিনব ধর্ম্ম সম্প্রদায় গড়িয়া গিয়াছেন, তাহা তোমার আমার দৃষ্টিতে অতি সুন্দর, অতি মনোহর। পরন্তু যাহার তেমন দৃষ্টি নাই, সেত উহার দোষ দেখিতে পারে। সে অধিকার হইতে অন্য মনীষিগণকে বঞ্চিত রাখিতে চাও কেন? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিবাদ করিয়া যদি রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক মাধব প্রভৃতি আচার্য্যগণ এক-একটা স্বতন্ত্র সাধন-সম্প্রদায়, স্বতন্ত্র Philosophy গড়িয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে সে অধিকার হইতে আধুনিক পণ্ডিতগণ বঞ্চিত থাকিবেন কেন? ভট্টপল্লী এবং নবদ্বীপের পুরাতন নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠগণ অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিতেন, কাশীতে বসিয়া পূজ্যপাদ ৺ রাখালদাস ন্যায়রত্ন শাঙ্কর মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য কি কাশীক্ষেত্রের পণ্ডিত সমাজে ন্যায়রত্নের মান-মর্য্যাদার অগৌরব ঘটিয়াছিল? এই মতামতগত স্বাধীনতা বঙ্গদেশে এক সময়ে খুব প্রবল ভাবেই ছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সে স্বাতন্ত্র্য অনেকটা নষ্ট হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে একটা উৎকট ও উদ্ভট গোঁড়ামী প্রবল হইতেছে; কর্ত্তাভজার প্রবৃত্তি যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

* * * *

এই গোঁড়ামী যাহাতে অপসারিত হয়, যাহাতে আবার বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন-সমাজ বিচারশীল এবং ন্যায়পরায়ণ হইতে শিক্ষা করেন, সে পক্ষে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিব। ছিল দিন যখন—শ্বশুর ঘোর বৈষ্ণব-গোস্বামী, জামাতা কুলীন তান্ত্রিক। তখন শ্বশুর-জামাইয়ে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলিত, নিয়মিত বিচার হইত। এই বিচার-বিতণ্ডার জন্য শ্বশুর জামাতার শত্রু হইতেন না,

আমাতা শ্বশুরকে অশ্রদ্ধা করিতেন না। অচু গোঁসাই ও রামপ্রসাদের দ্বন্দ্ব হালিসহর কুমারহট্টের একটা সুমধুর ও আনন্দদায়ক স্মৃতি। তেমনটি আর হয় না কি? হয় কি না হয়, তাহা বুঝিবার উদ্দেশ্যেই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সুলম্বিত সন্দর্ভগুলি ধারাবাহিকরূপে ছাপিতেছি!

* * * * *

শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন সিংহের লিখিত "সাহিত্যে স্বাস্থ্যসেবা" শীর্ষক সন্দর্ভমালা সাহিত্যে পুরা এক বৎসরকাল ছাপিলাম। তাহার কোন বাদ-প্রতিবাদ হইল না; ভাবিলাম আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর তেমন মজ্জাগত হয় নাই, তাহার জন্য একটা দলাদলি পাকা রকমে গড়িয়া উঠে নাই, তাই যতীন্দ্রমোহনের লেখায় কাহারও তেমন লাগে নাই,—কাহারও অঙ্গে তেমন বাজে নাই। শ্রীযুত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধের প্রকাশে একটু যেন সাড়া পড়িয়াছে, যেন একটু লাগিয়াছে! ইহা আশার কথা, ভরসার বিষয়। অনেকে ঐ সন্দর্ভ পাঠ করিয়া রুষ্ট হইয়াছেন, কেহ-কেহ গ্রাহক থাকিবেন না,—বলিয়া অভিমান করিয়া চিঠি দিয়াছেন। আমরা সত্যই উহাতে আনন্দিত হইয়াছি। তবে ত লাগে! এখনও অনুভূতি শক্তি সমাজ-শরীর হইতে বিলয়প্রাপ্ত হয় নাই। যখন লাগিয়াছে এবং লাগিতেছে, তখন বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া পণ্ডিত মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ঠিক মত বিচার আরম্ভ হইলে, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরবের কথা। রীতিমত বিচারের আশা করিতে পারি কি?

* * * * *

আর একটা নূতন ব্যাপার লইয়া জল ঘোলাইয়া তুলিবার চেষ্টায় আছি। মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ লইয়া সমাজে, ধর্ম্মমণ্ডলে, রাজনীতি ও শাসন-নীতির ক্ষেত্রে একটা বিষম গণ্ডগোল উত্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালার আধুনিক প্রধান গদ্য লেখক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় দাদামহাশয়ের "কোন্‌পথে" শীর্ষক এক প্রবন্ধ এই সংখ্যায় বাহির হইল। তাহা কাহার কেমন লাগে,—লাগে কি উপিয়া যায়, তাহা যাচাই করিয়া জানিবার এবং বুঝিবার বাসনা হইয়াছে। সাহিত্যে নির্ভাজ পলিটিক্সের চর্চ্চা হইতে পারে না, কেননা ইহা যে সাহিত্য। তবে নন-কো-অপারেশন যেন কাঁকড়ার দাড়া বিস্তার করিয়া সমাজ-ধর্ম্ম-সাহিত্য সর্ব্বস্বকে আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাই সাদরে শ্রীযুত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের সন্দর্ভ এই বৈশাখের সংখ্যায় বাহির করিলাম। ইহা লইয়া বিচার চলিবে কি? রাগ-রোষ না করিয়া, গালিমন্দ না দিয়া উহার উত্তর 'পক্ষ'

চালাইবার লেখক নাহি কি? আছে কি নাই তাহা বুঝিবার জন্য আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।

* * * * *

বোধহয় ইহার পরে "সাহিত্যে" সন্দর্ভ নিবন্ধ প্রকাশের জন্য আমাদিগকে আর মাস কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। সাহিত্য-সম্পাদক লেখকগণের মতামতের জন্য কখনই দায়ী থাকিবেন না। সাহিত্য-সম্পাদক কোন বিষয় লইয়া ন্যায় বিচারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারিলে সুখী হইবেন। সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকারের যুক্তিযুক্ত অভিমত প্রকাশ করিতে সাহিত্যসম্পাদক কখনই সঙ্কোচ বোধ করিবেন না; পরন্তু গালাগালি আড়াআড়ি বা দলাদলির প্রশ্রয় তিনি কখনই দিবেন না। ইহাই আমাদের মূল কথা, ইহা হইতে আমরা কদাপি বিচলিত হইব না। ধর্ম্মপথে থাকিয়া ৺ সুরেশচন্দ্রের জননী ও পত্নীর অন্নপানের ব্যবস্থা যাহা পারি, তাহা করিব।—সম্পাদক।

সিন্ধু ও বিন্দু।

সিন্ধু বলে গরজিয়া "অনন্ত মহান্,
আমি বিশ্বে; কে আছে গো আমার সমান"!
এত বলি', অহঙ্কার মহাদর্পভরে
বিস্ফারিয়া বক্ষস্থলে সবে তুচ্ছ করে।
হেনকালে আসে বিন্দু অতি ক্ষুদ্র কণা—
দর্প, গর্ব্ব, কিছু নাই কিন্তু মহামনা।
বিন্দু বলে, "আমি হীন ক্ষুদ্রকায় অতি,
সসাগরা ধরণীর তুমি আছ পতি।"
সাগর সে বুঝি প্রাণে বিন্দুর মহত্ত্ব
গরজিয়া গালি তা'রে দেয়গো অকথ্য।
সাগরের চলে নিত্য দর্প অভিনয়—
দেবতারা সবে শুনে বিন্দুর বিনয়
সকলে বাহবা দিল, বলে "বিন্দু সম
কে আছে জগতে আর, তারে নমোনম।"
সে অবধি সবে হ'ল বিন্দু-অনুকারী।
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহতারা বিন্দু সারি সারি।

শ্রীযতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজয়সেন-দেবের তাম্রশাসন।

[ব্যারাকপুর লিপি।]

প্রশস্তি পরিচয়।

বিগত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ এই তাম্রশাসনখানির আবিষ্কার কথা শুনিয়া আসিতেছি। ইহাতে উৎকীর্ণ লিপিটির প্রকাশ অপেক্ষা করিয়া অনেকেই বঙ্গের সেন-নরপতিগণ সম্বন্ধে কোন বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে পারিতেছিলেন না। সেই কারণে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি'ও সেন-রাজবংশের লেখমালাবচনায় হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায়, বহু আশা-নিরাশার পরে, আমরা গত তিন চারি মাস যাবৎ এই মূল্যবান্ লিপির প্রতিলিপি প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইতে পারিতেছি। প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস-রচনার এই সমাদরণীয় উপাদান প্রকাশ করার জন্য ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি প্রথমতঃ স্বরচিত "বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগের" ২৯১ পৃষ্ঠায় এই লিপির বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছিলেন, এবং পরে তদীয় "The Palas of Bengal" নামক ইংরেজী ভাষায় রচিত প্রবন্ধের (১০৫ পৃষ্ঠায়) একস্থলে এই লিপিতে উল্লিখিত দুই একটি ঐতিহাসিক তথ্যের কথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন লিপিপ্রকাশক পত্রিকায় (১) যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা হইতে উহার যেরূপ আবিষ্কারকাহিনী জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। প্রায় ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে Messrs Bird & Co'এর জনৈক কর্ম্মচারী (Mr. G. A. Schumaker) বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তঃপাতী ব্যারাকপুর (Barrackpur

আবিষ্কার কাহিনী।

সেনা-নিবাসের (Cantonment) নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এই তাম্রপট্ট লিপিখানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুমেকার সাহেব একজন গ্রামবাসীর নিকট হইতে এই অতি মূল্যবান্ বস্তুটি কেবল তাম্র-মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। Messrs Sinclair Murray & Co-এর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু এই আবিষ্কারসংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাম্রপট্টখানি এখনও সেই সুমেকার সাহেবের সম্পত্তি।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু সর্ব্বপ্রথম এই তাম্রশাসনলিপির পাঠোদ্ধার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন—ইহা প্রায় বার বৎসরের কথা। তদীয় "বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথমভাগে" (২৯১ পৃষ্ঠায়) তিনি ১৩২১ বঙ্গাব্দে লিখিয়াছিলেন,—"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ভদ্রব্যক্তি ইহা পাঠোদ্ধারের জন্য আমার নিকট আনিয়াছিলেন। পাঠোদ্ধার শেষ হইলে তিনি উহা লইয়া গিয়াছেন এবং প্রতিশ্রুত হইয়াও আমাকে উহার উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিবার অবসর প্রদান করেন নাই।" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অচিরপ্রকাশিত এই তাম্রশাসন সম্বন্ধীয় ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অবগত হওয়া যায় যে,

পাঠোদ্ধার কাহিনী।

পরে (ইং ১৯১০ সালে) ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের (Mr M B Garde নামক) একটি "তত্ত্বান্বেষণ ব্যাপৃত ছাত্র" (Research Scholar) এই লিপির একটি পাঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিবার অবসর (সম্ভবতঃ অনুমতি) প্রাপ্ত হন নাই। পূর্ব্বাঞ্চলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ডাক্তার স্পুনার (Dr Spooner) মহোদয় ইং ১৯১৫ সালে এই লিপি প্রকাশ করিবার জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর ভার অর্পণ করেন, কিন্তু সেই সময়ে মূল ফলকখানি ইংলণ্ডে ছিল বলিয়া এবং লিপির পূর্ব্ব প্রস্তুত ছাপ প্রভৃতি সরকারী আফিসে খুঁজিয়া না পাওয়ায়, তিনি দুইটি পেন্সিল-চিত্র ও ফটোগ্রাফের দুইটি যেমন-তেমন বিপরীত ছাপের (negative) সাহায্যে পাঠোদ্ধারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রতিনিধি সহ তাহা এখন Epigraphia India পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। দুই একটি স্থান ব্যতীত তদীয় পাঠ সর্ব্বত্র মূলানুগত হইয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয়।

এই তাম্রশাসনলিপি হইতে কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রথমতঃ রাখালদাস বাবু ইহার ব্যাখ্যা করেন এবং তাহা তদীয় "বাঙ্গালার ইতিহাসে"

Epigraphia Indica. Vol XV. 15 pp 278-286 বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রবন্ধ মনে হয়, ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বেই এই সরকারীপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়া থাকিবে।

ও অন্যান্য ইংরেজীপ্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত করেন। এতদিন তৎ-প্রদত্ত সেই দুই একটি তথ্যের উপরই সকলের দৃষ্টি পতিত ছিল এবং তাহা লইয়াই এতকাল আলোচনা চলিতেছিল। তিনি এবার তাঁহার Epigraphia India পত্রিকার প্রবন্ধে এই লিপির একটি সমগ্র ব্যাখ্যা বা অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা সর্ব্বাংশে মূলানুগত না হওয়ায় তাহার পুনরালোচনা প্রয়োজনীয় মনে করিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বঙ্গভাষায় এই লিপির সমগ্র অনুবাদ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, ডাক্তার স্পুনার ইহার একটি ইংরেজী অনুবাদ করিয়া তাহা বহু বৎসর পূর্ব্বে রাখালদাস বাবুকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই অনুবাদটি পূর্ব্বে দেখিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং এখন তাহা পাঠের সহিত মিলাইয়া দেখিতেছি যে, যদি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পূর্ণভাবে সেই অনুবাদের উপর নির্ভর করিতেন, তাহা হইলে তদীয় ব্যাখ্যায় এখন আর অধিক দোষ বিদ্যমান থাকিত না। বাঙ্গালার সেনবংশের প্রথম নরপতির এই একমাত্র তাম্রশাসনের বাঙ্গালা ভাষায় একটি অনুবাদ থাকা আবশ্যক সেইজন্য, ব্যাখ্যা-সহ একটি বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে।

তাম্র-লিপির আয়তন ১২॥+১০॥ ইঞ্চ। সমগ্র লিপিটি ৫০ পঙক্তিতে সমাপ্ত। তাম্রপট্টের প্রথম পৃষ্ঠায় ২৪ পঙক্তি ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ২৬ পঙক্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে। লিপির দুই একটি স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্রই অক্ষরবিন্যাস স্পষ্ট প্রতীত হয়। যে অক্ষরে লিপি ক্ষোদিত হইয়াছে, তাহা একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পূর্ব্বভারতে প্রচলিত বাঙ্গালা-অক্ষর বলিয়া কথিত হইতে পারে। এই সময়ের অক্ষরপ্রণালী প্রণিধান-যোগ্য। বর্ত্তমান বঙ্গ-লিপির অনেকগুলি অক্ষর তখনই প্রায় উহার আধুনিকরূপ ধারণ করিয়াছিল—দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা লিপিতে প্রযুক্ত অ, আ, উ, এ, ঔ, এবং ক্ষ, খ, গ, ত, থ, ধ, ন, ম, য, র, ল ও ব প্রভৃতির আকারের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি। লিপির বর্ণ-বিন্যাস প্রণালী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়,—যথা (১) কোথাও 'বর্গীয় ব'এর প্রয়োগ নাই; (২) অনুস্বার ও বিসর্গ প্রাচীন-পদ্ধতি-অনুসারে লিখিত; (৩) বিরাম-যুক্ত "ত" এবং "ম"-এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা, 'যাবৎ' (পং ৪৩), 'নরক ভয়াৎ'—'ধর্ম্মগৌরবাৎ' (পং ৪৪), 'মধ্যেভটম্' পং ২, 'শিরোভূষণম্' (পং ৪), 'আতপানাম্' (পং ১৫), 'ভবতাম্' (পং ৩১); (৪) দুই এক স্থান ব্যতীত,

যথা 'সর্ব্ব' (পং ৩৬), 'পূর্ব্বক' (পং ৪১), 'ধর্ম্ম' (পং ৩৭-৩৮) 'সৌন্দর্য্য' (পং ১৮), 'পর্য্যন্তা' (পং ৩৪), রেফ-সংযোগে প্রায় সকল ব্যঞ্জনবর্ণেরই দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে; (৫) অবগ্রহ চিহ্ন কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই; (৬) পরবর্ত্তী রেফ' বা 'র' যোগে পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বিহিত হয় নাই,—কেবল ২৫শ পঙ্‌ক্তির 'রাজপুত্র' শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'পুত্র' [যথা, 'রাজপুত্র' (পং ৮), 'পুত্রায়' (পং ৩৮)] ও 'ক্ষত্রিয়-শব্দে [যথা 'ক্ষত্রিয়াণাং' (পং ৯)] 'ত'-এর দ্বিত্ব করা হইয়াছে। উৎকিরণ কার্য্যে শিল্পী কয়েকটি স্থলে প্রমাদ-বশতঃ 'রেফ' প্রয়োগ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন (যথা, 'অগ্রর' পং ৪) এবং সন্ধিস্থলেও 'শ'-কারের সহিত অতিরিক্ত বিসর্গের ব্যবহার করিয়াছেন, [যথা, কুর্ব্বন্তঃশ্চন্দ্র (পং ৮) ও 'সুদক্ষঃশ্চক্ষুঃ' (পং ১১)]। তাম্রশাসনখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পদ্য-গদ্যাত্মক লিপি। ইহাতে প্রথম পঙ্‌ক্তি হইতে ২২শ পঙ্‌ক্তির মধ্যে বিভিন্ন-বৃত্ত-বিরচিত দশটি শ্লোক বর্ত্তমান আছে; তৎপূর্ব্বে ও পরে লিপির গদ্যাংশ; কেবল ৪৫শ হইতে ৪৯শ পঙ্‌ক্তির মধ্যে তিনটি ধর্ম্মানুশংসী শ্লোক ও অন্য একটি শ্লোক বিদ্যমান, এবং তৎপরে সামান্য একটু গদ্যাংশ আছে। এই তাম্রশাসনের উপরি-ভাগে রাজমুদ্রার একটি লাঞ্ছন সংযুক্ত রহিয়াছে। সেন-নরপতিগণের অন্যান্য তাম্রশাসনেও (২) আমরা এইরূপ লাঞ্ছন দেখিতে পাই। মুদ্রাতে দশভুজ সদাশিবের মূর্ত্তি উচ্চভাবে উৎকীর্ণ—ইহাতে রাজার নামাদি কিছুই ক্ষোদিত নাই।

লিপি-পরিচয়।

সেনবংশের রাজা মহারাজাধিরাজ শ্রীহেমন্ত সেন পাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর, পরমমাহেশ্বর (শিবভক্ত), পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্-বিজয়সেনদেব শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করাইয়া তদ্দ্বারা তদীয় রাজ্যের ৬২ সংবৎসরের বৈশাখ মাসের ৭ই তারিখে একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই ভূমির অবস্থান ছিল পৌণ্ডবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী খাড়ী বিষয়ের পাস-সন্তোগ ভট্টবড়া-নামক গ্রামে। সম্ভবতঃ ইহার দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের সীমা ছিল তিক্ষহণ্ড নামক জলার্দ্ধ (জলাভূমি)। নরপতি সমতটীয় নল দ্বারা মাপিয়া এই প্রদত্ত ভূমির সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়া শাসনে

ভূমি পরিচয়

(২) কেশব সেনের ইদিলপুর শাসনের (J. A. S. B. Vol X, p, 97), এবং লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া শাসনের (J. A. S. B., 1911) মুদ্রাদ্বয় দ্রষ্টব্য।

(৩৩ পঙক্তিতে) উক্ত হইয়াছে। ভূমিতে চারি পাটক জমি ছিল—ইহার আয় ছিল দুই শত কপর্দ্দক-পুরাণ মুদ্রা। বিক্রমপুরের উপকারিকা বা রাজ-প্রাসাদে, 'সোমগ্রহ' বা চন্দ্রগ্রহণকালে বিজয়সেনের পট্টমহিষী মহাদেবী শ্রীমতী বিলাসদেবী কনক-তুলা-পুরুষ মহাদান সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই মহাদানের হোমকর্ম্ম দক্ষিণারূপে নরপতি বিজয়সেনদেব মহেশ্বর ভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া, মাতাপিতার ও নিজের পুণ্য ও যশের অভিবৃদ্ধি কামনায়, মধ্যদেশবিনির্গত কান্তি-যোগীয় (তদ্দেশবাসী) রত্নকর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র রহস্কর দেবশর্ম্মার পৌত্র ভাস্কর দেবশর্ম্মার পুত্র, বৎস-সগোত্র, ভার্গব-চ্যবন-আপ্নবান-ঔর্ব্ব-জামদগ্ন্য-প্রবর ঋগ্‌বেদের আশ্বলায়ন-শাখার ষড়ঙ্গাধ্যায়ী, শ্রীউদয়কর দেবশর্ম্মাকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ক্ষিতি-সমকাল-পর্য্যন্ত ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়-স্মরণপূর্ব্বক তাম্রশাসন সম্পাদন করাইয়া, এই ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন সম্পাদনকার্য্যে শালাড্ডনাগ নামক ব্যক্তি দূতক ছিলেন। ইহাতে রাজকবির বা শিল্পীর নাম উল্লিখিত নাই।

প্রশস্তি পাঠ।

[সম্মুখ পৃষ্ঠা।]

১। (১) ৭ ওঁ নমঃ শিবায়॥

(২) ক্রৌঞ্চারি-দ্বিরদাস্যয়োঃ শিশুতয়া তাতস্য মৌলৌ মিথো—

গঙ্গা-

২। বারিণি খেলতোঃ শশিকলামালোক্য মধ্যেজটম্।

শে (শৈ)বালাবলিমধ্য ব(ম্ব)দ্ধ শফরী-

৩। বু(ম্বু)দ্ধ্যা সমাকর্ষতো-

রাক্রন্দ-স্ফুট-কন্দলেন বিহসন্নব্যাজ্জগদ্ধূর্জ্জটিঃ॥[১৯]

(৩) অস্তি ক্ষীরমহা-

---

(১) "সিদ্ধি"—সূচক চিহ্নবিশেষ, যাহা অদ্যাপি বাঙ্গালাদেশের বহুস্থানে প্রচলিত আছে।

(২) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। (৩) ঐ

৪। গ্ন (র্ণ)বস্য তনয়ং প্রেয়ান্মনোজন্মন-
চক্ষুঃ শ্রীপরিণেতুরদ্রিতনয়া-ভর্ত্তুঃ শিরোভূষণম্।
৫। প্রাগাশাতরুণী-ললাট-তিলকং পূর্ব্বাদ্রি-চূড়ামণি-
র্দ্যৌ-দেবালয়-দৈবতং দিবিষদাং সার—
৬। স্তুষার-দ্যুতিঃ ॥ [২*]
(৪) তদ্বংশে রাজহংসচ্ছদ-বিশদ-যশঃকৌমুদীমুদ্গিরন্তঃ
খেলন্তঃ ক্ষ্মাধ-
৭। রাণামুপরি কর-সমারোপ-সীমন্তিতাশাঃ।
সীমানঃ পুণ্যরাশেরমৃতময়-কলা-মণ্ড-
৮। লাভোগবন্তঃ
কুর্ব্বন্তঃ (৫)শ্চন্দ্র-লীলামবনিতল-ভুজো রাজপুত্রা ব(ন্ব)ভুবুঃ॥[৩*]
(৬) তেষাং বংশে ব(ন্ব)ভূ-
৯। ব প্রভুরুভয়-কুল-প্রৌঢ়ি-সম্পদ্‌গুণানা-
মুত্ত (ত্তং) সঃ ক্ষত্রিয়াণামধন-জন-মনশ্চাতকানাম্পয়ো-
১০। দঃ।
শত্রূণামন্তকর্ত্তা তুহিনকর-কলা-মুক্তি(র্ত্তি)-কীর্ত্ত্যঙ্গনানাং
কান্তঃ সামন্তসেনো রণ-শিরসি
১১। জিতারাতি-সামন্তসেনঃ ॥[৪]*
(৭) শশ্বৎ-প্রোদ্বু(দ্ভু)দ্ধ-পদ্মঃপ্রতিদিনমুদয়ীরাজরক্ষা-হৃদক্ষঃ (৮)
শ্চক্ষু-
১২। শ্চৈতন্য-চিন্তামণিরনণুমহাঃ প্রার্থকৈরর্থিতার্থঃ(র্থঃ)।
এতস্মাদুম্মলাভিদুর্তিভিরুপচি-

(৪) অশুদ্ধ।
(৫) এই স্থলে বিসর্গ চিহ্নটী অতিরিক্ত।
(৬) অশুদ্ধ। (৭) অশুদ্ধ।

১৩। ত-স্তামস্যানাং গুণানাং
হন্তা হেমন্তসেনো রবিরিব জগতাং মাননীয়ো ব(ব)ভূব ॥[৫*]

(৯) অজনি

১৪। বিজয়সেনস্তেন রাকা-সুধাংশো
রুচিভিরবচিতাভির্ভাস্বতোপি প্রভাভিঃ।
শিশির-

১৫। কর-খরাংশু-শ্রীর্যশঃ-কৌমুদীনা—
মপি সমুদয়হেতুর্যৎ প্রতাপাতপানাম্ ॥ [৬*]

(১০) অভবদ্বি-

১৬। লাস দেবী শূরকুলাম্ভোধি-কৌমুদী তস্য [।*]
নয়ন-যুগ মঞ্জ (ঞ্জু)-খঞ্জন-বিহার-কেলিস্থলী

১৭। মহিষী ॥ [৭*]

(১১) ক্ষত্রাণামাতপত্রং কনকগিরি-শিরোবর্ত্তিমার্ত্তণ্ডতেজাঃ
শশ্বদ্বিশ্বম্বিলিম্প-

১৮। ন্মজরপুরধুনী-ফেন-পুণ্যৈর্যশোভিঃ।
জাতস্তস্মাদয়ু(যু)ষ্যান্মনসিজ-রজনীজানি-সৌ

১৯। ন্দর্য-সারঃ
শ্রীমদ্বল্লালসেনঃ সুরু(র)গুরু-ধিষণা-কামুকী-কাম-কান্তঃ ॥[৮*]

(১২) এবংবিধ-গুণ-শ্রে-

২০। ণিঃ শ্রীমন্নিঃশঙ্ক-শঙ্করঃ।
আখণ্ডল ইবাদিত্যা দেবো গর্ভে যয়া ধৃতঃ [॥৯*]

(১৩) দোর্দ্দণ্ডচণ্ডি-

---

(৯) মালিনী। (১০) আর্য্যা।
(১১) স্রগ্ধরা। (১২) শ্লোক (অনুষ্টুভ্)।
(১৩) বসন্ততিলক।

২১। ম-নতাবনিপাল-মৌলি-
রত্নপ্রভাপটল-পাটল-পাদ-পদ্মঃ।
শ্রীমাংস্তয়া বিজয়সেন-মহী-
২২। মহেন্দ্রো
দানান্যদাপয়দশেষি[ত*]কৃৎস্নদানঃ ॥ [১০*]
স খলু শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-শ্রীম-
২৩। জ্জয়স্কন্ধাবারাত(ৎ)। মহারাজাধিরাজ-শ্রীহেমন্তসেন-
পাদানুধ্যাত-পরমেশ্বর-পরমমাহে-
২৪। শ্বর-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্বিজয়সেন দেবঃ
কুশলী।

(পশ্চাতের পৃষ্ঠা।)

২৫। সমুপগতাশেষ-রাজ-রাজন্যক-র(রা)জ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-
রাজামাত্য-পুরোহিত-মহাধর্ম্মা-
২৬। ধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-
অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিক-মহা-
২৭। ক্ষপটলিক-মহাপ্রতীহার-মহাব্যূহপতি-মহাপীলুপতি-মহাগণস্থ
দৌঃসাধিক-চৌরো-
২৮। দ্ধরণিক নৌবল-হস্ত্যশ্ব-গো-মহিষাজাবিকাদি-ব্যাপৃতক-
গৌল্মিক-দণ্ড-পাশিক দণ্ডনা-
২৯। য়ক-বিষয়পত্যাদীনন্যাংশ্চ সকলরাজপাদোপজীবিনোধ্যক্ষ
প্রচারোক্তা-ন(ন্) ইহাকীর্ত্তি-
৩০। তান(ন্) চট্টভট্টজাতীয়ান (ন্) জ(জা) নপদান(ন্) ক্ষেত্র
করাংশ্চ ব্রা(ব্রা) [ম্মা*] ণোত্তরান (ন্)যথার্হং
মানয়তি।
৩১। বো (ব্বো)ধয়তি সমাদিশতি চ। মতমস্তু ভবতাম্। যথা
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি-খাড়ী-বি-

৩২। ষয়ে ঘাসসন্তোগভাট্টবড়াগ্রামে তিক্ষহণ্ড-অলার্দ্ধসীমা-
দক্ষিণপশ্চিমোত্তরতঃ

৩৩। যথাপ্রসিদ্ধ-চতুঃসীমাবচ্ছিন্না[ন্নঃ] সমতটীয়েন পাটক-
চতুষ্টয়-কপর্দ্দক-পুরা-

৩৪। ণ-শতদ্বয়োৎপত্তিঃ ভূমিরিয়ং তৃণপূতিগোচরপর্য্যন্তা
সতলা সোদ্দেশা সাম্রপনসা

৩৫। সগুবাক-নারিকেলা সবনা সজলস্থলা সগর্ত্তোষরা সহ
দশাপরাধা পরিহৃত-স-

৩৬। র্ব-পীড়া অচট্টভট্টপ্রবেশা অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা সমস্তরাজ-
ভোগকর-হিরণ্যপ্রত্যয়-

৩৭। সহিতা। মধ্যদেশবিনির্গত-কান্তিযোঙ্গীয় রত্নাকরদেব-
শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় রহস্করদেব-

৩৮। শর্ম্মণঃ পৌত্রায় ভাস্করদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বৎস-
সগোত্রায় ভার্গব-চ্যাবনাপ্নাবান-ঔর্ব্ব জা

৩৯। ম [দ*] গ্নি (গ্ন্য)প্রবরায় ঋগ্বেদশ্বলায়ন শাখা শ(ষ)ড়ঙ্গা-
ধ্যাই(য়ি)নে শ্রীউদয়কর দেবশর্ম্মণে বিক্রম-

৪০। পুরোপকারিকামধ্যে সতি [সো]মগ্রহেতস্মন্মহামহাদেবী
শ্রীমদ্বিলাস দেব্যা দত্ত ক-

৪১। নক-তুলাপুরুষ-মহাদানে হো[ম]কর্ম্ম-দক্ষিণাবিধিবদুদক-
পূর্ব্বকং কৃত্বা ভগব[ন্তং] ম-

৪২। হেশ্বর-ভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভি-
বৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্ক-ক্ষিতিসম-

৪৩। কালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্র-ন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য
প্রদত্তাস্মাভিঃ। তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানু-

৪৪। মন্তব্যা ভাবিভিরপি নৃপতিভিঃ অপহরণে নরকভয়াৎ
পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ
৪৫। পালনীয়ং ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।
(১৪) ব(ব)হুভির্বসুধা দত্তা রাজভি [ঃ*] সগ-
৪৬। রাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভুমিস্তস্য তস্য তদা ফলং (ম্)[॥১১*]
(১৫) ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ
৪৭। ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌনিয়তং
স্বর্গ-গামিনৌ ॥ [॥১২*[১৬] স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো-
হরে-
৪৮। ত বসুন্ধরাং (ম্) [।*] স বিষ্ঠায়াং ক্রি (কৃ) মির্ভূত্বা
পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে। [।১৩*] (১৭) নৃপ-গণনাগ্রিমরেখঃ
শ্রীমানরি-
৪৯। বৃষভ-শঙ্করঃ কৃতবা (ন্) [।*] উদয়কর-শাসন-দানে
শালাড্ডনাগমিহ দূতং (ম্) [॥১৪*] (১৮) সং ৬২ বৈশাখ
দিনে ৭ শ্রীনি শ্রীনি-
৫০। [ম]হা নি [॥*]

---

(১৪) শ্লোক (অনুষ্টুভ্)
(১৫) ঐ
(১৬) ঐ
(১৭) আর্য্যা।

(১৮) আমার প্রিয়ছাত্র অধ্যাপক শ্রীদিনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, আমাকে দেখাইয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-উদ্ধৃত সংবৎ সংখ্যার পার্শ্ব ৩১ না হইয়া ৬১ হইবে।

অনুবাদ।

(১)

শিশু স্বভাববশতঃ পিতার মস্তকস্থিত গঙ্গার জলে একত্র খেলা করিতে করিতে, (তাঁহার) জটামধ্যে শশিকলা দর্শন করিয়া, উহাকে শৈবালাবলী মধ্যে আবদ্ধ শফরী (মৎস্য) জ্ঞান করিয়া, তৎসমাকর্ষণপর (পুত্রদ্বয়) ক্রৌঞ্চ-রিপু (কার্ত্তিকেয়) ও গজাননের (গণেশের) আক্রন্দন হইতে স্পষ্টানুমিত কোন্দল (বাক্‌যুদ্ধ) লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে ধূর্জ্জটি (মহাদেব) জগতের রক্ষাবিধান করুন।

(২)

স্বর্গবাসী দেবগণের সারভূত, কামদেবের প্রিয়বন্ধু, শ্রীপতির (বিষ্ণুর) চক্ষু, পার্ব্বতীপতির (শিবের) শিরোভূষণ, পূর্ব্বদিগবধূর ললাট-তিলক, পূর্ব্বাচলের চূড়ামণি, আকাশ দেবালয়ের দেবতা, শীতরশ্মি (চন্দ্রদেব) ক্ষীর মহাসাগরের তনয় ছিলেন।

(৩)

তাঁহার [চন্দ্রের] বংশে চন্দ্রলীলার বিধানকারী, অবনিতল-পালক অনেক 'রাজপুত্র' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্র যেমন রাজহংসপক্ষ-শুভ্র জ্যোৎস্না বিকিরণ করেন, তাঁহারাও তেমন তদ্রূপ শুভ্র যশঃ বিকিরণ করিতেন; চন্দ্র যেমন পর্ব্বতসমূহের ['স্নাধর'] উপর (কিরণদানে) খেলা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও রাজসমূহের ['স্নাধব'] উপর (নিজ প্রভাবে) খেলা করিতেন; আবার চন্দ্র যেমন রশ্মি সম্পাত দ্বারা ['কর সমারোপ'] দিগ্‌দিগন্তকে ['আশা'] বিভক্ত ['সীমন্তিত'] করেন, তাঁহারাও তেমন রাজগ্রাহ্য-কর-প্রবর্ত্তন দ্বারা ['কর-সমারোপ'] দিগ্‌দিগন্তের সীমা নির্দ্দেশ ['সীমন্তিত'] করিয়া লইয়াছিলেন(১); চন্দ্রের ন্যায় তাঁহারাও পুণ্যরাশির সীমা(২) লাভ

(১) "কর-সমারোপ-সীমন্তিতাশাঃ"—এই ক্লিষ্ট বিশেষণ-পদটীতে একটি ধ্বনিগত অর্থও বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। চন্দ্রপক্ষে আশাবধূ বা দিগ্‌বধূগণকে সীমন্তিনী বা ভার্য্যা বলিয়া কল্পনা করা অসুন্দর মনে হয় না। বিবাহবিধিতে বরের হস্তে বরের 'কর-সমারোপ' বা হস্তার্পণের প্রথা হিন্দুসমাজে সুবিদিত। 'রাজপুত্র'-পক্ষে রাজগ্রাহ্য করের প্রবর্ত্তন দ্বারা দিগ্‌বধূদিগকে পত্নীরূপে কল্পনা করাও নিতান্ত অন্যায় বোধ হয় না, কারণ রাজাতে সকল দিক্‌পালগণের তেজঃ সন্নিহিত থাকার কথা স্মৃতিশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে [illegible] 'সীমন্তিত' শব্দের এস্থলে 'সীমন্তিনী-কৃত''

করিয়াছিলেন এবং চন্দ্র যেমন সুধাময় কলামণ্ডলের পূর্ণতা ['অমৃত-ময়-কলা-মণ্ডলাভোগ'] লইয়া বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারাও তেমন অত্যুৎকৃষ্ট কলাবিন্যাসসমূহের ভোগ ['অমৃতময়-কলামণ্ডলাভোগ'] অনুভব করিতেন(৩)।

(৪)

[পিতৃমাতৃ] উভয়কুলের গৌরব, সম্পৎ ও গুণগ্রামের বিধানকর্ত্তা (৪), ক্ষত্রিয়গণের শিরোভূষণ, নির্ধন-জন-গণের মনোরূপ চাতকের [ধর্ম্মরূপ-জল-দাতা] জলদ-সদৃশ, শত্রুগণের অন্তকারী, চন্দ্রকলা রূপানুকারিণী (শুভ্র) কীর্ত্তি-রূপিণী অহ্লাদিগের প্রিয়-কান্ত, রণাগ্র ভূমিতে শত্রু সামন্ত সেনার পরাজয় কারী, সামন্তসেন-নামক ব্যক্তি তাঁহাদের [রাজপুত্রদের] বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৫)

তাহা হইতে [সামন্তসেন হইতে] রবির ন্যায় সর্ব্বজগতের মাননীয় হেমন্ত-সেন নামক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রবি যেমন পদ্মকে নিত্য বিকসিত করেন, তিনিও তেমন পদ্মাকে (রাজলক্ষ্মীকে) সর্ব্বদা প্রোদ্ধুরা (প্রবর্দ্ধমানা) রাখিতেন; রবি যেমন প্রতিদিন [পূর্ব্বাচলে] উদয় লাভ করেন, তিনিও প্রতি-দিন উন্নতি ['উদয়'] লাভ করিতেছিলেন; রবি যেমন চন্দ্রের রক্ষায় ['রাজ-রক্ষা'] সুদক্ষ, তিনিও তেমন (অন্য) নরপতিগণের রক্ষায় ['রাজ-রক্ষা']

অর্থ ধরিলে মহাকবি মাঘের একটী পঙ্‌ক্তি শ্রবণপথে পতিত হয়, যথা—"উত্তাল-তালীবন-সম্প্রবৃত্ত-সমীর-সীমন্তিত-কেতকীকাঃ" ।৩।৮০ ; আবার 'সীমন্তিত' শব্দের বিভক্ত্যা চিহ্নিত অর্থে প্রয়োগ লক্ষ্য করিতে হইলে মহাকবি ভারবির একটি পঙ্‌ক্তি মনে হয়। যথা—"রথাঙ্গ-সীমন্তিত-সান্দ্রকর্দ্দমান্ প্রসক্ত-সংপাত-পৃথক্কৃতান্ পথঃ" ।৪।১৮। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

(২) চন্দ্রলোক পুণ্যাত্মগণের শেষ গন্তব্যস্থান বলিয়া রাজকবি চন্দ্রদেবকে পুণ্যের সীমারূপে বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

(৩) চন্দ্রপক্ষে—কলা = ষোড়শ ভাগ ; মণ্ডল = বিম্ব। "কলা তু ষোড়শো ভাগো বিম্বোঽস্ত্রী মণ্ডলং ত্রিষু" ইত্যমরঃ। আভোগ = পরিপূর্ণতা "আভোগঃ পরিপূর্ণতা" ইত্যমরঃ।

(৪) 'উভয়-ভুগ-প্রৌঢ়ি-সম্পদ্ গুণানাম্'—এই পদটিকে 'ক্ষত্রিয়াণাং'—পদের বিশেষণ মনে করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন—"these Kshatriyas possessed of the principal good qualities (i. e. paternal and maternal")—তাহা সঙ্গত হয় নাই। পদটিকে তৎপরবর্ত্তী "প্রভুঃ" শব্দের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে অর্থ-প্রতিপত্তি সুগম হয়।

সুদক্ষ (৫) ছিলেন; আবার রবি যেমন (উদয় দ্বারা) চক্ষুর চেতনা-বিজয় চিন্তামণি-সদৃশ; তিনিও তেমন (নিজগুণে প্রজাবর্গের) চক্ষুদান ও চেতনদান বিষয়ে চিন্তামণিতুল্য ছিলেন (৬) রবির তেজের ন্যায়, তাঁহারও প্রতাপ প্রবল ছিল (৭); রবি যেমন প্রার্থনাকারি (উপাসক) গণকর্ত্তৃক অভিলষিত বস্তুর জন্য প্রার্থিত হন, তিনিও তেমন প্রার্থিজনগণ কর্ত্তৃক অর্থের (ধনের) জন্য প্রার্থিত হইতেন; রবি যেমন উষ্ণ দ্যুতি দ্বারা উপচিত, তিনিও তেমন উষ্ণ [প্রতাপ] দ্যুতিদ্বারা উপচিত ছিলেন; এবং রবি যেমন তামস (অন্ধকার-সম্বন্ধীয়) গুণরাশির নিহন্তা, তিনিও তেমন তামসিক গুণরাশির অপনোদন-কারী ছিলেন।

(৬)

পূর্ণিমাচন্দ্রের প্রভাপটলের সহিত একত্রীভূত সূর্য্যকিরণমণ্ডলী লইয়া চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সমান শোভাসম্পন্ন, বিজয় সেন তাহা হইতে [হেমন্ত সেন

রাজপুত্র-পক্ষে—কলা-চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা। বাৎসায়ন-কামসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬শ সূত্র দ্রষ্টব্য। "কলাস্তামূলবিবৃদ্ধৌ শিল্পাদাংশনাত্রকে। ষোড়শাংশে চ চন্দ্রস্য কলনাকালমানয়োঃ" ইতি মেদিনী। মণ্ডলসমূহ। আভোগনম্যক্ ভোগ।

(৫) এই শ্লোকে দ্ব্যর্থ-বাচক "রাজ্ঞরক্ষা-সুদক্ষঃ" বিশেষণ পদটি রবিপক্ষে কিরূপ ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় অনুবাদে তাহার কোন আভাস প্রদান করেন নাই। "ষষ্ঠে চন্দ্রে চ রাজাস্যাৎ" ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তম দেবের রাজন্-শব্দের এই বিভিন্নার্থ লক্ষ্য করিলে, আমরা রবিপক্ষে উক্ত বিশেষণটির—"যিনি চন্দ্রকে রক্ষা করিতে সুদক্ষ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারি। শাস্ত্রেও কথিত হয় যে, চন্দ্র অমাবস্যাতে সূর্য্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থিত থাকেন। এবং প্রতিপদ দিবসে তাহা হইতে নিঃসৃত হইয়া উদয় লাভপূর্ব্বক প্রতিদিন এক-কলাক্রমে বৃদ্ধি লাভ করেন। বরাহ-সংহিতায় এমন আভাসও আছে যে, চন্দ্রের নিজ কিরণ কিছুই নাই, রবির কিরণসম্পাতেই চন্দ্রের প্রভা, যথা "সলিলময়ে শশিনি রবের্দীধিতয়ো মূর্চ্ছি তাস্তমো নৈমাম্। ক্ষপয়ন্তি দর্পণোদর-নিহিতা ইব মন্দিরস্তাস্তঃ॥" এই প্রসঙ্গে রঘুর শরীরা-বয়বের সন্ধি বর্ণনায় মহাকবি কালিদাসের "পুপোষ বৃদ্ধিং হবিদন্বধীদিতেরনুপ্রবেশাদিব বাল-চন্দ্রমাঃ" (রঘুবংশ ৩।২২) এই বাক্যটি স্মরণীয়। প্রথম মহীপাল দেবের বাণগড়-লিপির ১০ম শ্লোকেও ইহার অনুরূপ ভাব লক্ষিত হয়, যথা, "তস্মাদ্ বভূব সবিতুর্ব্বসুকোটিবর্ষী কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেবঃ"।

(৬) 'চিন্তামণি'-শব্দের একরূপ ব্যাখ্যা "যে মণির চিন্তিত বস্তু প্রদানে শক্তি আছে" সেই মণি। 'স্পর্শমণি' ইহার অন্যতর ব্যাখ্যা হইতে পারে—অর্থাৎ "যে মণির স্পর্শে একবস্তুর অন্য বস্তুর ভাব সাধিত হইতে পারে"।

(৭) তদনুগ্রহাঃ—রবিপক্ষে 'মহঃ'-শব্দের 'তেজঃ' অর্থ ধরিয়া, অন্য পক্ষে ইহার উৎসব বা 'আনন্দ' অর্থ ধরিলে ব্যাখ্যা কুব্যাখ্যা হইবে না। "মহস্তূৎসব-তেজসোঃ" ইত্যমরঃ।

হইতে] জন্মলাভ করিয়াছিলেন ; তিনি [চন্দ্ররূপে] যশোরূপ কৌমুদীর ও [সূর্য্যরূপে] প্রতাপরূপ আতপের হেতুভূত ছিলেন (৮)।

শূরকুল-সাগরের জ্যোৎস্নারূপিণী (৯), নয়নযুগলরূপ চারু খঞ্জনদ্বয়ের বিহারকেলিভূমি, তাঁহার [বিজয় সেনের] বিলাসদেবীনাম্নী মহিষী ছিলেন।

(৮)

এই মহিষীর গর্ভে তাঁহার [বিজয় সেনের] শ্রীমান্ বল্লাল সেন নামক [একপুত্র] জন্মলাভ করেন ;—তিনি ক্ষত্রিয়গণের ছত্র-সদৃশ (রক্ষক) ছিলেন, কনকগিরির (মরুর) শিরোদেশস্থিত মার্ত্তণ্ডের প্রভার ন্যায় তাঁহার প্রতাপ ছিল ; তিনি সুর-পুর-সরিৎ [গঙ্গার] ফেনের ন্যায় নির্ম্মল যশোরাশি দ্বারা বিশ্বকে বিলিপ্ত করিয়াছিলেন ; মনোভবের (মদনের) ও রজনীপতির (চন্দ্রের) ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্যসার বর্ত্তমান ছিল, এবং তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ধীপতি [ধিষণা] রূপিণী কামুকী রমণীর কামকান্ত ছিলেন (১০)।

(৯)

অদিতি যেমন আখণ্ডলকে (ইন্দ্রকে) গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যিনি [এই মহিষী বিলাসদেবী] এবংবিধ গুণরাশিসমন্বিত শ্রীমান্ "নিঃশঙ্ক-শঙ্কর" নামে পরিচিত (১১) দেব [বল্লাল সেনকে] গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন ;

যিনি [এই মহিষী বিলাসদেবী] এবংবিধ গুণরাশি সমন্বিত শ্রীমান "নিঃশঙ্ক-শঙ্কর" নামে পরিচিত (১১) দেব [বল্লালসেনকে] গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন ;

---

(৮) এই শ্লোকের বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-কৃত ব্যাখ্যা দুর্ব্বোধ বলিয়া প্রতিভাত হয়। মনে হয় তদীয় অনুবাদে মুদ্রাযন্ত্রের ভুল থাকিতে পারে। রাজার মৃদু ও উগ্র উভয়বিধ গুণ থাকা আবশ্যক, এই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে ও নীতিশাস্ত্রে রাজাকে চন্দ্র ও সূর্য্য এই উভয়ের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে।

(৯) নেত্রসুখ বিধায়িনী এই অতিরমণীয়াকৃতি রমণী শূরকুলসম্ভূতা হইয়া পিতৃকুলেরও আনন্দবর্দ্ধিনী ছিলেন, ইহাই শ্লোকপ্রতিপাদ্য বিষয়। চন্দ্রকৌমুদী দেখিয়া সাগরের আনন্দ উচ্ছ্বলিত হয়।

(১০) চতুর্থপাদের বিশেষণটীর মর্ম্মার্থ এই যে, তিনি বৃহস্পতি অপেক্ষায়ও অধিকতর ধীসম্পন্ন ছিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতির অন্যতম নামও "ধিষণ" এবং ধীশক্তির অপর নাম "ধিষণা" যথা "ধিষণস্ত্রিদশাচার্য্যে ধিষণা ধিষি যোষিতি" ইতি মেদিনী। অত্যন্ত কামপরায়ণা স্ত্রীকে "কামুকী" বলা হয়, যথা, "ইচ্ছাবতী কামুকা স্যাদ্ বৃষস্তী তু কামুকী" ইত্যমরঃ।

(১১) বল্লালসেন দেবের অপর এক নাম (বিরুদ) ছিল "নিঃশঙ্ক-শঙ্কর"। বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া লিপি দ্রষ্টব্য—I. A. S. B. 1896, Pt. I. pp. 12-13, 11. 32-47.

(১০)

যাঁহার দোর্দ্দণ্ড-চণ্ডতায় আনত নরপতিগণের চূড়ামণির প্রভাপটল দ্বারা নিজ পাদ-পথ পাটল-বর্ণ ধারণ করিত, অশেষিত সর্ব্ব-দান সেই মহীমহেন্দ্র (পৃথ্বী-রাজ) শ্রীমান্ বিজয়সেন তাহা দ্বারা [সেই মহিষী বিলাসদেবী দ্বারা] অনেক দান প্রদান করাইয়াছিলেন (১২)।

শ্রীবিক্রমপুরে সমাবাসিত (সংস্থাপিত) শ্রীসম্পন্ন জয়স্কন্ধাবার (রাজধানী বা সেনানিবাস) হইতে, মহারাজাধিরাজ-শ্রীহেমন্তসেন পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরম-মাহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুশলময় সেই শ্রীমদ্-বিজয়সেনদেব—সমুপগত (সংবিদিত) সমস্ত রাজা, রাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য,

শ্রীবিক্রমপুরে সমাবাসিত (সংস্থাপিত) শ্রীসম্পন্ন জয়স্কন্ধাবার (রাজধানী বা সেনানিবাস) হইতে, মহারাজাধিরাজ শ্রীহেমন্ত সেন পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরম-মাহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুশলময় সেই শ্রীমদ্বিজয় সেন দেব সমুপগত (সংবিদিত) সমস্ত রাজা, রাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, রাজপুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ (ধর্ম্মাধিকরণিক বা শ্রেষ্ঠ বিচারপতি) (১৩), মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত (রাজার 'মোহর' রক্ষক), অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক (রাজাপ্তজনদিগের উপরিস্থিত অধ্যক্ষ (?) মহাক্ষপটলিক (লেখ্য রক্ষক), মহাপ্রতীহার (দৌবারিক শ্রেষ্ঠ), মহাব্যূহপতি, মহাপিলুপতি (প্রধান গজরক্ষক), মহাগণস্থ ('গণ' নামক সেনামণ্ডলীর নেতা) দৌঃসাধসাধিক (দ্বারপাল বা গ্রামপরিদর্শক), চৌরোদ্ধরণিক, নৌবল-

(১২) এই প্রশস্তির ৯ম ও ১০ম শ্লোক একত্র পঠনীয়;—৯ম শ্লোকের 'যযা'—পদের সহিত ১০ম শ্লোকের "তয়া" পদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই তাম্রশাসন-সম্পাদকের কাল বিজয়সেনের ৬২ রাজ্য সংবৎ। বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যশাসনকার্য্যে তিনি সর্ব্বগুণোপেত পুত্র বল্লাল সেনের উপর নির্ভর করিতেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। তাই তিনি স্বয়ং পুত্রের যোগ্যতায় মুগ্ধ ও তুষ্ট হইয়া এরূপ পুত্রের গর্ভধারিণী বিলাসদেবীর হস্ত দিয়া অনেক প্রকার দানের বিধান করিয়াছিলেন। রাজাদিগের নিজ প্রশস্তিতে অপ্রাসঙ্গিকতার ভয়ে পুত্র-প্রশংসা বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু বিজয় সেন বল্লালসেনের সম্পূর্ণ সহায়তা অপেক্ষা করিতেন বলিয়াই সম্ভবতঃ পুত্রের এতটা প্রশংসা করিয়াছেন।

(১৩) 'মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ'—বিজয়সেন দেবের পৌত্র মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের রাজ্য সময়ে ধর্ম্মাধিকরণিকের বা শ্রেষ্ঠ বিচারপতির পদে সমাসীন ছিলেন—"ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" প্রণেতা ঈশান ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা হলায়ুধ। সেন রাজগণের রাজত্বকালে এই উচ্চপদ উপযুক্ত পুরুষেরই প্রাপ্য ছিল।

ব্যাপৃতক, হস্তি-অশ্ব গো-মহিষ অজ অবিকাদি ব্যাপৃতক, গৌল্মিক ('গুল্ম'-নামক সেনামণ্ডলীর অধিনায়ক, অথবা গ্রাম-রক্ষিগণের অধিনায়ক), দণ্ড পাশিক বেধাধিকৃত পুরুষ), দণ্ডনায়ক (চতুরঙ্গবলাধ্যক্ষ), বিষয়পতি প্রভৃতি (রাজকর্ম্মচারিগণকে) এবং অধ্যক্ষপ্রচারে (১৪) উক্ত (কিন্তু) এই শাসনে (পৃথগ্‌ভাবে) অকথিত অন্যান্য রাজপদোপজীবিদিগকে ও চট্ট ভট্টআর্তীয় জনপদবাসিদিগকে, ক্ষেত্রকরদিগকে এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণোত্তমগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। বিজ্ঞাপন করিতেছেন এবং সমাদেশ করিতেছেন, (নিম্নোক্ত বিষয়ে) আপনাদের সকলের অভিমত হউক,—যথা,

শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী খাড়ী বিষয়ের ঘাসসম্ভোগ ভাট্টরডাগ্রামে তিফ্রহণ্ড জলার্দ্রসীমার দক্ষিণ পশ্চিম উত্তরস্থিত, তৎতৎপ্রসিদ্ধ চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন, সমতট দেশ প্রচলিত নলের পরিমাণানুসারে চারিপাটক পরিমিত এবং দুইশত কপর্দ্দক পুরাণ (মুদ্রা) আয়-বিশিষ্ট, সতল, উদ্দেশসহিত, আম্র পনস সহিত গুবাক-নারিকেল-সমেত, সবন, সজলস্থল, গর্ত্ত ও ঊষরের সহিত, (প্রতিগ্রহীতার) যৎসম্বন্ধে দশটি অপরাধ (রাজা) সহ্য করিবেন এমন, সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়নরহিত, চট্ট ভট্টপ্রবেশাধিকাররহিত, কোন প্রকার করাদি যাহা হইতে গৃহীত হইবে না এমন, সমস্ত রাজভোগ্য কর হিরণ্যাদির আয়ের সহিত এই ভূমি,—

বিক্রমপুরস্থিত উপকারিকা (রাজপ্রাসাদ) মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে, আমার মহামহাদেবী শ্রীমদ্‌বিলাস দেবীর প্রদত্ত সুবর্ণতুলাপুরুষ মহাদান উপলক্ষে হোমকর্ম্মের দক্ষিণাবিধির অনুসরণ করিয়া, উদকপূর্ব্বক ভগবান্ মহেশ্বর ভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া, (আমার) পিতামাতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য যাবৎ চন্দ্র দিবাকর, ক্ষিতি সমান কাল পর্য্যন্ত, ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায় (১৫) স্মরণ করিয়া, তাম্রশাসন সম্পাদনপূর্ব্বক,—

মধ্যদেশ বিনির্গত কান্তিজোঙ্গ দেশীয় রত্নাকর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, রহস্কর দেবশর্ম্মার পৌত্র, ভাস্করদেবশর্ম্মার পুত্র; বৎস-সগোত্র, ভার্গব চ্যাবন আপ্নাবন ঔর্ব্ব জামদগ্ন্যপ্রবর, ঋগ্‌বেদের আশ্বলায়ন শাখা ষড়ঙ্গাধ্যয়নকারী শ্রীউদয়কর

(১৪) 'অধ্যক্ষপ্রচার' অর্থশাস্ত্রের একটি অধিকরণ। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রের' দ্বিতীয় অধিকরণ দ্রষ্টব্য। ইহাতে সকল প্রকার রাজপাদোপজীবীদিগের বিষয় বিবৃত আছে।

(১৫) 'ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়'—ইহা নীতিশাস্ত্রে উল্লিখিত একটি প্রথাকে লক্ষিত করে। কৌটিল্যের "অর্থ শাস্ত্রের" 'অধ্যক্ষ প্রচার' নামক অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দেবশর্ম্মাকে, আমি প্রদান করিলাম। ইহা (আমার এই দান) আপনারা সকলেই অনুমোদন করুন, এবং ভাবী নরপতিগণও (ভূমি) অপহরণে নরকপাত ভয়ের ও (ভূমি) পালনে ধর্ম্মগৌরবের কথা স্মরণ করিয়া ইহা পালন করুন। এই প্রসঙ্গে ধর্ম্মানুশংসী শ্লোকাবলীও আছে,—

"সগরাদি অনেক নৃপতি ভূমিদান করিয়াছেন, কিন্তু যখন যাঁহার অধিকারে ভূমি থাকে, তখন (ভূমিদানের) ফল তাঁহারই হইয়া থাকে" ॥১১॥

"যিনি ভূমির প্রতিগ্রহ করেন; এবং যিনি ভূমি প্রদান করেন, তাঁহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা ও নিয়ত স্বর্গগামী হন" ॥ ১২ ॥

"ভূমি স্বদত্তই হউক, আর পরদত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণসহ পচিতে থাকিবেন" ॥ ১৩ ॥

নৃপগণনায় অগ্রিম রেখাপাতের অধিকারী শ্রীমান্ অরিবৃষভ শঙ্কর (১৬) [বিজয়সেন] উদয়করের এই শাসন দানবিষয়ে শালাড্ডনাগ নামক ব্যক্তিকে দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

সংবৎ ৬২, বৈশাখ দিন ৭। শ্রী—নি (বদ্ধ), মহা—নি (বদ্ধ)॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

---

(১৬) 'অরিবৃষভ-শঙ্কর' বিজয়সেন দেবের অপর নাম (বিরুদ) ছিল।

স্মৃতি ও সমাজ।

শ্রুতি,—স্মৃতি—স্মৃতিসংহিতাকারগণ।

হিন্দুসমাজের সহিত স্মৃতিশাস্ত্রের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। হিন্দুর ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য যাবতীয় বিষয়ের তথ্য স্মৃতিশাস্ত্রে নিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক ভাবেই হউক, অথবা ধর্ম্মকর্ম্মের যাথাতথ্যোপলব্ধির জন্যই হউক, হিন্দুর স্বরূপ বুঝিতে হইলে স্মৃতিশাস্ত্রের মর্ম্মাবগতি একান্ত প্রয়োজন। এমন কি, সমাজমর্য্যাদা-স্থাপয়িতা ঋষিগণ একবাক্যে শ্রুতি ও স্মৃতিকে ব্রাহ্মণের দুইটি চক্ষু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) স্মৃতিশাস্ত্রের নাম ধর্ম্ম-সংহিতা বা ধর্ম্ম-শাস্ত্র। এই দুইটি নামই সহেতুক অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থযুক্ত। ধর্ম্ম এই শাস্ত্রে সংহিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতিপাদ্যরূপে কথিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা "ধর্ম্মসংহিতা"। "ধর্ম্মশাস্ত্র" এই শব্দের নিরুক্তি, ধর্ম্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্র। স্মৃতি-শাস্ত্র যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহাই ধর্ম্ম, পক্ষান্তরে যাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহাই অধর্ম্ম। স্মৃতি—এই শব্দটিরও ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ আছে। মূলীভূত বেদবাক্য স্মৃত হইয়াছে ইহাতে, অথবা ইহার দ্বারা এইরূপ অর্থে অধিকরণ-বাচ্যে অথবা করণ-বাচ্যে বিহিত ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত স্মৃ-ধাতুর দ্বারা স্মৃতিশব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। যে হিন্দু-সমাজের সহিত স্মৃতিশাস্ত্রের সম্বন্ধ দেখাইতে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই হিন্দু কে? তাহার লক্ষণইবা কি? এই প্রশ্নের উত্তররূপে বলিতে হয়—যে মানব বেদবাক্যকে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং তদনুযায়ী বিধি-নিষেধ যথাশক্তি পালন করে, সে-ই হিন্দুনামে অভিহিত হয়। যদিও হিন্দু এই নামটি আধুনিক, তথাপি ভূরিব্যবহার দেখিয়া—হিন্দুনামের প্রদর্শিত অর্থ কল্পনা করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আদিম হিন্দু-সমাজের নেতা আর্য্য ঋষিগণ সমস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে,—"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মঃ" বেদে যাহা কর্ত্তব্যরূপে প্রণিহিত অর্থাৎ বিহিত হইয়াছে, সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ে বেদই অকাট্য প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ধর্ম্ম

(১) শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রস্য নয়নে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে।
একেনাপি বিনাঙ্গেন হ্যন্ধঃ কাণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

ধর্ম্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থ; প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহারও জানিবার শক্তি নাই, প্রত্যক্ষ প্রমাণের অধীন কেবল অনুমানও ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ প্রকটনে সমর্থ হয় না; সুতরাং কেবল অজ্ঞাত-জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যই ইহার স্বরূপজ্ঞাপনে সমর্থ হয়। এই বিষয়ে মীমাংসাদর্শনে বিশেষরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। ঋষিগণ অপ্রতিহত জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁহারা বেদের অর্থ স্মরণ করিয়া সংহিতাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন; সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রের ভিত্তিও বেদেই সুপ্রতিষ্ঠিত। অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান-সম্পন্ন ঋষিগণ বেদের অর্থ সম্যক্‌রূপে অধিগত ছিলেন, তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ এবং প্রতারণার ইচ্ছা ছিল না; সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত হিন্দুর নিকট আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বাস্যবাক্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এবং অদ্যাপিও আছেন। সমস্ত দার্শনিকগণই সমস্বরে আপ্তোপদেশের প্রামাণ্য ঘোষণা করিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে,—আগম-বিরুদ্ধ অর্থাৎ বেদ-বিরুদ্ধ "অনুমান প্রভৃতি" প্রমাণপদবীতে সমারূঢ় হইবার যোগ্য নহে। দার্শনিক মহাবৈয়াকরণ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন যে,—

"অতীন্দ্রিয়ানসংবেদ্যান্ পশ্যন্ত্যার্ষেণ চক্ষুষা।
যে ভাবান্ বচনং তেষাং নানুমানেন বাধ্যতে" ॥

অর্থ—সাধারণ দৃষ্টির অযোগ্য অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহ যাঁহারা অসাধারণ জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পান, তাঁহাদের বাক্য অনুমানের দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। (বাক্য পদীয়। ১৩৮)

কারণ—"যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে" ॥

অনুমানকারি-নিপুণ মানবকর্ত্তৃক যত্ন সহকারে অনুমানের দ্বারা নির্দ্ধারিত বিষয়ও তদপেক্ষা অধিকতর নিপুণ—মানব কর্ত্তৃক অন্য প্রকারে প্রতিপাদিত হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ একব্যক্তি কেবল বুদ্ধিবলে যুক্তিতর্কের দ্বারা যাহা স্থির করে, তদপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান্ মানব সমীচীনতর তর্কের প্রভাবে তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয় অর্থাৎ এই কাজের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য হয়, এই কাজের আচরণে পাপ হয়, এইরূপ অবধারণ অনুমানের দ্বারা হইতে পারে না। প্রত্যুত উপদেশ-নিরপেক্ষ অনুমানমাত্র-পক্ষপাতি—মানবের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ভর্তৃহরি এই বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"হস্তস্পর্শাদিবোধেন বিষমেঽপ্যভিধাবতা।
অনুমান-প্রধানেন বিনিপাতো ন দুর্লভঃ"—

ইহার অর্থ—কোনও এক অন্ধমানব অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দুর্গম-পথে হস্তস্পর্শের দ্বারা যদি পথ নির্ণয় করিতে করিতে গন্তব্য স্থানের প্রতি প্রধাবিত হয়, তবে তাহার বিনিপাত অর্থাৎ পথভ্রষ্ট অবস্থায় কষ্টদায়ক স্থানে পতন দুর্লভ হয় না; অবশ্যই তাহাকে পতিত হইতে হয়। যেমন এক অন্ধ মানব হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিতে করিতে পথ ঠিক করিয়া যাইতেছে, এমত অবস্থায় তাহার সম্মুখে তৃণসমাচ্ছন্নমুখ একটি পুরাতন কূপ থাকিলে, সেই অন্ধ তৃণের কোমল স্পর্শ নিবন্ধন অগ্রবর্ত্তি স্থানের সুখসেব্যতা অনুমান করিয়া যদি অতর্কিত-চিত্তে অগ্রগামী হয়, তবে তাহার দুর্গতির আর পরিসীমা থাকে না। সেইরূপ শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল বুদ্ধিবলে পাপ পুণ্য নির্ণয়কারীরও অধঃপতন অর্থাৎ পরলোকে নরকযন্ত্রণাভোগ অবশ্যম্ভাবী। পরমহিতৈষী মনীষী ঋষিগণ বেদের অর্থ স্মরণপূর্ব্বক ধর্ম্মসংহিতা প্রণয়ন করিয়া শাস্ত্রবিশ্বাসীর অধঃপতনের পথ আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসী মানবের নিকট নিরতিশয় ভক্তিভাজনরূপে পরিচিত।

বেদশাখা বিবরণ।

বেদ অতি বিস্তৃত শাস্ত্র। নানাশাস্ত্রে এক সামবেদেরই সহস্র-শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। (২) চরণব্যূহ পাঠে জানা যায় যে, সামবেদের সহস্রশাখার মধ্যে রাণায়নীয় প্রভৃতি সাতটি মাত্র শাখা বর্ত্তমান রহিয়াছে। অবশিষ্ট শাখাগুলি অনধ্যায়দিনে পঠিত হওয়ায়, ক্রুদ্ধ ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে। (৩) অন্যান্য বেদেরও অনেক শাখা স্মরণাতীত কাল হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছে। মনু-প্রভৃতি ঋষিগণ যোগবলে অতীন্দ্রিয় বিলুপ্ত বেদশাখারও অর্থ স্মরণ করিতে সমর্থ ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে অধুনাতন কলামাত্রাবশিষ্ট বেদভাগে অদৃষ্টচর বিষয়ও দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যোগসিদ্ধির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অন্তর্দ্ধান, স্মৃতি, কান্তি, দৃষ্টি, শ্রোত্রজ্ঞতা, নিজশরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরকায়ে প্রবেশ, ও অভিপ্রায় মত পদার্থের সৃষ্টিকরা, যোগসিদ্ধির এই কয়টি লক্ষণ

(২) সামবেদস্য কিল সহস্রভেদা ভবন্তি। (চরণব্যূহ পরিশিষ্ট)

(৩) এষ্বনধ্যায়েষধীয়ানাস্তে শতক্রতু-বজ্রেণাভিহতাঃ শেষান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বুঝিতে হইবে। (৪) অতএব স্মৃতিশব্দের অর্থ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের স্মরণ। অতএব মনুপ্রভৃতির গ্রন্থে যে সমস্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের প্রতিপাদক সাক্ষাৎ শ্রুতি অধুনা দৃষ্টিগোচর না হইলেও, স্মৃতিবাক্যের দ্বারা মূলীভূত বেদবাক্যের অনুমান করিতে হইবে। মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন যে,—"বিরোধেত্বনপেক্ষং স্যাদসতিহ্যনুমানম্" প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত যে স্মৃতিবাক্যের বিরোধ হয়, সেই স্মৃতিবাক্য অনপেক্ষ অর্থাৎ অপ্রমাণ। পক্ষান্তরে যে স্থলে বিরোধ নাই, সে স্থলে স্মৃতিবাক্যের দ্বারা বেদবাক্যের অনুমান হয়। কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে বেদই স্বতঃপ্রমাণ, সুতরাং স্মৃতির মূলেও বেদের অস্তিত্বই প্রামাণ্যজ্ঞাপক। এইরূপ সদাচারের দ্বারাও স্মৃতির অনুমান হয়, এবং সেই অনুমিত-স্মৃতিবাক্যের দ্বারা আবার মূলীভূত শ্রুতির অনুমান হয়, এইরূপে সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা-সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই হিন্দুধর্ম্মে বেদমূলকতা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

স্মৃতির দ্বারা বেদের অনুমান।

বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ ইহার কোনও কর্ত্তা নাই। সুতরাং ইহাতে কোন প্রকার দোষেরও আশঙ্কা নাই। শিব হইতে ঋষিগণ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই বেদের স্মরণ করিয়াছেন, কেহই বেদ প্রস্তুত করেন নাই। বিধর্ম্মিগণ বুঝিতে না পারিয়া অন্য কোনও অনভিপ্রায়ে বেদকে চাষার গান বা অন্য শ্রেণীর সাময়িক গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, অজ্ঞতাবশতঃ কতিপয় হিন্দুও সেই অপসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া সমাজে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে বেদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া অবনত-মস্তকে স্বীকার করিতে হয়। বেদ-স্মৃতির বিরুদ্ধে কথা বলাও হিন্দুর পক্ষে গুরুতর পাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, শ্রুতিরূপ বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ স্মৃতিবাক্য সর্ব্ব বিষয়ে অমীমাংস্য, অর্থাৎ কেন উহা করিব, কেন উহা করিব না, এইরূপ প্রতিকূল তর্কের দ্বারা বেদস্মৃতির বিচার করা চলিবে না, কারণ এই উভয় হইতেই ধর্ম্ম বিশেষরূপে

বেদের অপৌরুষেয়তা।

বেদনিন্দায় দোষ।

(৪) অন্তর্ধানং স্মৃতিঃ কান্তির্দৃষ্টিঃ শ্রোত্রজ্ঞতা তথা।
নিজং শরীরমুৎসৃজ্য পরকায়প্রবেশনম্।
অর্থানাং ছদ্মতঃ সৃষ্টির্যোগসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্ ॥ যাজ্ঞ্য প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়। ২০৩।
অণিমাদ্যাপ্ত্যা পরৈরদৃশ্যত্বমন্তর্ধানম্। স্মৃতিরতীন্দ্রিয়েষর্থেষু মন্বাদেরিব স্মরণম্। কান্তিঃ রমণীয়তা। দৃষ্টিরতীতানাগতেষ্বপার্শ্বেষু। (মিতাক্ষরা)

প্রকাশিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যদি শাস্ত্র না থাকিত, তবে ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ কিছুই বুঝিতে পারা যাইত না। যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্রের অর্থাৎ যুক্তি-প্রধানশাস্ত্রের অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের মূল সেই বেদস্মৃতিকে অবজ্ঞা করে, সাধুগণ সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। (৫) এমন কি বেদের নিন্দা সুরাপানের তুল্য পাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (৬)

স্মৃতিশাস্ত্রের ক্রম বিকাশ।

স্মৃতিশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিরচিত হইয়াছে। বাৎস্যায়ন-কৃত কামসূত্র পাঠে জানা যায় যে, প্রজাপতি মনুষ্যসমূহ সৃষ্ট করিয়া তাহাদের রক্ষার জন্য প্রথমতঃ লক্ষাধ্যায়ে বিভক্ত "ত্রিবর্গ সাধন" অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামের ব্যবস্থা প্রতিপাদক গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। (৭) সুতরাং প্রজাপতি-প্রোক্ত স্মৃতিসংহিতাই বেদভিন্ন যাবতীয় শাস্ত্রের মূল বলিয়া বিবেচিত হয়। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, প্রজাপতিপ্রোক্ত স্মৃতিসংহিতা কেবল ধর্ম্মসংহিতা নহে। কাম-সংহিতা প্রভৃতিও ইহারই অন্তর্গত। এই বিপুলসংহিতার "ধর্ম্মাধিকারিক" অর্থাৎ ধর্ম্মসংহিতারূপ অংশ ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু পৃথক্ করিয়াছিলেন। (৮)

মনুসংহিতা।

সুতরাং ধর্ম্মসংহিতার মধ্যে মনুসংহিতাই সকলের আদি, ইহা নির্ব্বিবাদ সিদ্ধান্ত। নারদসংহিতার উপ-ক্রম পাঠে জানা যায় যে, ভগবান্ মনু প্রথমেই সর্ব্বভূতের অনুগ্রহার্থ সদাচার

---

(৫) শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেযো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্বভৌ॥
যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥ ২।১০।১১।

(৬) ব্রহ্মোজ্ঝতা বেদনিন্দা কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ।
গর্হিতানাদ্যয়োর্জ্জিঃ সুরাপান সমানিবট্॥ মনু। ১১।৫৭

(৭) প্রজাপতির্হি প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসাং স্থিতিনিবন্ধনং ত্রিবর্গস্য সাধনং অধ্যায়ানাং সহস্রেণাগ্রে প্রোবাচ। ১ম অ। ৪ সূত্র। যশোধরকৃতটীকা—অগ্রে চকারেতি তদানীং শাস্ত্রান্তরাভাবা-দিদমেবাগ্র্যমিতি। শ্রুতিরপি সর্ব্বজনবিষয়েতি তামেব হৃদিস্থামনুসন্ধিত্য সাধারণভূতং স্মার্ত্ত-শাস্ত্রং প্রকর্ষেণোবাচ। তত্র যত্র ধর্ম্মোঽধিকৃতস্তমনুঃ পৃথক্ চকার। যত্রার্থস্তদ্ বৃহস্পতিঃ। যত্র কামস্তন্নন্দীতি।

(৮) তস্যৈকদেশিকং মনুঃস্বায়ম্ভুবো ধর্ম্মাধিকারিকং পৃথক্ চকার।

১ম অ। ৫ সূত্র।

বক্ষার হেতুস্বরূপ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ শাস্ত্রে লোকসৃষ্টির বর্ণনা প্রভৃতি চব্বিশটি প্রকরণ ছিল। উক্ত শাস্ত্রকে ভগবান্ মনু লক্ষসংখ্যক শ্লোকে এবং একহাজার আশী অধ্যায়ে নিবদ্ধ করিয়া দেবর্ষি নারদকে প্রদান করিয়াছিলেন। নারদ সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া উহা অত্যন্ত বিস্তৃত, সুতরাং মানবদিগের পক্ষে উহার অধ্যয়ন সহজ নহে, এইরূপ মনে করিয়া দ্বাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক সংক্ষেপ গ্রন্থ রচনা করিয়া, তাহা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়ও নারদের নিকট তাহা অধ্যয়ন করিয়া তাৎকালিক মানবদিগের আয়ু ও শক্তির অপেক্ষা করিয়া, অর্থাৎ অল্পায়ুঃ ক্ষীণশক্তি মানবদিগের পক্ষে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকপাঠ কষ্টকর মনে করিয়া, সেই গ্রন্থের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক অষ্ট সহস্র শ্লোকাত্মক সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহা সুমতি ভার্গবকে অধ্যয়নার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। সুমতি ভার্গবও তাহা অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর হ্রাস বশতঃ মানবদিগের শক্তির অল্পতরতা বিবেচনা করিয়া অধীত গ্রন্থের সারসঙ্কলনপূর্ব্বক চতুঃসহস্র শ্লোকাত্মক সংক্ষিপ্ত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। (১) প্রদর্শিত গ্রন্থের দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে,—ভগবান্ মনু প্রথমতঃ ধর্ম্মপ্রতিপাদক যে সুবৃহৎ সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই সমস্ত স্মৃতিসংহিতার মূল। তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী মুনিঋষিগণ অধীত মনুসংহিতাকে উপজীব্য করিয়া আবশ্যক মত দেশভেদে এবং কালভেদে ব্যবস্থার জ্ঞাপক প্রভৃতি সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ মনুর গ্রন্থ কোন্ দেশে রচিত হইয়াছিল, সংহিতায় তদ্বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় না। মনোযোগের সহিত উক্ত মনুসংহিতা পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উহা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের এবং জ্ঞানকাণ্ডের সংক্ষিপ্তাংশের সার সঙ্কলন মাত্র।

---

(১) ইহ হি ভগবান্ মনুঃ প্রথমং সর্ব্বভূতানুগ্রহার্থমাচারব্যবস্থিতিহেতুভূতং শাস্ত্রং চকার। যত্র লোকসৃষ্টের্ভূতপ্রবিভাগঃ সদ্দেশপ্রমাণং পর্যবেক্ষণং বেদবেদাঙ্গযজ্ঞবিধানমাচারে ব্যবহারঃ কণ্টকশোধনং রাজবৃত্তং বর্ণাশ্রমবিভাগো বিবাহন্যায়ঃ স্ত্রীপুংসবিকল্পোদায়ানুক্রমঃ শ্রাদ্ধবিধানং শৌচাচারবিকল্পো, ভক্ষ্যাভক্ষ্যলক্ষণং বিক্রেয়াবিক্রেয়মীমাংসাপাতকভেদাঃ, স্বর্গনিরকানুদর্শনং, প্রায়শ্চিত্তাদ্যুপনিষদোরহস্যস্থানানি। এবং চতুর্ব্বিংশতিপ্রকরণানি। তদেতদ্বত্র শ্লোকশতসহস্রেণ সাক্ষীভিনাধ্যায়সহস্রেণ চ ভগবান্ মনুরুপনিবধ্য দেবর্ষয়ে নারদায় প্রাযচ্ছৎ। স চ তস্মাদধীত্য মহত্ত্বান্নায়ং গ্রন্থঃ সুকরো মনুষ্যৈরবধারয়িতুমিতি দ্বাদশভিঃ সহস্রৈঃ সঙ্কিক্ষেপ, তঞ্চ মহর্ষয়ে মার্কণ্ডেয়ায় প্রাযচ্ছৎ। স চ তস্মাদধীত্য তথৈবায়ুঃশক্তিমপেক্ষ্য মনুষ্যাণামষ্টভিঃ সহস্রৈঃ সঙ্কিক্ষেপ, তঞ্চ সুমতয়ে ভার্গবায় প্রাযচ্ছৎ। সুমতিরপি ভার্গবঃ [illegible] ক্ষীণায়ুষাং মনুষ্যাণাং শক্তিমল্পতরাং বিবেচ্য চতুর্ভিঃ সহস্রৈঃ সঙ্কিক্ষেপ।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলাদেশে অবস্থানকালে সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদীয় সংহিতার উপক্রমেই ইহা কথিত হইয়াছে। (১০) তিনি কণ্ঠোক্তির দ্বারা বিংশতিসংখ্যক ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তার নামনির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসর্ব্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খ-লিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মিতাক্ষরাটীকায় লিখিত আছে যে, উক্ত বিংশতিজন মাত্রই ধর্ম্মবক্তা নহেন; ইহাঁদের নাম কেবল প্রদর্শনার্থ উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষিগণও ধর্ম্মবক্তা ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও আপত্তি হইতে পারে না। (১১)

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার অপরার্ক টীকায় ছত্রিশজন স্মৃতিকর্ত্তার নাম কথিত হইয়াছে, এবং এই বিষয়ের প্রমাণরূপে ভবিষ্য পুরাণোক্ত গুহ্যকেশ্বর-বৃত্তান্ত উপন্যস্ত হইয়াছে, এবং স্মৃত্যন্তর হইতে ছত্রিশ ঋষির নাম সংগৃহীত হইয়াছে।

ষট্‌ত্রিংশ মত।

(১২) অনেক বিষয়ে উক্ত ছত্রিশজনের ঐকমত্য বিবেচিত হওয়ায়, ছত্রিশজনের ঐকমত্যজ্ঞাপক বচনাবলী "ষটত্রিংশন্মত" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। (ষটত্রিংশন্মত পুস্তক এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই; উক্ত পুস্তকসম্বন্ধে আমরা গুরুপরম্পরায় যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, তাহাই এ স্থলে নিবদ্ধ করিলাম; প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক বচনেই ছত্রিশ জনের ঐকমত্য আছে কিনা, তাহা মূলসংহিতা না দেখিলে বলিবার উপায় নাই) অতি প্রাচীন কালেই ষট্‌ত্রিংশন্মত সঙ্কলিত হইয়াছিল।

---

(১০) মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্রঃ কথং ধ্যাত্বাব্রবীন্মুনীন্।

(১১) নেয়ং পরিসংখ্যা কিন্তু প্রদর্শনার্থমেতৎ। অতো বৌধায়নাদেরপি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তৃত্বমবিরুদ্ধম্।

(১২) অতএব ভবিষ্যপুরাণে গুহ্যকেশ্ববাক্যে স্মৃতয়ঃ ষট্‌ত্রিংশদেবাভিহিতাঃ—"মন্বাদি স্মৃতয়ো যাস্তু ষট্‌ত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ। তাসাং বাক্যানি ক্রমশঃ সমাসেন ব্রবীমি তে"। তাশ্চ —মনুবিষ্ণুযমদক্ষাঙ্গিরোঽত্রিবৃহস্পত্যুশনাপস্তম্ববশিষ্ঠকাত্যায়নপরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতসম্বর্ত্তগৌতম-পাতাতপহারীতযাজ্ঞবল্ক্যপ্রচেতোবুধদেবলসোমজমদগ্নিবিশ্বামিত্রপ্রজাপতিনারদপৈঠীনসিতাসহ-

বিদেশী গল্প।

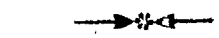

(সুইডিস উপকথা।)

(২)

পরদিন রাজার দ্বিতীয়া কন্যাকে সয়তানের হাতে সঁপিবার পালা। প্রজারা আবার দুঃখের সাগরে ডুবিল। কেহ কেহ মনে করিতে লাগিল, দরজী যখন বড় রাজকন্যাকে রক্ষা করিয়াছে, তখন রাজার এই মেয়েটিও এ বিপদে রক্ষা করিতে পারিবে। এখন দরজীই সকলের আশা ভরসার ঠাঁই। দরজীও মুখে খুব বীরত্ব দেখাইতে ও বড়াই করিতে ছাড়িল না।

মধ্যমা রাজকন্যা সাগরকূলে চলিলেন, নগরের লোক দলে দলে তাঁহার পিছু পিছু গেল। রাজার মেয়ে জলের কিনারায় আসিয়া বালির উপর বসিয়া পড়িলেন, বসিয়া বসিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। দরজীটা পূর্ব্বদিনের মত গাছে উঠিয়া লুকাইয়া রহিল।

এদিকে পাকশালার যুবা চাকরটি সরদারের কাছে গিয়া বলিল,—"কর্ত্তা যদি হুকুম হয় ত সহরে গিয়া একটু আমোদ করিয়া আসি, কাল সহরটা দেখা হয় নাই বলিলেই হয়।"

সরদার সূপকার বলিল, "দরজী যদি আজও সয়তানের সঙ্গে লড়াইয়ে কালিকার মত জিতে ত সন্ধ্যার পর প্রকাণ্ড ভোজ হইবে, ভোজের আয়োজনে আমার সঙ্গে পিঠে থাকিয়া কাজ করে, এমন দ্বিতীয় মানুষ আর নাই। যাও, সহরে আমোদ কর গিয়া, কিন্তু বেশীক্ষণ বাহিরে থাকিও না।"

কর্ম্মকারের পুত্র তখনই গিয়া সেই একমণ ওজনের ঝক্‌ঝকে তরোয়াল খানি খুঁজিয়া আনিল। আবার একটা জামা গায় দিল, তাহার পর একেবারে সমুদ্র মুখে চলিয়া গেল।

দরজীর পো তাহাকে আসিতে দেখিয়া মনে মনে ভারি খুসী হইল। কিন্তু কামারের ছেলে তাহাকে যেন দেখিয়াও দেখিল না। সে অতি নম্রভাবে রাজকুমারীকে নমস্কার করিল। তাহার পর বলিল, "সুন্দরী, তুমি একাকিনী এখানে বসিয়া রহিয়াছ কেন, কি দুঃখেই বা কাঁদিতেছ?"

উত্তর প্রত্যুত্তর পূর্ব্বেকার মতই হইল। রাজকন্যার কথায় যুবাপুরুষ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সেই দরজীটা গাছে চড়িয়া ঠায় বসিয়া আছে। সে একটু হাসিয়া বলিল, "যে বীরবরের আসনটি অত উপরে, তাহার উপর খুব বেশী নির্ভর করিতে নাই। তুমি যদি আমার চুল চিকাইয়া দিতে রাজি হও, আমি তোমায় রক্ষা করিতে পারি।"

কথাটা শুনিয়া রাজকন্যার বড় রাগ হইল। কিন্তু এ যে ঘোর বিপদ, মান অপমান বিচারের সময় কৈ? কাজেই রাজকন্যা রাজি হইলেন। তখন তিনি বাহিরে একটু মিষ্টভাব দেখাইয়া কর্ম্মকারপুত্রের চুল চিকাইয়া দিতে লাগিলেন। দরজীটা গাছে বসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। কিন্তু রাজার মেয়ে যে কখন তাহার ঘাগরীর একটা কাল রেশমী ফিতা খুলিয়া লইয়া সেই বীরপুরুষের চুলের গোছায় জড়াইয়া দিল, তাহা সে দেখিতে পাইল না।

তখন পূর্ব্বের মত সমুদ্রের জল তোলপাড় করিয়া একটা ভয়ানক সয়তান জল ঠেলিয়া উঠিল—তাহার তিন জোড়া মাথা!

হুম্ হুম্ ওম্ গুম্ শব্দে চারিদিক কাঁপাইয়া সাগরি সয়তান বলিল,—"যে রাজকন্যাকে আমাকে দেবার কথা, সে কোথায় রে?"

"তিনি এখানেই আছেন, তুমি আরও কাছে সরিয়া এস, তোমার সঙ্গে গোটা কয়েক কথা আছে।"

"কি! তুই একটা ক্ষুদে মানুষ, তুই আমার সঙ্গে লড়্‌বি?"

"আমি ত সেইজন্যই এসেছি।"

যুবা তৎক্ষণাৎ তরোয়াল টানিয়া বাহির করিল এবং তীরের মত ছুটিয়া গিয়া সয়তানের উপর পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তার ছয়টা মাথা খসিয়া সাগরের জলে পড়িল।

নিস্তার পাইয়া রাজকুমারী আনন্দে বীরপুরুষকে রাজবাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু কর্ম্মকারপুত্র পূর্ব্বের মত উত্তর দিয়া পাকশালে চলিয়া গেল।

বিপদ কাটিয়া গেল। দরজীবীর গাছ হইতে পূর্ব্বের মত তরোয়াল ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাজকন্যাকে বলিল—"দিব্য করিয়া বল, রাজবাড়ীতে গিয়া আমাকেই তোমার উদ্ধারকর্ত্তা বীর পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিবে। নহিলে তোমার নিস্তার নাই।" প্রাণের দায়ে রাজকন্যা তাহা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। রাজপুরীতে তখন সেবারের মত আবার উৎসব হইল।

আগেকার ভোজের চেয়ে খুব একটা জাঁকাল রকম ভোজ হইল। সকলেই দর্জ্জীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

তৃতীয় দিনে রাজার ছোট মেয়েকে সয়তানের হাতে সমর্পণ করিবার কথা। তাই রাজবাড়ীতে আবার চোখের জলের বন্যা বহিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই। ঠিক সময়ে রাজকুমারী প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। প্রজারা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রের ধারে লইয়া গেল। একে একে সকল লোক চলিয়া গেল, রহিল কেবল সেই দরজী। কিন্তু দরজীও আর দাঁড়াইল না, সে দৌড়িয়া গিয়া চট্ পট্ গাছে উঠিয়া, গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালের পাতার রাশির ভিতর লুকাইল।

ও দিকে সরদার পাচকের চাকর সেই কর্ম্মকারপুত্র তাহার মনিবের কাছে আবার ছুটী চাহিল, বলিল, "আজিই শেষ, আর সহর দেখিবার জন্য ছুটি চাহিব না।" সরদার পাচক তাহার কথায় অসম্মত হইতে পারিল না। বলিল, "যাও বেড়াইয়া এস গে, কিন্তু খুব বেশী বিলম্ব করিও না। আজ যদি দরজী সয়তানের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতিতে পারে ত রাজবাড়ীতে একটা অসাধারণ ভোজ হইবে।"

কর্ম্মকারপুত্র তখন তাহার সেই পেণে দুইমণী তলোয়ারখানা লইয়া আসিল। তরবারিটি হাতে তুলিতেই যেন কিছু হালকা ঠেকিল। তখন সে মনে মনে বলিল,—"ভগবান্ করুন যেন যুদ্ধে মরিয়া না যাই, যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারি।"

এই বলিয়া সে তরোয়ালখানা কোমরে বাঁধিয়া, আর একটা জামা পরিয়া, সাগরকূলে চলিয়া গেল।

দরজীটা গাছ হইতে বীরপুরুষকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইল। কর্ম্মকারপুত্র খুব শিষ্টভাবে কুমারীকে নমস্কার করিয়া বলিল, "রূপবতী, তুমি এখানে বসিয়া আছ কেন, চোখের জলে তোমার বুক ভাসিয়া যাইতেছে কেন?"

উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রথম দুই বারের মতই হইল।

রাজকন্যার কথায় যুবক মুখ উঁচু করিয়া একবার গাছের দিকে চাহিল, হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল "রাজকুমারি, অত উপরওয়ালা বীরপুরুষকে ছেড়ে আমার মত ছোটখাট লোককে যদি বিশ্বাস কর, আর আমার চুল চিকাইয়া দিতে সম্মত হও ত আমি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।"

এই যুবা বীরপুরুষের সুন্দর মূর্ত্তিটি দেখিয়া রাজকন্যা মোহিত হইল। সে বলিল "তুমি যা বলিবে আমি তাই করিব।"

তখন বীরযুবা রাজকুমারীর কোলে মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল। রাজকন্যা তাহার কাল চুলের গোছাগুলি আঙ্গুল দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। ঐরূপ করিতে করিতে হঠাৎ তাহার ভগিনীদের বাঁধা ফিতা দুইটি তাহার চোখে পড়িল। তখন সে আপনার ঘাগরা থেকে একটী লাল ফিতা টানিয়া লইয়া যুবকের চুলের গোছায় বাঁধিয়া দিল।

এই সময়ে সমুদ্রের ভিতর হইতে একটা ভয়ানক শব্দ হইল। যুবা বলিল,—"আর শুয়ে থাকা চল্‌বে না। রাজকুমারি, আমাকে তোমার ওড়নাটি দাও ত, কাজ আছে।" রাজকন্যা ওড়না খুলিয়া দিলেন, কর্ম্মকারপুত্র সেটাকে ছিঁড়িয়া বারটা টুকরা করিল।

দেখিতে দেখিতে জল তোড়পাড় করিয়া একটা ভীষণ মূর্ত্তি সয়তান দেখা দিল। তার বারটা মাথা!

সয়তান হাঁকিয়া বলিল—"আমার কাছে যার আসিবার কথা, সে রাজকন্যা কৈ?" সে হুঙ্কারে আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র যেন কাঁপিয়া উঠিল।

যুবক কহিল "এখানেই আছেন। তুমি আরও খানিকটা এগিয়ে এস,—আমি তোমার সঙ্গে গোটা কয়েক কথা বলিব।"

সয়তান গর্জ্জিয়া বলিল, "আরে ক্ষুদে বেটা, মনে ভেবেছিস্ আমার ভাইদের মত আমাকেও তুই প্রাণে মারিবি,—না?"

যুবাপুরুষ সদর্পে বলিল "তোকে মারিতেই ত এসেছি। এই বলিয়া সে সয়তানটার উপর গিয়া পড়িল এবং এক কোপে তার বারটা মাথাই কাঁধ হইতে নামাইল। কিন্তু এই সয়তানটা যাদু বিদ্যা জানিত, তাই তার কাটা মুণ্ডগুলা জলে পড়িতেই জল হইতে উঠিয়া আবার কাঁধে জোড়া লাগিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া কর্ম্মকারপুত্র রাজনন্দিনীকে ডাকিয়া বলিল,—রাজকন্যে, এক কাজ কর, আমি এই পাপটার মাথা কাটিয়া ডাঙ্গায় ফেলিবা মাত্র তুমি তার কাটা মাথা জীয়ন্ত হইতে না হইতে তার কাটা মুণ্ডের তলার উপর ওড়নার একটা টুকরা চাপা দাও।"

কর্ম্মকারপুত্র তখন এমন কায়দা করিয়া লড়িতে লাগিল যে, সয়তানের মাথাগুলা জলে না পড়িয়া টিপ্ টিপ্ করিয়া ডাঙ্গায় পড়িতে লাগিল আর রাজকন্যা ঐ কাটামুণ্ডের কাটা জায়গায় ওড়নার টুকরা চাপা দিতে লাগিল। এমনই

করিয়া যখন সাতটা মুণ্ড কাটা গেল, অষ্টম মুণ্ডে তরোয়াল পড়িতে আর বিলম্ব নাই, তখন সয়তানটা নরম হইয়া "রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। বলিল, আমি রাজকন্যা চাই না, আমাকে ছাড়িয়া দেও।"

যুবক বলিল "তোমাকে জীয়ন্তে ছাড়িব না, লড়াইয়ে আমারই জিত।"

যুবকের তরোয়ালখানা আবার ঝকমক করিয়া উঠিল, আবার দুম্ দুম্ করিয়া ডাঙ্গার উপর মুণ্ডপাত হইল, আবার রাজকুমারী কাটা মাথার কাটা গায়ের উপর ওড়নার টুকরা গুলি সাজাইয়া দিল। শেষ মাথাটা মাটীতে না পড়া পর্য্যন্ত কি কর্ম্মকারপুত্র, কি রাজকন্যা কেহই একটু থামিল না।

যখন যুদ্ধ ফুরাইল, রাজকুমারী আনন্দে উচ্চরবে বলিল—"আঃ রক্ষা পাইলাম!" তার পর রাজকুমারী শতমুখে বীরপুরুষের ধন্যবাদ করিল, কত মিষ্ট কথায় সাধিয়া সাধিয়া উদ্ধারকর্ত্তা বীরকে রাজবাটীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বীরপুরুষটি কিছুতেই টলিল না। সে বলিল, "এই একটা তুচ্ছ কাজের কথা বার বার মুখে আনিও না।" এই বলিয়া সে রাজকন্যাকে আদর করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। তখন সেই দর্জ্জিটী গাছ হইতে নামিল। রাজকন্যার কাছে আসিয়া ঝনাৎ করিয়া তরোয়াল খানা বাহির করিয়া তাহাকে শাসাইয়া বলিল, যদি রাজবাড়ীতে গিয়া আমাকেই তোমার উদ্ধারকর্ত্তা না বল, তা'হলে এখনই তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

রাজকন্যা তাহার কথায় সম্মত হইলেন না, যে বীরপুরুষ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রাণ দিতে গিয়াছিল, তাঁহার প্রতি রাজকন্যার অনুরাগ জন্মিয়াছিল।

কিন্তু অবশেষে রাজকন্যাকে প্রাণের দায়ে দরজীর কথা শুনিতে হইল। তখন দুইজনে মিলিয়া রাজবাড়ীর দিকে চলিল। রাজকন্যার মন তখন দুঃখে ভরা—সে মাথা হেঁট করিয়াই চলিল।

রাজকন্যা ফিরিয়া আসাতে রাজার আদেশে পুরীতে মহাভোজের আয়োজন চলিতেছিল। কিন্তু রাজা যখন দেখিলেন, অতিথিদিগের আহারের সময় হইয়াছে, অথচ ভোজঘরে আহারের দ্রব্য সম্ভার নাই, তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি ছোট মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভিতরে গিয়া দেখে এস ত মা, পরিবেশনে এত দেরি হইতেছে কেন?" রাজকন্যা পাকশালায় চলিয়া গেলেন। সেখানে সরদার সূপকারের মুখে শুনিলেন, তাহার সহকারী পাচক কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সে

একাকী সমস্ত রান্না রাঁধিতেছে, তাই দেরী হইয়াছে।" রাজকন্যা পাকশালা হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে পথে একটী যুবাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। লোকটা পাকশালার পরিচারক। তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল সে যেন রাজকন্যাকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। আর পাছে রাজকন্যার চোখে পড়িতে হয় এই ভয়ে সে যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। রাজকন্যা ভাল করিয়া তাহার মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সব কথা মনে পড়িয়া গেল। হাঁ এই বীরপুরুষই ত নিজের প্রাণ দিয়া তার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। রাজকন্যা তখনই ঐ সুসংবাদটি তাহার ভগিনীদের শুনাইবার জন্য চলিয়া গেলেন। যখন তিন বোনে মিলিয়া গোপনে এই কথার আলোচনা হইতেছিল। তখন হঠাৎ আড়াল হইতে রাজাও কথাটা শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া রাজার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি রাজকুমারীদের বলিলেন, "তোমরা সব কথা আমাকে খুলিয়া বল।" ছোট রাজকুমারী পিতাকে আগাগোড়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। বড় রাজকন্যা দুইটীর কথার সহিত তাহার কথার মিল হইল। তখন রাজা বৃত্তান্তটা আরও ভাল করিয়া জানিবার জন্য পাকশালের সেই যুবাপুরুষটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজার কাছে যাইতে হইবে শুনিয়া কর্ম্মকারপুত্রের প্রথমে বড় ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু রাজার হুকুম লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য? কর্ম্মকারপুত্র যখন রাজপ্রাসাদে গেল, তখন রাজা সভাসদ ও পারিষদ্ দিগকে লইয়া মজলিস করিয়া ভোজে বসিয়াছেন। বীরচূড়ামণি দর্জ্জী স্ফূর্ত্তিপূর্ণ মূর্ত্তিতে রাজার দক্ষিণ দিকে বসিয়া আছেন। কিন্তু কর্ম্মকার পুত্রকে দেখিয়াই তাহার মুখখানা শুকাইয়া গেল। এ যে সেই সয়তানবিজয়ী বীর! যুবার দিকে ফিরিয়া রাজা মেঘের মত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যিনি আমার কন্যাদের সয়তানের হাত থেকে রক্ষা করিয়াছেন, তুমিই কি সেই বীর!"

যুবাপুরুষ বলিল, "মহারাজ, আমার কথা কে বিশ্বাস করিবে, সকলেই বলিবে দর্জ্জী রাজকন্যাদের উদ্ধার করিয়াছেন।"

রাজকুমারীরা এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"না—কখনই না। তুমিই আমাদের উদ্ধার করেছ, তুমি যখন আমাদের কোলে মাথা রেখে শুইয়া ছিলে, তখন আমরা তোমার চুলের গোছায় ফিতা বাঁধিয়াছিলাম। ঐ ত ৫৮ তিনটি ফিতা! এই বলিয়া তিনটি রাজকুমারী কর্ম্মকারের বীরপুত্রের নিকট দৌড়িয়া গেল, তাহার মাথা নোয়াইয়া চুলের গোছায় বাঁধা ফিতা তিন গাছি বাহির করিল

তখন আর কোন কথা ছাপা রহিল না। সকলেই সব বুঝিল। তখন রাজা বলিলেন :—তুমিই যখন রাজপুত্রীদিগের উদ্ধারকর্ত্তা, তখন এই বীরোচিত কার্য্যের পুরস্কার তোমারই প্রাপ্য। আমি ছোট রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজ্য তোমাকে দিলাম।”

রাজার এই ঘোষণার পর, সকলেই মহানন্দে ভোজ খাইতে আরম্ভ করিল। কর্ম্মকারপুত্র রাজার ডান দিকে ঠাঁকিয়া বসিল। দরজীটা যে কোন্ ফাঁকে সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা কেহ টেরও পায় নাই।

প্রকৃতির প্রতি।

মুক্ত বাতায়ন পাশে নিঃশব্দে একলা বসি' আজ,
প্রকৃতি লো, হেরিতেছি তব ওই অপরূপ সাজ!
নিবিড় কুন্তলদাম স্তরে স্তরে দূর নভঃ বুকে
কি আনন্দে প্রেমময়ী বিস্তারিয়া দিয়াছে কৌতুকে!
অলক স্তবকে ওই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক সমীরণ
আত্ম-হারা ক্রীড়াসক্ত ফুলদলে ভ্রমর যেমন!
মন্দির-পরশে তার রবিশশী গ্রহতারা-গণ
যেন কি সুপ্তিতে ডুবি' হেরিতেছে সুখের স্বপন!
সদা-হাস্যময়ী অয়ি, আজি কি করেছ অভিমান,
অশ্রুসিক্ত চারু আঁখি সুগম্ভীর সুস্মিত বয়ান!
প্রেমের পীযূষধারা বিশুষ্ক হৃদয়ে বসুধার
কি মহা জীবনী-বন্যা অলক্ষিতে করিছে সঞ্চার!
নব কিশলয়ে আজি তব পূত শ্যামল অঞ্চল
শোভিতেছে—ঝলকিছে মণিমালা ফুল্ল ফুল ফল!
চরণপঙ্কজ কার স্নেহভরে করিতে স্থাপন
শূন্য-ক্ষেত্রে কি বিচিত্র শ্যাম-শয্যা করেছ রচন!
সমীরের মৃদু স্পর্শে গাঢ়তম প্রেম-আলিঙ্গনে
কি তরঙ্গ জেগে উঠে সাধ যথা মনুষ্য-জীবনে!

উচ্ছ্বসিতা তটিনীর 'কল'-স্বনে মিলাইয়া তান,
কবি বিশ্বমনোরমা, আজি তুমি কি গাইছ গান!
সারা অঙ্গে উথলিছে যৌবনের উদ্দাম লহরী,
এ কার পূজার অর্ঘ্য অয়ি প্রিয়ে, অয়ি লো সুন্দরি!
একি লীলা একি খেলা বুঝিতে যে নাহি পারি কিছু,
সৌন্দর্য্য উথলি উঠে সৌন্দর্য্যের শুধু পিছু পিছু!
কি অদৃশ্য শক্তিবলে সমগ্র হৃদয় মন মম,
করিতেছ আকর্ষণ তব পানে আজি নিরুপম!
একান্ত তোমার করি'এ বিপুল বসুন্ধরা মাঝ
বল, বল প্রাণময়ী, আমারে কিনিতে চাহ আজ!
এ দগ্ধ হৃদয়-জ্বালা —পরাণের তীব্র তৃষানল—
ও অক্ষয় প্রেম দানে করিবে কি স্নিগ্ধ সুশীতল!
এ ব্যর্থ-জীবনখানি আজি কিগো প্রেমভরে চুমি'
রচিবে কি চিরতরে সাফল্যের রম্য পীঠ ভূমি!
এ ভগ্ন বীণায় মোর যে সুর ফুটেনি সাধনায়,
যে গীতি জাগেনি কণ্ঠে বুকভরা শত আকাঙ্ক্ষায়,
সেই সুর সেই গান শিখাইয়া আমারে কি আজ
ভাসাইবে অফুরন্ত আনন্দের মহাসিন্ধু মাঝ!
লও তবে, লও তবে, অর্পিতেছি তোমারে আমায়,
তোমারি হাতের যন্ত্র আমি হব আজি হতে হায়!
গন্ধ যথা ফুলদলে সংগোপনে রহে লুকাইয়া,
তেমতি তোমার বক্ষে চিরদিন রব আমি প্রিয়া!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

"৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি।"

(প্রতিবাদ)

"৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি—* * * আমি তাঁহার প্রতি ভক্তির ভাব পোষণ করি * * এ অবস্থায় তাঁহাকে খর্ব্ব করিবার জন্য বর্ত্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই—বরং তিনি প্রকৃত যাহা ছিলেন, তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হউক"—ইত্যাদি ভূমিকা সহ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের একখানা পত্রে নিজের অভিমত সহ যে প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন ; উহা বিগত ১৩২৭ সালের পৌষ ও মাঘ সংখ্যার 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় পরমহংসদেব সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণার বিষয় অনুরুদ্ধ হইয়া উক্ত পত্রে বিবৃত করিয়াছেন। পত্রখানির তারিখ দৃষ্টে বুঝা গেল, ইহা দুই বৎসর পূর্ব্বের লেখা। "পরমহংস মহাশয়" সম্বন্ধে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভিমত মোটামুটী এই :—

(১) "রামকৃষ্ণ, পরমহংস নহেন। কারণ শাস্ত্রমতে যেরূপ অবস্থা হইলে পরমহংস বলা যায়, সে লক্ষণ তাঁহাতে আমি দেখিতে পায় নাই। তাঁহার পরমহংসের লক্ষণ যেমন ছিল না, তেমন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-ত্রয়েরও শাস্ত্রতঃ লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই—দণ্ডীও ছিলেন না। তবে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ব্যবস্থামতে তাঁহাকে 'অবধূত আশ্রমী' বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। অতএব আমার মতে তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণ অবধূত' বলাই উচিত।"

ইহার উত্তর এই—চূড়ামণি মহাশয় পরমহংসের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ উল্লেখ করেন নাই। আমরা জানি 'অবধূত' 'পরমহংস' ও 'স্থিতপ্রজ্ঞ' ইহার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া ইহার প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। পরমহংসগণ যে লিঙ্গ চিহ্ন বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা

সন্ন্যাসের লক্ষণ যে চূড়ামণি মহাশয়ের দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই; ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কেননা ঐ তিন আশ্রমই তিনি পর পর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। সন্ন্যাসী বলিয়াই তিনি মাতৃশ্রাদ্ধ করেন নাই। চূড়ামণি মহাশয় নিশ্চয়ই 'বিবেকচূড়ামণি' পাঠ করিয়াছেন, অতএব 'শঙ্করাচার্য্যের ব্যবস্থামত' পরমহংসের লক্ষণ তিনি উহাতে প্রচুর পরিমাণেই পাইয়াছেন; এবং একটু অবহিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবের আচরণের সহিত উহা মিলাইয়া লইলেই পারিতেন। সম্ভবতঃ স্বীয়মত ও ধারণাসম্বন্ধে চূড়ামণি মহাশয় সাধারণের নিকট যে পরিমাণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দাবী করেন; যদি সাধারণ অন্য কোন অভিজ্ঞ পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মত ও ধারণার প্রতি সেই পরিমাণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রদর্শন করে, তাহা হইলে আশা করি পণ্ডিত মহাশয় ক্ষুব্ধ হইবেন না। অতএব তাঁহার 'বিবেচনা' যদি সকলে মানিয়া না লয়, তাহা হইলে 'নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।'

(২) "ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে তোমার কোন চাপরাশ আছে কিনা"— আমাকে এতটুকু জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমি তাঁহাকে দেয় নাই। সুতরাং ঐ ভাবে আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, করেনও নাই, তিনি যে লেখাপড়া কিছু জানিতেন না এবং শাস্ত্রও পড়েন নাই, এ বিষয়ে তিনি বেশ ধারণা রাখিতেন এবং আমি যে তখন ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যথাশক্তি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছি, তাহাও তিনি জানিতেন। আমাকে তিনি নিতান্ত অপাত্র বা তাঁহার অনুচরগণের একতম বলিয়াও মনে করিতেন না; কাজেই আমাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।"

সুদীর্ঘ ৪২ বৎসর নীরব থাকিয়া "চাপরাশ আছে কি না?" ইহার প্রতিবাদ করিবার মূলে যে গোপনীয় কারণ আছে, তাহা জানিবার জন্য আমাদের কোন কৌতূহল নাই। তবে আশঙ্কা হয়, ঐ প্রশ্ন স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, (পরমহংসের শিষ্যগণ ব্যতীত) এমন ব্যক্তি এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও জীবিত আছেন; এ সংবাদ শুনিয়া চূড়ামণি মহাশয় লজ্জিত হইবেন। প্রশ্নটী এমন কিছু গ্লানিকর নহে, অথবা উক্ত প্রশ্নদ্বারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা লাঘব হইবারও কোন কারণ ছিল না। উদ্ধৃত দ্বিতীয় আপত্তিটী চূড়ামণি মহাশয় যে ভাষায়, ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত এখনো তাঁহার স্মৃতিশক্তি অব্যাহত আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ হয়। যিনি বিদ্যাসাগর, বৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুমল্লিক, [illegible]

করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই; তাঁহার পক্ষে চূড়ামণিমহাশয়কে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কেন সম্ভবপর হইবে না, অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পরমহংসদেবের কথা দূরে থাক্, তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেও কেহ পণ্ডিত মহাশয়কে 'অপাত্র' মনে করেন না, অথচ এক অমূলক আশঙ্কায় পণ্ডিতজী নিজেকে সুপাত্র প্রমাণ করিবার জন্য কেন অধীর হইলেন? আর ঐরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার পণ্ডিতজী তাঁহাকে না দিলেও, তিনি উহা এমন স্থান হইতে পাইয়াছিলেন, যেখানে পাণ্ডিত্যের স্পর্দ্ধা অভ্রভেদী হইয়া উঠিলেও, পৌঁছিতে পারে না। যাহা হউক পণ্ডিত মহাশয় এবং তাঁহার আমমোক্তার ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যে ভাবে অন্যান্য 'প্রত্যক্ষদর্শী'কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, আমরা সে ভাবে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া বৃদ্ধ বয়সে লজ্জা দিব না।

(৩) "তিনি কোন প্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং আধ্যাত্মবিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ববিষয় বা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয় বা তৎপ্রাপ্তিসাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না। * * * * সে সকল তত্ত্ব এত দুরূহ যে, রীতিমত দর্শন এবং উপনিষদ অধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরু উপদেশে তাহার ধারণা বা জ্ঞান বা তাহাতে কোন অনুষ্ঠান কদাপি হইতে পারে না।"

পাণ্ডিত্যের অন্ধ অহঙ্কার ও তৎপ্রসূত ঈর্ষা কেমন করিয়া বিচারবুদ্ধিকে অতি সহজেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এই-তৃতীয় সিদ্ধান্তটী তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে 'সাধারণব্যক্তি' প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ হাস্যকর ব্যবস্থাপত্রের অবতারণা করিতে পণ্ডিতজী একটুও সঙ্কুচিত হন নাই; ইহা আশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক। কেবলমাত্র শাস্ত্রপাঠেই ঐ সকল দুরূহ তত্ত্ব ধারণা হয় না, আমরা জানি। কিন্তু কেবলমাত্র গুরুউপদেশে ঐ সকল তত্ত্বের ধারণা সম্ভব, এবং হইয়াছে, এমন প্রমাণ শাস্ত্রে অবশ্য প্রচুরই আছে। দর্শন ও উপনিষদ অধ্যয়ন ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হয়, তবে 'হস্তামলক' সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর মত কি? এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ভূরি ভূরি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—নাই বা করিলাম। যদি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হয়, সে জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। পণ্ডিতজীও যখন শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই, তখন আমরাও করিলাম না। রীতিমত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যে সমস্ত পণ্ডিত আজও সংসারের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, শাস্ত্রমতে পঞ্চাশৎবৎসর বয়সের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন না করিয়া যিনি আরও সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সংসারের নানা সম্বন্ধ

জড়িত, তাঁহার নিকটও ব্রহ্মতত্ত্ববিষয় কোন মুমুক্ষু জানিবার আশা করেন না।

(৪) পণ্ডিতজীর মতে পরহংসদেবের সমাধি হইত না। যাহা হইত, তাহা নাকি, পণ্ডিতজীর এক শিষ্যেরও হইত—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। কেননা পরমহংস তো লেখাপড়া জানিতেন না; অতএব "যেখানে গিয়া নির্বীজ বা নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে পারে, সে সকল বিবরণ তিনি জানিতেনও না, সে সকল সমাধি হওয়ার সম্ভাবনাও তাঁহার ছিল না"—ইহাই পণ্ডিতজীর সিদ্ধান্ত। ইহাও তৃতীয় সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীকে যখন পণ্ডিতজী প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী ও অজ্ঞ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তখন আর যুক্তির আবশ্যক কি? 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'—অতএব তর্ক নিরর্থক। তবে পণ্ডিতজী রামকৃষ্ণের সমাধি সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা প্রকাশ না করিলেই ভাল করিতেন। মরণের প্রাক্কালেও দাম্ভিকতাটা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না—দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয়!

অপর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টীকাটিপ্পনিগুলির উত্তর দিতে ঘৃণা বোধ হয়। এত স্পর্দ্ধা, এত অসঙ্গতি, এত কুৎসিত প্রয়াস কেমন করিয়া সাহিত্যের অঙ্ক কলুষিত করিল? বঙ্গবাণীর এই পবিত্র মন্দিরপ্রাঙ্গণে এই ন্যাক্কারজনক আবর্জ্জনা নিক্ষেপের অপরাধে শ্রদ্ধেয় দিনেশবাবুর ভাষায় 'সাহিত্যের নৈতিক আদালতে বেত্রদণ্ড' পাইবার যোগ্য। বাঙ্গালার এই সব সনাতন পঙ্কিগণের কদর্য্য অভ্যাস ও প্রবৃত্তিগুলিও কি চরিত্রের মধ্যে সনাতন আসন পাইয়াছে? বিচক্ষণ সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের এই সমস্ত হীন চেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত ছিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংসসম্বন্ধে তিনিও সবিশেষ অবগত আছেন; এবং তিনি শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদর্শী। অতএব প্রতিবাদটা তাঁহার করাই উচিত ছিল।

ইতি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্বামী বিবেকানন্দ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

এই গেল ব্রাহ্মণের প্রতি পেটের ভাব (†) ক্ষত্রিয়ের প্রতি ভাব অন্যরূপ, বোধ হয় তাঁহার 'স্বজাতি' বলিয়া! পূর্ব্বোদ্ধৃত ৮নং পত্রেই আছে—" * * ক্ষত্রিয়েরা নাংসই খাক্, আর নাই খাক্, তাবাই হিন্দুধর্ম্মের ভিতর যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিস দেখ্‌তে পাচ্চ, তার জন্মদাতা। উপনিষদ লিখেছিল কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্ম উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা জাতিনির্ব্বিশেষে সবাইকে ধর্ম্মের অধিকাব দিয়েছেন আর যখনি ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখেছেন, তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন এই ভাব তাঁদের দেখা যাব। আহাম্মক, গীতা আব ব্যাসসূত্র পড় অথবা আর কাক-ঠেঁকে শুনে নাও। গীতাব মুক্তির রাস্তায় সকল নর-নারী সকল জাতি, সকল বর্ণের অধি-

---

† আমি 'পেটের ভাব' এজন্য বলিলাম যে, এই সকল উক্তি চিঠির মধ্যে লিখিত কথা,—বিবেকানন্দ তো ভাবেন নাই যে, এগুলি প্রকাশিত হইয়া "গুমর ফাঁক" করিবে। প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহের ভাবও আছে—মাদ্রাজেই কোনও এক সভায় বক্তৃবিশেষ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ জাতিকে শিক্ষাদান প্রথার দোষ প্রদর্শন করিলে স্বামীজি বলেন—এই প্রথার ভাল মন্দ দু'দিকই আছে। ব্রাহ্মণগণ হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান ও চিন্তা সম্পত্তির রক্ষকস্বরূপ। যদি তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে ও সমগ্র হিন্দুজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন বিঃ ৮৭৩ পৃষ্ঠা। অপিচ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে স্বামীজি যে সব উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রথার প্রচলন দ্বারা জাতিভেদের উচ্ছেদসাধন প্রধান কল্প হইলেও "তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা তাঁহাদের নিন্দা গ্লানি প্রচার করিতে নিষেধ করিতেন; কারণ তাঁহারাই এই বিদ্যাকে (অর্থাৎ সংস্কৃত বিদ্যাকে) রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এক্ষণে ভারতের কুত্রাপি সংস্কৃত বিদ্যার অস্তিত্ব থাকিত না।" বিঃ ৭৯৭-৮ পৃষ্ঠা। তবে ইহাও বক্তব্য যে, বিবেকানন্দের মতের স্থিরতা খুব কমই ছিল। ঈদৃশ অনেকগুলি পশ্চাৎ ভূরিশঃ প্রদর্শিত হইবে।

কার দিয়েছেন, আর ব্যাস গরীব শূদ্রদের বঞ্চিত করবার জন্য বেদের যকপোল-কল্পিত অর্থ করছেন।" (পত্রাবলী ১ম ভাগ ৪র্থ-৫০ পৃষ্ঠা) আবার সিষ্টার নিবেদিতা-প্রণীত স্বামীজির সহিত ভ্রমণকাহিনীতে আছে, তিনি "ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্বের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইতেন, ভারতের ইতিহাস কেবলমাত্র এই দুই জাতির সংঘর্ষের দৃশ্য, আর বলিতেন, ক্ষত্রিয়েরাই বারবার এদেশের লোকের শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। * * ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে তিনি দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার স্রোত বলিয়া চিত্রিত করিতেন—একটি চিরপ্রচলিত রীতি পদ্ধতি ও প্রাচীন আদর্শের গভীর খাতে ধীর সন্তর্পণ গতিতে প্রবাহিত। অপরটি ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত বিশ্বব্যাপী উদার দৃষ্টি লইয়া যুগ-যুগান্তরের লৌহনিগড় ভগ্ন করিতে উদ্যত এবং সামাজিক বিধানের প্রস্তর-স্তূপকে অপসৃত করিয়া তাহার স্থলে নূতন ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুৎসুক। তিনি বলিতেন—এটি একটি ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট ধারা যে রাম, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ সকলেই ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহই ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, আর ব্রাহ্মণের অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য ব্রাহ্মণত্বের প্রবল প্রতাপের প্রত্যুত্তর প্রদানের জন্যই জাত্যভিমান চূর্ণ করিবার বিরাট মুদ্গরহস্তে 'ক্ষত্রিয়দিগের উদ্ভাবিত' বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়। বিঃ ৮৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা।

বিবেকানন্দের এই সকল উক্তি তত্ত্বজ্ঞ পাঠক হয়তো "বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা" মনে করিয়া 'হাসিয়া উড়াইয়া' দেওয়াই যথেষ্ট মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমি এতদুপলক্ষে দু'চারটি কথা আলোচনাচ্ছলে না বলিয়া পারি না—ইনি লোকচক্ষে কিরূপ ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন, তাহা কতকটা দেখান সঙ্গত মনে করিতেছি।

হিন্দুধর্ম্মে যা কিছু মহৎ ও সুন্দর—তন্মধ্যে বুদ্ধকে এবং জৈনদের তীর্থঙ্কর দিগকে আনিয়াছেন; এরা কি প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দু'? এরা তো 'বেদ' না মানাতেই হিন্দু অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের বহির্ভূত।*

ব্রাহ্মণত্বের প্রভাবের উপর মুদ্গরাঘাত করিবার জন্যই যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়, তখন স্বামীজির মতে 'বুদ্ধ' অবশ্যই হিন্দুধর্ম্মের 'মহৎ ও সুন্দর' রূপে পরিগণিত হইবেনই। কিন্তু এই বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যে ভারতের অধঃপতন—এটাও স্বামীজিই বলিয়াছেন—

* পরন্তু স্বামীজি প্যারিস নগরীতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"বেদই হিন্দু ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তিভূমি।" (বিঃ ৯৬০ পৃষ্ঠা।

"বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মাংস ভোজনের প্রথা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। * * * আর এটাও ঠিক যে আমিষভোজন প্রথার অনাদর হওয়াতেই এদেশের লোকের শক্তি সামর্থ্য এত হীন ও জাতীয় অবনতি এত গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে।" ইত্যাদি (বিঃ ৩৩২ পৃ)।

"উপনিষদ লিখিয়াছিল কাহারা?" এই প্রশ্নের সঙ্গে যে সকল ব্যাপার জড়িত হইয়া পড়ে (যথা বেদের অপৌরুষেয়তা), ইত্যাদি), তাহা না-ই ধরিলাম। কিন্তু তিনি যে মনে করিতেছেন—এটা ক্ষত্রিয়দেরই প্রচারিত বিদ্যা—এ বিষয়েরই আলোচনা করিব। কোনও কোনও আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ শিক্ষা করিয়াছেন—এরূপ কাহিনী উপনিষদে আছে। পরন্তু তদ্বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাঁহার বেদান্ত 'লেক্‌চারে' কি বলিয়াছেন, দেখা যাউক। পঞ্চাল দেশের রাজা প্রবাহনের নিকট হইতে কিরূপে আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পঞ্চাগ্নি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই গল্পটি বিবৃত করিয়া পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহোদয় বলেন, "বৈদিক আখ্যায়িকার কিন্তু যাথার্থ্য নাই। অভিপ্রেত বিষয়ের উৎকর্ষখ্যাপনের জন্য আখ্যায়িকাগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত আখ্যায়িকার যাথার্থ্য স্বীকার করিলেও কেবল পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, উক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা এই মাত্র প্রতিপন্ন হইতে পারে। কেননা ঐ প্রশ্নবেণী ও তাহার উত্তরে (রাজা প্রবাহন কর্ত্তৃক) পঞ্চাগ্নি বিদ্যাই বিবৃত হইয়াছে। পঞ্চাগ্নি বিদ্যা কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা নহে। প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণেরা জানিতেন এবং উপদেশ করিতেন। ভূরি ভূরি আখ্যায়িকাতে ইহা পরিব্যক্ত রহিয়াছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত উদ্ধৃত হইল না।" শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোসিপের লেক্‌চার—২য় বর্ষ প্রথম লেক্‌চার ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা।

অতঃপর রাম ও কৃষ্ণের কথা।† শ্রীরামচন্দ্র গুরু বশিষ্ঠের নিকটে কিরূপ

---

* আমরা স্বামীজির নিজের কথাগুলিই নিজের প্রতিবাদ প্রদর্শনার্থে ইহা উদ্ধৃত করিলাম। এইরূপ অসঙ্গতি আরও দেখান যাইবে। আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ভারতের অধঃপতন হয় কারণে হইয়াছে মনে করি এবং সেটা সনাতন ধর্ম্মের শ্রীহীনতা—যেমন এই যুগেও ঘটিতেছে।

† শ্রীভগবান্ রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ রূপে ক্ষত্রিয়বংশে জাত হইয়াছিলেন বলিয়া যদি ক্ষত্রিয়ের শ্লাঘার কারণ হয়—তবে সর্ব্বাদৌ মৎস্য কূর্ম্ম-বরাহ শ্লাঘ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বামন পরশুরাম ও ভবিষ্যকল্কির কথাও বিস্মৃত হওয়া অনুচিত। তবে শেষের দু'জনের কথা ক্ষত্রিয়মন্য ম্লেচ্ছকল্প ব্যক্তির হৃৎকম্পকরী হইবারই সম্ভব।

উপদিষ্ট হইয়াছিলেন—যোগবাশিষ্ঠই প্রমাণ—হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মুনি কর্ত্তৃক সম্যক্ শিক্ষিত হন, এ কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র কোনও দিন ব্রাহ্মণ-বিরোধী তো হন-ই নাই। বরং অব্রহ্মণ্য কিঞ্চিৎ দমনার্থ যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নামগ্রহণে স্বামীজির সাবধান হওয়াই উচিত ছিল—আজ রাম-রাজত্ব থাকিলে সর্ব্বাদৌ স্বামীজিই (সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত, অন্ততঃ) দণ্ডকারণ্যের শূদ্র-মুনির দশাপ্রাপ্ত হইতেন! ধর্ম্মময় মহাক্রমের মূলরূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ পরিকল্পিত;—সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সেবা ভিন্ন তদ্বিরোধি কোনও কিছু কদাপি করিয়াছেন—এমন তো পুরাণেতিহাসে পরিদৃষ্ট হয় না। স্বামীজি ব্রাহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতার বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন; ব্রহ্মসূত্রের প্রথমেই 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' আছে—'অথ' এবং 'অতঃ' এর অর্থ স্মরণ করিবা স্বামীজি অসুবিধা বোধ করিতে পারেন সন্দেহ নাই, কেননা তাহা হইলে তাঁহার 'বেব্‌সা'ই যে মাটি হইয়া যায়। আর গীতায় কি সর্ব্ববর্ণের সমান ব্যবস্থা আছে? বরং ক্ষণিক বৈরাগ্যে মুহ্যমান হইয়া অর্জ্জুন তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়ায় তাঁহাকে ভগবান্ বারংবার তিরস্কার করিয়াছেন—এবং বহু জ্ঞানের কথা উপদেশ করিয়া "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" এই সিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমরে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—এই তো গীতার শিক্ষা। গীতায় কদাপি "সকলকে সকল রকম অধিকার" দেওয়া হয় নাই। এই গীতায়ই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ' সেই ব্যাসদেব এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বামীজি ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে পার্থক্যের আরোপ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে?

তার পর খাদ্যাখাদ্য-বিচার—স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচার সনাতন ধর্ম্মের আচারানুষ্ঠানের একটা মস্ত বিষয়—বিবেকানন্দ এটার প্রতি এত চটা যে, তিনি 'হাঁড়ি-ধর্ম্ম' 'ছুঁৎমার্গ' বলিয়া ইহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। এবিষয়ে শৈশবাবধিই তিনি স্বাধীন মতের পরিপোষক—ছেলে বেলায়ই মোসলমানের স্পৃষ্ট খাদ্য খাইতেন,

---

* দুই হাজার বছর পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাস কর্ত্তৃক পরিবল্লিত এক অশিক্ষিত মৎস্যজীবী নিজের 'বেব্‌সা' সমর্থন করিতে গিয়া গীতার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিয়াছিল—"সহজং কিল যে বিনিন্দিএ ন হু সে কর্ম্ম বিবর্জ্জনীয়ে" (সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ—গীতা)। ফলতঃ শাস্ত্রানুসারে স্ব স্ব জাতিগত আচার পালনেই ভারতের আপামর সাধারণ আবহমান কাল হইতে উপদিষ্ট হইয়াছে।

মুসলমানের হুকায় মুখ দিতেন—তাঁহার পিতাও যেন খাদ্যাখাদ্যবিচার কম করিতেন (বিঃ ২৭ পৃষ্ঠা) যৌবনের প্রারম্ভে ব্রহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখাইয়াছিলেন (বিঃ ১০২ পৃষ্ঠা) এবং কিয়ৎকাল পরে পরমহংসদেব কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া যতির বেশ অবলম্বন করিলেও আহারবিষয়ে 'সবলোট' ছিলেন। মেথরের ক'ল্কে নিয়ে তামাক খাওয়া (বিঃ ১৮৭ পৃষ্ঠা) হইতে মুচির প্রস্তুত রুটি খাওয়া (বিঃ, ৩৪৯ পৃঃ) এমন কি কয়েকদিন এক মেথর পরিবারে বাসকরা (বিঃ ৩৫৩ পৃষ্ঠা) পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। আর খাদ্য বিষয় এই মাত্র বলিলেই হইবে যে, মৎস্য মাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে, তিনি পূর্ব্বে যে গোমাংস পর্য্যন্ত ঋষিরা ভক্ষণ করিতেন, সে কথাটুকু না বলিয়া ছাড়িতেন না। (৩১২ পৃঃ ও ১০১১পৃ) বিশেষতঃ আমেরিকা ও ইউরোপে গিয়া আশা মিটাইয়া নির্ব্বিবাদে রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন ; অতএব ইঁহার নিকট হইতে আমরা খাদ্যাখাদ্য-স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচারের আর কি সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করিতে পারি ?

বিবেকানন্দ তো গীতার প্রশংসাবাদী ছিলেন। সেই গীতায় সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই ত্রিবিধ আহারবিচার রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায়ও তাঁহাদের মধ্যে বড় বড় লোক নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী ছিলেন। ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত জর্জ্জকুম্ব-লিখিত গ্রন্থের অনুসরণে "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে" আহারের বিচার করিয়া গিয়াছেন। সাহেবদের মধ্যেও নিরামিষাশী অনেক আছেন। ফল কথা খাদ্যাখাদ্য বিচার একটা সকল সমাজেই দেখা যায়। বিবেকানন্দের যেমন দস্তুর—এ বিষয়েও বিপরীত কথা অর্থাৎ খাদ্য বিচারের কথা—তাঁহার উপদেশমধ্যে দেখিতে পাই। পঞ্জাব ও রাজপুতানায় ভ্রমণকালে তিনি শিষ্য ও সঙ্গীদিগকে বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান্ হইতে এবং আমিষ আহার বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'আঠার ও বারো বছর নিরামিষাশী হইলে সিদ্ধ পুরুষ হওয়া যায়।' (বিঃ ৭৯৬ পৃষ্ঠা) যে-সে লোকের হাতে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ অর্থাৎ স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ পরমহংসের আচরণ দ্বারাও যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হয়। "ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাস্ জল রাখা হইয়াছিল। সে জল খাইতে পারিলেন না, আর এক গ্লাস্ জল আনিতে বলিলেন। পরে শুনা গেল যে, কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি এ জল স্পর্শ করিয়াছিল।" কথামৃত ১ম ভাগ ১৪২ পৃষ্ঠা। * এই যে স্পর্শদ্বারা শক্তিসঞ্চার বা রোগমুক্তি, যাতে স্বামীজিরও

* এইরূপ কথা আরো আছে—অনেক সময় পরমহংস দেব যাহার তাহার হাতে জল খাইতেন

বিশ্বাস ছিল—ইহার দ্বারাও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবাদ প্রমাণিত হয়। ফলতঃ সকল জীবেরই পরস্পর স্পর্শে ভালমন্দ ভাবের আদান প্রদান হয়—তবে অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ অনুসারে পরিমাণে তারতম্য হয় মাত্র। অধ্যাত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন না হইলে ইহা অনুভব করা সুকঠিন; কিন্তু তাই বলিয়া এটা উড়াইয়া দেওয়া অসঙ্গত।

এই বিষয়ে বিচারবিমূঢ়তার ফল আমরা একপ্রকার প্রত্যক্ষই দেখিতেছি—যত্র তত্র যা তা খাইয়া আমরা নিজে এবং আমাদের সন্ততিবর্গ যে কিরূপ অধোগতির পথে চলিয়াছে, আমাদের জীবনীশক্তি যে কিরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সমাজহিতৈষী মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন। "আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ;"—"প্রমাদাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রানজিঘাংসতি" এই যে মনুর বাক্য তাহার সত্যতা প্রমাণীকৃত হইতেছে। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রাচীন রীতিতে যাঁরা জীবন যাপন করিতেছেন—সেই অধ্যাপকগণ প্রায়শঃ নীরোগ ও দীর্ঘজীবী আর নব্য চালচলনে অভ্যস্ত হইতেছেন যাঁরা—তাঁরা অনেকে পীড়াগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। এই বিবেকানন্দই তার এক প্রমাণ। এমন সুন্দর সবল দেহ—যৌবনের মধ্যভাগেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িল—চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। পরমহংসের কৃপায় এবং বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের কিঞ্চিৎ পরিপালন সত্ত্বেও আচারব্যত্যয়ে বিবেকানন্দ অকালে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। † এই ছুৎমার্গ ব্যাপারেও যেন

না বা যাহার তাহার স্পৃষ্ট খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেন না। নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) মনে করিতেন ঊর্দ্ধ কুসংস্কার মাত্র, কিন্তু পরমহংস দেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—ঐ লোকগুলি বিশুদ্ধচরিত্র নহে। প্রথমে একথা নরেন্দ্রের তত বিশ্বাস হয় নাই; কিন্তু পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন, বাস্তবিকই লোকগুলি অতি হীনচরিত্রের।" বিঃ ১৩২ পৃষ্ঠায়।

* এই বিষয়ে প্রবন্ধান্তরেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছিল—ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" প্রবন্ধের প্রতিবাদে এই বিবেকানন্দেরই উক্তির অসমীচীনতা দেখান হইয়াছে—অনুসন্ধিৎসু পাঠক "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস ১৭-২০ পৃষ্ঠা" দেখিতে পাবেন, উহাতে জনৈক ইউরোপীয় ডাক্তারের পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উল্লেখ আছে।

† বিবেকানন্দের জীবনচরিতলেখকের কথায় প্রত্যয় করিলে বলিতে হয়, এই উন্মার্গগামিতার নিমিত্তে পরমহংসও কিয়ৎপরিমাণে দায়ী ছিলেন। তিনি নাকি বলিতেন "ও হচ্ছে আগুন, ওর স্পর্শে পাপ তাপ সব পুড়ে থাক্ হয়। ও যদি শোওর পরুও খায় কোন দোষ হইবে না।" (বিঃ ১৩৩ পৃঃ) ঐ পৃষ্ঠার ফুটনোটে আরো আছে:—ভগবদ্ভক্তির হানি হইবে বলিয়া পরমহংস দেব স্বয়ং নানা নিয়ম পালনপূর্ব্বক ভক্ত সকলকে তদ্রূপ করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। কিন্তু তিনিই আবার বলিতেন, নরেন্দ্র ঐ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে

বিবেকানন্দের শেষকালে উল্টাসুর দেখা গিয়াছে। মঠে এক কুকুর ঠাকুর পূজার জন্য আনীত জল নষ্ট করিয়া দেওয়ায় যে ব্রহ্মচারীর উপর উহার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাহাকে খুব বকিয়াছিলেন। [বিঃ ১০৭৩ পৃষ্ঠা]

স্বামীজির গুরু ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে এস্থলে পুনরপি কতকগুলি কথার আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়ের অবতার বলিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনিই স্বয়ং সাধনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য বস্তু এক এবং সেই এক বস্তুই ব্রহ্ম। এইটি একেবারেই কোনও অভিনব বিষয় নহে। শ্রীভগবান্ তো গীতায় "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" বলিয়া সমস্ত সাধকমণ্ডলীকেই আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন। মধ্যশতাব্দীতেও শ্রীশ্রীজগন্মাতা ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সর্ব্বদেবশক্তিকে স্বীয় শরীরে বিলয় করিয়া অসুরকে বলিয়াছেন—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা' পুষ্পদন্ত মহিম্ন-স্তোত্রেও বলিয়াছেন—"ত্রয়ীসাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি

প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শিবমন্দির দেবীমন্দির প্রভৃতিতে গিয়া বন্দনা করিয়া নৃত্যাদি করিয়াছেন। ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"ঐ সে কালীকৃষ্ণ শিবরাম সকল আমার এলোকেশী।"

ত্রিপুরার দেওয়ান রামদুলাল আরো দূর অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন,—

"জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজি॥

* * * * *

মগে বলে ফরাতারা গড বলে ফিরিঙ্গী বারা—মা
আল্লা ব'লে ডাকে তোমায় সৈয়দ পাঠান মোগল কাজী।" ইত্যাদি

কিন্তু তাহার কোনও প্রত্যবায় হইবে না। নরেন্দ্রের ভিতর জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা দোষকে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে, ইত্যাদি। নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) যদি একপই ছিলেন, তবে তো স্বামীজির ছুঁৎমার্গাদি কথা বলিতে অধিকতর সাবধান হওয়া উচিত ছিল; কেন না, সকলের ভিতর (এমন কি স্বয়ং পরমহংস ও তদীয় অন্যান্য ভক্তদের মধ্যেও যেন জ্ঞানাগ্নি তেমন তীব্রভাবে প্রজ্বলিত ছিল না। ফল কথা বিবেকানন্দের সঙ্গে পরমহংস [illegible] হইয়া সিদ্ধান্তিক হইয়াছেন—ইহা আমার [illegible]

এবং সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—

"একব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হবেছে পাজী॥"

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, এই সমন্বয়ের ভাব হিন্দুর ধর্ম্মে বরাবরই রহিয়াছে—দু'চার স্থলে অজ্ঞ বৈষ্ণব ও মূর্খ শাক্ত পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়াছে—তাও কবি রাশু রায় শেষটায় 'সমন্বয়' করিয়া দিয়াছেন।

এই 'সমন্বয়' দেখানের জন্য সাধনা, সুতরাং অনাবশ্যক ছিল। যাহা তখন আবশ্যক ছিল, তাহা সাকার-বাদের প্রমাণ—তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল প্রতিবাদ হইয়াছে—এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাধনা—উক্তি প্রভৃতি দ্বারা সনাতন সাধন-রীতি ও ধর্ম্মচর্য্যার সারবত্তা প্রমাণিত হইয়া উন্মার্গপ্রস্থিত অনেকের উপকার হইয়াছে। এসকল কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সার্থকতা এইখানেই—এবং এই জন্য তিনি আমাদের বরেণ্য।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিবাদ কেবল তাঁহারই দ্বারা হইয়াছে—একথাও মনে করা উচিত নহে। জ্বর প্রবল হইয়া খুব ঘর্ম্ম হইলে যেমন উপশমও আরম্ভ হয়—তেমনই যখন ১৮৭২ সালে কেশবসেনের তিন আইন পাস্ হইল, তখনই প্রতি-ক্রিয়া আরম্ভ হইল—সুপ্রসিদ্ধ আদি-ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতায় দেশে বিদেশে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। 'সোমপ্রকাশ'সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "হিন্দুধর্ম্ম ডুবিতেছিল—রাজনারায়ণ বসু তাহা রক্ষা করিলেন।" পুণ্যশ্লোক ভূদেব বলেন, "আমাদিগের দেশের চূড়ামণিস্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ ও সর্ব্বপ্রাধান্য প্রকটনপূর্ব্বক স্বাভিমত ব্যক্ত করায় অনেকানেক স্বল্পবিত্ত অপরি-ণামদর্শী অনুচিকীর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিব্যূহের ভ্রমভঞ্জন এবং মোহান্ধকার তিরো-হিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যে আনন্দোৎ-সব উচ্ছলিত হইয়াছে, তাহা বাক্যাতীত।"

বোধ হয় এই সময়েই হিন্দুমেলার'ও সৃষ্টি হয়—এবং তদ্দ্বারা স্বদেশে পূর্ব্ব

বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ—১৫২ পৃঃ। ভূদেব বাবু পরমহংসদেব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন—কৌতূহল তৃপ্ত্যর্থে উদ্ধৃত হইল। "ইনি অতি সরল ভাষায় হিন্দুমতবাদের যাহাসম্মত সামঞ্জস্য করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ তাঁহার নিজের জীবন-রিত হইতে বুঝিয়া যদি প্রকৃত তান্ত্রিকসাধনায় রাঙ্গালী ভক্তিপূর্ব্বক রত হয়, তাহা হইলে আবার সমাজমধ্যে একাগ্রচিত্ত, উদ্যমশীল, নির্ভীক, কর্ম্মী ও ধার্ম্মিক লোকের বৃদ্ধি অবশ্যই হইবে।"

গৌরবস্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইয়া লোকের 'মোহ' কাটিবার সহায়তা হইয়াছিল। এই প্রায় এই সময়েই থিয়োসফির দল ভারতে আসিয়া যোগ-মাহাত্ম্য প্রচারিত করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পরমহংসদেবের তথা বিবেকানন্দের ভক্তগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রচারিত গ্রন্থসমূহে এবং স্বামীজির বক্তৃতাদিতে গুরুশিষ্য উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিব।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতা পুত্রপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া ৺ কাশীতে বীরেশ্বর শিবের অর্চ্চনা করাইয়াছিলেন—নিজেও শিবের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। অতঃপর একদিন স্বপ্ন দেখিলেন "যেন যোগীন্দ্র শঙ্কর [বিঃ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পুত্ররূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।" (বিঃ ১০ ও ১১ পৃষ্ঠা) পুত্রের জন্ম হইলে তাই জননী নাম রাখিলেন 'বীরেশ্বর' (১২ পৃঃ)। এদিকে যখন বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে জন্য প্রথম বার † গিয়াছিলেন, তখন পরমহংসদেব (নরেন্দ্রের গান শুনিয়া পরে) 'হঠাৎ উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উত্তরের বারাণ্ডায় লইয়া গেলেন। ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া দরবিগলিত-ধারে অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে যেন বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে তোর পথ চেয়ে হাঁ করে বসে আছি তা কি একটি বারও মনে হয় নাই? বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার যে ঠোঁট পুড়ে যাবার মতন হয়েছে; এই কথা বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ

* ঢাকা দেওভোগের নাগ মহাশয়; (শেষ অবস্থায়) স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও বলিয়াছেন—"ম * জয় শঙ্কর জয় শঙ্কর সাক্ষাৎ শিবদর্শন হল।" (বিঃ ১১৮ পৃঃ

† ইহাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতলেখকের মত। শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গকার বলেন, এইটি দ্বিতীয় বারের সাক্ষাৎকার। (বিঃ ১০৭ পৃঃ ফুটনোট) অথচ উভয়েই স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছেন। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক ৺ রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়-কৃত পরমহংসদেবের জীবনচরিতে বিবেকানন্দসম্বন্ধীয় এই সব কথা নাই—অথচ তিনি (রামচন্দ্র বাবু) বিবেকানন্দের আত্মীয় ও শিশু অন্নে পালিত 'রামবাবা' ছিলেন (বিঃ ১০৬-৭)। [পরমহংসদেব শ্রীচৈতন্যকে হইতে বড় 'অদ্বৈত' (কেননা তিনি সর্ব্বাদৌ রামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলেন) এবং বিবেকানন্দ 'নিত্যানন্দ' ছিলেন। "ভারতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ" শীর্ষক একটি চিত্রে দেখিলাম—এই শ্রীচৈতন্য যেন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ সহ বিরাজমান—রামকৃষ্ণও রামানুজ এবং বিবেকানন্দ সহ সমাসীন। এইরূপে ৩৫ বৎসরের কাছাকাছি এই সম্প্রদায় কেহই বসুন বলেন নাই—বাগবাটীর নাটমন্দিরে রামকৃষ্ণমিশন সাধু বা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় 'মহাপ্রভুর' জন্মোৎসব হিন্দু নাই—কিন্তু পরমহংসদেব অবতারিত হইয়াছেন কি দেখা হইতেছে।]

[illegible] ইহা তাঁহাকে বুঝি [illegible] বলিলেন 'তবু আমি জানি তুমি কে।' [illegible] পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনারায়ণ, জীবের দুর্গতিনিবারণের জন্যই তাঁহার [illegible] হইয়াছে—ইত্যাদি।" (বিঃ ১০৭—৮ পৃঃ)। পরে আছে, নরেন্দ্রকে [illegible] (পরমহংস) প্রায়ই বলিতেন 'ও খাপখোলা তলোয়ার।' 'পুরুষ [illegible] ভেতরে।' 'ও অখণ্ডের (নিরাকারের) ঘর' 'সপ্তর্ষির একজন' 'নর [illegible] ঋষির নর' ইত্যাদি ইত্যাদি।" (বিঃ ১৩০ পৃষ্ঠা)। সপ্তর্ষির সঙ্গে [illegible] যে ছিলেন কি?—এবং একই ব্যক্তি নর (বা নারায়ণ) ও সপ্তর্ষি [illegible] কিরূপে হইতে পারে? আরও দেখুন: "পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন [illegible] অর্থাৎ বিবেকানন্দ যখন নিজকে জানতে পারবে ওকে তখনই দেহ ত্যাগ [illegible]।" (বিঃ ১৮৪ পৃঃ) অথচ বিবেকানন্দ যে জাতিস্মর ছিলেন, তৎসম্বন্ধেও [illegible] আছে; (গোপালদাদার বাগানে অবস্থান কালে, ১৮৯৭ অব্দে) "[illegible] স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা স্বামীজি, আপনি আপনার পূর্ব্ব [illegible] বিষয় জানেন?' তিনি উত্তর করিলেন—'হাঁ, নিশ্চয়ই।' কিন্তু যখন [illegible] তাঁহার যবনিকা উত্তোলন করিবার জন্য তাঁহাকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহ [illegible] পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন "আমি সবই [illegible] এবং ইচ্ছা করিলে আরো জানিতে পারি, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই [illegible]" (বিঃ ১০৫ পৃষ্ঠা) তিনি নিজের পূর্ব্ব কথা—তিনি যে কি—তাহা [illegible] তার পরেও পাঁচ বৎসর কাল দেহ ধারণ করিয়া গিয়াছেন। আবার [illegible] "স্বামীজির জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিয়াছিলেন যেন [illegible] উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আকাশের উত্তর পশ্চিম দিক [illegible] কলিকাতার উত্তরভাগে শিমলা পল্লীর দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া [illegible] বলিয়াছিলেন 'এইবার যে আমার কাজ করবে সে এল।' এবং উত্তর [illegible] ভারতের কোন সহরের সহিত তাঁহার আগমনের সম্বন্ধ আছে এইরূপ [illegible] দিয়াছেন। কে বলিবে সেই সহর ৺ কাশীধাম কি না?" বিঃ [illegible] পৃঃ—ফুটনোট।

[illegible] নরেন্দ্রের জন্ম ১৮৬৩—জানুয়ারী; অতএব জ্যোতির্দর্শন ১৮৬২ সালের [illegible]

[illegible] বলেন, দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই পরমহংসদেব স্বামীজিকে [illegible] বলিয়াছিলেন, কিন্তু কথামৃতে (৩য় ভাগের পরমহংসদেবের ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে) [illegible] ৩।৪ দিন। বিঃ ১৮৫ পৃষ্ঠা ফুটনোট। [পূর্ব্ব পাতার রাগ উদ্বিগ্ন ১০৭ পৃঃ [illegible] এই [illegible] দেখিয়া নিজ ভাষা পরের মুখে শুনুন।]

পাঠক—এপ্রিল মাসে হইবার কথা।—তখন কুমুদ্বতী কোন অবস্থায় ছিলেন পাঠক তাহা বিস্মৃত হন নাই। যাহা হউক, এই জ্যোতিঃ নরনারায়ণের স্থান বা সময় হইতে আইসে নাই—কেবল উত্তর পশ্চিমের নগর বিশেষের সংবাদ ছিল। এবংবিধ নানা প্রকার কথা পরমহংস [illegible] প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার প্রতি আপনাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কি পরিমাণে থাকিতে পারে—বুধ পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মা

প্রদীপ ও পতঙ্গ।

পতঙ্গ বাসিছে ভাল
নিরমল প্রদীপেরে।
দীপ ভাবে—কি জঞ্জাল
ওটা কেন আসে বারে?
পতঙ্গ পাগল হ'য়ে
প্রদীপের প্রেম আশে।
উ'ড়ে উ'ড়ে ক্লান্ত হ'য়ে
ঘোরে প্রদীপের পাশে॥
পাষাণে গঠিত নারী
তাই দীপ অভিমানে।
ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করি'
চাহিলনা পতঙ্গ পানে॥
প্রিয়ার বিরহে শেষে
জীবন ভাবিয়ে ছার।
পতঙ্গ আপন প্রাণ
দেয় তারে উপহার॥
রাক্ষসী প্রদীপ তাহে
দুঃখিতা না হয়ে মনে।
হাসি মুখে আনন্দেতে
পোড়ায় পতঙ্গে প্রাণে॥
হায়রে সংসার মাঝে
যাহারে পরাণ চায়।
সে কেন চাহে না ফিরে,
যদি এ কি হয় না?॥

শ্রীরাজকুমার সেন গুপ্ত।

গোপালাপিত।

বৈদ্যনাথধাম হইতে প্রায় এককোশ দূরে একটা ছোটগাঁট বাড়ী দেখা যায়। সেটী এত ছোট যে, কাহারও নজরে পড়ে না। এমনকি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক বড়মানুষ রোগী, যাহারা প্রতিবৎসর শরৎকালে 'ধাইসিস্' রোগ হইতে পরিত্রাণার্থে গার্ভ-যাসনে হাওয়া বদলাইতে আসেন, তাঁহারাও তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া বাটীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ, বাটীর সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা বটবৃক্ষ। এক পার্শ্বে একটা বকুল, অন্য পার্শ্বে একটী নারিকেল বৃক্ষ ডোবা, ও তাহার পাড়ে নিম্নবৃক্ষশ্রেণী।

বর্ষা বাঙ্গলার বটবৃক্ষ সেই অঞ্চলের পাখীর আড্ডা। যখন বর্ষাদিনে উচ্চ ভূমির জল গড়াইয়া ডোবা পরিপূর্ণ হইত, তখন কোনো অজানা প্রান্তর হইতে ছোট ছোট মোরলা, পুঁটি, ও চ্যালা মাছের নূতনরঙ্গ, বাৎসরিক লীলাখেলা করিতে কিছুদিনের জন্য আসিয়া জুটিত। সেই সময় শুল্ক পানকৌড়ী তাহার কসিয়া বক উড়িয়া আসিত। বকুল গাছে কাঠবিড়ালী বাসা করিত।

বাটী ছোট হইলেও, মালীর ঘর খুব বড়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সেটী "অউট হউস্" বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মালী একজন দীর্ঘাকৃতি গাঁওতাল। বাটীর তত্ত্বাবধান তাহারই করকমলে ন্যস্ত। মালীর চার্জে দুইটী পশুও ছিল। একটী গাভী ও একটি কুক্কুর।—নশ্বর সংসারে বৈরাগ্যযুক্ত মানবের স্থিরি সহচর! কুক্কুরের একটি ঘর। গাভীর আর একটি। এবং বৎসের আর একটি মাটীর "উপুড়ায়," সুতরাং গৃহস্থালীতে তাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না; সে কেবল কুক্কুরটি লইয়া বাটীর পাহারা দিত, এবং দরকার হইলে বটবৃক্ষের ফল খাইয়া পরমা রাখিত।

বাটীর মালিক কলিকাতায় এডিনবরো বাসিতেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও একটি কন্যা।

কুটীরের নাম "পর্ণকুটীর"। পর্ণের লেশ মাত্র ছিল না, তবে কুটীরের নাম পর্ণকুটীর কেন হইল, তাহা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তরে আমরা বলিব

দিব যে, কন্যার নাম পরী। কন্যাটি যখন ভূমিষ্ঠ হইল তাহার ভিতর [illegible] অবশ্য। কাহারও নাম একটা পশুর নামে রাখিলে পিতা তাহাকে সখ করিয়া 'পরি' বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মেয়েটিকে [illegible] পরী কিম্বা পরি,' কোনটির সঙ্গেই সাদৃশ্য ছিল না। 'গুহুহরে [illegible] চেহারা'। পরীর মা—জননী বলিতেন 'আমার মেয়ের মতো সুশ্রী মেয়ে [illegible] যায় না। শ্যামবর্ণ হলে কি হয়?' পিতৃদেব এই মন্তব্যে কোন অমত [illegible] করেন নাই, তবে মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন 'একটু ফর্সা হলে কতই ভাল হত'। পরীর পিতৃদেব গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। এখন পেন্সনভোগী। নাম অধরচন্দ্র বসু। তিনি সম্প্রতি বিবাহের পাত্রীনির্বাচন-সমস্যা সমাধানের ভার লইয়াছিলেন। পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে, উহার সঙ্গে প্রত্যেক পাত্রীর ফটোগ্রাফ সংলগ্ন, এবং প্রত্যেক ফটোগ্রাফের নীচে বিবাহে বরকর্তাদের সহিত কত টাকা কুথা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ, যেমন—

১। শ্রীমতী গিরিবালা—বয়স ১৩—গৌরবর্ণা—নাক উঁচু নয়—গোলালো গঠন—'রয়েল রিডার নং ৪ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। নিজের কচুরি ভাজিতে চমৎকার জানে। বর—শ্রী—বিত—চাকরি করে—দাবী ৫০০০৲—কুথা ২৩৯৩৲—বড়ি ও চেন সহিত।

২। শ্রীমতী বিমলা—বয়স ১৭—উজ্জ্বল শ্যাম। বড় বড় চুল। [illegible] কিন্তু নাক টিকালো। ঠোঁট পাতলা। গোটাকতক ইংরাজী কথা [illegible] ঈশ্বর বাবু—রেলওয়ে আপিসে প্রাক্টিকী—বয়স চল্লিশ—বেলা পাঁচটা ছেলেপুলের জনক—লাইফ ইন্সুর করা। দাবী ১৭০০৲।

এই রকম তিনশত 'কেস্' হইতে অধর বাবু গণনা করিয়া দেখিয়াছেন—

১। বেশী বয়সেরই 'ডিমাণ্ড' অধিক। এবং— Demand varies inversely as the Square of the girl's age—অর্থাৎ [illegible] অনুপাতে দাবী বিপরীতদিকে হেলিয়া পড়ে। কিন্তু তাহা কেবল—১৮ বৎসর পর্য্যন্ত।

২। চক্ষুর মধ্য হইতে নাক হইতে ১½ গুণ, এবং কাণের মূল হইতে ওষ্ঠের মধ্য (পাতলা হইলে) কাণের প্রায় সমান। পায়ের পাতার মাপ, গ্রন্থ প্রভৃতি, মাপান-সই হইলে মূল্যের অর্দ্ধেক।

৩। এই রকম Doctor হইতে পূর্ব্বদিকে বসিয়া কলিকে যাইতে [illegible] তাহাতে ১০০০৲ টাকা দিয়া শুধু করিলে বরপক্ষের [illegible]

বর। গৃহিণীর পছন্দ হইলে, সমর্থ পক্ষে, সেই কন্যার স্বর্ণ।

পছন্দ হইল যদি গৃহিণীর পছন্দ না হয়, তবে উভয়ের মতামতের Common ratio ধরিয়া যতটুকু দাঁড়ায়, তাহার $\frac{১৬}{১৭}$ অংশ দিলেই চলিবে।

মনে করুন—নাক, চক্ষু সম্বন্ধে বরকর্ত্তা ও তাঁহার গৃহিণীর মত এক, কিন্তু কাণ সম্বন্ধে তফাৎ। এমত স্থলে যদি সাধারণ Farmula কষিলে কন্যা-কর্ত্তার দেয় হইতে দাঁড়ায়, তবে মতভেদ স্থলে—

ধরি A = নাক × কাণ × চক্ষু

B = গৃহিণীর (কর্ত্তার Estimate)

C = ঐ (গৃহিণীর Estimate)

তফাৎ ধরি A (B—C) × $\frac{১৬}{১৭}$ × ২০০০

ইহা হইতে যত দাঁড়ায় কসিয়া লউন।

ধরি বর স্বয়ং থাকিয়া বসে—অর্থাৎ পিতামাতার পছন্দ অপছন্দের সহিত যোগ হয়, তবে তাহাকে অধর বাবু Accidental variation বলিতেন। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই জঞ্জালটুকু প্রমিলার কসিয়া দিয়া তিনি বহুদোষের ঘটনার তালিকা সংগ্রহ করিতেছিলেন।

অদ্যাহ বৎসর অধর বাবু শীতকালেই বৈদ্যনাথধামে হাওয়া বদলাইতে যান। এ বৎসর হঠাৎ বর্ষাকালে আসার কারণ—তাঁহার অন্তঃপুরের স্ত্রীর স্বাস্থ্য। পূর্ব্ব সপ্তাহে আই এ পাশ করিয়া অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অধর বাবু তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, 'অনেকের অসুখ পড়িয়া আরও খারাপ হইয়া যায়, কিন্তু পরির কেবল শরীর খারাপ হয়েছে—রোগ হয় নাই।' 'রোগের কথা নয়', গৃহিণী উত্তরে বলিলেন 'আমার বোধ হয়, তোমার ঐ বিবাহের পাঁজিগণিত দেখে অবধি তার মন খারাপ হয়েছে। তার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলছে ও চিঠি পত্র আসছে, সেগুলো তার চোটেই ভাল পাচ্ছে না।'

যাহা হউক পরীটীরে আসিয়া সকলেরই শরীর ও মন, ও ভালরূপ সুস্থ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রায় তিন চারিদিন হইল, দাসদাসী ও পরিবার লইয়া অধর বাবু আসিয়াছেন। গাড়ী দুগ্ধ দিতেছে। কুকুর ডিম পাড়িয়া দিতেছে। পূর্ব্ব তাঁহার অননীদ সঙ্গে মাঠের নবীন ঘাসের তৃণের

[illegible] বরং বাবু তাঁহার পাটীগণিতের অঙ্ক কষেন [illegible] স্বরূপ মাসের একটা বিলাতে দুঃখ করিয়া দিল।

ধোপানাপিতের ভাব।

সম্প্রতি একটা প্রচণ্ড ঝড় হইয়া ধোপা ও নাপিতমণ্ডলী তাহাদের ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছিল।

অবশ্য, যাহারা শুভ্র বস্ত্রে ও মলিন বসন পরিবর্তন করিতে মুক্তহস্ত [illegible] তাহাদের পক্ষে সেটা কিছুই নয়, কিন্তু অধর বাবুর প্রত্যহ [illegible] এবং বাটীতে রাশীকৃত ময়লাকাপড় কলিকাতা হইতে সপ্তাহান্তে কাচাইয়া [illegible] লইয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং সেই অভাবনীয় ঘটনায় তাঁহার বড় [illegible] গেল।

৪

কিন্তু যুবতী কন্যা থাকিলে পিতামাতাকে কষ্ট পাইতে হয় না। [illegible] মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, ময়লা কাপড়গুলি [illegible] কাচিয়া দিবেন। [illegible] কাপড় কাচিতে নাবাজ, বরং সেই সঙ্গে তাদের ময়লা কাপড়গুলি [illegible] ঠাকুরকে দিয়ে কাচাইয়া লয়, তাহাই মনে মনে ইচ্ছা। তবে [illegible] মোট ভোলা পর্য্যন্ত রহিয়া লইবে, এবং ঝি দড়ি টাঙ্গাইয়া সেগুলি [illegible] ও স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিতে স্বীকার করিয়াছিল। সাহেব [illegible] কর্ম্মঠ, কিন্তু তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কেহ কাপড় কাচে [illegible] কখনো ধৌত বস্ত্র পরিধান করে নাই, তাহা বলাবাহুল্য বিনীতভাবে [illegible] দেওয়াতে, কেবল এতদর্থে লইয়া প্রহরী স্বরূপ ধৌত বস্ত্রগুলি পাঠকক্ষে [illegible] হইতে রক্ষা করিবে, তাহাই স্থির হইল।

কিন্তু ভোরবেলা পড়িচিয়া সেই এমেচিউর কোম্পানী বুঝিতে পারিলেন [illegible] কাপড় কাচা তত সোজা নয়। ছেলেপুলের দুই একখানা ছোট কাপড় [illegible] হইতে পারে, কিন্তু ঢাকাই শাড়ী, শান্তিপুরে ধুতি, বোম্বাই [illegible] কাচা এমনসাধ্য ব্যাপার। পর্ণের পুঁজিপাটা একজনের নাবান, আড়ম্বর [illegible] শক্তি নাই। তিনকুড়ি দশখানা কাপড়ের মধ্যে কেবল ছয়খানি [illegible] বেশ, বাকীটা বাজিয়া গেল। তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূলবান্ ঢাকাই শাড়ী [illegible] বহুযত্নে কাতরা ঝি নিংড়াইয়া দিয়াছিল, এবং ভৃত্য দড়ির উপর [illegible] হইল, এবং সাহেবের মানী অহর্ব্বাণহস্তে পাহারা [illegible] পাঠাইয়া ছিল।

হইয়া পর্ণ ফিরে [illegible] ও চাকর বাকর [illegible]

[illegible] পাবেন না।

উভয়ে চলিয়া গেলে পর্ণ ডোবার পাড়ে বসিয়া সংসারের অবস্থা ও ভারতবর্ষের অবস্থা ভাবিতেছিল। পাছের ডাল প্রাতঃকালীন ঘনচ্ছায়ার কক্ষ কোলে বসিয়া পর্ণের দুঃখ দেখিতেছিল। দিবা দ্বিপ্রহর। পূর্বদিন [illegible] হইলেও পার্বতীয় ভূমি অত্যন্ত অতিশয় উত্তপ্ত। যে নিম্ন-[illegible] পর্ণ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার নিম্নভাগে কতকগুলি সফরী দলে দলে [illegible] বেলার সময়টুকু আহার করিবার জন্য ছুটিয়া যাওয়াতে, একটা বক ও [illegible] আসিল।

[illegible] নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পর্ণ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, [illegible] ব্যাপার ঘটিয়াছে।

অদূরে পর্ণকুটীরের শ্যামাঙ্গিনী গাভী ধৌত শুভ্র ঢাকাই শাড়ীখানা [illegible] চিবাইতেছিল! প্রভুভক্ত কুক্কুর তাহার পশ্চাতে ধাবমান। সে বেচারা [illegible] যে, প্রত্যহ ২ সের দুগ্ধ দিয়াও সেই তুচ্ছা গাভী একখানা ষোল [illegible] বস্ত্রখণ্ডের ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবে না।

পর্ণ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। অদূরে একটা পগার ছিল, সেটা দেখিতে না পাইয়া [illegible] গেল, এবং পড়িয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিল নিশ্চয়, কারণ সংজ্ঞালাভ করিয়া [illegible] তাহার মুখে এক জন যুবক জল সিঞ্চন করিতেছে। এবং সেই যুবক যে [illegible] করিয়া ডোবার পাড়ে লইয়া আসিয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারিল, [illegible] ডোবা হইতে ঘটনাস্থল প্রায় একশত হাত দূরে। যুবক যে অবস্থায় [illegible] তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল তাহাও ঠিক, কেন না সে তিল মাত্র [illegible]

এই সব অনুধ্যান মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে পর্ণের মুখ রক্তবর্ণ, বিশেষতঃ [illegible] প্রদেশে, খুবই সম্ভব।

[illegible] যুবক ধীরে ধীরে বলিল—"আপনি লজ্জা পাবেন না! আমি [illegible] যে কাপড় কিনে দেওয়া যায়, সেখানে কাপড় কাচি। আপনার [illegible] ঢাকাই শাড়ীখানা গরু নষ্ট করিছিল দেখে তারি সিং হতে ছাড়িয়ে এনেছি।

পর্ণের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া পর্ণ বলিল—"সকলে ধর্ম্মঘট করেছে, তুমি [illegible] দাও নাই কেন?

যুবক। আমার পয়সা কড়ি কিছু আছে তাই—ওদের সঙ্গে মিশি নাই।

পর্ণ। আমাদের কাপড় গুলো যদি কেউ চেনে, তবে চোরাই ...

যুবক। আর যদি তাদের সন্তানের মাথা কেটে দিই?

পর্ণ [illegible] তবে কিন্তু চাকরি [illegible]

যুবক। আমাকে শিখিয়ে দাও, তবে কি নেবে?

যুবক। কালকে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বলব।

পর্ণ। নিতান্ত আহাম্মকি হইয়া যাইতেছে। দেখ, এ ব্যাপারে তোমার মত [illegible] যায়?

যুবক। আমি নারীদের কাজও জানি, বলিব কাদের কী।

পর্ণ। কি আশ্চর্য! এসব শেখালে কে?

যুবক। ভগবান ও বিপদে পড়লে ভগবানই শিখিয়ে দেন। আমি [illegible] দেশের কি দুরবস্থা হবে সেটা কল্পনা করে [illegible] হিসাব।

পর্ণ। বি ভুইর! তোমার কতগুলো অনাবশ্যক লেখা পড়া শিখে যে [illegible] নষ্ট করেছি, সেই সময়টুকুর সুব্যবহার করে যদি কাপড় ব্রাচা ও রঙিন [illegible]

যুবক। সেলাইও দরকার। তবে আমি সুতোকাটা ও [illegible] যদি দরকার হয় তাও শেখাতে পারি।

পর্ণ। এক আশ্চর্য! এত কাজ একসঙ্গে শেখাবে কি করে?

যুবক। আপনারা লেখা পড়া জানেন, খুব শীঘ্র শিখে নেবেন। [illegible] এগুলোর জোগাড় অতি সোজা। কেবল একবার মন দিয়ে [illegible] যারা আপনাকে ছোটলোকের কাজ মনে করে, তাদেরই চেষ্টা করে দিয়ে [illegible] বলে। অহঙ্কারই কাজের পথে বাধা দেয়।

পর্ণ যুবকের মুখের দিকে তাকাইয়া সবের ঔজ্জ্বল্যে বলিল, আমি [illegible] ছোট লোকের কাজ মনে করি না। আমার কাছে [illegible] কাজই শ্রেষ্ঠ। যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে [illegible] তোমার কাছে এসব শিখে নেবার ইচ্ছা হচ্ছে।

যুবক। আর না, কাল একেবারে [illegible] নিয়ে আসব। [illegible] কাটি বিধে আসব। সোপলাদের ভাল সাইজ আছেত?

পর্ণ। আচ্ছা!

যুবক [illegible] বোঝা মাথায় [illegible] চলিয়া গেল। [illegible]

পর্ণ তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিল। অবশেষে প্রফুল্লমনে এবার ভাল করিয়া পাচিতে গিয়াছিল, তখন আর কেমন একটা।

বাসায় ফিরিতে আসিতে পর্ণ ভাবিতেছিল যদি ও লোকটা এতগুলো কাজ একসঙ্গে শেখায়, তবে তাকেও একটু লেখাপড়া শেখাতে দোষ কি?

[৫]

চূনা বস্ত্রের ঝোল, কলমির শাক, সোণামুগের দাইল ও পটল ভাজার সঙ্গে একথালি ভাত বাড়িয়া পর্ণের মা-জননী কন্যার প্রতীক্ষায় বসিয়া। পর্ণ তাই দেখিয়া নিতান্ত লজ্জিতা।

'মা! তোমরা এখনও খাও নাই?'

মা। তোর কি একটুও বুদ্ধি নাই। মনে করেছিলুম খাস করলে একটু বুদ্ধি হবে, তাই তুই এখনো নিতান্ত কচি খুকি।

পর্ণ। আমার দোষ কি মা? আমি ত একটু হলে আজ পথারের পড়ে' মরে' যেতুম, একজন ধোপার ছেলে বাঁচিয়েছে। সে নাপিতের কাজ

অমর বাবুর কর্ণ-কুহরে 'নাপিত' শব্দ প্রবেশ করাতে তিনি পাতীসমিত খাইয়া কন্যার নিকট আসিলেন। 'সে কিরে পরি? নাপিত দেখলি কোথায়?'

পর্ণ ঐকদলা কলমি শাকমিশ্রিত ভাত মুখে দিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল 'কেমন সব বলছি।'

মুখে আহার ও গল্প চলিতে লাগিল। গল্পের পূর্ব্বে আহারি শেষ হইয়া যাক, কিংবা গল্পের উৎসাহে আহারের দিকে মন না থাকাতে, পর্ণ আঁচাইয়া আসিয়া গল্প আরম্ভ করিল। গল্প শেষ করিয়া পর্ণ জিজ্ঞাসা করিল,—'কেমন হয়েছে না?'

জননী। যা, সর্ব্বনাশ হয়েছে। তুই না কেন একজন লোকে কাপড়গুলো দিয়ে এলি?

অমর বাবু। যাঃ—ওরে রামা, একবার দৌড়ে যেয়ে আয় ত—ও নি।—

পর্ণ। [হাসিয়া] আপনারা নাগল হয়েছেন। আমাকে যদি বিশ্বাস করেন, তবে তাকেও বিশ্বাস করুন। সে ভদ্রলোকের মত, দেখতে খুব সুশ্রী ও কথাবার্ত্তা বুদ্ধিমানের মত। যদি চোর হত তবে আমি যখন পথারে পড়ি গিয়েছিলুম, তখন হাত হতে সোণার বালা, কি আঙ্গুরি হতে খুলে নিত।

ঠিক। সে কথা ঠিক। আপনাদের দেশটিকে বিশ্বাস করা অন্যায়, তাই সন্দেহ হচ্ছে। ঢাকাই শাড়ীখানাও ত' নিয়ে যেতে পারে।

তারক বাবু তিন কুড়ি বৎসরের কাপড়ের দাম কল্পিয়া দেখিলেন, প্রায় ঐই টাকা হয়। বাজার দাম প্রায় তিন শত, হাতেরই প্রায় অর্দ্ধেক মত। সুতরাং প্রতিবাদ করিলেন না।

যদনী। আচ্ছা দেখা যাবে, সে কাচা কাপড় নিয়ে কাল আসে কি না।

সাঁওতাল মালী বলিল আসিবে—আসিবে! যদি আসিবার হয় ত' আসিবেন, তবে চলিয়া যাইতেন—এটা কি রকম কথা?

সাঁওতাল মালীর লজিকটুকু কি বুঝিতে না পারিয়া ঝি চটিয়া গেল। যদি ধনুর্ব্বাণ হাতে ঘুমিয়ে না পড়তিস্ তবে এই ঢাকাই শাড়ী কার?

মালী। ধনুর্ব্বাণ হাতে দেবের লক্ষণ বুঝিয়ে পড়ছিলেন, এটা তোরে বোঝা হয়েছে কি না? তুই রিটু তার মর্ম্ম কি বুঝছিস্?

যাদব। যাক্ ঝগড়া ক'রে কাজ নেই। যা হবার তা হ'য়ে গেছে।

সকলের মনেই একটা খট্‌কা থাকিয়া গেল। পূর্ণের মুখেও একটু হাসি হইয়াছিল, কিন্তু শরতের অকিঞ্চিৎকর মত তাহার মনে যে খেদটুকু সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা মিলাইয়া গেল। রাত্রিকালে ক্ষতবিক্ষত পদতল শয্যার এক প্রান্তে রাখিয়া যখন নিদ্রার কোলে মাথা দিতেছিল, তখন শেষবার মনে হইল 'সকলি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিও কখন রাগা দেবে না'।

(৬)

প্রাতঃকালে উঠিয়া আবার সেই কথা মনে হইল। 'সে রাগা নেবার কে?' আর একটা কথাও মনে পড়িল। 'সে, মুখে জল সিঞ্চন করিতে কি ভয়ানক! ধোপার হাতের জল! তবে জাতিও গিয়াছে!

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্ব জোবার দিকে গেল। তাহা নাই। অনেক গাধীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, এবং তাহারা ঘুম-কাতরের উদ্দেশে গালাগালি বিস্তার করিতেছিল। একটা পাখী, বোধ হয় সত্যভামার প্রভাত শ্রোতা স্থির করিয়া কিংবা বকুলফুলের তাজাগন্ধে বিভোর হইয়া, উচ্চডালে পক্ষ পুটে বিলার করিয়া বসিয়া গেল। একটা বিড়াল তাহার উচ্চ পক্ষ প্রতিক দেখিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। বোধ হয় তাহার মনের ভাব শ্রেষ্ঠ জাতি, উড়িতে জানে বলিয়া এত অহঙ্কার!

ডোঙায় পড়ে বসিয়া এই জাতিতত্ত্ব মনে মনে আলোচনা করিতেছিল।

যারা কাপড় কাচে, তারা ধোপা, আমি যদি কাপড় কাচি, তবে আমিও ধোপা। কিন্তু এর মধ্যে বোধ হয় Fallacy আছে। আমি ত কাপড় কাচছি, কিন্তু কাপড় কাচে, তবে আমরা ধোপা নয় কেন? এটা Undistributed Middle। ব্রাহ্মণ, কাপড় কাচলেও ধোপা হয় না, কিন্তু ধোপা যদি কাপড় কাচা ছেড়ে দেয়, তাহলেও সে ধোপা থাকবে। অনেকে নিজের দাড়ি কেটে দিয়ে কামায়, কিন্তু তারা ত নাপিত হয় না। একটা কোনো যুগে [illegible] তে আরম্ভ করেছিল, তখন হতেই ধোপার নাম ও জাতি। সেই রকম তাঁতি ও কুমোর। তার পূর্ব্বে তারা কোন জাতি ছিল? ইতিহাসে পড়েছি, যে Wat Tyler এর বিদ্রোহের সময় কে যেন ছড়া বেঁধেছিল—

When Adam delvt and Eve span
Who was then the gentleman?

যে সময় কাটলে ও কোদালি পাড়িলে জাতির সূত্রপাত হয়, তবে আমরা তাঁতি ও চাষী। মধ্যে যে জাতিগুলো বাড়িয়ে গিয়েছে, সেগুলো কর্ম্মের বিনিময়ে। কিন্তু কর্ম্ম বদলে গেলে জাতি বদলাবে না কেন? শুনেছি কর্ম্ম নিয়ে ধর্ম্ম। ধর্ম্ম নিয়ে বর্ণ। কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের কোনখানে ছাড়াছাড়ি? বৈষ্ণব-[illegible] প্রেমের জন্য তাঁরা ধর্ম্ম ও কর্ম্ম একাকার করে ফেলেছিল? [illegible] ত তাই। প্রেম কি ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বাহিরে? তাহাদের জাতি [illegible] নাই কেন? হাতের জল খেলে জাতি যাবে কেন? নদীর স্রোতে, পৃথিবীর জল, কত লোক স্নান করে, কিন্তু তাতে ত জাতি যায় না?

এই প্রকার বহু তোলাপাড়ের পর পর্ণের বোধ হইল যে, তাহার জাতি নষ্ট হয় নাই। ধোপার প্রদত্ত জল সেত ইচ্ছা করিয়া খায় নাই, সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সে জল পিয়াছিল। তখন প্রাণের বেদনায় জাতির কথা মনে পড়ে নাই। অবশ্য মনে পড়িলে সে যে ধোপা, সেটা জানত কে? তাহলে আমি নিশ্চয় যানা যেতাম। আর একটা কথা কিন্তু মনে পড়িল। সে যে ধোপার হাতের জল খাইয়াছে, সে কথা গল্পের সময় পিতামাতাকে বলে নাই। কি আশ্চর্য্য! তখন [illegible] কথা মনে পড়ে নাই! আমার মনে হইল, বোধ হয় মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু [illegible] অনাবশ্যক মনে করিয়া বাদ দিয়াছিল। কি জানি যদি প্রায়শ্চিত্ত [illegible] হয়!

কতক্ষণ ধরিয়া এসব কথা পূর্ণ ভাবিতেছিল, তাহা জানা ছিল না। এবং কত ক্ষণ পূর্ণর দৌহিত্র একটা গর্দ্দভের পৃষ্ঠে হাপস করিয়া যুবক গাছের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও সে জানিত না। সুতরাং যুবককে দেখিয়া পূর্ণ একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

'কতক্ষণ এসেছ? এ গাধাটা কার?

যুবক। এইমাত্র। কাপড় প্রস্তুত। গণিয়া লন। গাধাটী আমার।

পূর্ণ। যাঃ আমি ত খাতায় কাপড়গুলো লিখি নাই।

যুবক। নম্বর মনে আছে?

পূর্ণ। না।

যুবক। আমাকে বিশ্বাস করুন। তিন কুড়ি চারি খানা। আপনি ছ'খানা বেচেছিলেন। আপনি গণে দেখুন, আমি কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করে নিয়ে আসি। গাধাটাকে দেখবেন।

৭

পূর্ণ কাপড়গুলি একে একে দেখিতে লাগিল। তার মধ্যে একখানা সাদা চাদর তাহার একজন বন্ধুর প্রদত্ত। সেখানা তাহার সেই বন্ধু প্রবীণাকে নিজের হাতে ধোলা। সে বিনের একটা উদ্দেশ্য করিয়া কাপড়খানা বুনিয়াছিল। অর্থাৎ বিনয়ে হইল তোমার স্বামীর গলায় একবার বাঁধিয়া দিও'।

৮

অধর বাবু বিবাহের পাটিগণিতের শেষ কষাটি পাতা লিখিতেছিলেন। এমন সময় যুবক খুর লইয়া উপস্থিত।

নাপিতের চেহারা দেখিয়া অধর বাবু খুব খুসি হইলেন।

'বাবা তুমি ধোপার কাজও জান?'

যুবক। কিছু কিছু জানি।

অধর বাবু। 'আশ্চর্য্য বটে। বসে' যাও'।

ক্ষৌরকার্য্য শেষ হওয়ার পর অধর বাবু, Expert ডাক্তার যেমন রোগীর রোগের বহর বুঝিয়া মুখ-ভাবের নবীন ভাব দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, আমরা গরিব আহ্মণ, তার উপর কন্যাদায়গ্রস্ত, তবুও বাবা তুমি একবার এস, তবে মাসের শেষে ছ টাকা দেব।

যুবক কোন কথা বলিল না।

অম্বর বাবু। কাপড়গুলো কাচা হয়েছে?

যুবক। হয়েছে।

অম্বর বাবু। কোথায়?

যুবক। গাছ তলায় রেখে এসেছি।

অম্বর বাবু। নিয়ে এস।

যুবক প্রস্থানোদ্যত—

এমন সময় রন্ধনশালা হইতে অম্বরবাবুর স্ত্রী বাহির হইয়া বলিলেন 'একটু দাঁড়াও ত'।

যুবক নতমুখে দাঁড়াইলে, গৃহিণী বলিলেন—প্রফুল্ল যে—এখানে কবে এলে?

যুবক। মার সঙ্গে এসেছি।

গৃহিণী। ওমা সেকি কথা! একথা আমাকে কেউত বলনি।

যুবক ইতস্ততঃ চাহিয়া বলিল 'মাকে খবর দিইগে' এবং বলের দিকে চলিয়া গেল।

গৃহিণীর চিরপরিচিত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অম্বরবাবু সেদিকে তাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্যাপারখানা কি?'

গৃহিণী। তোমার পাটীগণিতের ২৩২ নম্বরের বরের সন্ধানটি দেখ—

অম্বর বাবু পাতা উল্টাইয়া দেখিলেন, 'গৃহিণীর পিত্রালয়ের সন্নিকটে—দিনাথ মিত্রের পুত্র—প্রফুল্ল—এম, এস, সি পাশ—কটু মাথা খাটায়।' ওখানে কোন দাবী নাই কিন্তু ছেলের মতি গতির উপর নির্ভর।

গৃহিণী। তোমার ধোপা ও নাপিত ঐ ছেলেটি।

অম্বরবাবু। পাগল হলে নাকি?

গৃহিণী। মোটেই না। আমাকে চিনতে পেরে ও পালিয়ে গেছে। বাবা লিখেছিল 'ছেলে দেখে শুনে বিয়ে করবেন। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, দেখেশুনে নেওয়া হচ্ছে। এখন তার উপর নির্ভর।

অম্বর। এটা accidental variationএর মধ্যে। এ সম্বন্ধে আমি কোন কথা কব না।

(৮)

ধোপা ও নাপিত ব্যবসায়ী প্রফুল্ল মিত্র M. Sc. বিলক্ষণ উদ্বেলিতহৃদয়ে আবার বকুল বৃক্ষের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। ইত্যবসরে পণ্ড ভিক্ষুক বস্ত্রখানা লইয়া গর্দ্দভের গলায় বাঁধিয়া বসিয়াছিল।

পর্ণ। ওটা পালাবার চেষ্টা কচ্ছিল।

প্রফুল্ল। পালিয়ে গেলই বা? অমন সুন্দর কাগড়খানা মাটি কর্‌লে কেন? আমি কাল ঐখানা ওর গলায় বেঁধেছিলুম। এটা বোপাদের বড়বাবু।

পর্ণ। এটা আপনার ভাল হয় নাই।

সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে পর্ণের শরীর বহিয়া বিদ্যুতের মত একটা কি প্রফুল্লের শরীরে আবিষ্ট হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল,—আপনি আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করলেন কেন? আমি ত ছোট জাতি?

পর্ণিকা গম্ভীর ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল,—তুমি যখন আমার মুখে [illegible] ছিলে, তখন আমারও জাতি গিয়াছে। তুমি এখন আমাকে 'তুমি' বলতে পার'।

প্রফুল্ল। আমাদের ততদূর সাহস হয় না।

পর্ণ। তবে তুমি আমাকে শেখাবে কি ক'রে?

প্রফুল্ল। আমি লেখা পড়া জানিনে।

পর্ণ। আমি শেখাব। প্রথমে তোমাকে লজিক পড়তে হবে।

প্রফুল্ল। মা'কে একথা বলে আসি।

কয়েক পেয়ার মোট মাথায় করিয়া যখন পর্ণ উপস্থিত হইল, তখন মা-জননী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ওর সঙ্গে কি তত্ত্বা হচ্ছিল?'

পর্ণ। আমি ওকে লেখা পড়া শেখাব।

মা-জননী। তুই ওকে লজিক শেখাস্, ও তোকে বিজ্ঞান শেখাবে। তবে বিয়ে হ'য়ে গেলে কি হয় বলা যায় না।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ।

রাজপুতনার কথা ও উপকথা।

(১)

রাজপুতী।

:০:

সকলেই জানেন, উদয়পুর ছাড়া রাজপুতনার প্রায় সমস্ত রাজা মোগল বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এমন কি বাদসাহের ঘরে কন্যা দিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে বাদসাহদের সহিত রাজপুতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হয়। বিকানীর রাজ্যকে কেহ-কেহ এদেশে জঙ্গল ধরা বলিয়া থাকেন। কেন এ নাম হইল, তাহার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। বরঞ্চ এ দেশটাকে জঙ্গল ধরা না বলিয়া মরু ধরা বলা উচিত।

জঙ্গল ধরার রাজ্যে একদিন রাজবাটীতে মহারাজা এবং বাদসাহ বসিয়া আছেন। উভয়ে নানারূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে। ইতিমধ্যে চতুর্দ্দিকে রব উঠিল, একটা পাগলা হাতী শিকল ছিঁড়িয়া রাজবাটীর সম্মুখস্থ বৃহৎ মাঠের দিকে ছুটিয়াছে। সাবধান সাবধান সাড়া পড়িয়া গেল।

মাঠের মধ্যে একজন পাঠান "এক্কা" সর্দ্দার একাগ্রচিত্তে বসিয়া কোরাণসরিফ পাঠ করিতেছিলেন। রাজাদের দরবারে সেকালে বিশিষ্ট বংশীয় অনেক চাকর থাকিত। তাহারা রাজসরকার হইতে বসিয়া বৃত্তি ভোগ করিত, কোন কার্য্য করিতে হইত না। এরূপ সর্দ্দারদের "এক্কা" বলিত। ইহাদের মধ্যে এক-একজন খুব উচ্চদরের যোদ্ধা। বিশেষ কোন শুরু কার্য্য পড়িলে ইহাদের উপর হুকুম দেওয়া হইত।

হাতিটা সটান মাঠের দিকে যেখানে এক্কা সর্দ্দার বসিয়া কোরাণসরিফ পাঠ করিতেছিলেন, সেই দিকে ছুটিল। লোকে পালাও, পালাও, বলিয়া পাঠানকে সাবধান করিতে লাগিল। পাঠানের কোন ভ্রূক্ষেপ নাই তিনি একমনে কোরাণসরিফ পাঠে রত। তাহার পার্শ্বে একটী ধনুক ও কতকগুলি তীর পড়িয়াছিল। হাতি যখন প্রায় তাঁহার সন্নিকট, তখন তিনি মাথা তুলিয়া দেখিলেন এবং ধনুকে তীর জুড়িয়া হাতির ললাটে এমনি শর নিক্ষেপ করিলেন যে, হাতি তীর-বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। অমনি চতুর্দ্দিক

হইতে লোকে আনন্দে করতালি দিতে লাগিল। পরে মহারাজও প্রশংসাচ্ছলে বলিয়া বলিলেন "আচ্ছা রাজপুতী দেখাইতে হইবে না। রাজপুতী কেমন বাদসাহের সে ইচ্ছা নাই।" সাহাদুরী বলিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন "রাজপুতী কি জিনিষ, তাহা আমি জানি না; তোমার রাজ্যে 'রাজপুতী' জিনিষটী দেখিতে হইবে"। এই বলিয়া বাদসাহ নিজ শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

জয়সাহবাবু মহাবিপদে পড়িলেন। রাজপুতী দেখাইতে না পারিলে বাদসাহের রাগ পড়িবে না। বিপদ সমূহ। হঠাৎ রাজপুতী দেখাইবার কি করিয়া হয়? এই চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া তিনি অন্দর মহলে আসিলেন এবং হাত দিয়া ধরিয়া আর বাহিরে আসিলেন না। রাজার এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই চিন্তিত। কি উপায় করা যায়, সকলেই এই ভাবনায় ভাবিত।

রাজার এক অতি বৃদ্ধ পলিতচর্ম্ম ও পলিতকেশ খুড়া ছিলেন। বৃদ্ধের বয়স অত্যন্তই হইয়াছে তাহার উপর আফিম খাইয়া তাঁহার শরীর আরও জীর্ণ-শীর্ণ। একখানি বৃষকাঠ বলিলেই হয়। রাজার এই অবস্থা [illegible] বৃদ্ধের কর্ণ-কুহরে তাঁহার কাণে গিয়া পঁহুছিল।

বৃদ্ধ রাজপুত সেকেলে একটী অহিফেন প্রস্তুত করিবার যন্ত্র বাহির করিয়া একখানি ডেলোয়ার হস্তে খানিক আফিম খুইয়া দিতে দিতে কটাক্ষে তাকাইতে তাকাইতে মহারাজের নিকট হাজির। মহারাজ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন "খুড়া মহাশয়! কি মনে করিয়া"? খুড়া বলিলেন:—"শুনিলাম তুমি কয়দিন হইতে বাদসাহকে কি করিয়া রাজপুতী দেখান যায়, সেই চিন্তায় ব্যাকুল। অন্দর মহল হইতে বাহির হও নাই। আহার নিদ্রা ত্যাগ কর না, সদা বিমর্ষ থাক"। এই সংবাদ পাইয়া আমি তোমায় বলিতে আসিয়াছি যে, আমি রাজপুতী দেখাইতে প্রস্তুত। হুকুম দেও আমি বাদসাহকে দেখাইয়া বাদসাহের তাক লাগাইয়া দিতেছি।

মহারাজ তাঁহার কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন "খুড়াজান, আপনার ধমুর্ভার গোড়া কাঠ হইয়া গিয়াছে একথা কাহার নাই"। বৃদ্ধ জেদ করিয়া বলিল—"মহারাজ! সেই তুকের নাম আমাকে আপনার নিকট না জানিতে পারি, তাহা হইলে এরাজ্যে আর আসিব না"।

এই কথা শুনিয়া মহারাজা সন্তুষ্ট হইলেন।

পরদিন প্রাতে মহারাজ রাজপুতী দেখাইবার জন্য বাদশাহকে রাজবাটীতে আহ্বান করিলেন। একা-সর্দার ঠিক সেই মাঠে পূর্বের মত কোরাণ সরিফ [illegible] এমন সময় তুর্কী অসি হস্তে পূর্ব বেশে আসিয়া উপস্থিত। মহারাজা ও বাদশাহকে দীর্ঘ সেলাম করিয়া বলিল—"তুর্ককে বলিয়া দিন সাবধান হইতে, নতুবা বুঝিবে, ধোঁকা দিয়া মারিল"। রাজপুতের পক্ষে ইহা ভয়ঙ্কর কথা।

মহারাজ বলিলেন "তুমিই সাবধান করিয়া দেও।"

"আচ্ছা নাজাদী" বলিয়া বৃদ্ধ মাঠের মধ্যে যেখানে পঠান ছিল, তথায় যাইয়া চিৎকার করিয়া বলিল—"রে তুর্ক সাবধান! আমি তোকে মারিতে আসিয়াছি।"

পঠান পূর্বমত ২।৪টি তীর ও ধনুক লইয়া বসিয়াছিল। দ্বিরুক্তি মাত্র সে তুর্কের তীর যোজনা করিয়া রাজপুতের দিকে নিক্ষেপ করিল। রাজপুত তখন প্রায় ৫০ হাত দূরে। তীর তাহার পেট বিদ্ধ করিয়া পশ্চাদ্ভাগ দিয়া বাহির হইয়া গেল। রাজপুতের ভ্রূক্ষেপ নাই। সে নির্ভীকচিত্তে অসি হস্তে তুর্কের দিকে ছুটিল। প্রায় ২০ হাত দূরে থাকিতে আর এক তীর তাহার বুকের কেন্দ্র করিয়া চলিয়া গেল। রাজপুতের তখনও ভ্রূক্ষেপ নাই। তৃতীয় তীর তাহার অঙ্গে বিদ্ধ হইবার পূর্বে সে এক লাফে তুর্কের নিকট পৌঁছিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। চতুর্দিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল।

কাটা মাথা লইয়া রাজপুত মহারাজের চরণে সমর্পণ করিয়া বলিল, "দাদা! আমার মান হয় নাই, কাপড়-চোপড় রক্তে ভরিয়া গিয়াছে। এখন যদি আরও রাজপুতী দেখাইতে হয়, তাহা হইলে আমায় বলিয়া পাঠাইবেন।" এই বলিয়া বৃদ্ধ রাজপুত ঘরে চলিয়া গেল।

বাদসাহ বৃদ্ধ রাজপুতের বীরত্ব দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে করিতে সানন্দে প্রত্যাগমন করিলেন।

পুস্তক-সমালোচনা।

গুপ্ত উপন্যাস।—শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ-সঙ্কলিত।

বইখানি পড়িয়া এই প্রৌঢ় বয়সে বাল্য ও যৌবনের কথা মনে পড়িল। গ্রামের একজন প্রবীণ লোক সন্ধ্যার পর 'কেচ্ছা' বলিতেন, সেই [illegible] পিতৃদেব প্রভৃতি গুরুজনগণ শ্রোতা ছিলেন। আমি তখন [illegible] ছিলাম বড় ভালবাসিতাম, কিন্তু এ কেচ্ছাগুলির মধ্যে আদিমের [illegible] গুরু গুরুজন পিতৃদেব আমাকে সে মজলিসে বড় একটা বসিতে দিতেন [illegible] স্কুলের পড়া মুখস্থ করিতে পাঠাইতেন। সে বয়সে আমি [illegible] [illegible] কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এ সুযোগ বড় একটা মিলিত না; সুতরাং [illegible] আনন্দের সৃষ্টি মনে উদিত হইলে—To snatch a fearful [illegible] কবির এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারি। তাহার পর [illegible] ছুটির সময় কলিকাতা হইতে যেখানে যিনি [illegible] [illegible] ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে অজস্র গল্প শুনিতাম। সর্ব্ব ছিল, আমি [illegible] যোগাইব, তিনি আমার [illegible] যোগাইবেন। [illegible] কতদিন ইচ্ছা হইয়াছে, [illegible] করিয়া মুদ্রিত করি; কিন্তু বিলেতী সাহিত্যের পঠন-পাঠনে ও [illegible] ছাইলাম বেমালি ব্যস্ত থাকায় সেই রত্নগুলির সংগ্রহে [illegible] করিতে পারি নাই। সেই জন্যই আজ এই সংগ্রহ-পুস্তকখানি হাতে পাইয়া বাল্য ও যৌবনের স্মৃতি জাগিয়াছে।

এই প্রকারের পুরাতন গল্পগুলি এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে, [illegible] এখনও ফিরিয়াছে; অথচ এগুলির রক্ষা আবশ্যক, এই কটি [illegible] দিলেও এগুলি perennial source of pleasure, আমাদের [illegible] উৎস, [illegible] কাব্যতীর্থ মহাশয় এগুলি প্রকাশিত করিয়া [illegible] করিয়াছেন। সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। আমাদের [illegible] [illegible] তিনি বিলেত হইতে [illegible] সংগ্রহ করিয়া [illegible]

আমাদের কিন্তু 'একাঙ্কিক সহস্র' শিবদের কাহিনী না পাইলে তৃপ্তি হইবে না। আশা করি, তিনি সময়ক্রমে 'গুপ্ত উপন্যাসে'র নূতন নূতন পর্ব্ব সংগ্রহ করিয়া পাঠকসমাজের আনন্দবর্দ্ধন ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবেন।

গল্পগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র; সংকলিতা বিখ্যাত বিদেশীয় আরব্যোপন্যাস, পারস্য গল্পমালা, Decameron, Heptameron, Canterbury Tales, Earthly Paradise, অথবা আমাদের প্রাচীন গল্প-ভাণ্ডার পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের মত সুকৌশলে গল্পগুলি একসূত্রে গাঁথিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে বক্তা ও শ্রোতার কথোপকথনে কাল্পনিক বৈঠককে সজীবতা ও সরসতা দিয়াছেন। তাঁহার বাদশা আরব্যোপন্যাসের নারীর সতীত্বে সন্দিহান বাদশা নিষ্ঠুর শেয়ারের মত নৃশংস নহেন; প্রবল বাদবিবাদে যখন প্রাণটা ভারাক্রান্ত, কিছুই ভাল লাগে না—'পতত্যবিরতং বারি,' 'আর কিমিদোহপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ'—তখন বাদশা গল্পের ফরমায়েশ করিবেন। কিন্তু তিনি নিজের আমোদ লইয়া রাজকর্ত্তব্য বিস্মৃত নহেন, আগে এই নাগপাশে বদ্ধ দরিদ্র প্রজাবর্গের কষ্ট ঘুচাইবার ব্যবস্থা করিয়া তবে নিজের আমোদে মনোনিবেশ করিতেন: কাব্যতীর্থ মহাশয়ের এই চিত্রটুকু বড় সুন্দর, সঙ্গে সঙ্গে দরবেশ-রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ' আমাদের সেই প্রাচীন আদর্শ স্মরণ করাইয়া দেয়। আশা করি বাদশা আরব-পারস্যের 'উপন্যাস' না শুনিয়া নিজের জন্মভূমি ও কর্ম্মভূমি ভারতভূমির 'গল্পগুজব' শুনিতে চাহেন, এই দেশভক্তিটুকুও সুন্দর, পবিত্র। গল্পগুলির বক্তা একজন দরিদ্র হিন্দুপণ্ডিত—ইমামমিশ্র। তিনি নিত্য দরিয়া পরিতোষপূর্ব্বক গল্প শুনিয়া বাদশা পণ্ডিতজীকে বহুধন দিলেন। এখনকার দিনে আর বাণীপুত্রদিগের পুরস্কারদাতা রাজা নহেন—পাঠক সম্প্রদায়ই এখন সেই কার্য্যের অধিকারী। আশা করি, তাঁহারা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের পুস্তক ক্রয় করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত (ও নূতন নূতন গল্পসঙ্কলনে উৎসাহিত) করিবেন এবং 'কাব্যম্...অর্থকৃতে' আনন্দায়িনের এই বাক্যও সার্থক করিবেন।

গল্পগুলি সেকালের গল্প, সঙ্কলয়িতা সেকালের atmosphereটি ঠিক বজায় রাখিয়াছেন। অদৃষ্টবাদ, জন্মান্তরবাদ, ব্রহ্মশাপ প্রভৃতি হিন্দু সংস্কার একটির মূলে নিহিত। সদাচারী নির্লোভ ব্রাহ্মণ, সদ্ব্রাহ্মণে দানশীল উদারহৃদয় রাজা, সতী সাধ্বী স্বামীহিতৈষিণী বুদ্ধিমতী ব্রাহ্মণী, বাল্যকালে [illegible] প্রভৃতি প্রাচীন পবিত্র আদর্শ চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠে।

আদর্শ-নায়িকা [illegible], কুক্রিয়াসক্ত [illegible] খাঁটি [illegible] বাস্তব (realistic) চিত্র [illegible] করিতেছে। রাজপুত্র, ধনপুত্র, বণিকপুত্রগণ [illegible] তাহাদের উদ্ধার, সন্ন্যাসীর কৃপায় [illegible] সমুদ্রযাত্রার সঙ্কল্প-লাভ [illegible] অতিরিক্তের জন্য নায়ক পুরুষবেশে মেনকাটীল, স্বপ্নে বিবাহ [illegible] কোন সুন্দরীর প্রেমে পড়া, সাগর পার, সিদ্ধ যতী, আকাশ হইতে পড়া [illegible] [illegible] দেবতাদের, [illegible] অভিশাপ, [illegible] প্রবেশ, বন্দীর [illegible] [illegible] [illegible]

...না যা বেরিয়ে চলে, ইতালি চালিত রাস্তার অভাব নাই। ...লকাতে গল্পগুলির সরলতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। (তবে ইংরেজী ...বাদ 'পাইল' ও 'ফ্লাস' এই তিনটি শব্দ সেকালের গল্পে ঠিক খাপ খাইত না।)

গল্পগুলির কোন কোনটি আমাদের জানা ছিল, তবে আমাদের জানা ...এর সহিত একটু অমিল আছে। কোনও ক্ষেত্রে সংস্কৃতের Version ই বেশী মনে পড়ায়, কোনও ক্ষেত্রে আমাদের জানা Version ই বেশী মনে পড়ায়। 'পঞ্চ পথিক' গল্পের এক অংশ বিলাতী 'The Sleeping Beauty' ...সহিত মিলে, 'রাজপুত্র ও মন্ত্রিকন্যা' গল্প শেক্‌স্‌পীয়ারের 'All's well that ends well' নাটকের সহিত কতক অংশে মিলে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য গল্পের এরূপ সাদৃশ্য ...সকল পণ্ডিতগণ গবেষণা-দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা ...আমাদের ঐতিহ্যের বন্ধন কমে; এ বিষয়ে মূলে প্রতীচ্য সাহিত্য প্রাচ্য সাহিত্যের ...নিকট ঋণী, ইতিহাসের সাক্ষ্য এই। 'মাসুল ও তাগিদের', 'পাতভীত ভূত', 'নবজন্মের ...বুদ্ধির উদয়', 'আদর্শ মিতব্যয়ী' প্রভৃতি গল্পের হাস্যরস উপভোগ্য। 'চন্দ্রপাত' ...প্রভৃতি গল্পের প্রহসন বিদ্রূপের সুর বড় মিঠা। কোথাও কোথাও ...ও রসবোধের অপূর্ব্ব মিশ্রণ লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচায়ক। দুই ...একটি নীতি-প্রবণের গল্পও আছে; একটিতে যেরূপ মর্ম্মবিদারে উপসংহার ...করিয়াছে, তাহাতে 'বামের ধন শ্যাম পাইল' বলিয়া কোনও পাঠকের অন্তঃকরণ ...কাঁদিতে লাগিবে এরূপ ত মনে হয় না; অপর দুইটিতে ব্যভিচারিণীর ও দুরাত্মার ...হাতের শাস্তি Poetic justice হিসাবে পাঠককে প্রীতিপ্রদ করিবে। আমি ...বহুল ব্যাপক দুইলেও হালের বাঙ্গলা-সাহিত্যে যে রকম (pure) কৌতুক ...বা Bernard Shawর ভাষায় বলিতে গেলে যে রকম aphrodisiac ...নাটকীয় বিষয়ের থাকে, জ্ঞানবাবু মহাশয়ের পুস্তকে সেরূপ কিছুই নাই। ...এই জন্য বলি, এখনকার তথাকথিত সভ্যরুচির দিনে বইখানি পুস্তকের ...'ইণ্ডিয়ান' প্রচারের সম্রান্তের ও সাহিত্যের মঙ্গল।

এই 'তিন দিনে' লিখিত গল্প-সমষ্টির তিনটি সামান্য ত্রুটির উল্লেখ করিয়া ...করিব। প্রথম ত্রুটি, পুস্তকখানির একটি পৃষ্ঠা নাই। দ্বিতীয় ত্রুটি, যেমন ...সুন্দর ছাপান ও বাঁধান পুস্তকে অনেকগুলি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে; ...এই, এইকালের অত্যধিক দিনেও পুস্তকখানির দুই টাকা মূল্য একটু বেশী ...বলিয়া মনে হয়।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্যতীর্থ-সঙ্কলিত

[illegible] কাব্যতীর্থ মহাশয়ের আর একখানি সংগ্রহগ্রন্থ। [illegible] শাখার, প্রাচীন কালের বিক্রমাদিত্য রাজা, ভোজরাজা, [illegible] ও আধুনিক [illegible] বাদসাহ, প্রতাপাদিত্য, মহারাজ রামকৃষ্ণ, তথা প্রাচীন বাঙ্গালা [illegible] কৃত্তিবাস, বররুচি, বচন ভারতী, দিগ্গজ ও আধুনিক বাঙ্গালার সুপণ্ডিত [illegible] অপাত্র তর্কালঙ্কারকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল কিংবদন্তী এবং সংস্কৃত শ্লোক প্রচলিত ও [illegible] মুখে শ্রুত হয়, কাব্যতীর্থ মহাশয় সেগুলি একত্র করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। [illegible] শিরোনামা-বিশিষ্ট ওগুলি বৈঠকী গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখন [illegible] রুচি-প্রবৃত্তি পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে এ সব [illegible] করা [illegible] হইতেছে; প্রাচীনদিগের কীর্তি স্মৃতিতে ভিন্ন এগুলির আর [illegible] না; সংগ্রহকার যথার্থই বলিয়াছেন, 'এক একটি তৃণ যবাবাদাম ছাড়িয়া [illegible] যে বিবিতে পারে, তাঁহার সহিত সঙ্গে কত অতীত প্রসঙ্গিনীও না [illegible] বিসর্জন হইতেছে।' তিনি এগুলি এই বেলা সময় থাকিতে [illegible] লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচারিত করিয়া ভালই করিলেন। [illegible] এগুলির ছাপা [illegible] এগুলি পাঠ করিলে বেশ একটু বিমল আনন্দ পাইবেন এবং [illegible] অনেক প্রাচীন কিংবদন্তী জানিতে পারিবেন। [illegible] সকলেই জানেন, [illegible] আরও সংযত প্রবচন ও তদাশ্রিত কিংবদন্তী [illegible] যেমন, শাস্ত্রকে ভগবান্ ভূত, অগ্নিকে ভবিষ্যতি—সংগ্রহ [illegible] করিবে ভাল হয়। আজকাল অনেকেই এই সকল প্রবচনের উৎপত্তি-[illegible] সঙ্গে সেই সঙ্গে এগুলির একত্র-সংগ্রহ বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থকের কাব্যরূপে [illegible] ভাগ্যক্রমে উপভোগ্য। [illegible] করিয়াছি। তাঁহারা প্রথম শাখান্তিত 'বসাল'-দম্পতির কথা-কথনে তৃপ্ত হইবেন। [illegible] ওরফে [illegible] তাঁহারা দ্বিতীয় শাখান্তিত 'বনাল'-দম্পতি সম্বন্ধে [illegible] এবং প্রত্যেক বা একজন সংসর পূর্ব্বের হিন্দুসমাজের [illegible] পরিচয় পাইবেন। আমাদের মনে হয়, সংযুক্তভাবে প্রচলিত কিংবদন্তীগুলি [illegible] সঙ্গে এই সকল বৈঠকী গল্প একই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইলে [illegible] কিংবদন্তী-গুলি স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রদত্ত হইলেই সুসঙ্গত হইত। [illegible] পুস্তকের [illegible] সাধারণ [illegible] প্রভৃতির আমরা [illegible]

দ্বিতীয় পাণ্ডার জন্মলগ্নের প্রভৃতির আমলের কথা থাকিলে শ্রেণী-বিভাগ ইহা অপেক্ষা সুনিযুক্ত হইত। একালের বৈঠকী গল্পগুলি বতন্ত্র পুস্তকে সংগৃহীত হইলে, অন্ততঃ পক্ষে এই পুস্তকের তৃতীয় শাখাভুক্ত হইলে, শোভন হইত।

প্রথম গল্প 'কনিয়া রাজি' রিউস্ প্রাপ্তার প্রথম গল্পটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে। ঋষি জনক ও শুকদেব সম্বন্ধে বিবৃত হইতে শুনিয়াছি।

পুস্তকের ভাষা অপরখানির মতই সাধুভাষা ও চলিতভাষার মিশ্রণে সুখপাঠ্য, সুন্দর। কোথাও কোথাও সেকেলে 'মেটা' রসিকতা—অর্থাৎ অশ্লীলতা ও গুরুতর দোষ আছে—সেকালের চিত্র-হিসাবে তাহা অপরিহার্য্য। তথাপি এযুগের দিনে ইহাতে হয়ত অনেকে নাসিকাকুঞ্চন করিবেন কিন্তু হালে যে সকল কামোদ্দীপক চিত্র দেখা যায়, সেগুলির মত এগুলি সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে, ইহা জোর করিয়া বলা যায়।

পুস্তকেরও তিনটি ত্রুটির কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। ইহারও একটি ত্রুটি নাই, ইহার মূল্য (এক টাকা) একটু বেশী বলিয়া বিবেচনা হয়, এবং মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সংস্কৃতশ্লোকে যে সমস্ত গোলযোগ হইয়াছে, সেগুলি বড়ই মারাত্মক; কেননা একেইত সংস্কৃত অতি দুরূহ ভাষা, অল্পজ্ঞ লোকের অর্থগ্রহ করিতে কষ্ট হয়; তাহার উপর ছাপার গোলযোগ থাকিলে মাথার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায়। ইহা সংগ্রহকারের হিতের জন্যই উল্লিখিত হইল, সমালোচ্য-সুলভ দোষৈকদর্শিতার নিদর্শন বলিয়া যেন গ্রন্থকার ও পাঠক মনে না করেন।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালা।

প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। কিন্তু বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।" তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ থাকিলে তিক্ত বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজ মাকালই ফলে। [illegible]

আমরা দুর্বল অসার শ্রেয়বুদ্ধি ভিন্ন অন্য অস্ত্রে প্রকৃত হইয়া [illegible] করি না। [illegible] চেষ্টাতেও সিদ্ধি হয় না। যে জাতির পূর্ব মাহাত্ম্যের [illegible] হাত্রিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, তাহাদের পুনঃ [illegible] চেষ্টা করে। [illegible] প্রবন্ধে প্রকাশিত অতি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকাশকালে তিনি বলিয়াছিলেন—"এক সময় ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসর—অভাবে এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে দুরভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।—অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য, বঙ্গদর্শনের দ্বারা সুবিস্তৃত সম্পর্কে সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টায় সফলাচরণ আমি এই [illegible] অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর পাওয়া গেলে জঙ্গল কাটিয়া [illegible] পাওয়া গেলে সেনা প্রস্তুত করিতে পারেন, আমি সেইরূপ [illegible] সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাসসম্বন্ধে আমার [illegible] প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়ন জন্য অবসর, বহুতর এবং অন্যান্য সাধন [illegible] অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার [illegible] বেশী। কম বেশী হউক, বা না হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিতাম না। যে [illegible] সে সোণারূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপূজা করিবে না? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন, সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমিত কুলি-মজুরের কাজ করিয়াছি, অথচ কুলি লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সময়ের পূর্বগামী ছিলেন। যাঁহারা সময়ের [illegible] তাঁহারা সময়ের পূর্বগামীই হইয়া থাকেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আজ কালি [illegible] স্থানে ঐতিহাসিক আলোচনা দেখিয়া মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য [illegible] বিফল হয় নাই। তিনি যে পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, সে পথে এখনও কি সেনাপতির আগমন হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে ঘোর মতভেদ আছে, তবে পথে সৈন্য লইয়া অতিযানের যে যথাসম্ভব আয়োজন হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশিষ্ট [illegible] সংগ্রহ হইতেছে। সে কাজ যে সহজসাধ্য তাহাও নহে; কারণ, বাঙ্গালার ইতিহাস [illegible] বর্তমান বাঙ্গালার চক্ষুঃসীমাতেই বদ্ধ নহে, পরন্তু নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত

বাঙ্গালার প্রতিভা ও কর্ম্মতা বাঙ্গালার বাহিরে বৃহত্তর বাঙ্গালা সৃষ্টি করিয়াছিল। যতই অনুসন্ধান হইতেছে, ততই বাঙ্গালার বাহিরে বৃহত্তর বাঙ্গালার ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর সভ্যতা তাম্রলিপ্তির পথে—জলপথে এবং হিমালয় অতিক্রম করিয়া স্থলপথে নানা দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে—এ দিকে তিব্বতে বাঙ্গালী আপনার শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্মমত ও শিল্প রাখিয়া গিয়াছিল। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সেকালে বাঙ্গালী শ্রমণেরা ঐ দুই পথেই বিদেশে গমন করিয়াছিলেন। বারাণসীতে, প্রয়াগে, উড়িষ্যায় বাঙ্গালী-বাহুবল জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিল।

এ সব ইতিহাসের পুরাতন অধ্যায়ের কথা। তাহার পর বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালী কখনই বাঙ্গালার সীমায় আবদ্ধ রহে নাই—ভারতের নানা স্থান নানা দেশে বাঙ্গালী আপনার প্রতিভা ও প্রভাব প্রদর্শন করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছে। আজও বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর গৌরবে বাঙ্গালী গর্ব্বানুভব করিতে পারে—করিয়াও থাকে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী গড়ে বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী যে বৃহত্তর বাঙ্গালা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার বিবরণও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ নহে। কিন্তু তাহাতেই বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। সে বিবরণ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। জীবন-চলতি খাতার হিসাব বন্ধ করিয়া ঠিক অঙ্কপাত করা যায় না। এ ক্ষেত্রে সে খাতা বন্ধ করাই এখন নহে—দুর্ভাগ্য হইবে। বরং বাঙ্গালীর আশা—বাঙ্গালীর প্রতিভা দিগন্তে ঔজ্জ্বল্যে বাঙ্গালার বাহিরে অতীতকেও ম্লান করুক।

কিন্তু অতি পূর্ব্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহিরে গেলেও বাঙ্গালার সহিত তাঁহার সংযোগের অভাব হয় নাই। সে বাঙ্গালা ভাষা। বাঙ্গালার কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"যখন থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে;
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।"

বাঙ্গালী যিনি যখন যে স্থানে থাকিতেন, বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় আনন্দ উপভোগ করিতে ত্রুটি করিতেন না। ধর্ম্মালোচনার জন্য কাশীবাসী হইয়াও রামনারায়ণ ঘোষাল ও লালমোহন বিদ্যানিধি বহু চেষ্টায় বিশ্বনাথের কথামৃত

করিয়াছিলেন। জর্মনীবাসীদের কাশীখণ্ডের সহিত প্রথম পরিচয় কিরূপে হইয়াছে—

'মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি;
আমার সহায় হয় কাহারে না দেখি।
ভাগ্যক্রমে হেনকালে পাটুনীনিবাসী
শ্রীযুত্ কুলিহরের রায়গত কাশী।"

উদ্ধৃত কয়টি পদের মধ্যে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেক্সপীয়র বলেন, শেক্সপীয়ার 'হ্যামলেট' লিখিয়াছেন—সে ভাষা কবি চিনে। রাজারাণীর কাছে ভাষা বলিতে বাঙ্গালা ভাষাই বুঝিতে হয়। সেইরূপ নহিলে অন্ধ-ভাষায় মন উঠে না—হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। রাডিয়ার্ড কিপলিং এক স্থানে বলিয়াছেন—ইংরাজ যে স্কটলেই কেন থাকুক না—সে অবসরকালে কে পড়িতে উত্ত না, সে জানে—সে ইংরেজ—

"ফিরে বটে বাস তা'রা দেশ দেশান্তর,
হৃদয় তা'দের কিন্তু রহে একস্থানে;
জননীর মুখে শুনি—শিশুর অন্তর
সুন্দর ইংলণ্ড তা'র দেশ বলি জানে।"

বাঙ্গালীও বাহিরে বাঙ্গালীরা বঙ্গভাষার পুষ্টি বিষয়ে বিশেষ [illegible] করিয়াছেন। মোক্ষদা মহাশয়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঈশ্বর—

"নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তটশালিনী সুফলদা যমুনে ও।"

এবং

"কতকাল পরে কহ ভারতরে,
দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে"

এমনি করিয়া [illegible] সেই গোড়ার [illegible] পাইত। যিনি বহুদিন দিল্লীতে বাঙ্গালী সমাজের অগ্রণী ছিলেন, সেই [illegible] রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের কথায় 'প্রবাসী' [illegible] সহিত [illegible] উদারচেতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সেন মহাশয় [illegible] বঙ্গসাহিত্যের বহু সাহিত্য চেষ্টার [illegible] শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ [illegible] [illegible] [illegible]

...যেয়ে কথা বলিতে পারিলে না। কালীপুরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের সাহিত্যকীর্ত্তিই তাহার প্রমাণ। এবং সে জন্য থাকিয়া আমিও আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রস্তাবিত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম না।

কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, মুখ্যে কিছুদিন—প্রবাসে থাকিবার যে আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা যদ্দীভূত হইয়াছে। ইহাতেই দুঃখের বিষয়। বিশেষ যখন দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালার বাহিরে [illegible] ছিল, তাহাতে উপকরণ সংগৃহীত না হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস [illegible] তখন বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর বাঙ্গালায় অনুরাগশিথিলতা ইহার বেদনার কারণ।

[illegible] কেহ কেহ বলিবেন, জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার লোকের পক্ষে [illegible] বিরল প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু সে কঠোরতায় অন্যান্য দেশেও সাহিত্য চর্চ্চার ত্রুটী হইতেছে না। বিজ্ঞানের বিস্তারে কবিতা ক্ষুণ্ণ হইবে—এমন আশঙ্কাও অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবং বর্ত্তমানকাল সাহিত্য চর্চ্চার পক্ষে সুবিধাজনক বলা যাইতে পারে। সকল দেশেই দেখা গিয়াছে, সাহিত্য কিছুকাল অর্থশালী ব্যক্তিদিগের অনুগ্রহে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। [illegible] সাহিত্যের সময় হইতে এদেশে কালীপ্রসন্ন সিংহের সময় পর্য্যন্ত ইহার [illegible] পাওয়া গিয়াছে। সত্যই বঙ্কিম দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে, আর কালিদাস নিয়ে। অথচ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের চিহ্ন মাত্রও নাই আর কালিদাসের শকুন্তলা আজও জীবন্ত।" কিন্তু তবুও [illegible] সহায়তা লাভ না করিলে কালিদাসের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাইত কি না সন্দেহ—

"অস্পৃশ্য রতনসম উদ্ধারি কিরণ,
রাহে সদা লুকাইয়া জলধি-মাঝার;
নিভৃতে প্রান্তরে পুনঃ পুষ্প অগণন—
পবনে মিলায়ে যায় সৌরভ তাহার।"

[illegible] এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ডাক্তার জনসনের কথা [illegible] তিনি তাঁহার অভিধানরচনার জন্য প্রথমে বেদনীর সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তিনি অভিধান প্রণয়নকালে তাঁহাকে সাহায্য না করিবেন এমনটির সময় উৎসর্গ পাইবার আশায় চেষ্টা করিয়াছিলেন জনসন তাহাকে যে [illegible] দিয়াছিলেন, তাহাতেই জনসনের তৃপ্তি নিনাদে ধ্বনিত হইয়াছিল। [illegible] সাহিত্যে আমরা ধনীর আনুকূল্যের প্রয়োজন নাই। সেই সময় হইতে [illegible] নাটক-সাধারণ পাঠকদিগের আনুকূল্যে তাঁহাদিগের আদরের পুষ্ট [illegible] হইতেছে। বাঙ্গালাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বাহি- [illegible] যাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। বাঙ্গালার পাঠক সমাজ

দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে—পাঠকবর্গের যত্নে ও আদরে সাহিত্যও পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। এ সময় আমরা এমন আশা অবশ্যই করিতে পারি যে, বাঙ্গালী যিনি যে স্থানেই কেন থাকুন না—বাঙ্গালার প্রতি বীতভক্ত হইবেন না; পরন্তু সর্ব্বপ্রযত্নে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করিবেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আদর দেখাইবেন।

কিন্তু কেবল সাহিত্যের দিক্ দিয়াই একথা দেখিবার প্রয়োজন নাই। জাতির সাধারণ উন্নতির জন্যও বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইয়া থাকিবে মাত্র। ডাকাতের সময়ে বরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি বাঙ্গালা কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হইতে খাঁটী রূপা ভাল। ফুলের বুলবুলি অপেক্ষা ফুলমিতা বঙ্গ নারী জীবন যাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালী শ্রদ্ধেয়। ইংরাজি লেখক ইংরেজীবাচক বক্তৃতা দিবেন। নকল ইংরাজ ভিন্ন কথা খাঁটী বাঙ্গালার মনুষ্যত্বের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। এ কথা সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালীর হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত বাঙ্গালী ইংরাজি বুঝে না; কস্মিন্ কালে বুঝিবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালীর যে কথা উক্ত না হইলে, তাহা তিন কোটী বাঙ্গালায় কখন বুঝিবে না, শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

বাস্তবিক সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তর পর্য্যন্ত উন্নতির বিস্তার সাধিত না হইলে ব্যক্তিবিশেষ মূল কথা সে স্তরের গোচর না হইলে, আজকাল তিন অভিজাতের সমাজের সর্ব্ব নিম্নস্তরের লোক ও জানিল না বুঝিল না সমাজের কখনই প্রকৃত উন্নতি হইবে না—হইতে পারে না। যতদিন কংগ্রেস বক্তৃতা ইংরাজীতেই পরিচালিত হইত, ততদিন তাহার কতটুকু শক্তি ছিল এবং তাহার পরেই বা তাহার কতটা শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের দ্বারা বঙ্গদেশে যে ভাব বিস্তার হইতেছে, ইংরাজি [illegible] তাহা [illegible]

[illegible]

[illegible] স্থানে তাহাদের উন্নতির কথা তুলিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible]

বৈঠকী।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা বন্ধ হইতেছে না কেন? আমরা প্রায়ই উত্তরে বলিয়া থাকি, অন্য মাসিক পত্রে সাহিত্যগত কিছু বাহির হইলে তবেত সমালোচনা। প্রায় সকল মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপনের ছোট গল্প থাকে; আর যাহা থাকে, তাহা খোসখেয়ালের লিখা মাত্র। শব্দপ্রয়োগ এবং বাক্যবিন্যাস সম্বন্ধে পূর্ণ স্বৈরাচার প্রায় সর্ব্বত্র পরিদর্শিত হয়। কোন্ মাপকাটি ধরিয়া সমালোচনা করিব? বিশুদ্ধ প্রীতি এক ছটাকের মাপকাটি না থাকিলে সমালোচনা বা বিচার সম্ভবপর নহে।

আজকাল বহু লেখক পাঠকবর্গের দিকে তাকাইয়া কোন কিছু লেখেন না; তাঁহাদের যাহা ভাল লাগে বা স্ফূর্তিমধুর বোধ হয়, তাঁহারা তাহাই লিখিয়া থাকেন। কেহ বা রবিয়ানা মক্স করেন, কেহ বা হুচ্ছে-খাচ্ছে, গেলুম-নিলুম, করুন-চালাইয়ে গল্প লেখেন, খাস্ কলিকাতার প্রচলন ভাষা পর্য্যন্ত বাদ, কেহ বা ইংরেজী গল্পের কারচুপী কেবল উৎকট শব্দপারম্পর্য্যে বিস্তর বাঙ্গালায় আমদানী করিয়া তুষ্ট হন। তাহার উপর একটু প্রাচ্য হইলে একটু জানা-শোনা হইলেই অমনি লেখক মহাকবি বা আর্ট-প্রয়োগে ব্যস্ত হন। বল দেখি, কোন্ মাপকাটিতে মাপিয়া, কোন্ রাটগ্রাহ্য-তত্ত্ব করিয়া এই সকল লেখার সমালোচনা করিব?

বঙ্কিম যুগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রায় সকল প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখক সংস্কৃত জানিতেন, সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র এবং অলঙ্কারে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাহার উপর ৺কালী সিংহের মহাভারতের গদ্যকে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শব্দবিন্যাসপদ্ধতিকে সরাই বা সার গদ্যের বনীয়াদ স্বরূপ গ্রাহ্য করিয়া চলিতেন এবং তাহারই উপরে নিজের নিজের প্রতিভাগত বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়া বাহাদুরী দেখাইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ইন্দ্রনাথ, রজনী গুপ্ত প্রভৃতি গদ্য লেখকগণের এই চাল ছিল। চন্দ্রশেখর কাব্যের মাধুরী আমদানী করিয়া গদ্যকে মধুময় করিয়াছিলেন। এই ধারা অবলম্বন করিয়া নবযুগের সোপেনহর ও ভিবারীর

[illegible] [illegible] [illegible] [

প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কথকতা শ্রবণ, রামায়ণ ও চণ্ডীর গান এবং মনোহর-সাহী কীর্ত্তন শ্রবণ এখন আর গৃহস্থের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নহে। সমাজের সে ভাব নষ্ট হইয়াছে, সে পুরাতন পদ্ধতির Mass Education বা লোকশিক্ষা নাই; ফলে, বাঙ্গালার সভ্য নর ও নারী সমাজের আকার প্রকার সবই বদলাইয়া গিয়াছে। এখন কি সেই পুরাতন ধরণের সমালোচনা অনেকের রোচক হইবে?

* * *

সমালোচনার আর একটা বিপদ আছে। বাবুরা বহি সমালোচনা করিতে দেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বহির বিরূপ সমালোচনা বাহির হইলেই অমনি তাঁহারা ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হন। একেবারে কথাবার্ত্তা বন্ধ করেন, মুখ দেখা দেখি বন্ধ করেন এবং সমালোচকের এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকের অজস্র নিন্দা করিয়া বেড়ান। কোন বহিকে অশ্লীল বা কুৎসিত বলিয়া নিন্দা করিলে উহা উৎপত্তি হয়, তাহার বিক্রয় বাড়িয়া যায়। তাহার উপর লেখকের শত্রুতা করে, সবিস্তর সমালোচনা এখন ত প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম-বাবু এবং ভূদেব বাবু উভয়েই বলিয়া ছিলেন যে, লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই মাসিক পত্রের সৃষ্টি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং আচার্য্য শিবনাথ এই অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরন্তু এখন দেখিতে পাই, দর্শন এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের লাম্পট্য বৃদ্ধি উদ্দেশ্যেই যেন কোন কোন মাসিক পত্র প্রচারিত হইয়া থাকে। ছাপা ও ছবি পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ ভাল হইয়াছে বটে, পরন্তু কেবলই কি ছাপা-ছবি-মলাট এই তিনের উপর নির্ভর করিয়া মাসিক পত্রের প্রচার বাড়াইতে হইবে? সাহিত্যকে তেমনই স্বৈরিণীর শোভায় ভূষিত করিয়া বাহির করিতে অনেকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কেন না তেমন সাজ করিলে কাটতি বাড়িবে, তবে, টাকা আসিবে।

* * *

টাকা—টাকা—টাকা! ছাতের পাখীর মতন সবাই ঐ এক রবই করিতেছেন। কাহার নভেল নাটক ম্যাকমিলান খরিদ করিল, কাহার কোন্ বহি এডওয়ার্ড হাউসের কৃপায় লিটারারী টাইম্‌সে বা বিলাতী কোন কাগজে সুসমালোচিত হইল, কাহার বহির কয়টা সংস্করণ বাহির হইল, এই চিন্তা, এই অনুজ্ঞা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। অথচ গৌড়ায় কি মধুসূদন কি হেমচন্দ্র, কি বঙ্কিমচন্দ্র বড় বড় বহি লিখিয়া লাভবান্ হইবার প্রত্যাশা কেহই করেন নাই। সমস্তটাই

এতটা কমলার দাসী করিয়া লিখার প্রবৃত্তি পূর্ব্বে বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন সমাজে এতটা প্রকাশ পায় নাই। ইহার হেতু এই, এখন সাহিত্যচর্চ্চা অনেকের জীবিকার্জ্জনের উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গলাল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার পূর্ব্বেকার কোন কবি বা লেখকের সাহিত্যচর্চ্চা জীবিকার উপায়-স্বরূপ ছিল না। কাজেই তাঁহাদের রুচি প্রবৃত্তি অন্য রকমের ছিল। তাঁহারা প্রত্যেকেই একটা উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। এখন সে সাধনা, সে ব্রতের বালাই কাহারও নাই।

* * *

একটা শ্লাঘার কথা বলিব। সবুজ পত্রের শ্রীমান্ প্রমথ চৌধুরী 'রবিবাবুর' ধুরন্ধর হইলেও, তিনি সংস্কৃত জানেন, সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, বৈষ্ণব সাহিত্য ভাল করিয়া পড়া আছে, তিনি যে বাঙ্গালা গদ্য লিখেন, তাহাতে বিন্যাসগত বা শব্দগত একটিও অপপ্রয়োগ পাওয়া যায় না। ভাষা লইয়া তিনি মাঝে মাঝে বেশ ডিগ্‌বাজী খান, পরন্তু তাঁহার ডিগ্‌বাজী বিধিনিষেধ-সংবদ্ধ। এমনটি পাইলেও যে সমালোচনা করিয়া সুখ হয়, কাব্যামোদীর উল্লাস-বিকাশ হয়। ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ইদানীং রীতিমত মাসিক সাহিত্য সমালোচনা করিতেন না। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "দাদা, আর যে হাতে পানী পাই না, সমালোচনা করিব কাহার?" যাহা হউক, গালাগালি এবং পরনিন্দা বড়ই রোচক, তাহা স্বাভাবিক। সেই হিসাবে আবার মাসিক সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু এক বড় প্রমাদে পড়িয়াছি, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে ধরি? প্রায় সবটাই যে এক দোষে দুষ্ট! যাহারা সংযত লেখক, গণ্ডী কাটিতে পারেন না বা জানেন না, তাহারা প্রায় সকলেই সাহিত্যের লেখক। শ্রীমান্ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত একখানি বহির সমালোচনার নমুনা দিয়াছি, তাহাতেই আলকুশীর চুলকানী অনেক অঙ্গে ধরিয়াছে। তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে—পারিবে কি? যখন প্রতোদপাণি হইয়া সমালোচনা আরম্ভ করিব, তখন সহিতে পারিবে কি? অনেকে বলেন, গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া সমালোচনা কর্ত্তব্য। লেখকগণের মধ্যে অনেকের প্রমাদ দেখিলে গাম্ভীর্য্য যে রক্ষা করা চলে না। যে ন্যাঙট হইয়া নাচিতে লজ্জা বোধ করে না, তাহার উপর জল বিছুটীর চাবুকই চালাইতে হয়। বলিয়া রাখিলাম অনেক কথা, আমাদের মাপ কাটি কি, বাটখারা কেমন, উদ্দেশ্য কি সবই ব্যক্ত করিলাম। অতঃপর এই নীতি ও ধর্ম্মগত বিধিনিষেধের কষ্টি পাথরে ফেলিয়া সকল সোণা যাচাই করিব। আমাদের হিসাবে মেকী বলিয়া কেহ প্রতিপন্ন হইলে তখন কাঁদিলে চলিবে না।

আদিম মানবের গতিবিধি।

[১৯২০ সালের মার্চ্চ মাসে ইটালী দেশীয় 'সায়েন্সিয়া' নামক প্রত্রিকায় মানব জাতির প্রথম গতিবিধি (Le prime Migrazine Umane) নামে ইটালী ভাষায় লিখিত এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ জিওক্রিদে কব্জেরি উহার যে পুনর্মুদ্রিতাংশ আমাকে পাঠাইয়াছেন, এই প্রবন্ধ তাহার অনুবাদ।]

নিউ ইয়র্কের প্রথিতনামা জীববিজ্ঞানবেত্তা মেথিও (W. D. Matthew) স্তন্যপায়ী জীববর্গের আদিম আবাসভূমি নিরূপণ প্রসঙ্গে মানবের প্রথম গতিবিধিও যে মধ্য এসিয়া হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, যে মানববর্গীয় জীবগুলি সর্ব্বপ্রথমে বাহির হইয়াছিল, তাহারা দক্ষিণ মুখে সটান অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ ভূভাগের শেষ সীমানায় উপনীত হইল। আর পরে পরে যাহারা যাহির হইল, তাহারা ক্রমে ক্রমে আদিম বাসস্থানের নিকটতর স্থানে রহিল গেল—ফলে দাঁড়াইল যে, মধ্য এসিয়া হইতে যে জাতি অধিকতর দূরে অবস্থিত, তাহারা সমধিক প্রাচীন ও যাহারা নিকটতর, তাহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক অর্থাৎ তাহাদের গতিবিধি পরে আরম্ভ হইয়াছিল।

মধ্য এসিয়া বাস্তবিকই মানবের আদিম বাসভূমি কিনা এখানে সে বিচার করিবার স্থান নহে। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে—কেহ কেহ মনে করেন যে, জাভাদ্বীপে কপিমানবের (Pithecanthropus) * অস্তিত্ব এ মতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। কপিমানব কপিবর্গভুক্ত ইহা বলিয়া ওধু উপেক্ষা করিলে চলিবে না—কারণ বহুসংখ্যক মানবাকার কপি ওরাঙ্ (বনমানুষ) এখনও ঐ দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে মানব আবির্ভাবের স্থাননির্দ্দেশ

* ডাক্তার ইউজিন ডি বয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জাভাদ্বীপে ট্রিনিল নামক স্থানে কয়েকটি, পরে ও তৎপরে কয়েকটি দন্ত পাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, উহা মানব ও কপির মধ্যবর্ত্তিকোন জীবের শরীরাবয়বের মাত্র।

কিছু বাধ আসে না ; সকলেই জানেন যে, আর দুইটি মানবাকার কপি অর্থাৎ শিম্পাঞ্জি ও গোরিলা আফ্রিকাবাসী। তাহা বলিয়াই কেহ আফ্রিকা আদিম মানবের জন্মভূমি মনে করেন না। আমি কিন্তু কপিমানবকে মানববর্গভুক্তই মনে* করি (যদিও মানবের উৎপত্তিবিচারে উহাকে ভিন্ন-শ্রেণী ধরিতে হইবে) এবং আমার ধারণা যে, ইহার পূর্ব্বপুরুষ আভাদ্বীপে ছিল না, বরং খুব অতীতকালে মধ্য এশিয়াখণ্ড হইতে ঐখানে আসে এবং বার্দ্ধক্যকারণে ঐখানেই উহা চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়া অবশেষে বিহতি ও বিলয় প্রাপ্ত হয়।

আমি বাস্তবিকই মনে করি যে, মানবের ন্যায় দ্রুত গমনশীল জীবের পক্ষে বহু প্রব্রজনই (multiple migrations) অধিকতর সম্ভব। প্রথম প্রব্রজনের গতি কিন্তু দক্ষিণ দিকে ছিল কি না সন্দেহস্থল—ঠিক দক্ষিণেই তুষারময় হিমালয় গিরিশৃঙ্গ ও কঠোর জলবায়ুর অবস্থা হইতে অনুরূপই অনুমান করিতে হয়। এ দিকে কিন্তু পূর্ব্বে বা পশ্চিমে প্রসারোপযোগী ভূমির অভাব কিছুই ছিল না ; সুতরাং ইহা সম্ভব যে, বহু পূর্ব্বেই এক প্রব্রজনতরঙ্গের প্রতিঘাতে কপিমানব হইতে কিঞ্চিন্মাত্র আধুনিক হাইডেলবার্গ মানব † অন্যান্য এসিয়ার স্তন্যপায়ী জীবের সহিত পশ্চিম ইয়ুরোপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অপরাপর মানবজাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আসে। অস্‌বর্ণের (osborn) অনুমান যে, প্রথম মানব শিকারীমাত্র এবং সর্ব্বভুক্ ; সুতরাং শিকারী জীবগুলি যে আসিয়াছে, মানবও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে ; ইহা খুব সম্ভব সত্য এবং এখন সকল লুপ্তজীবতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন যে, মধ্য এসিয়ার সাধারণ বাসভূমি হইতেই সকলে ক্রমে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। হাইডেলবার্গ মানবের যে উৎপত্তি ইউরোপে হইয়াছিল এবং নিয়েন ডারথাল মানব উহারই অভিব্যক্তিমাত্র, এ মতে আমার আস্থা নাই।

প্রকৃত সমুন্নত মানবের (Homo sapiens) দক্ষিণ হিমালয়ে প্রব্রজন ইহার অনেক পরে ঘটিয়াছিল। হয় ত উহা ডসন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত প্রাচীন মানবের

---

* মনীষী যুল্ প্রভৃতি অনেকে ইহাকে এখন কপিবর্গভুক্ত ধরেন—(অনুবাদক)

† ১৯০৭ সালে জর্ম্মাণীতে হেডার নদীর তীরে একটি অতি প্রাচীন প্রস্তর (fossil) মানব খুলি আবিষ্কৃত হয়, উহার দন্তগুলি কিন্তু মানবীয় এবং উহাকে এখন হাইডেলবার্গের প্রাচীনতম মানব বলা হয়। উহার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, হাইডেলবার্গের প্রাচীন মানব।

সম্ভাবনাময়ক। উক্ত প্রাচীন মানব এখনও বহু তর্কের ও সন্দেহের স্থল। এখানে উহার কথা আর বলিব না। আমার ধারণা যে, অধিকতর স্নিগ্ধ জলবায়ু ও প্রচুরতর খাদ্যের সন্ধানেই সম্মুখ মানব (Homo sapiens) মধ্য এসিয়া হইতে প্রব্রজনে বাহির হইয়াছিল।

ইহাও সম্ভব যে, ভিন্ন স্থানের জলবায়ুর প্রভাবে বিশেষতঃ বিস্তৃত সন্নিহিত বনসমূহে মানবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং বিয়াজুটি (Biasutti) মনে করেন যে, অল্পদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মানবজাতিগুলিতে—এই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এই বামনজাতিগুলি তৎকালীন স্থলসেতুর সাহায্যে এসিয়া মহাদেশ হইতে ভারতদ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন দ্বীপ ও [illegible] অবাধ আসিয়াছিল এবং অপর রাস্তা দিয়া আফ্রিকার অধিভাগে [illegible] করিয়াছিল।

উহাদের চতুষ্পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের মানবজাতি বাস করিত এবং [illegible] বামনদেশের নিকটবর্ত্তী যাওয়া যাইত, ততই দীর্ঘাকৃতি মানবজাতি পাওয়া যাইত। এই পার্শ্বতন জাতিকে আমি দক্ষিণদেশীয় মানব Homo Meridionalis বলিয়াছি। এই জাতিগুলি যেখানে অপর মানব আসে নাই, এমন স্থানে [illegible] আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাহাদের তৎকালের গতিবিধি—মানবদেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রসার দেখিয়া কিঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে। [illegible] দ্বারা সভ্যতা বা সংস্কারের ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত্ত অনুকল্পিত হয়।

প্রধানতঃ জর্ম্মাণদেশেরই নানা গবেষক ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের [illegible] ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর বা ব্যবহৃত পরিচ্ছদের কি ভাবে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। অধুনা একজন সুইটজারলণ্ডের [illegible] ডাক্তার মণ্টানাডন এরূপ প্রসার দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মণ্টানাডনের ধারণা পূর্ব্বকথিত ম্যাভিউর অনুরূপ। তাঁহার মতে সমস্ত [illegible] আদিম কেন্দ্র মধ্য এসিয়ায় নিহিত। যে গুলি কেন্দ্র হইতে দূরে, সে [illegible] অধিক প্রাচীন ও নিকটতর গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

(২) প্রবল সংস্কারবর্জ্জিত প্রবর কেবল ট্যাস্‌ম্যানিয়া দ্বীপ হইতে

---

১ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ববিদ্ ইংলণ্ডের কর্ণেল সেন্ মিশেলডাউন নামক গ্রামে [illegible] কপোটের বিশিষ্টাংশ এবং চোয়াল দেখিতে পান এবং উহাকে অতি প্রাচীন মানব নামে অভিহিত করেন ([illegible] নাম Dawsoni) কাহারও মতে উহা কপির অনুরূপ। H... এবং উহার কিয়দংশ এক সূত্র শিরস্ত্রাণের মানবের [illegible]

পাওয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ঐ দ্বীপ আবিষ্কারের সময়ই সেখানকার যেরূপ সভ্যতা ছিল, তাহাই এই শ্রেণীভূত। মণ্ট্যানাডান ইহার বর্ণনকরণ করিয়াছেন—আদিম সংস্কারাবর্ত্ত (Primitive cycle)। বিপর্য্যস্ত বা ঘর্ষিত শিলায়ুধ অর্থাৎ প্রস্তরনির্ম্মিত ছুরিকা বা মাংসঘর্ষকরূপে কয়েকখণ্ড শাণিত প্রস্তরের ব্যবহারমাত্র, কাষ্ঠখণ্ডও ঐরূপ শাণিত করিয়া বর্ষা বা খনিত্র নির্ম্মাণ করা ; চর্ম্মনির্ম্মিত, জলপাত্র ব্যবহার ভেলাজাতীয় আদিমভাবের জলযান নির্ম্মাণ ; কাষ্ঠ বা অরণিসঙ্ঘর্ষে অগ্ন্যুৎপাদন, ছিন্নপত্র দিয়া কোনরূপে আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ—এই সব লইয়া এই সংস্কার, এক কথায় ইহা খুব প্রাচীন শিলাযুগের (Palaeolithic) সংস্কারমাত্র।

শস্যসংরক্ষণ, মৃণ্ময়পাত্র, বস্ত্রাবরণ বা কুটীর নির্ম্মাণ এ কালে একেবারে অবিদিত ছিল।

(২) দ্বিতীয়টি দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায় (এবং তৃতীয় আবর্ত্তের সহিত সংমিশ্রিতভাবে আফ্রিকা ও আমেরিকার প্রান্তেও দেখা যায়)। ইহাকে (cycle of the Boomerang) বুমেরাঙ্ সংস্কার বলা যাইতে পারে। এক কোণে বাঁকান কয়েকটি ছোট লাটির মত এক অদ্ভুত অস্ত্র এই বুমেরাঙ। মিসরবাসিগণ পক্ষী শিকারের জন্য এই রকম ব্যবহার করিত, অনুমান করা যায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ব্যাকটি এমনভাবে দেওয়া যে, যে কোনদিকে ছুঁড়িলে পর আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্ব্ববিক্ষিপ্ত স্থানে আসিয়া হাজির হয়, সুতরাং নিক্ষেপকারী স্বেচ্ছায় ইহা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। (এ কালে খণ্ডিতশিলাযুধ অভাঙ্গাদিদ্বারা কাষ্ঠবাটে আবদ্ধ করিয়া ব্যবহৃত হইত ও মার্জ্জিত শিলাযুধের ব্যবহারের সূচনা এই স্তরেই হয়।) ইহা ছাড়া মণ্ট্যানাডন দেখাইয়াছেন যে, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় ঠিক যথার্থ ঢাল নাই, তৎপরিবর্ত্তে বিপক্ষের আঘাত ঠেকাইবার জন্য বা হস্তরক্ষার্থে যষ্টির ব্যবহার আছে। মাছ ধরিবার বর্শা, জটিল ধাঁজের ঝোড়াঝুড়ি, ছাদ ও দেওয়াল অবিচ্ছিন্নভাবে নির্ম্মিত ত্রিকোণ কুটীর—এ সব এ কালের জিনিষ। ধর্ম্মানুষ্ঠানে মস্তকোপরি বিঘূর্ণিত শব্দায়মান ঢিলা ও অন্যস্থানে সুরনংবুক্ত যষ্টিদ্বয়ের ব্যবহার চলিত ছিল।

(৩) তৃতীয়াবর্ত্তের পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ; ইহা এক দিকে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, নবগিনি, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা ও অপরদিকে ভূতত্ত্ববিদ্ ও লুপ্তজীববেত্তাগণ যাহাকে উত্তর মেরু (Holartic) সংশ্লিষ্ট ভূমি বলিয়া থাকেন, সেই

বলা হয়। কারণ এ সব স্থানেই এই টোটেমতন্ত্র বর্ত্তমান, কিন্তু উচ্চতর সভ্যতার কোনও নিদর্শন নাই।

বাস্তবিকই স্বীকার করিতে হইবে যে, টোটেমতন্ত্র এ সকল স্থানে একাধারে প্রাধান্য লাভ করে নাই (এবং কোনও জাতির বিস্তৃতির সহিত উহার সম্বন্ধ করা যায় না); কারণ স্থানে স্থানে যথা পশ্চিম আফ্রিকায় ইহার পূর্ব্বকার সংস্কারের প্রভাবও দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তাহাদিগকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই স্তরের টোটেম ব্যতীত লক্ষণ এইরূপ—মৃতদিগকে অনাবৃত রাখা ও শুষ্কক্রিয়া। এ চক্রের এক নিদর্শক বর্ষানিক্ষেপক (propulseur) অর্থাৎ কোন যষ্টিখণ্ডের মধ্যে এরূপে খাঁজকাটা হইত যে, তাহাতে বর্ষা বসাইয়া সজোরে নিক্ষেপ করা যাইত এবং সামান্য নিক্ষেপাপেক্ষা উহাতে ফল অধিক হইত। ত্রিকোণ কুটীর, বল্কল, কাষ্ঠপাত্র, বাঁশী, ভেরী ও শীস্ দেওয়ার যন্ত্র প্রভৃতি আদিম ছাঁদের বাদ্যযন্ত্র এ স্তরে ব্যবহৃত হইত।

উত্তরে এসিয়ো ও দক্ষিণে অষ্ট্রেলিয়াবাসী সবই এই শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। কাজেই লক্ষণের এত আতিশয্য এবং উত্তর আমেরিকা বা আসিয়ায় ঠিক অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত অনেক ব্যবহৃত বস্তু থাকা সম্ভবপর নহে। কেবল উভয়স্থানে টোটেমতন্ত্র ও বর্ষানিক্ষেপক এই উভয়ই বর্ত্তমান থাকাতে জাতিগত ও অভ্যাসগত পার্থক্য অন্তর্হিত হয় নাই।

(৪) চতুর্থ বিভাগ অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব্বাংশে মেলানেসিয়ার পূর্ব্বাংশে ও নিউগিনির চতুর্দ্দিকে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, ইন্দোনেসিয়ার (ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি) উপর দিয়া ইহার প্রভাব ছড়াইয়াছে তবে সেখানে তাহার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়।.....এই চতুর্থ শ্রেণীতে মুখোস সংস্কার ও দ্বিশ্রেণীবিবাহের (cycle of the masks and two-class system) শ্রেণী বলা হইয়াছে। ইহার চিহ্ন এই যে, অনুষ্ঠানগুলিতে মুখোস পরিবার রীতি আছে এবং জাতিগুলি সাধারণতঃ দুই চারি বা আট অংশে বিভক্ত এবং ইহাদের মধ্যে স্বগোত্র বাদে অপরাপরের মধ্যে পরস্পর বিবাহকার্য্য প্রচলিত আছে। ইহাদের সমাজ মাতৃপ্রধান (অর্থাৎ কন্যাগত বংশপরম্পরা চলিয়া থাকে); নবখাদকতা, কৃষির সূচনা ও খাটের মতন ত্রিকোণ কুটীর ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কৃষকব্যবহৃত বাঁশি, তারের ধনুকছড়ি, একতারা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

(৫) পঞ্চম আবর্ত্তের বেড় সমগ্র মেলানেসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও

যে সে স্থানে চতুর্থ বিভাগ বর্ত্তমান—সমস্তটি ঘিরিয়া আছে। ইহাকে "ধনুর্ব্বাণের আবর্ত্ত" (cycle of the bow of warfare) বলা হয়। যুদ্ধার্থে ধনুর্ব্বাণের ব্যবহারই ইহার প্রধান লক্ষণ। তদ্ব্যতিরেকে চাল, মৃণ্ময়পাত্র, জলে বা স্থলে বাটী ও খোঁটার উপরে চারি এবং একতার তাম্বুরিণ এ সংস্কারের বিশেষত্ব।

এক কথায় মণ্টানাডন বলেন যে, মার্জ্জিতশিলায়ুধ (Neolithic) যুগের ইউরোপের সংস্কারের যাবতীয় লক্ষণ এস্থলে বর্ত্তমান, তবে ইহা কোনও জাতিবিশেষের নিজস্ব সামগ্রী বলিয়া বলা যায় না; কারণ ভূখণ্ডের প্রায় এক পঞ্চমাংশের উপর ইহা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

মণ্টানাডন আরও বলেন যে, আফ্রিকাতে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সংস্কারদ্বয় ভিন্নপ্রতিভাবে সংমিশ্রিত। আফ্রিকার কঙ্গো ও গিণিতে যেরূপ সংমিশ্রণ দেখা যায়, পূর্ব্বদিকে নবগিণি ও মেলানিসায়ও ঠিক তদ্রূপ...সম্ভবতঃ বিষুবরেখাস্থ জাতিগণ (Equatorial races) উত্তর দেশীয় (boreal) আর্য্যদিগের আক্রমণে এসিয়া হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে এই সংস্কার বিস্তার করিয়াছে।

প্রায় এই সময়েই আর এক জাতীয় দক্ষিণদেশীয় মানবের (Homosapiens meridionalis) অভিযান হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহারা বিষুবরেখাস্থ নিগ্রোজাতিগণের ন্যায় অত কৃষ্ণকায় নহে এবং ভারতবর্ষে তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ দ্রাবিড়দিগকে পাওয়া যায়। ইহারা পূর্ব্ব আফ্রিকার নানা জটিল সংস্কার (ইথিওপিয় প্রভৃতি) হইতে উদ্ভূত; এজন্য আমি ইহাদের নাম Homo Indo-africanus æthiopicus * দিয়াছি।..... উত্তরদেশীয় জাতিদিগের (boreal races) কথা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার। ইহা দ্বারা আমরা প্রাচীন পৃথ্বীর দুইটি মানবজাতির নির্দ্দেশ করিতেছি—ভারত-ইউরোপীয় (Homosapiens Indo-Europeanus) এবং আসিয়াদেশীয় (Homo sapiens Asiaticus) মানব। প্রথমটির মধ্যে দীর্ঘশির (dolichocephalic) উত্তরের শ্বেতকায় ও ভূমধ্য সাগরের লোহিতকায় উভয়ই আছে। তদ্ব্যতিরেকে প্রাগুশির (Brachycepehal) কয়েকটি জাতিও ইহার মধ্যে ধরা হয়। (এখানে মনে রাখা উচিত, ইউরোপের যথা ইণ্ডিয়ট্‌স্‌ † সেরা প্রভৃতি অনেকে এই তিন

* (আমি ইহাদের প্রাচীনতা ও বিস্তার বুঝাইবার জন্য ইহাদিগকে Ind. Eythraeans নাম দিয়াছি—অনুবাদক।)

† ইহাই অনেকের মতে আর্য্যজাতি

শ্রেণীর মানব এক জাতিভুক্ত করিতে চাহেন না।) যাহাই হউক ইহাদের মূল-নিবাস সাধারণ আবাসভূমি এসিয়ার উত্তর-পশ্চিম কোণে ধরা যায়। তদ্রূপ এসিয়াদেশীয় মহাজাতি অর্থাৎ পীতবর্ণ মঙ্গলীয় জাতিও বোধ হয় এখানেই উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহাই এখন অনেকের ধারণা হইতেছে। এই প্রস্থশির ও দীর্ঘশিরের একই উদ্ভবকে (Rosa) Ologenasis নাম দিয়াছেন।

যাহাই হউক যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রথম প্রব্রজনের দলের লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা দূরনিহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইলে পীতজাতির প্রান্ততম বিভাগের অংশদ্বয় অর্থাৎ আমেরিকা ও ওসিয়ানিয়ার জাতিগণকে অগ্রজের স্থান দিতে হইবে। অবশ্য এ সব স্থানে পরেও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের সমাগম হইয়াছিল —কিন্তু যদিও এই অভিযান বা প্রব্রজন তাম্র লৌহাদি ব্যবহারযুগের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, আগমনকারিগণ যে পরবর্ত্তী যুগের সংস্কার আনিয়া সেই স্থানের আদিম সভ্যতার সহিত সংযোগ করিয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপঞ্চানন মিত্র।

(১ যথা আস্‌পাইন জাতি, বা পামির জাতি। রমাপ্রসাদ চন্দ, হাডন ও রাৎজেলি মনে করেন বাঙ্গালী এই প্রস্থশির ভারত-ইউরোপীয় জাতি। রিসলের মতানুসারে আমরা দ্রাবিড় ও অস্ত্রাল জাতি উদ্ভূত, সংমিশ্রণে ইহার ভিত্তি বিশেষ নাই।)

বিজয়সেন দেবের তাম্রশাসন

ও

বাঙ্গালায় সেনরাজবংশের অভ্যুদয়।

এই পত্রিকার পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় আমাদের প্রথম প্রবন্ধে আমরা বিজয়সেন-দেবের [ব্যারাকপুর] তাম্রশাসনের পরিচয়, পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই শাসন হইতে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়া, সেনরাজবংশের অভ্যুদয়-বৃত্তান্তেরও আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকে ধূর্জ্জটির (মহাদেবের) বর্ণনা দেখিয়া ইহার উক্তিতে বিজয়সেনদেবকে "পরম-মাহেশ্বর" বলিয়া অভিহিত করার মূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেনরাজগণের মধ্যে অনেকেই মহাদেবানুরক্ত ভক্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সদাশিব মূর্ত্তিই তাঁহাদের মুদ্রা-লাঞ্ছন-রূপে ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয় শ্লোকে তুষারদ্যুতি চন্দ্রমার বর্ণনা। ইহা সেনরাজগণের চন্দ্রবংশে উৎপত্তি বিজ্ঞাপিত করিতেছে। তৃতীয় শ্লোকে চন্দ্রবংশে অনেক "রাজপুত্রের" জন্মলাভ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে—অন্যান্য নরপতিগণের উপর তাঁহারা আত্মপ্রভাব বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা কোন্ দেশ হইতে প্রভাব বিস্তার করিতেন, এই শাসনে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও বল্লালসেনদেবের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে সেনবংশের পূর্ব্বপুরুষ এই "রাজপুত্রগণ" বাঙ্গালার রাঢ়-দেশকে অননুভূতপূর্ব্ব বিভূতিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই বর্ণনা হইতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন যে, সেনরাজগণ হয়ত চন্দ্রবংশীয় কোন রাজার কনিষ্ঠপুত্র হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা "রাজপুত্র" বা "রাজপুত" বলিয়া নিজ পরিচয় দিতে অধিকারী ছিলেন—শাসনে উল্লিখিত রাজপুত্র শব্দের প্রয়োগ এইরূপ কথারই বিজ্ঞাপক। সে যাহাই হউক, চতুর্থ শ্লোক পাঠে বুঝা যায় যে, সেনরাজগণ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। অন্যান্য লিপি হইতেও জানা গিয়াছে যে, তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়কুল-সম্ভূত ছিলেন। এই শ্লোকে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব-বর্ণিত

"রাজপুত্র"-বংশে পিতৃমাতৃ-(উভয়)কুল-চূড়ামণি, শত্রুদিগের অন্তকর্ত্তা, সামন্তসেন-নামক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া অরাতি-সামন্তসেনার পরাজয়কারী হইয়াছিলেন। পঞ্চম শ্লোকে তৎপুত্র হেমন্তসেনের বর্ণনা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে—তিনি যে অন্যান্য রাজগণের রক্ষকরূপে প্রতিদিন রাজলক্ষ্মীকে প্রবুদ্ধ করিতেছিলেন এবং নিজপ্রভাবে "জগতাং মাননীয়ঃ" হইতেছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। [ব্যাঢ়াঞ্চলে] তিনিই প্রথমতঃ রাজ-পদধারী হইতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে এইরূপ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হয় না। এই জন্য আমরা পরে তাঁহাকেই সেনরাজবংশের প্রথম নরপতি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি। ষষ্ঠ শ্লোকে হেমন্তসেনপুত্র বিজয়সেনের জন্মকাহিনী। সপ্তমশ্লোকে আমরা তাঁহার মহিষী বিলাসদেবীকে কোন এক "শূরকুলের" দুহিতা বলিয়া বর্ণিত প্রাপ্ত হইতেছি। বিলাসদেবীর নাম প্রথমতঃ বল্লালসেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল—কিন্তু তিনি কোন্ কুল হইতে আগুলাভ করিয়াছিলেন, তাহার কোন পরিচয় ইতিপূর্ব্বে অবগত হওয়া যায় নাই। বল্লালসেনদেবের মাতা বিলাসদেবীকে শূরকুল-সম্ভূতা বলিয়া বর্ণিত পাওয়ার পর, আমরা তৎপুত্র বল্লালসেনদেবকে আর কুলপঞ্জিকার নানাস্থানে উল্লিখিত "আদিশূরের দৌহিত্র" বা "তদীয় দৌহিত্রের বংশজাত" বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না—কারণ এই শাসনে স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি কোন শূরকুলের দুহিতৃ-সম্ভূত। কুলজী-গ্রন্থের অনেক কথা যে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না—শ্লোকের টিপ্পনী করিতে যাইয়া তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। বিজয়সেন-মহিষী বল্লালসেন-মাতা বিলাসদেবী যে "শূরকুল-সাগরের কৌমুদী বা জ্যোৎস্নারূপিণী" ছিলেন—ইহা এই শাসনের একটি নূতন ঐতিহাসিক তথ্য। অষ্টম শ্লোকে বিলাসদেবীর গর্ভে জাত, বিজয়সেনদেবের পুত্র—বল্লালসেনদেবের প্রতাপ ও ধীশক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। "নিঃশঙ্ক-শঙ্কর"—এই অপর নামে পরিচিত, এমন গুণবান্ পুত্র বল্লালসেনকে বিলাসদেবী গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহীমহেন্দ্র রাজচক্রবর্ত্তী বিজয়সেনদেব সহিষী দ্বারা সর্ব্বপ্রকার মহাদানাদির ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন—নবম দশম শ্লোকদ্বয়ে রাজকবি তাহাই কীর্ত্তিত করিয়াছেন। নিজ-সম্পাদিত তাম্রশাসনে পিতা বিজয়সেনদেব প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া উপযুক্ত পুত্র বল্লালসেনের নামোল্লেখপূর্ব্বক প্রশংসা করিয়াছেন কেন—তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে এইরূপ বুঝা যায় যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে পূর্ব্বদত্ত পুত্রের উপরই রাজকার্য্য

একরূপ স্থির করিয়াছিলেন। পরে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করা হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শ্লোকে আমরা বিজয়সেনদেবের অপর নাম "অরিবৃষভ-শঙ্কর" বলিয়া অভিহিত পাইতেছি।

এতদিন পর্য্যন্ত আমরা সেনরাজগণের অভ্যুদয় কাহিনীকে ঐতিহাসিক সূত্রমাত্রেই মনে করিয়া থাকিলেও, এখন এই নবাবিষ্কৃত শাসনের প্রকাশের পর—ইহার পাঠ ও ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া বিজয়সেনদেবের ও তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের অভ্যুদয়-বৃত্তান্তের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

একাদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে বরেন্দ্রভূমিতে "কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ" নামক যে প্রজাবিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল—তাহার ফলেই পাল-সাম্রাজ্যের অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিহত হইতে আরম্ভ করে। সেই শতাব্দীর শেষভাগে তৃতীয় বিগ্রহ-পালের তৃতীয় পুত্র, স্বনামপ্রসিদ্ধ রামপাল দেব যদিও কৈবর্ত্ত-নায়ক দিব্যোকের পুত্র ভীমকে নিহত করিয়া বহুকষ্টে বহুযুদ্ধের পরে "জনক-ভূ" (জন্মভূমি) বরেন্দ্রীর পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া, তন্নিমিত্ত নূতন রাজধানী রামাবতী-নগরী হইতে কিছুকাল রাজ্যশাসন করিবার পর পরলোকগত হন, তথাপি প্রজাশক্তির সহিত রাজশক্তির এই সংঘর্ষের পরে, পাল-নরপালগণের আর পূর্ব্ববৎ প্রতাপ সংস্থাপিত হইতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাম-পাল দেবের বংশধরগণ আরও কিছু কালের জন্য রাজত্ব চালাইতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এই "কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহকে" পাল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের আদি কারণ বলিয়া অভিহিত করিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা অতিক্রান্ত হয় না। বিজয়সেনের পিতামহ, হেমন্তসেনের পিতা, সামন্তসেনেরও পূর্ব্বপুরুষগণ ("রাজপুত্রাঃ") রাঙ্গালার রাঢ়-দেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা বল্লালসেনের সীতাহাটি (বা নৈহাটি) তাম্রশাসনে উল্লিখিত (৩য় শ্লোকে) পাইয়াছি—এবং সামন্তসেন যে, শেষ বয়সে গঙ্গাপুলিনস্থ পুণ্য আশ্রমে বাস করিয়া তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও দেবপাড়ায় আবিষ্কৃত পাষাণ-প্রশস্তিতে (৯ম শ্লোকে) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মনে হয় যে, পালসাম্রাজ্য যখন উত্তরবঙ্গের "কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহে" জর্জ্জরিত হইতেছিল—তখনই সেনরাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ অর্থাৎ সামন্তসেন ও তৎপুত্র হেমন্তসেন ক্রমশঃ আত্মশক্তি বাড়াইয়া লইয়া নিজ-রাজপ্রভাব রাঢ়াঞ্চলে বিস্তৃত করিয়া ভবিষ্যতে সর্ব্ববঙ্গে রাজ্যস্থাপ-নের পথ পরিষ্কার করিতেছিলেন। হেমন্তসেনকে সেনরাজবংশের প্রথম নরপতি বলিবার প্রমাণও যে না পাওয়া যায়, তাহা নহে।

প্রথম প্রমাণ।—দেবপাড়াপ্রশস্তিতে (১৫শ শ্লোকে) তাঁহাকে "ত্রিকলিঙ্গাধিপ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং তাঁহার মহিষীকে (১৪ শ্লোকে) মহারাজ্ঞী আখ্যায় বিভূষিত করা হইয়াছে এবং তৎপুত্র বিজয়সেনদেবকে ইঙ্গিতে "কুমার" বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে (১৫শ শ্লোক)।

দ্বিতীয়ও প্রকৃষ্টতর প্রমাণ।—বিজয়সেন দেবের ব্যারাকপুর লিপির প্রথম শ্লোকে শত্রু-সামন্ত-সেনার পরাজয়কারী সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেনকে রাজকবি "রাজরক্ষাসুদক্ষঃ" বলিয়া বিশেষিত করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, তৎপুত্র বিজয়সেনদেবকে পরিচিত করিবার সময়ে লিপির গদ্যাংশে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ-পদ-লাঞ্ছিত হেমন্তসেনের "পাদানুধ্যাত" বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্ব হইতেই যে রাঢ়া-ভূমিতে বাস করিয়া ক্রমে ও সেনবলে বলীয়ান্ হইয়া বাঙ্গালায় স্বপ্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক রাজ্যসংস্থাপন-চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গে (বরেন্দ্রীতে) পালরাজগণের প্রজা-বিদ্রোহজনিত দুর্দ্দশার সুযোগ পাইয়াই হয় ত হেমন্তসেন অনুত্তর-বঙ্গে অর্থাৎ রাঢ়ামণ্ডলে নিজকে রাজা বলিয়া বিঘোষিত করিয়া সেই স্থানের পাল-নরপালগণের সামন্তবৃন্দকে নিজপ্রভাব স্বীকার করাইয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ অনুমানের অনুবলে আমরা হেমন্তসেন দেবের "দানসাগর"—নামক গ্রন্থের ভূমিকায় "তদনুবিজয়সেনঃ প্রাদুরভূদ্ বরেন্দ্র" প্রভৃতি বাক্যের এরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারি যে, হেমন্তসেনের পর বিজয়সেনদেব প্রথমে বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হন। বরেন্দ্রের দক্ষিণপশ্চিমাংশে বিজয়নগরনামক স্থানেই বিজয়সেন তাঁহার প্রথম রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া থাকিবেন—"গৌড়রাজমালা"-রচয়িতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তদীয় গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। রাঢ়দেশে যে এখন পর্য্যন্ত সেনবংশের সহিত সম্বন্ধ অনেক অনেক স্থান ও প্রাচীনকীর্ত্তির সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কারণ নাই—কারণ, বিজয়সেনের পিতার-সময় পর্য্যন্ত সেনবংশীয়েরা রাঢ়াঞ্চলেই নিজ প্রতিপত্তি পরিচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু যখন রামপালের রাজ্যের শেষ সময়ে এবং তৎপুত্র কুমারপালের ও তৎপৌত্র তৃতীয় গোপাল ও তাঁহার (রামপালের) অন্যতম পুত্র মদনপালদেবের সময়ে বরেন্দ্রে পাল-প্রতাপ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং পালসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই তাঁহাদের অধিকার হইতে নিজ নিজ মুক্তির পথ দেখিতেছিলেন—সেই সময়েই বিজয়সেনের পক্ষে সর্ব্ববঙ্গের নরপতি হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

সন্দেহ নাই। বিজয়সেনের রাজ্যের প্রথম অবস্থার বিজয়কাহিনী দেবপাড়া-প্রশস্তির কয়েকটী শ্লোকে (১৮—২৩শ শ্লোক) পরিষ্কাররূপে ইঙ্গিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গের বিজয়বার্ত্তা বর্ণিত আছে; এবং নান্য, রাঘব, বর্দ্ধন ও বীর—এই নরপতিচতুষ্টয়ের পরাজয়কাহিনীও কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিজয়সেন সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই প্রতাপান্বিত মহীপাল রামপাল দেবের মৃত্যুর পরে তদীয় অন্যতম পুত্র কুমারপাল বা মদন-পালকে বরেন্দ্র হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রামপালের বংশধর নরপতিগণ তখনও একবারে বরেন্দ্রভূমি ত্যাগ করেন নাই বলিয়া মনে হয়, অন্যদিকে নূতন নগর বিজয়নগর হইতে বিজয়সেন বরেন্দ্রে স্বাধিকার বিস্তার করিয়া সাম্রাজ্যগঠনে ব্রতী হইতেছিলেন। যদিও প্রথমতঃ তাঁহার রাজধানী বরেন্দ্রের এক প্রদেশে (বিজয় নগরে) সংস্থাপিত ছিল—তথাপি তিনি যে বৃদ্ধবয়সে বাঙ্গালার নানাপ্রদেশে রাজ্য বিস্তার পূর্ণ করিয়া কোনও এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরেও এক রাজধানীর পত্তন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও আমরা এই ব্যাবাকপুরের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হইতেছি। এই রূপ 'বিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়-স্কন্ধাবার' হইতে তদীয় রাজ্যের ৬২ সংবৎসরে লিপিটি প্রদত্ত হয়। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই লিপিতে উল্লিখিত সংবৎ-সংখ্যাকে ৩২ মনে করিয়া পাঠ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমার পূর্ব্ব ছাত্র, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দিনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, মহাশয় এই লিপির সংবৎ-সংখ্যাটির প্রতি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ইহা কিছুতেই ৩২ সংখ্যার চিহ্ন নহে,—ইহা ৬২ সংখ্যার চিহ্ন। দিনেশচন্দ্রের সংখ্যাপাঠই আমার নিকট মূলানুগত বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। অতএব, এই তাম্রশাসনখানি রাজা বিজয়সেন দেবের অতি বৃদ্ধ সময়ের লিপি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালায় ৬২ বৎসর পর্য্যন্ত অন্য কোন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন কি না—তাহা জানা নাই। লিপিতে বিজয়সেন-পুত্র বল্লালসেনদেবের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, এই সময়ে বল্লালসেনই সকল রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন—তৎপিতা তখন কেবল নামে রাজা। এই লিপির সম্পাদন-কাল বিজয়সেনের ৬২ রাজ্য-সংবতে ধরিয়া লইলে, স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় (১) যে "দানসাগরে" ও "অদ্ভুতসাগরে" উল্লিখিত তারিখগুলিকে

(১) J. A. S. B.—N. S. Vol LXI, pp 274-77.

প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বর্ষ ১০৮১ শক বা ১১৫৯ খৃষ্টাব্দ। বল্লালসেন অন্ততঃ একাদশ বর্ষ (নৈহাটি তাম্রশাসনে উল্লিখিত সংবৎসংখ্যা) রাজত্ব করিয়াছিলেন। অদ্ভুত সাগরের বোম্বাই প্রদেশের পুঁথি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বল্লালসেন ১০৯০ শকে (=১১৬৮ খৃষ্টাব্দ) এই গ্রন্থের সম্পাদন আরম্ভ করিয়া (অর্থাৎ তিনি তদীয় রাজ্যের নবম সংবৎসরে ইহার সম্পাদন করিয়া) গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া পুত্র লক্ষ্মণসেনের উপর পূর্ণ সম্পাদন-ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ইহাতে মনে হয় যে, বল্লালসেন ১১ বৎসরের রাজ্যের পরে জীবিত থাকিলেও অধিক কাল জীবন ধারণ করিয়াছিলেন না—তিনি পিতার বৃদ্ধবয়সে নিজে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন, এ কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পিতার অন্ততঃ ৬২ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্বের পরে পূর্ণবয়স্ক পুত্রের পক্ষে ১১ বৎসরকাল রাজ্য-পরিচালনও বড় অল্পকালব্যাপী ব্যাপার বলা যায় না। সে যাহা হউক, বল্লালসেনের রাজ্যকাল সম্প্রতি খৃষ্টীয় ১১৫৯ সংবৎ হইতে প্রায় ১১৭০—৭১ সংবৎ পর্য্যন্ত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং, বিজয়সেন-দেবের রাজ্যের প্রথম বৎসরকে আনুমানিক ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে ধরা যাইতে পারে। এই সময়ে বরেন্দ্র রামপাল দেবের রাজ্য চলিতেছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাটি স্বীকার করিয়া লইয়া এমনও মনে করা অসঙ্গত হইবে বলিয়া প্রতিভাত হয় না যে, বিজয়সেন দেব রাঢ়দেশে হেমন্তসেনের রাজত্বের পর হইতেই নিজেকে বাঙ্গালার রাজা মনে করিয়া স্বরাজ্যকাল গণনা করিতে আরম্ভ করেন—তখন, হয়ত, বরেন্দ্র-ভূমিতে রাজ্য-বিস্তারের উপক্রম করিয়া বিজয়নগর স্থাপনের সময় হইতেই "রাজচক্রবর্ত্তী" হইয়া গৌড়েন্দ্রকে বিতাড়িত করিয়া গৌড়াধিপ সাজিয়া বসিয়াছিলেন। পিতামহের এই গৌড়াধিপত্ব স্মরণ করিয়াই সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে লক্ষ্মণাব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন।

"সেখ শুভোদয়া" নামক গ্রন্থে বিজয়সেন দেবের রাজা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি উল্লিখিত পাওয়া যায়, তাহা সত্য হইলে, এই সেনের রাজ-নির্ব্বাচন সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, রামপাল দেবের স্বর্গারোহণের পর, মন্ত্রিগণ [illegible] এক শিবোপাসক বাঠুরিয়াকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। [illegible] দেব শিবোপাসক ছিলেন তাহা নিশ্চিত তথ্য, কিন্তু সেই গ্রন্থে তাঁহাকে কোন

অবজ্ঞাসূচক "কাঠুরিয়া" বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা কঠিন। সেনরাজগণ বাঙ্গালী ছিলেন না—তাই বুঝি জাতিতে বাঙ্গালী পালরাজগণের মন্ত্রিগণ আগন্তুক রাজাকে "কাঠুরিয়া" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, রাজত্বের প্রথম ২২।২৩ বৎসর পর্য্যন্ত বিজয়সেনদেবকে রাজ্য সংস্থাপনের অক্লান্ত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যের পরবর্ত্তী সময়ে গৌড়-বঙ্গ-রাঢ়ে পালরাজগণের কোনপ্রকার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় না। নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে এইরূপ অনুমান করাই সেই সময়ের ইতিহাসের নূতন উপাদান-পরীক্ষা বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

বরষার অভিষেক।

নামিল বরষা আজি গগনের মেয়ে
জলদের দিব্যরথে আসিলরে ধেয়ে;
কদম্বের রেণু মাখি' শ্যামল বরণা—
চরণে ঝুমুর বাজে রজত ঝরণা
ছাই-রঙ্গী সাড়ীখানি কিবা কারিগরি!
রামধনু পা'ড় তায় বিজলীর জরী—
বরষা অঞ্চল যবে আকাশে বনায়
যতেক সরিৎ সখি তুফানে ফনায়।
ভেকের আনন্দধ্বনি উঠে চারিদিক;
ময়ূরেরা কেকারব করে মাঙ্গলিক,
বাজিল পুষ্কর বাদ্য ভেরীর নিনাদ,
বরষারে দেখি সব ঘুচিল বিষাদ।
চাষীরা আনন্দ প্রাণে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া
বরষার অভিষেক করে পূর্ণ হিয়া।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভগ্নবিগ্রহ।

—:০:—

১

কার দেবতা ভেঙ্গে গেল
আঘাত লেগে কোদালীতে ?
কালাপাহাড়ী বিদ্যাটুকু
আস্‌ল কেবা ফলাইতে ?

২

কত যুগের ঠাকুর এ যে
কখন বুঝি লীলাভরে,
কত ভক্তে পাগল করি
লুকাইলেন সরোবরে !

৩

আজকে তাঁর এম্‌নি দশা
অনাড়ীর এ অনাচারে,
সোণার শশী লুটায় ভূমে
ছিঁড়ল চারু ফুল হারে !

৪

এখনো তবু অধর কোণে
মধুর হাসি লেগে আছে,
জ্যোছনা যেন করছে খেলা
পোড়বাড়ীর কাছে কাছে !

৫

হাতের বাঁশী পড়ল খসে,
লীলাকমল গেল টুটে,
তাঁরই সনে দস্যুপণা
ভুবন ত্রিনি লন লুটে!

৬

হায়রে কালা! কালের ফেরে
তুমিও আজ ধরা দিলে?
দারুণতর অস্ত্রলেখা
কোমল বুক পেতে নিলে!

৭

ত্রিভঙ্গিমা ঘুচে গেল
বাঁকা শ্যামের চতুরালী;—
নয়ন ছেপে অশ্রু এল
কবির চিতে চিতা জ্বালি'!

৮

ভাঙ্গা ঠাকুর! এস তবে
আমার এ ভাঙ্গা ঘরে,
ভাঙ্গা হৃদি লাগবে জোরা
রাঙ্গা চরণ শিরে ধরে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বিবর্ত্তন-বাদ।

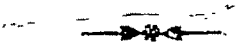

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

ধরাতলে যে কত প্রকার জীব আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জৈব-শক্তিসম্পন্ন বস্তুই বা কত বিচিত্র, তাহাও বলা কঠিন। ভূতলে, ভূমধ্যে, সাগর-গর্ভে, গিরিপৃষ্ঠে, আকাশে সর্ব্বত্রই জীবনীশক্তিসম্পন্ন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি এক কথায় মোটামুটি হিসাবে এ কথা বলিতে পারা যায় যে, পৃথিবীর কোথাও জীবশূন্য স্থান নাই; কেহ 'অণোরণীয়ান্' কেহ 'মহতো মহীয়ান্।' ফলে এই ধরিত্রী জীবপূর্ণা। জীবদিগের মধ্যে চারিটি সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান। যথা—উহারা খায়, বৃদ্ধি পায়, সন্ততি উৎপাদন করে এবং মরিয়া যায়। জীববিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মধ্যে অনেকে মৃত্যুটাকে লক্ষণের মধ্যে ধরেন না,—তাঁহারা উহাকে পরিবর্ত্তনের মধ্যেই পরিগণিত করেন। পরিবর্ত্তন জীবের ধর্ম্ম। তাঁহাদের মতে জীবের সাধারণ কার্য্য তিনটি,—ভোজন, বর্দ্ধন ও প্রজনন। আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য মরণকে সাধারণ জৈব লক্ষণ ও জৈব কার্য্যের মধ্যে ধরিলাম। অবশ্য মরণও যেমন একটা পরিবর্ত্তন, বর্দ্ধনও সেইরূপ আর একটা পরিবর্ত্তন। যাহা হউক, এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভে আর সে কচকচি না তুলিয়া, মরণকে জৈব কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ধরিলে আমাদের সুবিধা হয়, এই বলিয়া আমরা রেহাই পাইতে চাহি।

এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে; এই ধরাতলে যে এত জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণী রহিয়াছে,—প্রকৃতি বা প্রজাপতি কি ইহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্ট করিয়াছেন?—না তিনি একটা কিছু করিয়া দিয়া খালাস পাইয়াছেন—আর তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট নিয়মবশে, পরিবর্ত্তনফলে, ধরাতলে কোটি কোটি জীবের আবির্ভাব হইয়াছে? অবশ্য এমন তর্কও উঠিয়াছে যে, যখন প্রজাপতির বা প্রকৃতির নিয়মবশে এত জীবের আবির্ভাব, তখন উহারা তাঁহারই সৃষ্ট একথা বলা যাইতে পারে। আমরাও সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের এখন দেখিতে হইতেছে যে, পৃথিবীতে যত জীব বর্ত্তমান, তাহারা সকলেই কি এক জীবের বা

একজাতীয় জীবের বংশধর ? না—প্রত্যেকের ঠিক নিজের অনুরূপ এক একটি আদি-দম্পতি সৃষ্ট হইয়াছিল ?

ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বপ্রথমে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই বলেন যে, বিধাতা প্রত্যেক জীবের এক একটি স্বতন্ত্র আদি-দম্পতি সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের মনুসংহিতা প্রভৃতিতে ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, প্রত্যেক জীবের বংশলতা স্বতন্ত্র। উহাদের পরস্পরের মধ্যে কস্মিন্ কালেও জ্ঞাতিত্ব রক্ষিত ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে য়ুরোপে এই বিশ্বাসের একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে একটা নূতন বাতাস উঠে। সেটি অনুসন্ধিৎসার বাতাস। এই সময় হইতে লোক বিনা প্রমাণে আপ্তবাক্যেও বিশ্বাস করিতে চাহে না। সকলেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিতে থাকেন। তাহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বাতাসে জোর বাঁধে। এই সময় মানুষের অনুসন্ধান চারিদিকে প্রসৃত হইতে থাকে। সৃষ্টিতত্ত্ব সন্ধানেও এই সময় লোকের মন আকৃষ্ট হয়। প্রথমে ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিৎ লামার্ক আভাস দেন যে, এক জাতীয় জীব অন্য জাতীয় জীবে পরিণত হইতে পারে। ইনি মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদিগের শারীর গঠনের সাদৃশ্য দর্শনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তৎপরে ইনি মেরুদণ্ডবান্ প্রাণী সম্বন্ধেও এই সিদ্ধান্তের আরোপ করেন। ইনি বলেন, পারিপার্শ্বিক প্রভাবে এক জাতীয় জীব অন্য জাতীয় জীবে পরিণত হইয়া থাকে। জীব মাত্রকেই প্রতিবেশ-অবস্থার সহিত আপনাকে সমঞ্জসীভূত করিয়া লইতে হয়। আমি যে অবস্থায় পড়িব, আমাকে সেই অবস্থার যোগ্য করিয়া লইতে হইবে, নতুবা প্রকৃতির প্রতিকূলতায় আমি টিকিতে পারিব না। সুতরাং আমাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল করিয়া লইতে হইবে। এই প্রচেষ্টাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য সাধন (Adaptaton to environment) বলা হয়। যথা জিরেফির (giraffe) ও জিব্রা আদৌ এক জাতীয় জীব ছিল, তবে উহাদের একদল ক্রমাগত ঘাড় বাড়াইয়া তালপাতা খাইবার চেষ্টা করাতে তাহাদের ঘাড় অত্যন্ত লম্বা হইয়াছে। সাপেরও এককালে পা ছিল, তবে ক্রমাগত পুরুষ পুরুষানুক্রমে ফাটালে ফাটালে গড়াইয়া বেড়াইয়া অব্যবহারে

উঁহাদের চরণ লোপ পাইয়াছে। ইনি বলেন যে, আত্মরক্ষার জন্য বহু পুরুষ-ব্যাপী বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার ফলে এক জীব হইতে বহু প্রকার গঠনসম্পন্ন বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইঁহার মতটা ইহার সময় বড় একটা গ্রাহ্য হয় নাই। ইনি সমঞ্জসীকরণের (adaptation) এর উপর বড় বেশী জোর দিয়াছিলেন এবং নিজের মতে অতীন্দ্রিয় দার্শনিক তত্ত্ব একটু অধিক মাত্রায় মিশাইয়াছিলেন; সেই জন্যও তাঁহার মত অনেকেই গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কেহ কেহ এই মত গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিলেন। এখনও যে এই মতবাদী লোক কেহ নাই, তাহা নহে।

আর একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার লামার্কের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পূর্ব্বেই নেপোলিয়ানের সৈন্য দল্ভ প্রাণিবৃত্তান্তবিদ্‌গণ মিশর হইতে কতকগুলি সুরক্ষিত মৃতদেহ পাঠাইয়া দেন। ঐ সকল সুরক্ষিত শবের (mummy) মধ্যে বানর, কুক্কুর, বিড়াল, সারসপক্ষী, শিকারী পক্ষী, ও কুম্ভীর প্রভৃতির সুরক্ষিত দেহও অনেক ছিল। উহা অন্ততঃ তিন হাজার বৎসরের পুরাতন। কিন্তু আধুনা মিশরে ঐ জাতীয় যে সমস্ত জীব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইতে ঐ সকল অতি প্রাচীন জীবদেহের অণুমাত্র পার্থক্য লক্ষিত হয় নাই। লামার্কের প্রতিকূলবাদীরা এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, যদি আড়াই হাজার তিন হাজার বৎসর জীবদেহে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ছয় হাজার বৎসরে জীবদেহে এত পরিবর্ত্তন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? লামার্ক ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ দুই তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে মিশরের জলবায়ুর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, নোয়ার আমলে সংঘটিত জলপ্লাবনে এক এক জোড়া তিন শত জীব লোপ পাইয়াছিল, ইহা সত্য নহে। বলা বাহুল্য, তখন তাঁহার সে যুক্তি কেহ কাণে তুলে নাই।

কিন্তু মানুষের মনে একটা চিন্তার তরঙ্গ উঠিলে তাহা সহজে নিবৃত্তি পায় না

* এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে বাইবেলের মতে পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর সৃষ্ট হইয়াছে। বাইবেলের মতানুসারে যাঁহারা সময় নির্দ্দেশ করিতেন, তাঁহারা পৃথিবীর বয়স সাড়ে তিন হাজার বৎসর হইতে সাত হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ধার্য্য করিয়াছেন। আর্ম্মাঘের প্রধান ধর্ম্মযাজক (Archbishop) জেমস আশের জ্যোতিষগণনার দ্বারা সাব্যস্ত করেন যে খৃষ্ট পূঃ ৪০০৪ অব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী ভোর ৬ টার সময় পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। Wrexel-এর ধর্ম্মযাজক ভাস্কার লেখেড ঐ মতই বাইবেলের পার্শ্ব টীকায় গ্রহণ করেন। খৃষ্টানদিগের এই ভ্রান্ত ধারণা পূর্ব্বে বিজ্ঞানের গতিকে অনেকটা রুদ্ধ করিয়াছিল। এখনও অনেকের অস্তিত্বকাল সম্বন্ধে উহা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিতেছে।

পা মার্কের কথাটা কেহ তখন তেমন গ্রাহ্য করিল না,—উহা কিছু কাল চাপা পড়িয়াই রহিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর এই ভাবে কাটিয়া গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চার্লস ডারবিন্ নামক জনৈক মনীষাসম্পন্ন ইংরেজ Origin of Species নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি অনেক তথ্যদ্বারা সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে, এক কিম্বা অতি সামান্য দুই একটি আদি জীব হইতে ক্রমিক পরিবর্ত্তনফলে এই বিচিত্রা ধরায় নানা জাতীয় জীবের অভ্যুদয় হইয়াছে। তিনি নানাজাতীয় উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর বিষয় পর্য্যবেক্ষণ (observation) করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তিনি বলেন,—জীবদেহে পরিবর্ত্তন হইতেছেই; এই পরিবর্ত্তনফলেই এক জাতীয় জীব কালবশে বিভিন্ন প্রতিবেশ-শক্তির প্রভাবে অন্য জাতিতে পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তাঁহার মতে এই পরিণতিপ্রাপ্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটী বলা যাইতে পারে। প্রথম পরিবর্ত্তন বা বিভিন্ন হওন (variation), দ্বিতীয় বীজশক্তি (Heredity) এবং তৃতীয় জীবন সংগ্রাম (struggle for existenee)। প্রধানতঃ এই তিনটি কারণের কার্য্যফলে জীবের জাত্যন্তরপরিণতি হয়,—এক জাতীয় জীবের বংশে অন্য জাতীয় জীব জন্মে। তাঁহার গ্রন্থে তথ্যসংগ্রহের বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষিত হয়। তিনি দেখাইয়াছেন,—এক হইবার কারণ যতই থাকুক, এক জাতীয় জীবের অন্তর্ভুক্ত একের সহিত অন্যের কিছু না কিছু পার্থক্য থাকিবেই। একই বটফলের মধ্যস্থ দুইটি বীজ একই জমিতে পাশাপাশি দুইটি স্থানে রোপণ কর,—তাহা হইতে যে দুইটি বটবৃক্ষ জন্মিবে, তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য যতই থাকুক না কেন—একটু না একটু বিভিন্নতা থাকিবেই। দুইটি গাছ সর্ব্বাংশে কখনই একরূপ হইবে না। উভয়ের উপর একই প্রতিবেশ প্রভাব কার্য্য করিলেও পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতি কেমন যেন অলক্ষ্যে একটু পার্থক্যের সৃষ্টি করিবেনই। এটা প্রকৃতির খেয়ালি। একই বৃক্ষের সকল পাতা, সকল ফল ঠিক সমান হয় না,—এক দম্পতির সকল সন্তান হুবহু একরূপ হয় না। এমন কি যমজ সন্তান যদি দুইটি ঠিক একরূপ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে কিছু না কিছু বিভিন্নতা থাকিবেই। এই ভিন্নতা কেবল একদিকেই আত্মপ্রকাশ করে না। নানাক্রমে নানাদিকে ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। শারীরিক গঠনে, যান্ত্রিক কার্য্যে, চরিত্রের ভাবে, ওজনে, প্রজননশক্তিতে, রোগবিতাড়নসামর্থ্যে এই বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক ব্যাপারে কোন না কোন দিক্ দিয়া এই ভিন্নতা লক্ষিত হইবেই হইবে।

দ্বিতীয় কারণ,—বীজশক্তির বা বংশানুক্রমিকতা (Heredity)। বীজ-শক্তির প্রভাবে পিতা ও মাতার গুণ সন্তানে বর্ত্তে। বংশধারা ধরিয়া গুণ পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সন্তানে সংক্রামিত হয়। ইহার কারণ পিতামাতার জৈবকোষ (Cell) হইতে সন্তান জন্মে বলিয়া সন্তান জনকজননীর তুল্য হইয়া থাকে। এই গুণ কেবল দুই এক পুরুষ পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয় না; বহুপুরুষ পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, পূর্ব্বপুরুষের বিশেষ ব্যাধি চারিপুরুষ অতিক্রান্ত করিয়া পঞ্চম পুরুষে প্রকাশ পায়। ডারুইন এবং তাঁহার আধুনিক শিষ্যগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, এই বৈজিক শক্তি না থাকিলে ক্রমবিকাশ হইতে পারিত না। পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের কেন্দ্রাতিগ শক্তি ও কেন্দ্রানুগ শক্তি যেমন গ্রহগণের গতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে, তাহাদিগকে তাহাদের কক্ষপথ হইতে বিচ্যুত হইতে দেয় না;—সেইরূপ পরিবর্ত্তন ও বৈজিক শক্তি মিলিত হইয়া জীবকে ক্রমবিকাশের নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর করে। এই বীজশক্তির কার্য্য বড়ই জটিল। অল্প কথায় ইহার সকল দিক্ ও সকল কাজ বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। বৈজিক শক্তির উপর প্রতিবেশ-শক্তির (environment) প্রভাব অনেক পরিবর্ত্তন ঘটায়। উদ্ভিদের হরিদ্বর্ণ পুরুষানুক্রমে সংক্রমিত। কত যুগযুগান্তর ধরিয়া গাছ সবুজবর্ণ হইয়া জন্মিতেছে, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে হরিদ্বর্ণ বৃক্ষের বীজ রোপণ কর, দেখিবে উহা হইতে জাত বৃক্ষ সবুজবর্ণ নহে। আলোকের অভাবেই উহার এই বর্ণবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আবার সেই চারাকে সৌরকরসমুজ্জ্বল স্থানে রক্ষা কর, দেখিবে উহা ক্রমে ক্রমে আবার সবুজবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তুল্য অবস্থায় পূর্ব্বপুরুষের গুণপ্রাপ্তি বৈজিক শক্তিরই প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। যে জমিতে লৌহের সম্পূর্ণ অভাব, সেই জমিতে হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদের বীজ বপন কর, দেখিবে—সেই জমিতে জাত বীজ হইতে উদ্ভূত চারা সবুজবর্ণ ধারণ করে নাই। ঐ জমিতে কিছু লৌহ মিশাইয়া দেও, দেখিবে উহা আবার সবুজবর্ণ ধরিয়াছে। ইংলণ্ডের ইংরেজ খুব শুভ্রবর্ণ। গরমদেশে ইহারা আসিলে ইহাদের বর্ণ মলিন হইয়া যায়। কয়েক পুরুষ ধরিয়া উষ্ণকোটীবন্ধে বাস করিলে ইহাদের বর্ণ অনেকটা ময়লা হইয়া পড়ে। কিন্তু যেই সেই সৌরকর প্রভাবে মলিন ইংরেজ পুনরায় স্বদেশে ইংলণ্ডে যান, অমনই তাঁহাদের সন্তান এক পুরুষেই সেই পূর্ব্বকার পৈতৃক-বর্ণই প্রাপ্ত হয়। অনেক বাঙ্গালী দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করিয়া অনেকটা

বাস করিলে বেশ ফর্শা হয় বলিয়া মনে হয়। পঞ্চনদপ্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। অবশ্য ঐ দেশপ্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যেই যদি বিবাহবন্ধন নিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলেও ঐরূপ ফল দেখা যায়। পক্ষান্তরে নিগ্রোরা শীতপ্রধান দেশে বহু পুরুষ ধরিয়া বাস করিলেও তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ কিছুতেই ঘুচে না। ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেই জন্য অনেকে অনুমান করেন যে, নিগ্রোর কৃষ্ণবর্ণ সূর্য্যকিরণসম্ভূত নহে। উহার কৃষ্ণত্বের অন্য কোন কারণ আছে। আবার কেহ কেহ এমনও অনুমান করেন যে, বহু লক্ষ বৎসর প্রখর সূর্য্যকিরণে বাসহেতু তাহাদের বর্ণ পাকা হইয়া গিয়াছে। তাই দুই দশ পুরুষে তাহাদের মলিনত্ব ঘুচে না। বলা বাহুল্য প্রথমোক্ত মতবাদীদের সংখ্যাই অত্যন্ত প্রবল। যাহা হউক, প্রতিবেশ-শক্তির প্রভাবে বৈজ্ঞিক শক্তির পরিবর্ত্তন (modification) ঘটে। জৈবধারা বিকাশে এই নিয়মের প্রভাব অল্প নহে।

ডারবিন ও তাঁহার পরবর্ত্তী মনস্বিগণ ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন,—এই পরিবর্ত্তন যে ধীরে ধীরে ঘটে, তাহা নহে। ক্ষেত্রবিশেষে অকস্মাৎও এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সে পরিবর্ত্তন অত্যন্ত দ্রুত হয়। অনেকে বলেন, এই আকস্মিক দ্রুত পরিবর্ত্তনই এক জাতীয় জীব হইতে অন্যজাতীয় জীবের আবির্ভাবের কারণ। আমষ্টার্ডামের অধ্যাপক হিউগো ডি ভ্রাইস (Hugo de Vries) বলেন, ধীরে ধীরে জীবদেহে যে পরিবর্ত্তন ঘটে (continuous variation) তাহার ফলে এক জাতীয় জীব হইতে অন্যজাতীয় জীবের আবির্ভাব হয় না,—আকস্মিক দ্রুত পরিবর্ত্তনের (discontinuous variation) হইতেই জীবের বিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি ওগ্রাডী (O' Grady) এই মতটির আরও একটু পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইঁহার মত এই যে, ধরাপৃষ্ঠে এক এক সময় এক একটা ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার ফলে বিভিন্ন জাতীয় জীবের অভ্যুদয় হইয়াছে। এই মতকে পরিবর্ত্তনবাদ (Theory of Mutation) বলে।

তাহার পর জীবনসংগ্রাম (Struggle for Existence)। পৃথিবীতে যত জীব জন্মে, তাহা যদি সবই জীবিত থাকে, তাহা হইলে অল্প দিনেই ধরায় আর স্থান সঙ্কুলান হয় না। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মবশে ইহার অনেকগুলিই মরিয়া যায়। যাহারা যোগ্যতম, তাহারাই টিকিয়া যায়। ইহাকে Survival of the fittest বা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন বলে। এই যোগ্যতার পরিমাপক,

তাহারাই বাঁচিয়া যায় ও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (natural selection) কহে। যৌন নির্ব্বাচন এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন।

ডারবিনের মতে প্রধানতঃ যে তিন কারণে এক বা একরূপ কতকগুলি জীব হইতে ধরাতলে বিচিত্র বহু জীবের আবির্ভাব হইয়াছে,—আমরা এ স্থলে তাহার একটু আভাসমাত্র দিলাম। এই মতটি স্থূলভাবে বুঝাইতে হইলেও এই চারিটি বন্দর্ভে উহা শেষ করা যায় না। ডারবিনের পর তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ এই মতের অনেক পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এই মতটি কিছুদিন প্রবল হইয়াছিল, এখনও ইহা বিলক্ষণ প্রবল আছে। গ্যাল্টন প্রভৃতি ইহা সামাজিক ব্যাপারেও প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই মত যে সত্য, তাহার পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করা যায় নাই। মৎস্য হইতে সরীসৃপের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা লক্ষণ দেখিয়া অনুমান মাত্র, প্রত্যক্ষসিদ্ধ তথ্য নহে। বর্ত্তন বা বস্তুবিজ্ঞানের ন্যায় ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ করাও সম্ভব নহে। ইহার অনেক নিয়ম এখনও সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। ডারবিন স্বয়ং বলিয়াছেন, Our ignorance of the laws of variation is profound, অর্থাৎ বিবর্ত্তনের নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অত্যন্ত অধিক। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকরাও বিস্তর ঠিক ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, এখনও এই মতটি আনুমানিক।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক মহলে এই মত সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ডারবিন সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন যে, বানর হইতেই মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধান দ্বারা যে তথ্য জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে মনে হইতেছে যে, ঐ মত ঠিক নহে; নরবানর এক সময়েই ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছে। অধ্যাপক লিওনার্ড ডন কাইর লিখিয়াছেন যে, "অনেকগুলি বিশেষ যোজক জাতির অভাব লক্ষিত হইতেছে। মানুষের পূর্ব্বপুরুষের সন্ধান মিলিতেছে না; যাহাদিগকে এক সময় মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, তাহারা সমবংশীয় জাতি বা জাতি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে,—লোক মানুষের অভিব্যক্তি নির্ণয় যতটা সহজ বলিয়া মনে করিত, উহা তত সহজ নহে (but the hope of finding all the stages, especially in the ancestry of man, has not been realized and it has been what at one time were regarded as direct ances-

tors are collaterals and that the problem of human evolution is much less simple than was once supposed.) পূর্ব্বে মনুষ্য-প্রতিম বানরকে (anthropoid ape) মানবজাতির পিতামহ বলিয়া বৈজ্ঞানিকরা প্রচার করিয়াছিলেন,—এখন ষাট বৎসর নূতন তথ্য অনুসন্ধানের পর অনেকেই বলিতেছেন,—একই আদি পুরুষ হইতে মানুষ ও মানুষের মত বানর উদ্ভূত হইয়াছে। মানুষ ও বানর এক বংশের দুইটি শাখা। মানুষের উৎপত্তি এখনও তিমিরাচ্ছন্ন। * এখনও অভিব্যক্তিবাদের ব্যাপারগুলি অন্ধকারে অনুসন্ধানের মতই চলিতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের যতটা অভিব্যক্তির বিকাশ হয় বলিয়া ডারবিন মতাবলম্বীরা মনে করিয়াছিলেন,—বাস্তবিক তাহার দ্বারা ততটা কার্য্য সিদ্ধ হয়—কি না,—ইদানীং সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

আর একটা দিক্ দিয়া ইউরোপ এই বিষয় ভাবিতে চেষ্টা করিতেছেন। উদ্ভিদরা যে প্রাণবন্ত, তাহা ইউরোপ এত দিন জানিতেন না। উহা প্রাচীন ভারতীয় সিদ্ধান্ত। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইউরোপ সমক্ষে সম্প্রতি উহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইউরোপ এ পর্য্যন্ত জৈব-অভিব্যক্তিবাদের মধ্যে উদ্ভিদ্ জাতিকে ধরেন নাই; এখনও তাঁহারা উদ্ভিদকে জৈব অভিব্যক্তির স্বতন্ত্র ধারা বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, এখন দেখা যাইতেছে যে, জীব-জগতে জীবের তিনটি স্তর আছে, ১ম, উদ্ভিদ, ২য় তির্য্যক্ প্রাণী, ৩য় মনুষ্য। সম্প্রতি পোলাণ্ডের কাউণ্ট কোর্জ্জেব্স্কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই তিনটি স্তরের বিভিন্ন জীবের শক্তিগত পার্থক্য আছে প্রথম উদ্ভিদ জাতি সৌর শক্তিকে আপনার আয়ত্ত করে। ইহারা একস্থানে স্থির থাকে এবং ভূমি হইতে পুষ্টি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের জীবকোষে (cell) সেই শক্তি সঞ্চিত রাখে; এই সৌর শক্তি (Solar energy) আবদ্ধ রাখাই উদ্ভিদের প্রধান জৈব কার্য্য। পক্ষান্তরে তির্য্যক প্রাণীর কার্য্য তাহা অপেক্ষা আরও একটু অধিক অগ্রসর। ইহারা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চরণশীল। ইহারা সৌর শক্তিকে সংগ্রহ করিয়া তাহা ব্যয় করে। সঞ্চরণাদি ক্রিয়ায় তাহাদের সেই শক্তি ব্যয়িত হয়। ইহারা স্থানকে আয়ত্ত করিয়া থাকে। প্রত্যেক

* It is possible that man arose as a mutation as an anthropoid genius in short, but the factors that led to his emergence are all unknown.—Evolution by Arthur G. Geddes and J Arthur Thomson.

তির্য্যক্ প্রাণী নিজের জন্য যায়গা করিয়া লয় এবং বংশ বৃদ্ধি দ্বারা ক্রমশঃ অন্য স্থানাধিকার করিতে থাকে। এই তির্য্যক প্রাণীর মধ্যে জীবন সংগ্রাম প্রবল। তির্য্যক্ প্রাণী স্থানানুবন্ধী জীব (-binding space class) কিন্তু মানুষ তাহা নহে। মানুষের প্রধান শক্তি এই যে, সে অতীত অভিজ্ঞতাকে রক্ষা করিয়া ভবিষ্যদ্বংশধরকে তাহা দিয়া যাইতে পারে। অতীতের ও বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভবিষ্যতের অনুমান করিতে পারে। কোন তির্য্যক্ প্রাণীই তাহা পারে না। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়ের এই তিনটি বিভাগের জ্ঞান মানুষের আছে। মানুষ পূর্ব্বপুরুষের অভিজ্ঞতার ও চিন্তার অধিকারী হয়, এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের জন্য তাহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া বা অন্যবিধ উপায়ে রাখিয়া যাইতে পারে। এমিবা হইতে মানববৎ বানর (anthropoid ape) পর্য্যন্ত কোন জীবই তাহা পারে না। ইহাদের নিকট অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের এই দুই পরিচ্ছেদই অন্ধকারময়। এই জন্য মানব তির্য্যক্ প্রাণী হইতে স্বতন্ত্র পর্য্যায়ের জীব। এই মতাবলম্বীরা উদ্ভিদ, তির্য্যক্ প্রাণী ও মানুষ এই ত্রিবিধ জীবকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্য্যায়ে ভুক্ত মনে করিলেও ডারবিনের অভিব্যক্তিবাদের সহিত বিরোধ করিতে চাহিতেছেন না। বরং তাঁহাদের মতের সহিত ডারবিনের মতের সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস পাইতেছেন! কিন্তু যত দিন তির্য্যক্ প্রাণীর সহিত মানুষের সংযোজক জীবের সন্ধান না পাইতেছেন, ততদিন সে চেষ্টা সফল হইবার নহে। উহা এখন অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায় অনিশ্চিত ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে।

প্রাচীন ঋষিরাও এই জীব পর্য্যায়ের ক্রমবিকাশের একটা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। সে কথা নানাস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে উক্ত আছে। অগ্নের ঐতরেয় আরণ্যকে (২।৩।২) বলা হইয়াছে, স্থাবরজঙ্গম সমস্ত চরাচরই আত্মা প্রকাশমান; তন্মধ্যে স্থাবর অপেক্ষা উদ্ভিদে, উদ্ভিদ অপেক্ষা পশুতে এবং পশু অপেক্ষা মানুষে উহা ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া থাকে। অর্থাৎ মায়া উপহত আত্মা প্রথমে তমোগুণে অভিভূত হইয়া জড়বৎ থাকে; তাহার পর যতই তাহার চিচ্ছক্তির উন্মেষ হইতে থাকে, তমোগুণে নিরস্ত হইয়া সে রজোগুণের আশ্রয় লাভ করে, ততই তাহার ক্রিয়াশক্তি একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আর তাহার একটা জন্ম ছাড়িয়া আর একটা জন্মলাভ হয়। এমনি পর জন্মে সে ধাপে ধাপে জীব আত্মোন্নতিতে উঠিতে থাকে। (ভাগবতীয় পুরাণ)

স্থাবরাস্ত্রিংশলক্ষঞ্চ জলজো নবলক্ষকঃ।
কৃমিজা দশলক্ষঞ্চ রুদ্রলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ॥
পশবোবিংশলক্ষঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥

প্রাণতোষিণী ১।৩।

বৃহৎ বিষ্ণু পুরাণে ব্যাপারটা আরও একটু পরিস্ফুট করিয়া বলা হইয়াছে, যথা—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্
কূর্ম্মশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণং
ত্রিংশ লক্ষং পশূনাং চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

ইহাতে বেশ লেখা আছে যে, জীবাত্মা প্রথমে উদ্ভিদ (২০ লক্ষ প্রকার) পরে জলজ (৯ লক্ষ যোনি) তৎপরে কূর্ম্ম অর্থাৎ উভচর ও সরীসৃপ (৯ লক্ষ যোনি) তাহার পর পক্ষী (১০ লক্ষ) তাহার পর পশু (৩০ লক্ষ) তৎপরে বানর (৪ লক্ষ) যোনিতে জন্মিয়া পরে মানুষ হইয়া জন্মে। পাঠক দেখুন প্রথম উদ্ভিদ বাদ দিলে, ইহাতে ডারবিণের ও নিয়ো ডারবিনের মতে জীববিকাশের ধাপের বা পর্য্যায়ের সহিত এই মতের মিল আছে; যথা জলচর হইতে উভচর ও সরীসৃপ, সরীসৃপ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু, পশু হইতে বানর, বানর হইতে মানুষ অভিব্যক্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্যগণ জীবের বাহ্য মূর্ত্তিরই ক্রমিক অভিব্যক্তি দেখেন; ঋষিরা জীবাত্মার আভ্যন্তরীণ শক্তির ক্রমবিকাশ অনুসারে বাহ্য দেহের ক্রমবিকাশ ঘটে, এই সিদ্ধান্ত করেন।

ঐতরেয় উপনিষদে উক্ত আছে, বিধাতা অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সৃষ্টি করিলে তাহারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত আধার বা দেহ চাহেন। বিধাতা তাঁহাদিগকে তখন এক গোরুর (পশুর) শরীরে রাখিয়া দেন। তখন তাঁহারা বলিলেন, ইহাতে আমাদের কাজের সুবিধা হইতেছে না, তখন তাঁহাদিগকে একটা অশ্বদেহ (অপেক্ষা কৃত উন্নত পশুদেহ) প্রদান করিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন, উহাতেও আমাদের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। শেষে বিধাতা তাঁহাদিগকে মানবাকৃতি দেহ দিলেন। সেইবার তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, এইবার ঠিক হইয়াছে। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, পশুদেহে আত্মার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায় না বলিয়াই শেষে বিধাতা মনুষ্য দেহের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তির্য্যক্ প্রাণীর দেহ অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ দেহে চেষ্টা দ্বারা জীবাত্মার শক্তি যখন স্ফূর্ত্তি পায়, ক্রমশঃ তমোভাবের ক্ষয় ও রজোভাবের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখনই জীব জৈব আরোহণীর ধাপে ধাপে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। ইহাই শ্রুতির নির্গলিতার্থ। মনু বলিয়াছেন,—

"অসংখ্যা মূর্ত্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ।
উচ্চাবচানি ভূতানি সত্ত্বং চেষ্টয়ন্তি যাঃ॥" ১২।১৫

অর্থাৎ স্রষ্টার দেহ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অসংখ্য জীব বাহির হইতেছে এবং উচ্চ নীচ দেহে থাকিয়া আপন আপন অভাব পূরণের চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার দ্বারাই জীবাত্মার তমোবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া পড়ে। যেমন উহা ক্ষয় হইতে থাকে, তেমনই বিধাতা উহাকে উন্নততর দেহ দিতে থাকেন। আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের সহিত ভৌতিক দেহেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। এই উন্নত দেহের যাহা অভাব থাকে; প্রকৃতিই তাহা পূরণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

"জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"

ইহার সরল অর্থ—জীবের জাত্যন্তর পরিণতি হইলে প্রকৃতি সেই পরিণত জীব দেহের যাহা অভাব,—তাহা পূরণ করিয়া দেন। অর্থাৎ এক জাতীয় জীবের দেহ অন্য জাতীয় জীবের দেহে পরিণত হয়। যখন এইরূপ পরিণতি ঘটে,—তখন, পূর্ব্ব শরীরে পর শরীরের যে অভাব থাকে, প্রকৃতি তাহা পূরণ করিয়া দেন। *

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই দৈহিক পরিবর্ত্তন একই দেহে হয়, না বংশানুক্রমে হয়, না জন্মান্তর হিসাবে হয়? অর্থাৎ নহুষ যেমন সর্প হইয়া নন্দীকেশ্বরের যেমন দেহ পরিবর্ত্তন হইল, (প্রবাদ মতে) তেলা পোকা যেমন নাড়ু পোকা হইয়া যায়,—সেইরূপ এক জন্মেই এই দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটে,—অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অবনতি হিসাবে পুরুষপরম্পরা ধরিয়া সেই পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া কোন দূর সংশধরের সাত্যন্তরে পরিণতি হয়? অথবা, সেই আধ্যাত্মিক উন্নতিশীল জীবেরই জন্মান্তরে দেহ পরিবর্ত্তন হয়? সমস্যা এইখানেই।

* এ স্থলে বেদব্যাসভাষ্যসম্মত ব্যাখ্যাই গৃহীত হইল। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি টীকাকারগণ বলেন যে, উহাতে মনুষ্যজাতি হইতে অন্য জাতির পরিণামের কথা বলা হইতেছে। সে ব্যাখ্যা আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হয় না। পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে আমার বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। লেখক।

পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য ইহ জন্মে কায়ারই পরিবর্ত্তন ঘটে,—এইরূপই বলিয়াছেন। কিন্তু তির্য্যক্‌প্রাণীর ত ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই। সেই জন্যই আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি টীকাকার মানবসম্বন্ধেই ঐ কথা বলা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল জীবেরই আছে। প্রত্যেক জীব যদি তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভালভাবে করে, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্ম সাধন হয়। পোল পণ্ডিত বলিয়াছেন, পশুর ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই। সুতরাং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করা পশুর ধর্ম্ম নহে। পশুর দয়া দাক্ষিণ্য ভক্তি প্রভৃতি নাই। সুতরাং তাহার নিকট উহার আশা করা যায় না। তাহার সহজাত জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি তাহাকে যেটুকু করিবার অধিকার দিয়াছে, তাহা অকুণ্ঠভাবে করিলেই তাহার ধর্ম্মসাধন হয়। তাহা করিলেই তাহার ক্রমোন্নতি ঘটিবে; কিন্তু মানুষের সময় জ্ঞান আছে,—ভবিষ্যৎ জ্ঞানও আছে,—পরকালের কথাও মানুষ ভাবে। এমন মানুষ নাই, যাহার কোন না কোন প্রকার ধর্ম্মবুদ্ধি ও পরকাল জ্ঞান নাই। সে যদি সরলভাবে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহার পর-পর উন্নতি হইবেই হইবে; কিন্তু কুপ্রবৃত্তির এবং কুশিক্ষার ফলে,—অথবা প্রকৃতির বশে সে যদি নাস্তিক বা অধার্ম্মিক হয়,—তাহা হইলে তাহার অবনতি হইবেই হইবে। ইহাই আর্য্য সিদ্ধান্ত। হিন্দুর বিশ্বাস যে, জীবকে ধরাতলে এই ক্রমিক উন্নতি করিতেই হইবে। এমন কি ভগবান্‌কেও যখন অবতার হইতে হইয়াছিল, তখন তিনি যথাক্রমে মৎস্য (জলচর), কূর্ম্ম (উভচর), বরাহ (তির্য্যক্ প্রাণী), নৃসিংহ (আধা-মানুষ আধা-পশুশ্রেষ্ঠ), বামন (ক্ষুদ্র নর), (পরশুরাম (বোকা), রাম (রাজা), কৃষ্ণ (দার্শনিক ও ব্রহ্মবাদী) প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। এই অবতারতত্ত্বের আলোচনা করিলে বুঝা যায়, অভিব্যক্তিবাদ হিন্দুরই মজ্জাগত। ইহার মূল কারণ আন্তরিক শক্তির উপচয়। অধর্ম্ম দ্বারা শক্তিক্ষয় হইলে জীবের অধোগতি হয়।

উল্লিখিত কোন মতই প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। এখন প্রশ্ন হইতেছে কোন্ মত সত্য?

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
(বিদ্যারত্ন, সাহিত্যবিনোদ)

স্বামী বিবেকানন্দ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তারপর বিবেকানন্দ পরমহংসদেব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার নমুনা দিতেছি :—"অবতার বল্লে তাঁকে ছোট করা হয়।" (বিঃ ১৫১ পৃষ্ঠা) "পরমহংস ইচ্ছা করিলে আরো বিবেকানন্দ তৈরী করিতে পারেন।" (বিঃ অবতরণিকা ১৩ পৃষ্ঠা) "শ্রীরামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই" (পত্রাবলী ৮নং পত্র ৪৫ পৃষ্ঠা)। * ইত্যাদি। অবশ্য এগুলিতে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই!! এদিকে তো এই পর্য্যন্ত—পরন্তু পরমহংসদেবের জীবনের ঘটনাগুলিরও খবর তিনি ঠিক্ ঠিক্ রাখিতেন কিনা সন্দেহ। 'My Master' বিষয়ক বক্তৃতায় পরমহংসদেবের স্ত্রীর যৌবনপ্রাপ্তির পরে প্রথম সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—* * the husband had entirely forgotten he had a wife. In her far off home the girl had heard that her husband had become a religious enthusiast * * *. She resolved to learn the truth for herself, so she set out and worked to the place where her husband was. When at last she stood in her husband's presence he at once admitted her right to his life; * * * The youngman fell at the feet of his wife and said: "I have learnt to look upon every woman as Mother but I am at your service." The maiden was a pure and noble soul, and was able to understand her husband's aspirations and sympathise with them. She quickly told him that she had no wish to drag him down to a life of worldliness: but that all she desired was to remain with him, to serve him and to learn of him," (pp. 21—22 Nateson's

* বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও স্বামীজি বলিয়াছেন—"মনুষ্যজাতির মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষি" (বিঃ ৮৬৯ পৃঃ)।

collection of Speeches of Swami Vivekananda.) অথচ ৺ রামচন্দ্র দত্তকৃত জীবনবৃত্তান্তে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। "তাঁহার স্ত্রী যখন ষোড়শবর্ষে উপনীত হন সেই সময় তাঁহার শ্বশুরালয় গমন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। * * * তন্ত্রমতে নাকি ষোড়শী পূজার বিধি আছে, তিনি তাঁহার স্ত্রীতে সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।" তারপর, কিরূপে তিনি ঐ পূজা সম্পাদন করিলেন, সেই সকল এই অধ্যায়ে (১৬শ অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে আছে, "পরমহংস-দেবের স্ত্রীর মনের ভাব বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি ষোড়শবর্ষে পতিত হইলে কি হইবে, তাঁহার তখন পর্য্যন্ত কুমারী ভাব ছিল। পতি তাঁহাকে বলে, তাহা তাঁহার সে পর্য্যন্ত জ্ঞান হয় নাই, তন্নিমিত্ত এক্ষেত্রে তিনি ভালমন্দ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।" (১৮ পৃষ্ঠা।) আবার দেখুন, যখন প্রকৃতি-ভাবাবলম্বনে তিনি কিয়দ্দিন স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন—তদ্বিষয়ে ঐ বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলিতেছেন,—"He began to think that he was a woman. he dressed like a woman * * * and lived among the women of his own family, * * *" (P. 23, Netesons collection of lectures.) রামচন্দ্র দত্তকৃত জীবনবৃত্তান্তের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং তিনি যে মানবাজারে মথুর বাবুর বাড়ীর অন্তঃপুরে তখন অবস্থান করিতেন, সে কথা স্পষ্ট রহিয়াছে। পরের অন্তঃপুরে স্ত্রীবেশে থাকাটা ব্রীড়াজনক মনে করিয়াই কি স্বামীজি পরমহংসদেবকে স্বীয় পরিবারস্থ মেয়েদের সঙ্গে অবস্থান করাইয়াছেন?

তারপর পরমহংসদেবের জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ বিষয়ে স্পষ্ট শম্ভুমল্লিককে উপদেশচ্ছলে যাহা বলিয়াছিলেন, কথামৃত হইতে তাহা উদ্ধৃত করা হইতেছে:—"শম্ভু বল্লে, এই আশীর্ব্বাদ করুন, যা টাকা আছে সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়; হাস-পাতাল ডিস্‌পেন্সারি করা, কুয়ো করা এই সব! আমি বল্লুম, এ সব কর্ম্ম অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন! আর যাই হোক্, এটা যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি করা নয়। * * * এই সব অনিত্য বস্তু, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, তাঁকে লাভ হলে আমার বোধহয় তিনিই কর্ত্তা, আর আমরা অকর্ত্তা।

* রামচন্দ্র দত্তকৃত পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত তৃতীয় সংস্করণ ৪৬ পৃষ্ঠা।

তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে চলি? তাঁকে লাভ হবে [illegible] ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী হতে পারে।' (খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ অবতার—প্রথম ভাঃ ১২৭পৃষ্ঠা।) এইরূপ আবার। কোন কোন স্থানে তিনি বাড়িতে [illegible] স্বামিজী এ বিষয়ে বিপরীত পথেই চলিয়াছেন, রামকৃষ্ণ মিশন ও সংস্থাগুলি [illegible] হাসপাতাল ডিস্পেন্সারিই সার ও মুখ্য সাধন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার গুরুভাতারা ইহা পরমহংসদেবের মতের বিরোধী বলিয়াই মনে করিতেছিলেন; কিন্তু বিবেকানন্দের সঙ্গে তর্কে আঁটিয়া উঠা তাঁহাদের [illegible] 'মিশন' স্থাপিত হইলেও যখন একদিন জনৈক গুরুভ্রাতা, ব্যাপারটা ঠিক্ হইতেছে না বলিলেন, তখন স্বামীজি প্রথম ধমকাইয়া দিয়া, তৎপর ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"তোমরা মনে করেছো, যে তোমরাই তাঁকে বুঝতে পেরেছ' আর আর কিছুই পারি নি। তোমরা মনে কর জ্ঞানটা একটা নীরস জিনিস। আর চর্চ্চা ক'রতে গেলে প্রাণের কোমল ভাবটাকে একেবারে গলাটিপে মারতে হয়। তোমরা যাকে ভক্তি বলছো সেটা যে দারুণ আহাম্মকী, কেবল মানুষকে দুর্ব্বল করে মাত্র, তা বুঝছো না। যাও, কে, তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমার ভক্তি মুক্তি চায়? দেখতে চাও তোমার শাস্ত্র কি বলছে? আমি আমার দেশের লোককে 'তমোকূপ' থেকে তুলে মানুষ ক'রে [illegible] পারি, যদি তাদের ভেতর কর্ম্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহ'লে হাসতে হাসতে সহস্র নরকে যেতে রাজী আছি। আমি রামকৃষ্ণ [illegible] কারও কথা শুনতে চাইনি। যে আমার মতলব অনুসারে কাজ করবে [illegible] তারই কথা শুনবো। আমি রামকৃষ্ণ কি কারুরই দাস নই—শুধু যে নিজে মুক্তি বা মুক্তি গ্রাহ্য না ক'রে পরের সেবা করতে প্রস্তুত, তারই দাস।"

(বিঃ ১২—৮৪

এই ঝড়ের পর কিছুদিন বর্ষণও হইয়াছিল;—ঐরূপ বলিয়া গৃহমধ্যে [illegible] কিছু সময় পরে যখন স্বামীজি বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার [illegible] যে তাঁর কত ভক্তিবেগ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ওঃ এখনও গায় [illegible]

[illegible] মিশন সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইল না—প্রয়োজন হইলে পরে [illegible] যাইতে পারিবে। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই এবং কাজও কিছু কিছু হইয়া থাকে [illegible] আশ্রমের প্রভৃতি অতি আবশ্যক হইলে নিজের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম অবিধা [illegible] মত অবলম্বন করা—ইহা [illegible] সর্ব্বসাধারণ হইতে পারে না।

অনেক কাজ বাকি রহিয়াছে; আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাসানুদাস, তিনি আমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন, যত দিন না সে কাজ শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নেই।" ইত্যাদি (বিঃ ৭২৫ পৃঃ) এই ঘটনা হইতে বুঝা গেল যে, তিনি রামকৃষ্ণদেবের বা অভিমত, তাহার অনুকূল ছিলেন না। মানুষ রাগিলেই পেটের কথা বাহির হইয়া যায়—এক্ষেত্রেও বিবেকানন্দ মনের কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—ফলতঃ তিনি "সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র"—কাহারো দাস্য হইবার লোক ছিলেন না—"দত্ত কাহারো ভৃত্য নয়।" তবে দল না বাঁধিলে চলে না—তাই গুরু ভ্রাতাদের সঙ্গে 'আপোষ' করিয়া চলিয়াছেন—গুরুভ্রাতারাও বুদ্ধিমানের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, ইঁহারই নাম-ডাকের সঙ্গে তাঁহাদের গুরুদেবের তথা সম্প্রদায়ের সম্মানগৌরব বিজড়িত। তাই, বোধ হয়, এ বিষয়ে অতঃপর আর তাঁহাদের কেহ কোনও বাঙ নিষ্পত্তি করেন নাই।

কথায় ও কাজে বৈপরীত্য এরূপ দু'একটি বিষয় আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি—সম্প্রতি আরো উদাহরণ দিতেছি। লাহোরে লালা হংসরাজকে তিনি প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছিলেন—"আর শাস্ত্রের গোঁড়ামী অপেক্ষা মানুষের ব্যক্তিবিশেষকে, অবতার বলিয়া আর তাঁহার আশ্রয় লইলেই মুক্তি—এইরূপ প্রচার) গোঁড়ামী দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে ও অতি শীঘ্র সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর আমার হস্তে সেই শক্তিও আছে। আমার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতার রূপে প্রচার করিতে, আমার অন্যান্য গুরু ভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র আমি ঐ প্রচারের বিরোধী। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণানুযায়ী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে, যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয়, কিন্তু উহা পাকা হইয়া থাকে। যাহা হউক চার বৎসর অন্ততঃ এইরূপ উদার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিব। যদি ইহাতে ফল না হয় (ফল হইবে বলিয়া যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস) তবে আমিও গোঁড়ামী প্রচার করিব।"
(ভারতে বিবেকানন্দ—২য় সংস্করণ, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

এই কথা তিনি ১৮৯৭ অব্দের নবেম্বরে বলেন। এ দিকে ঐ কথার তিন মাস মাত্র পরে (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮) [মতান্তরে ১৮৯৭ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থাৎ ঐ কথার ৯।১০ মাস পূর্ব্বে] তিনি নবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে রামকৃষ্ণের বার্ষিসেনের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় যোগ দিয়াছিলেন এবং মন্ত্রাদি বলিয়া যথানিয়মে পূজা করিয়াছিলেন। প্রণামমন্ত্রও রচিত হইল—তাহা এই—"ইতি কথার চ ধর্ম্মস্য

সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে। অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥" (বিঃ ৮০০-৮০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ঠাকুরের জন্মদিনে ব্রাত্য দ্বিজ সকলেই তাঁর নাম লইয়া শুদ্ধ হইয়াছিল—এ কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে। "গোঁড়ামী" আর কাকে বলে?*

যখন রামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের চারি বৎসর পরে তিনি দ্বিতীয়বার জাকত-ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন একদা একজন কৃতবিদ্য থিয়োসোফিষ্টকে রেল গাড়ীর কামরায় পাইয়া মহাত্মগনের অলৌকিক শক্তিসম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া স্বামীজি তাঁহার সহিত কিঞ্চিৎ কৌতুকালাপের পরে উপদেশচ্ছলে বলিলেন—"। * * ধর্ম্মের সঙ্গে অলৌকিক ব্যাপারের বা সিদ্ধির যে নিত্যসম্পর্ক আছে, এটা কেমন করে তোমার মাথায় সেঁধুল? কিন্তু এটা দেখছ না, ঐরূপ সিদ্ধির ব্যবহার যাহারা করে তাহারা কত বড় কামনার দাস? অহঙ্কারে ঢে কি! যথার্থ ধর্ম্ম মানে চরিত্র—সেইটাই হচ্ছে প্রকৃত শক্তি। চরিত্রবান পুরুষের রিপু দমন ও বাসনা ক্ষয় হয়েছে। আর যারা সিদ্ধি সিদ্ধি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও একটা অলৌকিক শক্তি চাচ্ছে, তারা জীবনসমস্যা সমাধানের পথে একটুও এগোয় নি, খালি দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপব্যবহার কচ্ছে ও মোহান্ধকারে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। * * বৃথা শক্তি-ভক্তির লোভে ছুটো না। ও সব আলেয়া।" (বিঃ ৩৪৭ পৃঃ)

কিন্তু যখন তিনি ঐ বারই বরাহনগর মঠ হইতে হিমালয় যাইব বলিয়া যাত্রা করেন, তখন গুরু ভাইদিগকে বলিয়াছিলেন; "এবার আর স্পর্শমাত্র লোককে বদলে ফেলতে পারার ক্ষমতা লাভ না করে ফিরছি না।" (বিঃ ২০৫ পৃঃ) এটা কি "অলৌকিক" কিছু নয়? এটা যে একটা স্পৃহণীয় ও প্রশংসার জিনিস, তা' তো পরমহংসদেবের "ভস্মাবশেষবর্ণিত কৌটাটি"

* অথচ চাকায় তাঁহাকে একটি ছেলে কোনও ব্যক্তির একখানি 'ফটো' দেখাইয়া ইনি 'অবতার' কি না পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে, স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"বাবা, এঁর যে একটু ভাল করে খেয়ো দেয়ো! তা হলে মাথাটা খুলবে। পুষ্টিকর পাদ্যের অভাবে মাথার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে গেছে।" আবার বলিলেন "গুরুকে শিষ্যেরা অবতার বলতে পারে বা যা ইচ্ছে ধারণা কর্ত্তে পারে। কিন্তু তাই বলে দেশশুদ্ধ লোক অবতার হবে, এ কি কখনও? ভগবানের অবতার যেখানে সেখানে বা যখন তখন হয় না।" ইত্যাদি (বিঃ ১০২৪ পৃঃ)। এই অবতার গজাইবার জন্য যে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরাই দোষী তা পূর্ব্ব প্রবন্ধে এ কথা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ 'অবতার' সাজার মত নিরাপদ আর দ্বিতীয় নাই—'হা' 'হু' বলিলে বা করিলে "ঠাকুরের লীলা" মাত্র বলিলেই সমস্ত দোষ ঢাকা যায়।

গঙ্গাজলে ধুইয়া নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে খাওয়াইয়া তাঁহাকে ১০৫ ডিগ্রী জ্বর হইতে মুক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন' "আখ্ ঠাকুরের শক্তি দেখ্। তিনি কি না করতে পারেন।,' (বিঃ ১০৫৩ পৃঃ) এমন যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঠাকুর, তিনি যাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ ছিলেন, সে পদার্থটা তো ঠাকুরের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শরীরেই সংক্রামিত হইয়াছিল। সে কথা তিনিই শিষ্য শরৎ বাবুকে বলিয়াছিলেন— 'স্বামীজী। ব'সে থাকবার যো আছে কি বাবা ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী-কালী' বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখ্বার দু তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাদের এদিক্ ওদিক্ কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়—ইত্যাদি, এই বলিয়া প্রথম খণ্ডে (বিঃ ১৪৮ পৃঃ) উল্লিখিত পরমহংস দেব কর্ত্তৃক তাঁহার মধ্যে শক্তি সঞ্চারের ঘটনাটি বিবৃত করেন।" (বিঃ ১০৩৪-৩৫ পৃঃ)

স্বয়ং 'কালী' যাঁর দেহ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন—তার আর কোনও শিক্ষাই অর্জ্জনের দরকার ছিল কি? সর্ব্বশক্তিমান্ পরমহংস তো তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছিলেন—"তোর ভিতর দিয়েই আমার সিদ্ধাই কাজ করবে।" (বিঃ ১৪৯ পৃষ্ঠা) পাঠকবর্গ এই সকল কথার সঙ্গতি বিধান করুন। স্বামীজি কাশ্মীরে (জুলাই ১৮৯৮) অমরনাথে গেলে না কি "স্বয়ং অমরনাথ তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন; এবং মৃত্যুঞ্জয় শিবের কৃপায় তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরলাভ করিয়াছিলেন।" (বিঃ ৮৭৭ পৃঃ) ক্ষীরভবানীতেও তিনি দৈববাণী বারংবার শুনিয়াছিলেন। (বিঃ ৮৮৭ পৃঃ) প্রায় সেই সময়েই (মে ১৮৯৮) নৈনিতালে জনৈক মোসলমান অদ্বৈতবাদী নাকি "স্বামীজি দর্শনে ও তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী, যদি ভবিষ্যতে কেহ কখনও আপনাকে অবতার বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে মনে রাখিবেন— আপনার এই মুসলমান বান্দাই তাহাদিগের সকলের অগ্রণী হইবে।" (বিঃ ৮২৮-২৯ পৃঃ) কিন্তু বিবেকানন্দের কোষ্ঠীর তেমন জোর ছিল না।

* দুরারোগ্য রোগে ভুগিয়া অকালে ৩৯ বৎসর বয়সে যিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন—তিনি নিশ্চয়ই "ইচ্ছামৃত্যু" বরপ্রাপ্ত!

† এই কথাটা আমার স্বকপোলকল্পিত নহে—বিবেকানন্দের জ্যোতিষি প্রবি ধর্ম্মস্থানে উচ্চাভিলাষী—পরমহংসের শনি তুঙ্গ বা উচ্চস্থ। সুতরাং তাঁহার (পরমহংসের) তুলনায় (শনি) অল্প বলপ্রদ এবং সেই জন্যই ইনি (বিবেকানন্দ) তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।"

তাই তিনি অবতার হইলেন না—কিন্তু তাঁহার জন্মতিথিতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সাক্ষাতে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক পূজার্চ্চা হইয়াছে—এ সংবাদ আমরা শুনিতে পাইয়াছি।

কি উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকায় গমন করেন, এ বিষয়ে হায়দ্রাবাদে "My mission to the west" শীর্ষক বক্তৃতায় সর্ব্বশেষে তিনি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—"এই উদ্দেশ্য মাতৃভূমির লুপ্তগৌরব উদ্ধার ব্যতীত আর কিছুই নহে।" সভায় তিনি সুস্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করিলেন যে, এই সংকল্প সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারকের বেশে দূরতম পাশ্চাত্য প্রদেশে যাইতে হইবে এবং বেদ-বেদান্তের অতুলনীয় মহিমা জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিতে হইবে।" (বিঃ ৩৭৪-৩৭৫ পৃঃ) পরন্তু মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই কেন উদ্দেশ্যের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হইল—তিনি আমেরিকা যাত্রার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের সময়ে বলিয়াছিলেন—"আমার যাওয়া যদি মার অভিপ্রেত হয়, তবে সাধারণ লোকদের নিকটই ভিক্ষা পাওয়া উচিত; কারণ আমি যে আমেরিকা যাইতেছি সে শুধু ভারতের দরিদ্র বা সাধারণ নরনারীর জন্য।" (বিঃ ৩৭৭ পৃঃ) বোধ হয় হায়দ্রাবাদে আমীর ওমরাহদের সভায় দরিদ্রদের কথাটা স্বামীজির মনে উদিত হয় নাই। তবে তাঁর "প্রিয় ম—"র নিকটে লিখিত চিঠিতে কিন্তু আছে—"* * জীবনের সারাংশটা আমেরিকায় কাটিয়ে এলুম, নিজের যতটা শক্তি ছিল, সব খোয়ালুম—কেন? না, ও দেশের লোকদের উদার উন্নত করবার জন্য ও ওদের আধ্যাত্মিক মার্গে নিয়ে যাবার জন্য।" (বিঃ ৭৪৪ পৃঃ)। পরন্তু আমার বোধ হয় গুজরাটে পোরবন্দর রাজসভায় পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য দেশে যাইবার জন্য উৎসুকতা জন্মে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন "সত্যই, স্বামীজি ভারত আপনার উপযুক্ত স্থান নহে। আপনি পাশ্চাত্য দেশে গমন করুন এবং সে দেশ আগুন জ্বালিয়া আসুন—দেখিবেন এ দেশের লোক আপনার প্রত্যেক কথায় উঠিতেছে, বসিতেছে।" (বিঃ ২৭৮-৭৯ পৃঃ) একটা বড় কিছু হয়—এই উৎসর্পিণী বাসনা—ইংরেজীতে যাকে 'এম্বিশন' (ambition) বলে—বিবেকানন্দের প্রকৃতিতে অতীব বলবতী ছিল। *

* তদীয় জীবনচরিতের অবতরণিকায় (৩ পৃষ্ঠায়) গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"সম্রাট কার্লের গুলিয়াস্ সীজার, আলেক্জাণ্ডার দি গ্রেট ও ইদানীন্তন কালের মহাবীর নেপোলিয়ন প্রভৃতি ২।৪টি মহাগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে শক্তিশালী পুরুষ বোধ হয়

এইরূপ লোকের একটা প্রবল আত্মাদর থাকে—সামান্য লোকের বিষয়ে ঐটাই দম্ভ বলিয়া আখ্যাত হয়। মহাকবি ভবভূতির প্রতিধ্বনি করিয়া 'ভারতী' সম্পাদিকার নিকটে লিখিত পত্রে তিনি বলিয়াছেন—কিন্তু আশা এই—"সম্পৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা, কালোঽয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।" (পত্রাবলী [১৫] প্রথম ভাগ ৮২ পৃষ্ঠা)।

তিনি ইউরোপ হইতে এক পত্রে শিষ্যদিগকে লিখিয়াছিলেন—"আমি ভারতের যেমন, সমুদয় জগতেরও তেমনি। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি আমার পশ্চাতে এক মহাশক্তি দাঁড়িয়ে আমায় চালাচ্ছেন। আমি কারও সাহায্য চাই না।" * (বিঃ ৫২৫ পৃঃ)

শিলংএ নাকি শ্বাসের পীড়ায় কাতর হইয়া আপনা-আপনি বলিয়াছিলেন—"যাক্ মৃত্যুই যদি হয়, তাতেই বা কি আসে যায়? যা দিয়ে গেলুম দেড় হাজার বছরের খোরাক।" (বিঃ ১০২৩) [তিনি না 'ইচ্ছামৃত্যু' বরপ্রাপ্ত—তবে এই মৃত্যুই হয়' ইত্যাদি কেন?]

শিষ্যকে বলিতেছেন,—হীন-সাহস হইলে ভাবিবে—"আমি * * অমুকের (অর্থাৎ স্বয়ং স্বামীজির) চেলা, * * এইরূপ খুব অভিমান রাখ্‌বি।" (বিঃ ১০৫০-৫১)

মৃত্যুর দিনেও নাকি অস্ফুট স্বরে স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাক্‌তো, তবে বুঝ্‌তে পারত বিবেকানন্দ কি করে গেল। কাজে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে।" (বিঃ ১০৮৭ পৃঃ)। এ সকলের উপর টীকা অনাবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপদ্মনাথ শর্ম্মা।

ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।" এই বাক্যে অত্যুক্তি থাকিলেও যথেষ্ট যথার্থতা আছে—সীজার, আলেক্‌জাণ্ডার ও নেপোলিয়ন্ ইঁহারা সকলেই দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি ছিলেন—বড় লোক ছিলেন; কিন্তু পুণ্যশ্লোক ছিলেন না।

* বিবেকানন্দ মহাসভায় বক্তৃতা দিয়া নামজাদা হইবার পূর্ব্বে মাদ্রাজী শিষ্যদের নিকটে লিখিত পত্রে তো সাহায্য প্রেরণের জন্য আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন। (পত্রাবলী ৪৯—প্রথম ভাগ ১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কর্ম্মফল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও রামশরণ চট্টোপাধ্যায়কে দেখিয়া সে বংশের লোক বলিয়া বোধ হইত না। তিনি মুগ্ধবোধ ছাড়িয়া রাজভাষার আশ্রয় লইয়া চুটকী ইংরাজী শিখিয়া রেল-বিভাগে ঢুকিয়াছিলেন। বংশের যজমানরা বেগতিক দেখিয়া নূতন পুরোহিত নির্ব্বাচন করিল, এবং শিষ্যরা বার্ষিক দানে অব্যাহতি লাভ করিয়া পরকালের ভাগ্যে যাহাই থাকুক, ইহকালটা সুখেই কাটাইতে লাগিল। রামশরণ মনে বুঝিয়া দেখিলেন, ইহাতে তাঁহার লাভ ছাড়া ক্ষতি হইল না। শীতকালে প্রাতে উঠিয়া নাক টিপিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করার চেয়ে গরম কাপড়ে অঙ্গ ঢাকিয়া গরম চা পান করা যে অধিকতর আরামপ্রদ, সে কথা আর কে না জানে? রেলের চাকরীতেও অবশ্য কষ্ট আছে, 'নাইট ডিউটীতে' সুস্থ শরীর ব্যস্ত হইয়া উঠে; কিন্তু পেটে খাইতে পাইলে পিঠে সহিয়া যায়। বংশের সম্মান বলিয়া একটা কথা এদেশেও আছে, ওদেশেও আছে; কিন্তু বংশের সম্মানের চেয়ে ব্যক্তির সম্মানই কাম্য সে যুগে বাণী, সে যুগে রামশরণের পক্ষে গুরুতা ও পৌরহিত্য ছাড়িয়া রেলের চাকরী গ্রহণ করাই, স্বাভাবিক না হউক, সুশোভন পথে চলা। কিন্তু যে গ্রামে রামশরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী, সে গ্রামের লোক বিশ্বসাহিত্যের কৃপায় বিশ্বপ্রেম তথা বিশ্বসভ্যতার আস্বাদ পায় নাই। সে গ্রামে কোনও ব্রাহ্মণের ছেলে ত্রিসন্ধ্যা না করিলে অব্রাহ্মণও তাহাকে ভ্রূকার চক্ষে দেখিত না। রামশরণ রেলের চাকরী করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপে অনাস্থা দেখাইতেছেন, এমন প্রমাণ পূর্ব্বে কেহ কখনও পায় নাই, কোনও কথা উঠে নাই; সুতরাং যেদিন তিনি কয়েক বৎসর পরে কিছুদিনের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলেন, সেদিন গোল উঠিল। গ্রামের সকলেই দেখিল, রামশরণের ষোড়শী কন্যা দুলালী তখনও অবিবাহিতা। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ জ্ঞাতি-ভ্রাতারা রামশরণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এ কি রকম কাণ্ড?' রামশরণ হাসিয়া বলিলেন, 'কাণ্ড আবার কিছুই নয়। উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া গেলে ত আর যার তার হাতে মেয়ে দেওয়া

যায় না।' উত্তরটা যদুনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের মনোমত হইল না! রামশরণের পিতৃপিতামহ রেলের চাকরী না করিয়াও যথাকালে কন্যাসম্প্রদান করিয়াছিলেন আর আজ হঠাৎ পাত্রের অভাব হইল? যদুনাথ বলিলেন, 'আমাদের মেয়েদের পাত্রের অভাব হয় না, আর তোমার মেয়ের পাত্র জুটছে না?' রামশরণ বলিলেন, 'পাত্রের অভাব না হতে পারে, উপযুক্ত পাত্রের অভাব হয়েছে, আমি এই কথাই বল্‌ছি।' যদুনাথ বলিলেন, 'তুমি কি বল্‌তে চাও রেলের চাকরী না করলে সে ব্যক্তি কখনও বিবাহের উপযুক্ত হয় না?' রামশরণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'না, আমি তা বলি না। রেলের চাকরীকে আপনারা হীন ভাবতে পারেন, কিন্তু শিষ্য-যজমান নিয়ে যারা পাড়াগাঁয়ে মাতব্বরী করে, তাঁদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে, রেলের একটা কুলীরও অধম।' রামশরণের শ্লেষ বাক্যে চটিয়া যদুনাথ বলিলেন, 'রেলের চাকরী করে তুমি যে ধরাকে সরাজ্ঞান করতে শিখেছ, তা আমরা জানি, উপায়ান্তর নাই বলে পাঁচঘর শিষ্য-যজমান নিয়ে ঘরসংসার করি বলে তুমি যে আমাদিকে অবজ্ঞার চোখে দেখ, তাও বুঝি; তবে কথা কি জান, তুমি আমাদের আত্মীয়, তোমার বুদ্ধির দোষে আমাদের বংশের একটা অখ্যাতি বা হয়, এই উদ্দেশ্যেই তোমাকে তোমার মেয়ের বিয়ের কথা বলতে এসেছিলাম, আচ্ছা আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমরা সকল সংস্রব ত্যাগ করলাম।' রামশরণ উত্তর দিলেন না।

সেই দিনই সন্ধ্যাকালে যদুনাথের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া রামশরণের জ্ঞাতি-ভ্রাতারা রামশরণকে সামাজিক ও বৈষয়িক উভয়বিধ শাসনের নাগপাশে বাঁধিবার কৌশল আবিষ্কার করিলেন। তাঁহাদের কথা এই, বংশগত আচার নিয়ম যে মানে না, বংশের সম্পত্তিই বা সে কোন্ অধিকারে ভোগদখল করিবে? কথাটা রামশরণের কাণে উঠিলে তিনি বলিলেন, 'গুলিখোরের বুদ্ধির দৌড় ঐ পর্য্যন্ত, তা আমার জানা আছে।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আর পাঁচজন যেমন নিজের কন্যাকে ভাল ঘরে এবং ভাল বরে দিতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করে, ফুলীর বয়স যখন বারো, সেই সময়ে রামশরণেরও সেইরূপ ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল। তিনি দশ-বারো বৎসর রেলের মালবাবুর চাকরী করিয়া বেশ

দু'পয়সা সঞ্চয় করিয়া ছিলেন। একটী মনোমত পাত্রও জুটিয়াছিল। চলাচলির জন্য একে একে গহনাগুলি গড়ান হইয়াছিল। পাকা বাড়ীর ভিত্তি যাহা দিবার স্থির হইয়াছিল, তাহা দেওয়াই ছিল। হঠাৎ যখন হুজুগপ্রিয় দেশের কেহ কেহ এখানে ওখানে যখন তখন বরপণনিবারণী সভার অধিবেশন করিতে লাগিল, সেই সময়ে রামশরণের মাথাটাও বিগড়াইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, এখান হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার এমন যদি একটা পথ আবিষ্কার করা যায়, যাহাতে কন্যাকর্ত্তাকে একটীও পয়সা ব্যয় করিতে না হয়, সে ত ভালই। কেহ কিছু বিবেচনার থাকিলে পথও যে একটা বাহির হইবে, তাহা নিশ্চিত। ও কাজের এত আয়োজন পণ্ড হইবে, ইহা ও কল্পনা করা যায় না। আর কিছু দিন অপেক্ষা করিতে পেরে কন্যাটী সবল বয়স্থা হইবে। ক্ষতি কি? ঘুঁটিনের পর অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যার অভাব নাই।

কিন্তু মতটী ভাল হইলেও একটী মত সকলের মনোমত হয় না। সংসার একটিক কাপারে আনন্দ মহলে সভামতও আবশ্যক হয়। বাড়ীওয়ালে তাঁহার বহিলেও তাঁহার গৃহিণীর দৃষ্টি গৃহস্থালীর অন্যান্য দিকে ছিল। বিবাহের ছট্টগোলের দিকে তাহার শঙ্কাহরের একেবারে ছিল। কন্যার ধ্বজা উড়াইয়া বেশী বয়সে স্বয়ম্বরা হয়, এমন অভাগা তাঁহার নহে। তিনিও কন্যাদায়ের প্রতীকারের কথা ভাবিতেন। আর স্বামী যে ভাবে ভাবেন, তিনিও সেই ভাবে ভাবিতেন, মেয়েটি যে ঘরে পড়ে না থাকে এমন হলে, অশ্রীরে এবং কম খরচে কিসে মেয়েটির বিবাহ হয়।

যখন যে পাত্রটী স্থির করিয়াছিলেন, কিছুদিন পরে সে পাত্রের অভিভাবকের সহিত বিচারিত হইয়া রামশরণগৃহিণী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ, ছেলেরা ছড়েছাড়া করতে আছে?'

রামশরণ বলিলেন, 'মাথাই নাই তার মাথাব্যথা, হাতেই এল না, তার খাই-খাই!'

গৃহিণী বলিলেন, 'সে চেষ্টাই যে তোমার নাই।'

রামশরণ বলিলেন, চেষ্টা আমার যোল আনাই আছে, তবে মুখের কথা ত নয়, [illegible]

গৃহিণী বলিলেন, [illegible]

তোমার ছেলে নাই বলে পরের ছেলের কথা ভাব না, শেষে টাকার পুটলী বাঁধতে গিয়ে মেয়েটাকে কি জলে ফেলে দেবে?"

রামশরণ বলিলেন, 'ছেলে থাকলে মেয়ের বিয়েতে টাকা ঢালতে পারতাম, কারণ সে টাকা আসল মায় সুদ হিসেব করে নেবার সুযোগ থাকত; ছেলে নাই বলেই ত মেয়ের বিয়েতে টাকা খরচ করতে পারছি না। পরকালে টাকা সঙ্গে যায় না, সে কথা তুমিও জান, আমিও জানি; কিন্তু চাকরী ছেড়েই অন্ন-ভাবে পরকালের পথে যাতে পা এগিয়ে না দিতে হয়, তার উপায় ত আমাকে করতে হবে। তখন মেয়ের শ্বশুর তোমার কি আমার ভরণপোষণের ভার নেবে না?'

গৃহিণী বলিলেন, 'ছেলে থাকলে ছেলের বিয়েতে টাকা নিতে তোমার যখন আপত্তি ছিল না, আর আর ছেলের বাপরাই বা তবে তোমাকে ছাড়বে কেন? একটা ছেলে মানুষ করতে ঢের টাকা খরচ হয়, তার পর সেই ছেলের উপার্জ্জন ভোগ করবার সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, তবু ত ছেলেকে মানুষ করতে কেউ ছাড়ে না।'

রামশরণ বলিলেন, 'আমিও সেই কথা বলি। যাদের ছেলে আছে, তারা ছেলেকে মানুষ করে, আমাদের ছেলে নাই, আমরা মেয়েকেই মানুষ করব।'

গৃহিণী বলিলেন, 'মেয়ে মানুষের যা কাজ, গৃহস্থালীর যত কাজকর্ম্ম, সবইত আমি দুলালীকে শিখিয়েছি।'

রামশরণ বলিলেন, 'গৃহস্থালীর সব কাজ না শিখলেও একালের মেয়েদের চলে। একালের মেয়েদের কিছু লেখাপড়া শিখতে হয়, কিছু গান-বাজনা জানতে হয়, বেশ-বিন্যাস করে অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করতে হয়, নইলে তার মহিলাজন্ম ব্যর্থ হয়।'

গৃহিণী বলিলেন, 'তোমার কথা শুনে দুঃখ হয়, হাসি পায়, রাগও হয়। হাঁগো, গেরস্ত ঘরের মেয়ে ভাতরাঁধা বাসলমাজা ফেলে গান গাইতে বসবে? ওমা, কি লজ্জার কথা!

রামশরণ বলিলেন, 'ওগো হ্যাঁ, এ যুগে ঐ চাই। তুমি ত আর প্রতিমাসে 'নরযুগ' মাসিক পত্রিকা পড় না, তা ওসব তোমার মগজে ঢুকবে কি করে?'

গৃহিণী বলিলেন 'আমার মগজ যা আছে তাই থাকুক, এখন তোমার মগজ ঠিক থাকলে বাঁচি।'

রামশরণ বলিলেন, সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আমার মগজ

ঠিক না থাকলে আর মাসে এত টাকা রোজগার করতে পারতাম না। তোমার কাজ তুমি করে যাও, মেয়ের বিয়ের চিন্তা আমার আছে।'

ঢং ঢং করিয়া ষ্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। রামশরণ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামশরণ কর্ম্মজীবনের গ্লানি দূর করিতে বাড়ী আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যাহাদিগকে লইয়া অবসরকাল হাসিয়া খেলিয়া কাটাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞাতিভ্রাতারা তাঁহার শত্রু হইল, তাঁহাকে একঘরে করিল। তাঁহার গৃহিণী বলিলেন, 'কেমন, যা ভেবেছিলাম তাই হল কিনা? মেয়ের বিয়েটা দিয়ে ফেল্‌লে এত খিটকেল হত না। ও বাড়ীর ভাসুরকে যখন মুখের উপর চড়া কথা বল্‌লে, তখনই জানি তিনি একটা অনর্থ না ঘটিয়ে ছাড়বেন না।'

কথায় বাধা দিয়া রামশরণ বলিলেন, 'তুমি ভয় পেয়েছ বলে আমাদের ভয় পেতে হবে? নারীর বুদ্ধি চিরকালই ঐ রকমের; সেই সীতাসাবিত্রীর কালে যা ছিল, আজ বড় বড় সভাসমিতিতে পুরুষের পাশে আসন পেয়ে তাই আছে। বহু চাটুয্যের গাঁয়ের 'দশ' হল, আর কি গাঁয়ে লোক নাই? আমি বহু চাটুয্যেকে না শিখিয়ে ছাড়ছি না, এ আমার স্পষ্ট কথা।' তাহার পর ডাকিলেন, 'ও দুলালী, হারমোনিয়মটা নিয়ে আয় ত একবার, আর ছাখ, সকালে চা'টা কড়া করে ফেলেছিলি, এ বেলায় একটু আদা ফেলে দিস।' হারমোনিয়ম লইয়া দুলালীকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, 'কি বল্‌ছিলাম, তুই নব জীবনে ঐ যে পরমার্থ সঙ্গীতটার স্বরলিপি বেড়িয়েছে মুখস্থ করেছিস্ত? ঐ যে—তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে, হের গো, কি দশা হয়েচে—'

গৃহিণী মুখভঙ্গী বিকৃত করিয়া বলিলেন, 'আ মরণ তোমার, বুড়ো বয়সে রস ত কম নয়! হারামণি নিজে টানছ নিজেই টান, মেয়েটার বিয়ের নাম নাই, আবার মেয়েটাকে খেমটাওয়ালী করা হচ্ছে। যা দুলালী, উনানে আগুন হল কিনা ছাখ্।'

রামশরণ বলিলেন, 'মরণ আমার নয় মরণ তোমার, তা নইলে আমি মেয়েটাকে সুশিক্ষা দেবার যতই চেষ্টা করি, তুমি ততই বাধা দাও। এর

রেখবে মেয়ের একূলও যাবে ওকূলও যাবে। শোন্ দুলালী, ওর কথা শুনিস না। 'জাগরণে' তুই যে বিরহের গল্প লিখেছিলি তা পড়ে 'নবজীবনে'র সম্পাদক 'রিদুষী মহিলার পাকা হাতের লেখা' বলেছেন, মনে আছে ত?' বাপ-পড়া যা শিখেছিস তাই যথেষ্ট, এখন সঙ্গীতে একটু জ্ঞান হলে তোর সুপাত্র আপনা হতে জুটে যাবে।' তাহার পর গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দলাদলির কথায় তুমি ভয় পেয়েছ, আমি কিন্তু সামাজিক দলাদলির ভয় করি না। এক সমাজ গেলে অন্য সমাজ আছে। আজ আমি যদি সমাজবিশেষের হাতগড়া আচার-নিয়মের ভয়ে আত্মসম্মান খর্ব্ব করি; তবে আমাতে 'আমি' কই? আমিও দশজনকে নিয়ে একটা দল বাঁধতে পারি না কি? প্রতি মাসের 'নবজীবন' পড়ে আমার জ্ঞান হয়েছে, আমি আমাকে সঙ্কীর্ণ পারিবারিক কি সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রেখে টিকে থাকতে পারি না। কতকগুলা নির্ব্বোধ লোক আমাকে একঘরে করেছে ভেবে হয়ত মনে মনে ধারা বোধ করছে, আমিও তাদিকে একঘরে করতে পারি। কি করে শোনা গায়ের মোড়লরা যাদিকে ছোট লোক বলে, ঘৃণা করে, তাদিকে নিয়ে আমি একটা জাতি মণ্ডল গড়ব। জাতি মণ্ডল শব্দটা তোমার কাছে দুরূহ হতে পারে, কিন্তু কাজটা সহজেই হবে। একটা 'নাইট স্কুল' খুলে ডোম, বাগদী, মুচিদের শিক্ষা দেব, তারা যেন কারও গোলামী না করে। তারাও ত মানুষ, তাদেরও দেহের গঠন আমাদেরই মত। তারাও সমাজের একটা অঙ্গ। শিক্ষা পেলে তাদের প্রত্যেকেই যদু-চাটুয্যের মত মাতব্বর হতে পারে।' তাহার পর মধু নাপিতকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন, ভাল আছিস্ ত রে?'

গৃহিণী চলিয়া গেলেন। মধু বলিল, 'আর বাবা' এখন-মলেই ভাল। যদু চাটুয্যের কাছে গত বছর পাঁচ টাকা ধার নিয়েছিলাম, শুনছি সুদে আসলে এখন ষোল টাকা হয়েছে; তাগিদের ঠেলায় অস্থির। আবার বলে, তোমাকে কামাতে দেখলে সেই দিনই নালিশ রুজু করে দিয়ে ঘটী বাটী নিলেম করে নেবে।'

রামশরণ বলিলেন, বটেঃ! আমি নিজেই কামাই, আমার বিলেতী খুরধানা এক্স্ টুয্যে দেখে নাই বুঝি। আচ্ছা সে ব্যবস্থা পরে হবে, তুই বাপু, এমন চামারের কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিলি কেন? গিয়েছিস্ ত গিয়েছিস। ককক না নালিশ যদু চাটুয্যে তোর ওপর। চড়া সুদ আদালত এখন দেয় না, সে খবর চামারটা জানে না।

মধু বলিল, চাটুয্যে মশাই নালিশ করলে আমি কি জবাব দিতে পারি? তুমি আজ এসেছ, কাল চলে যাবে, তখন তব চুষোরে গিয়ে আমাকে ধরা দিতে হবে।'

রামশরণ বলিলেন, 'তবে আর আমার কাছে এসেছিস্ কেন? যা ভাগ্, বুঝবি করগা।' আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, 'আজ সন্ধ্যার পর আসিস্ একবার, কথা আছে।'

মধু কিছু পাইবার আশায় প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রামের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা রামশরণের বাড়ীতে পাত পাড়িবে না ইত্যাদি মর্ম্মে ('তিন সত্য') করিলেও নিম্নশ্রেণী হিন্দু অনেকেই রামশরণের বিপক্ষতাদে সায় দিল। রামশরণ 'নাইট স্কুল' খুলিলেন। কিছু লেখাপড়া শিখিলেই যদি গ্রামের মাতব্বরি পাওয়া যায়, এমন কি প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের চাকরীটি পর্য্যন্ত মুচি-ডোমরা পায়, তবে সে সুযোগ তাহারা ছাড়িতে পারে না। লেখাপড়া শিখিতেই বা কষ্ট কি? সারাদিন খাটিয়া মনসাতলায় বসিয়া না-কাটা তামাক টানিয়া খক্ খক্ করিয়া কাসার চেয়ে ঘণ্টাখানেক রামশরণের বৈঠকখানায় বসিয়া মলা দেওয়া তামাক টানিতে টানিতে 'অচল' মুখস্থ করা মন্দ কিসে? আবার সেকালের রামপ্রসাদী গান গাওয়ার চেয়ে হারমোনিয়মের সুরে সুর মিলাইয়া একালের 'সত্যমঙ্গলের' গান কতদূর শ্রুতিসুখকর, সে কথা ব্যক্ত করা যায় না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া রামশরণের শত্রুপক্ষ তাঁহার 'নাইট স্কুলের' নাম দিল 'বিলিতি চৈতনের বটুক'। রামশরণ তাহাতে দমিলেন না। কিন্তু তাঁহার গৃহিণী কিছুদিনের জন্য শ্বশুরালয়ে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। রামশরণ তাঁহাকে অম্লানবদনে বিদায় দিয়া বলিলেন, 'আপত্তি নাই, কিন্তু দুলালীর এখন কোথাও যাওয়া সঙ্গত মনে করি না। এই তার শিক্ষার কাল, তার ভবিষ্যৎ এই বর্ত্তমানের উপর নির্ভর করছে।'

গৃহিণীকে বিদায় দিয়া রামশরণ বুঝিয়া দেখিলেন, তাঁহার যে সময় গৃহিণীর সহিত তর্কে কাটিত, সে সময় তিনি 'নাইট স্কুলের' কাজে কাটাইতে

পড়িলেন, পিছনে কেউ থাকিলে কাজে মন বসে না, সিদ্ধিলাভের পথে কাঁটা পড়ে।

সেদিন অপরাহ্নেই তিনি 'নাইট স্কুলে' দুলালীকে লইয়া বসিলেন। ছাত্ররা দূর হইতে দুলালীর গান শুনিয়া একে একে আসিল। ভবা মুচীর বেটা কেষ্টধন আসিয়াই রামশরণকে বলিল, 'মাষ্টার, আপুনি ভাবতা। আপনার ইস্কুলে বছরখানেক পড়লে আমরা সব মানুষ হয়ে উঠব। বাপ বেটা একানে আসতে দেকলেই বলে—ভতোক্ষণ ঢাকে কাঠি দে রে।—দেকুন ত মশাই কি আক্কেল!'

রামশরণ স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, 'ওরে কেষ্টা, তোদের উন্নতির আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বদেবতা আলিঙ্গনের হস্ত তোদের দিকে কেবলই এগিয়ে আসছেন। এ সুযোগ তোরা ছাড়িস না।'

কথায় বাধা দিয়া নবাই হাড়ী বলিল, 'মাষ্টার তুমি ভাবতা একবার নয়, একশো বার। ময়লা বয়ে বয়ে মাথায় চাঁদী পড়ে গিয়েছে, এতেও লোকের মন পাই না। রায়েদের গোমস্তা ওবেলায় জুলুম করছিল,—বলছিল, কাজে বড় ঢিল দিয়েছিস, ছাড়িয়ে দেব তোকে। দেনা বাপু, ছাড়িয়ে। আমার কাজটা না হয় তুই কর। আমি ল্যাকাপড়া কবে তোর কর্ম্ম করিগে।'

রামশরণ বলিলেন, 'বেশী দিন নয়, বিশ্বদেবতা তোদের অন্তরের কামনা পূর্ণ করবেনই করবেন।' তাহার পর বুক-পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, 'আটটা বাজে যে। দুলালী, কি করছিস? স্বরলিপিটা সেধে নে একবার।'

দুলালী তখন একটা কবিতা লিখিতেছিল, বিরক্তিব্যঞ্জক সুরে উত্তর দিল, 'বাবা—তুমি হট্টগোলে সময় কাটাতে ভালবাস, তোমার জ্বালায় স্থিরভাবে সাহিত্যচর্চ্চা করতে পাই না। যখনই একমনে কিছু লিখিতে বসি, তখনই তুমি ডাক।'

রামশরণ আনন্দগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, 'বেঁচে থাক্ মা, আমার পুত্র নাই, তুই ভবিষ্যতে আমার পুত্রের কাজ করবি, আমার মুখ উজ্জ্বল করবি, তা আমি বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, কি লিখছিলে বাছা? আচ্ছা থাক থাক, ঐ যে শ্রাবণের 'জাগরণে' সেই যে আধ্যাত্মিক গানটার স্বরলিপি বেরিয়েছে, আরে পাগল, হ্যাঁ—তুমি মম সুধাসম চিরজীবনে—হারমোনিয়ম ধরে গানটা একবার

গা দেখি। গানটা শুনে অজ্ঞ লোকেরা ভাবে, বেন গাস্থির প্রেমে বিভোর হয়ে নায়িকা তার প্রিয় মানুষকে প্রাণের বেদনা জানাচ্ছে কিন্তু তা নয়। ওর ভাব চমৎকার। ওর ভাব হচ্ছে এই, ভক্তমাত্রেই নায়িকা, আর সেই পরম পুরুষ পরব্রহ্ম বিশ্বদেবতা হচ্ছেন নায়ক।—প্রাঞ্জভাবের কথা আর কি? বাস্তবিক আজকাল বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় শ্রেষ্ঠভাবসম্পদবিশিষ্ট সঙ্গীতগুলির যে স্বরলিপি বেরোচ্ছে, তা দেখে মনে হয়, বাঙ্গালাসাহিত্য বিকাশের পথে চলেছে, বাঙ্গালা ভাষা ভাবের চোটে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষার স্থান একদিন অধিকার করবেই করবে। গা-দেখি-বাছা, গানটা একবার।'

দুলালী বলিল, 'হারমোনিয়ম ধরছে কে? নিজে বাজিয়ে নিজে গাওয়া সুবিধে হয় না।'

রামশরণ ছাত্রবৃন্দের মুখের দিকে চাহিলেন। ভবা মুচী বলিল, 'আমাদের ঢোলক থাকলে আমি সঙ্গৎ করতে পারতাম।'

নদের চাঁদ কামারের ছেলে গোপাল বলিল, আমি বাঁশের বাঁশীতে সুর দিতে পারি। হারমোনিয়ম যাত্রার দলে দু'একদিন টেনেছি, দু'পাঁচদিন অভ্যেস করলে সরগৎ হয়ে যাবে।'

রামশরণ বলিলেন, তবে গোপাল, তুই হারমোনিয়ম ধর। যে ওস্তাদী আর দেরী করিস্ না, ন'টা বাজে।'

গোপাল বয়সে যুবা, গ্রামের মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে 'বোধোদয়' পর্য্যন্ত পড়িয়া এক হাতুরে ডাক্তারের কাছে কিছু দিন কম্পাউণ্ডারী করিয়া শেষে নিজেই ডাক্তার হইয়াছিল। তাহার চিকিৎসার ফলে গ্রামের দুই একটী রোগী স্বর্গে ইহলীলা সম্বরণ করায়, সকলেই তাহার বোধোদয়ের পরিচয় ভালই পাইয়াছে। তাহার ব্যবসা ভাল চলিত না। যাহা কিছু পাইত, তাহাতে তাহার খরচটাই অতি কষ্টে চলিত। বংশলোপের ভয়ে তাহার পিতা তাহাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দেয় নাই, কিন্তু কামারশালায় বসিয়া সে পুত্রের কার্য্যকলাপ বিষয়ে যে সকল কথা বলিত, তাহা অকথ্য ও অশ্রাব্য। গৃহের অশান্তিতে পড়িয়া গোপাল রামশরণের নাইটস্কুলে নাম লিখাইয়াছিল। নদেরচাঁদ তাহার কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল, কারণ রামশরণের কৃপায় তাহার ছেলে রেলের একটা চাকরী পাইলেও পাইতে পারে।

সে রাত্রে দুলালী যে-গান গাহিয়া, তাহা শুনিয়া মাত্র রামশরণের নয়, গোপালেরও চক্ষু ছল ছল করিয়া

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামশরণের 'নাইট স্কুলে' যাতায়াত করিয়া গ্রামের তোম মোদক চামার চাষা প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে শিখিতে লাগিল, তাহা একেবারেই অসহ্য। স্বার্থে বাধা পাইলে হাসিমুখে কি কাটাইতে পারে, এমন লোক একালে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। রামশরণের স্বাভাবিক গৃহহয়। পূর্ব্বে চারি পয়সা মজুরী দিয়া যে কাজ করাইতেন, এখন চারি আনা পারিশ্রমিক দিয়াও সে কাজ যথাকালে হয় না। রামশরণের কাছে শিখিয়া তাহারা এক দিন ভদ্রলোকদিগকে অম্লানবদনে বলিতে লাগিল, 'মোশয়, এখন ত টাকায় একমন চাল পাওয়া যায় না যে, চার পয়সায় সের দিন খাটব আপনার বাড়ীতে।' এ শিক্ষা যে রামশরণের, তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। মাধব মোড়ল গ্রামের প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ। সে নাথ প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া জানাইলেন, 'রামশরণের অত্যাচারের পাকে ত আর বাস করা যায় না। এর একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে।'

মাধব মোড়ল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন, 'গোটা পঞ্চাশেক টাকা সংগ্রহ করে দিতে পারেন ত রামশরণের চোদ্দপুরুষকে একদিনে জব্দ করতে পারি।' আপনাদের কেউ থানা-পুলিস ডাইরী করলে, রামশরণের ওখানে যাবে আগে এমন একটা লোকের নাম করলেই হবে। এসব কাজে দু'একটা মিথ্যে কথা বললেও পাপ নাই। আমার ঠাকুর মশাই বলতেন, 'স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞো ন ছলেন প্রকারেণ।' রামাই ভট্টদেবতার উদ্দেশে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'তাহার পর বলিলেন, 'রামশরণ ব্রাহ্মণসন্তান, তাঁকে একবার ডেকিয়ে বুঝিয়ে দেখি। কে আছিস রে, বলো, রামশরণ চাটুর্য্যেকে একবার ডাক ত। বলিস তাঁর নামে একটা 'কল' করা হয়েছে, একবার এসে মীমাংসা করাই ভাল।'

পুলিসের নাম শুনিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। সকলে বলিলেন, ও বাবা যত চাটুয্যেকে পাও নাই কে ও নামেই চলে যাবে।'

মাধব বলিলেন, 'আমার বাবুন দুটি চাল, রামশরণ কি এতই বড়লোক হয়েছে যে, আমার ডাকে আসবেন না?' কেরাণীগিরী করে তিনি টাকার মায়া [illegible] পেরেছিলেন কি না, সে কথা পঞ্চায়েৎ ঠাকুর ঠাহর [illegible] কিন্তু [illegible] তাঁর আসন [illegible]

কিছুক্ষণ পরে রঘু ফিরিয়া বলিল, 'না, তিনি আসবেন না।'

যদুনাথ বলিলেন, 'ঐ আমি ত আগেই বলেছি।'

মাধব বলিলেন, 'থামুন, ব্যাপারটা কি আগে শুনি, তার পর ব্যবস্থা করছি।' তাহার পর রঘুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কিরে, তুই গিয়ে কি বললি?'

রঘু বলিল, আমি বললাম, মোড়ল মশায় ডাকছেন, আপনার নামে কি একটা 'কেশ' রুজু হচ্ছে। শুনেই তিনি চটে উঠলেন, বললেন, আমার নামে 'কেশ' কিসের? আমি কি মোড়লের খাতক না প্রজা না তার চালে চাল লাগিয়ে বাস করি? তার পর আমাকে বললেন, তুই আমার ইস্কুলে আসিস না কেন? একটু লেখাপড়া শিখতিস যদি রে, তবে আর তোর এ দুর্দ্দশা আমাকে দেখতে হত না, তুই মোড়লের কাজ করতে পারতিস।'

যদুনাথ বলিলেন, 'শুনলে রাবাজী,—তোমার চাকরটা নেবার চেষ্টায় আছে।'

মাধব বলিলেন, 'থামুন খুড়ঠাকুর, বহু চেষ্টাচরিত্রি করে আমাকে একজন নিতে হয়েছে, রামশরণ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আমি কি সহজে কাজটা ছেড়ে দেব? তারপর রঘো, তুই কি বললি?'

রঘু বলিল, 'আমি আর কিছু বলি নাই।'

মাধব বলিলেন, 'কাকে কাকে দেখলি সেখানে?'

রঘু বলিল, 'রামশরণের বেটীর সঙ্গে বসে গোপাল ডাক্তার কথা কচ্ছিল আর চাটুয্যে-মশায় চোক বুজে বসেছিলেন।'

মাধব বলিলেন, 'গোপাল-ডাক্তার কে রে? ও নষ্টা কাসারের বেটা—বুঝি সেও ওখানে গিয়ে জুটেছে।'

রতনাথ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'সে কথা আর বলনা বাবা, রামশরণ আমাদের কুলে কালি দিয়েছে।'

মাধব বলিলেন, 'কই, একথা ত এতদিন শুনি নাই।'

যদুনাথ উত্তেজিতভাবে বলিলেন, 'শোন নাই তবে শোন। রামশরণ ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে, তার আর জাত-বিচার নাই, গোপলার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দেবে বুঝি।'

মাধব বলিলেন, 'মহাভারত! ব্রাহ্মণের ঘরে এত অনাচার! হুঁ, উকিল ক'টা আজই জোগাড় করুন, আজই রেতে থানায় গিয়ে সব পোলিসে চুকিয়ে আসি।' তাহার পর বলিতে লাগিলেন, 'বাপু হে, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানীই হও আর

বেফাঁতিহ্ হও, আমি তোমাকে ভয় করি না। বহু চেষ্টা চরিত্র করে এই প্রসিডেন্টের কাঁধটা নিয়েছি, তা আর তোমার সহ্য হচ্ছে না? তুমি রেলের চাকরী করে কত টাকা লুটছ, কই একটা দিনের জন্যও ত আমি সে কথা তুলি নাই।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রামশরণের 'নাইট' স্কুলে দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বাড়িতেছিল, আর সেই সঙ্গে রামশরণের বিশ্বদেবতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এতই বাড়িতেছিল যে, দুই এক কিছুদিন পরে তিনি অন্তরের মধ্যে বিশ্বদেবতার একটা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইতেন। ওদিকে দুলালী ও গোপালের মৌখিক ভাব কে জানে কোন্ সময়ে ভালবাসায় পরিণত হইয়াছিল; তাহাদের একজন অপরকে ছাড়িয়া এক তিল থাকিতে পারিত না। স্কুলের অধিবেশন কাল সন্ধ্যার পর রাত্রি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু গোপাল নানাহারের সময়টুকু ছাড়া সারাদিন 'নাইট স্কুলে' বসিয়া হারমোনিয়ম টিপিত, দুলালীর রচিত কবিতা মনে মনে গুনিত। তাহার পিতা ভাবিত, রামশরণ চাটুয্যেকে তাহার পুত্র যে রকম 'বশ' করিয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে রামশরণের সুপারিশে গোপাল রেল-বিভাগে একটা চাকরী পাইবেই পাইবে। রামশরণ বুঝিতেন খোরাক পোষাক দিয়াও সারাদিন একটা লোককে কাছে রাখা যায় না; কিন্তু গোপাল কিছু না পাইয়াও তাঁহার বাড়ীতে সারাদিন পড়িয়া থাকে, ইহার কারণ বিশ্বপ্রেমের শক্তি। কিন্তু হঠাৎ একদিন পুলিস আসিয়া কৃষ্ণধন দাসের পো ওবফে কেষ্টা মুচি ও নবদ্বীপ হাজরা ওনকে নবাই হাড়ীকে গ্রেপ্তার করিল। যদুনাথ রাম-শরণকে শুনাইয়া দারোগাকে বলিলেন, ভাই বলি, আমার গরুটা সেদিন ধড়ফড় করে মরে গেল। কেষ্টা বেটা, তুই খাওয়ালি বিষ আর আমাকে করতে হয় প্রায়শ্চিত্ত। এইবার তোর প্রায়শ্চিত্ত না করে আমি ছাড়ছি না। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, কি বলেন দারোগা বাবু?'

দারোগা বলিলেন, 'বিষ দিয়ে গরু মারা মুচি বেটাদের একটা রোগ। আমি এ রকম ঢের 'কেস' করেছি। আর ধান চুরিটা আজকাল খুব হচ্ছে দেখছি। টাকায় ছ'সের চাল, একটা ধান নয় যেন একটুকরা সোণা। বিচারের ফলটা

আমার হাতে থাকলে নবাই হাড়ীকে একেবারে দায়রা সোপরদ্দ না করে ছাড়তাম না। প্রমাণ প্রয়োগ ঠিক রাখবেন, কোর্টে যেন 'কেস' ফেঁসে না যায়।' তাহার পর রামশরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনি গাঁয়ে এসে এ সব কি কাণ্ড আরম্ভ করেছেন? এই নবাই হাড়ী, কেষ্টা মুচি, এরা আপনার অনুগত, আমি তদন্তে জানতে পেরেছি। এদের চুরি যদি প্রমাণ হয়, তবে এরা মাল সামলায় নিশ্চয়ই আপনার বাড়ীতে।'

রামশরণ বলিলেন, 'বিষ দিয়ে গরু মারা, ধান চুরি যাওয়া, এসব কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

দারোগা বলিলেন, 'বিশ্বাস ত মশায়, প্রমাণের মুখে। যে রকম প্রমাণ পেয়েছি, তা অবিশ্বাস করা যায় না। আসামীর দিকে এত টান কেন আপনার বলুন দেখি?'

যদুনাথ অগ্রসর হইয়া যুক্তকরে বলিলেন, 'হুজুর, কার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছেন? ও কি একটা মানুষ? বিদেশে থাকে, রেলের চাকরী করে, খুব বড়ও নিয়ে পড়ে থাকে, দু'দিনের ছুটী নিয়ে বাড়ী এসেছে, এখানেও সে জমায়েত রেখে থাকতে পারে না। বাড়ী এসেই বড় চোর-বদমায়েসকে আড্ডা দিয়েছে। এই দেখুন, আমি ওর সম্পর্কে হই দাদা, কিন্তু বাড়ী এসে একটা পেন্নামও করে নাই।' বলিয়াই বক্রদৃষ্টিতে একবার রামশরণের দিকে চাহিলেন। দারোগা সহাস্যমুখে কেষ্টা মুচি ও নবাই হাড়ীর হাতে হাতকড়ি লাগাইবার হুকুম দিলেন। কৃষ্ণধন রামশরণের উদ্দেশে প্রণাম করিবার জন্য মাথা হেঁট করিল। একজন কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া আসামীকে 'সিধা' করিয়া লইল। বেগতিক দেখিয়া নবাই রামশরণের দিকে আর চাহিল না॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রাম হইতে পুলিস চলিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই যদুনাথ মাধব মোড়লের সহায়তায় গ্রামের মধ্যে প্রচার করিয়া বেড়াইলেন,—যে রামশরণের স্কুলে যাইবে, তাহাকেই জেলে যাইতে হইবে।

সেদিন সন্ধ্যাকালে গোপাল ছাড়া আর কোনও ছাত্র রামশরণের স্কুলে

ভুলে আসিল না। লেখা-পড়ায় মন আকৃষ্ট না হইলেও মসলা দেওয়া তামাক টানিতে ও হারমোনিয়ম যোগে দুলালীর গান শুনিতে সকল ছাত্রেরই বাসনা প্রবল হইয়াছিল; কিন্তু জেলে যাইবার ভয়ে সকলেই মাধবমোড়লকে জানাইয়া আসিল, 'মোড়ল ম'শায়, আপনি গরীবের মা বাপ।' মাধব সকলকেই বলিলেন, 'সাবধান।'

সন্ধ্যার পর রামশরণ যথানিয়মে বৈঠকখানায় সতরঞ্চ বিছাইয়া বসিলেন। তাঁহার এক পাশে গোপাল, অপর পাশে দুলালী। সকলেই বিষণ্ণ। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গোপাল কথা পাড়িল, বলিল, 'সবাই ত পলাইয়া বাঁচিল, আমি কিন্তু আপনাকে ফেলে পলাতে পারছিনা, কিন্তু দশের শক্তি উপেক্ষা করে ক'দিন টিকতে পারব, তাই ভাবছি।'

রামশরণ ধীরকণ্ঠে বলিলেন, 'দেখি কি হতদূর হয়। আজ রাত্রেই যাই। মোক্তারদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখি। সুযোগ পাইত মহকুমার হাকিমদের সঙ্গেও একবার দেখা করব। তিনি অশুই সুবিচার করবেন। দুলালী, বুঝেছিসত বাছা, গাঁয়ের সবাই আমাদের শত্রু হয়েছে। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত একটু সাবধানে থাকিস। গোপাল, এক একবার খোঁজ নিস্।'

গোপাল বলিল, 'সে জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

* * * * * *

থানা ও মহকুমা ঘুরিয়া দুইদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া রামশরণ যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। একটী বাক্সে তিনি তিনহাজার টাকা রাখিয়াছিলেন, ঘর খুঁজিয়া সে বাক্সের সন্ধান পাইলেন না। দুলালীকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া তাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না। বদুনাথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন, 'কি ভাই, বাড়ী এলে, মনের সাধ এতদিনে মিটল ত? মেয়েটা গোপলা কামারের সঙ্গে বেরিয়ে গেল, এখনও তুমি বেঁচে আছ?'

রামশরণ মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, তাহারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'জেনে শুনে ভালবেসে বিয়ে করা ভাল, একথা আমি মেয়েকে অনেকদিন শিখিয়েছি বটে, কিন্তু লেখাপড়া-জানা মেয়ে যে শেষে গোপলা কামারকে ভালবাসবে, তা ত বুঝতে পারি নাই। মেয়ে মরে গেলেও আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমার টাকার বাক্স—ঢের টাকা তাতে ছিল। আমি এতকাল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা কিছু উপায় করেছিলাম, সব গেল।'

যদুনাথ বলিলেন, 'তোমার কর্ম্মফল তুমিত ভোগ করবেই, কিন্তু লোকে বলবে—যদু চাটুয্যের ভাইঝি বেরিয়ে গিয়েছে, এ কলঙ্কের বোঝা আমি কেমন করে তাই ভাবছি!'

এক ভিক্ষুক তখন অদূরে গাইতেছিল,—

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রিয়ার রূপ।

—:০:—

প্রিয়ার মোর রূপের প্রভা নেহারি আজ কি-ভাবে!
বরাভয়ের অভয় পাণি-সুধাই শুধু বিলাবে।
জীবন-হরা মরণ এল শরণ কোথা নাহি যে!
সোণার ধরা আঁধার হ'ল বিদায় হেথা চাহি যে!
প্রিয়ার কোথা মধুর হাসি জ্যোছনা ঢাকা নীরদে!
নাইক কথা একটী মুখে নীরব সারা বিপদে!
অশন-হারা ভূষণ-হারা শয়ন-হারা আপনি!
একটু মোরে আরাম দিতে আকুল দিবা রজনী!
আমার যত রোগের জ্বালা, দুখের ব্যাথা অসহ,
আপন বুকে রাখিতে ঢেকে প্রিয়ার কত আগ্রহ!
মলিন মুখে অঞ্জন ছটা অধীর মন-মন গো!
কালেরে জয় করিবে আজি এমনি তার পণ গো!
সহায়হীনে সাহস-বলে হৃদয়ে দিতে শকতি,
করুণা-সেবা আসিল কিবা ধরিয়া প্রিয়া-মূরতি!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

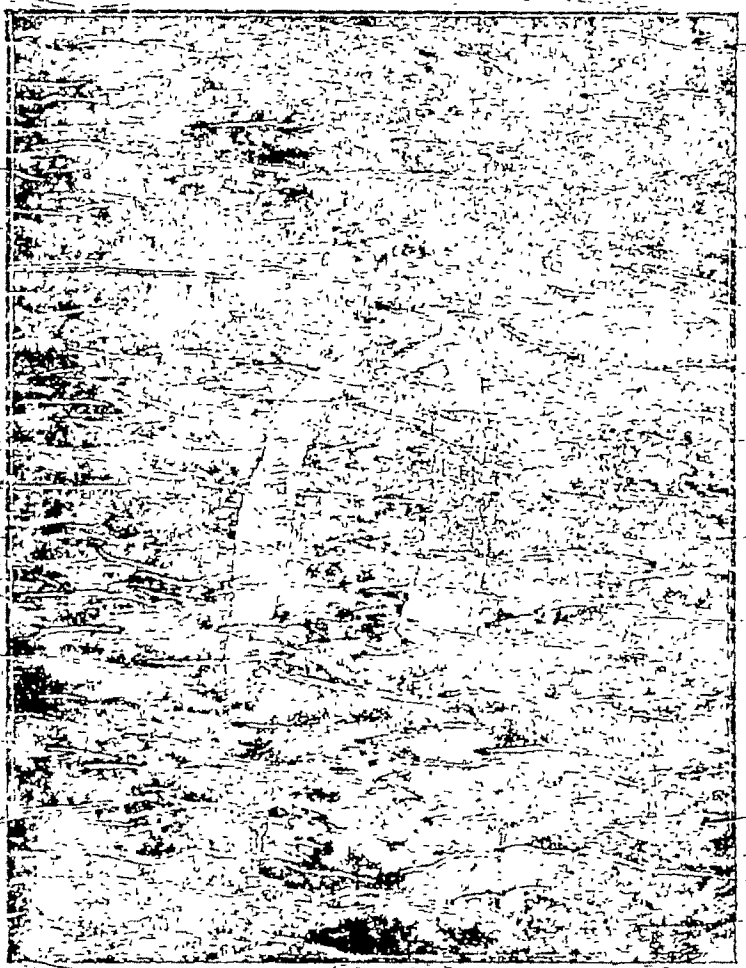

কবিবর ৺ রাধামাধব মিত্র।

কবিবর ৺ রাধামাধব মিত্র মহাশয় বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রি ২টা ৩৫ মিনিটের সময় তাঁহার কলিকাতা ৩৫ নং রিডনষ্ট্রীটস্থিত ভবনে সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়স হইয়াছিল ৯৬ বৎসর।

হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল থানার অধীন জেজুর গ্রামে প্রসিদ্ধ মিত্র বংশে রাধামাধব ১২৩২ সালের ২৬শে ভাদ্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার

নাম ৺স্বরূপচন্দ্র মিত্র। ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কবিবরের পিতৃবিয়োগ হয়। প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালায় কবিবরের বিদ্যারম্ভ হয়। পরে কলিকাতায় মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনিষ্টিটিউসন নামক খৃষ্টান পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ঐ বিদ্যালয় হইতেই তিনি প্রথমতঃ জুনিয়র ও পরে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনিষ্টিটিউসনের তাৎকালিক অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ডাক্তার ডফ ও মিঃ ওগিল্‌বী কবিবরকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। উক্ত বিদ্যালয় হইতে সিনিয়র স্কলারশিপ পাশ করিয়া রাধামাধব ঐ বিদ্যালয়ের আট বৎসরকাল শিক্ষকতা কার্য্য করেন। পরে এই শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া গ্রীলস্ ফ্রী কলেজে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। ৩২ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করিয়া ১৩০৩ সনে ৭১ বৎসর বয়সে ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, তৎপর রাধামাধব আর কোন চাকুরী গ্রহণ করেন নাই।

রাধামাধব একটীর পর একটী করিয়া ক্রমান্বয়ে তিনটী দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম দুই পত্নীর কোন সন্তান না হইতেই তাঁহারা পরলোক গমন করেন। শেষ পত্নীর গর্ভে রাধামাধবের কয়েকটী সন্তান জন্মে। সেই সতী লক্ষ্মী চারিটী পুত্র রাখিয়া—পরমারাধ্য পতিদেবতার পাদে মস্তক রাখিয়া আজ আঠার বৎসর হয় অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। রাধামাধব জীবদ্দশায় দুইটী মহাশোক পাইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর গত হইল, তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র বৃদ্ধ পিতাকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া যৌবনের প্রারম্ভেই সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। ইহাই হইল রাধামাধবের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত। এখন আমরা রাধামাধবের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব।

রাধা মাধব যৌবনের প্রারম্ভে কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকটে কবিতা লিখিতে শিক্ষা করেন। গুপ্ত কবি রাধামাধবের অতুল কবিত্ব সম্পদে মুগ্ধ হইয়া অন্যান্য শিষ্যগণ অপেক্ষা রাধামাধবকে সমধিক স্নেহ করিতেন। গুরুর কৃপায় শিষ্য এমন কবিত্বসম্পদে ধনী হইয়াছিলেন যে, গুরু-শিষ্যের কবিতার মধ্যে কোন তারতম্য বা প্রভেদ আছে বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিতেন না। রাধামাধবের রচিত "কবিতাবলী" ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম ভাগ, "বোধেন্দুদয়," "স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ," "বনিতামরণ," "সেকের

কুমার" ও "বসন্তে বিচ্ছেদ কুলকামিনীর খেদ" প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থগুলি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তৎকালে শিক্ষিত-সমাজে ঐ সকল পুস্তক অতি আগ্রহের সহিত পঠিত হইত। রাধামাধবের "কবিতাবলী"র প্রত্যেক ভাগ বিদ্যালয়-পাঠ্য কবিতা পুস্তকের শিরোমণিস্বরূপ। তাৎকালিক গুণগ্রাহী পাঠ্য-নির্ব্বাচক মহোদয়গণ বহুবৎসর ধরিয়া রাধামাধবের কবিতাবলী বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া প্রকৃত-গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। একালে যেমন যাতা রাবিশ ও ছাই ভস্ম পুস্তক অনুরোধ উপরোধ বা খোশামোদের জোরে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়া যায় এবং একালে যেমন কর্ত্তাভজা দলে নাম লেখাইয়া কর্ত্তার ভজনা করিতে পারিলেই বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের একচেটিয়া অধিকার লাভ করা যায়, সে কালে তাহা হইত না। সেকালের মাথিবজ্ঞানসম্পন্ন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচকগণ প্রকৃত কবিত্ব ও গুণেরই সমাদর করিতেন। বর্ত্তমান কালের পাঠ্যনির্ব্বাচকগণ যদি সেকালের পাঠ্য-নির্ব্বাচকগণের ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, গুণগ্রাহী ও নিরপেক্ষ নির্ব্বাচক হইতেন, তবে মনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' যদুগোপালের 'পদ্যপাঠ' মনোমোহনের 'পদ্যমালা' কালীপ্রসন্নের 'কোমল কবিতা' এবং রঙ্গলাল ও রাধামাধব প্রভৃতির উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলি উপেক্ষিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে কবিত্ব ও ভাষাজ্ঞানহীন লেখকের ছাইভস্ম পুস্তক পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়া কোমলমতি বালকগণের শিক্ষালাভের পথে আবর্জ্জনারাশির সৃষ্টি করিতেন না।

কবি রাধামাধবের বিদ্যালয়পাঠ্য কবিতাবলীর একএকটী কবিতা যেন মিশ্রির টুক্‌রা। পাঠক একটী নমুনা দেখুন,—

কবিতাবলী ২য় ভাগে "বিদ্যাহীন ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে পরিগণিত নহে।" শীর্ষক যে কবিতাটী আছে, তাহা এই :—

যে ফুলে সুবাস নাই সে ফুল কি ফুল।
যে কুলেতে মান নাই সে কুল কি কুল॥
যে চাষেতে লাভ নাই সে চাষ কি চাষ।
যার প্রভুভক্তি নাই সে দাস কি দাস॥
যে ছবিতে শোভা নাই সে ছবি কি ছবি।
যে গবী না দেয় দুগ্ধ সে গবী কি গবী॥
যে গানে না হয়ে মন সে গান কি গান।
যে কাণ বধির হয় সে কাণ কি কাণ॥

যে নাসা না পায় ঘ্রাণ সে নাসা কি নাসা।
যে আশা না পূর্ণ হয় সে আশা কি আশা॥
যে ফলেতে শস্য নাই সে ফল কি ফল।
যে হলে না চাষ হয় সে হল কি হল॥
যে ধর্ম্মেতে ত্রাণ নাই সে ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম।
যে কর্ম্মেতে যশ নাই সে কর্ম্ম কি কর্ম্ম॥
যাহাতে সতীত্ব নাই সে জায়া কি জায়া।
যে কায়াতে শক্তি নাই সে কায়া কি কায়া॥
যে নদীতে স্রোত নাই সে নদী কি নদী।
যে গদি কোমল নয় সে গদি কি গদি॥
যে অসিতে ধার নাই সে অসি কি অসি।
যে মসীতে জল সরে সে মসী কি মসী॥
যে ভূপের ভূমি নাই সে ভূপ কি ভূপ।
যে কূপেতে জল নাই সে কূপ কি কূপ॥
যে ঘাটেতে রাণা নাই সে ঘাট কি ঘাট।
দ্রব্যাদি না মেলে যাতে সে হাট কি হাট॥
যে পদে না চলা যায় সে পদ কি পদ।
যে পদে সম্ভ্রম নাই সে পদ কি পদ॥
যে রথেতে রথী নাই সে রথ কি রথ।
যে পথে পথিক নাই সে পথ কি পথ॥
যা'তে ধাপ শ্রেণী নাই সে মই কি মই।
যাতে জ্ঞানশিক্ষা নাই সে বই কি বই॥
যে ঘরে দ্বার নাই সে ঘর কি ঘর।
যে নরের বিদ্যা নাই সে নর কি নর॥
যে ধনেতে পরানিষ্ট সে ধন কি ধন।
যা'তে ঈশভক্তি নাই সে মন কি মন॥

পাঠক দেখুন, কেমন সরল সোজা খাঁটী বাঙ্গালায় সুন্দর কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কবিবরের গ্রন্থগুলি এমন সুন্দর সরল কবিত্বভাবে পূর্ণ যে, পাঠ করিলে বস্তুতই মুগ্ধ হইতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাধানাথ গুপ্তকবির অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

রাধামাধবের গুণমুগ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র রাধামাধবকে তাঁহার সর্ব্বজনপ্রিয় পত্রের প্রধান সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, রাধামাধবকে সহকারিরূপে প্রাপ্ত হইয়া গুপ্তকবি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। সংবাদ-প্রভাকর তখন দেশের বিশেষ শক্তিশালী সংবাদপত্র ছিল। রাধামাধবের সহকারিতায় ঐ পত্রের প্রভাব প্রতিপত্তি আরও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার অতি প্রিয় সংবাদ-প্রভাকর সম্পাদনের ভার প্রিয় শিষ্য রাধামাধবের উপরে পতিত হয়। রাধামাধব যে ধারা বজায় রাখিয়া এমন দক্ষতার সহিত প্রভাকর সম্পাদন করেন যে, তাহাতে প্রভাকর নিজের গৌরব পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ৺ গুপ্ত কবির মৃত্যুর পরে এক লোক সমাগম হইলে তদীয় প্রিয় শিষ্য রাধামাধব ঐ সভায় এক কবিতা পাঠ করেন, কবিতাটির প্রারম্ভে এইরূপ ছিল :—

"যেখানেতে সভা হ'ল এ কি অলক্ষণ।
মনের মানুষ নৈ তোমার মতন॥"

এই কবিতাটী শ্রোতৃবর্গের এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, গুপ্ত-কবির গুণমুগ্ধগণের মধ্যে অনেকেই ঐ কবিতা শ্রবণ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

বিগত ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন কবি রাধামাধব "যুবরাজের অভ্যর্থনা" নামে যুবরাজের অভ্যর্থনাসূচক এক রাজভক্তিমূলক ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎপর সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন যুবরাজরূপে এদেশে আগমন করেন, তখন এবং শেষে যুবরাজ যখন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্-রূপে এদেশে আসেন, তখনও কবি রাধামাধব তাঁহার অভ্যর্থনাসূচক দুইখানি রাজভক্তিমূলক কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই শেষোক্ত ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকদ্বয়ই কবির শেষ রচনা। ঐ সকল অভ্যর্থনাপুস্তক দুইটি শেষ রচনার নমুনা পাঠকবর্গকে উপহার দিবার বাসনা রহিল। এই সকল অভ্যর্থনাপুস্তকের পরে বৃদ্ধ কবি রীতিমত কোন পুস্তক রচনা করেন নাই, তবে তিনি তাঁহার দুই পৌত্রীর বিবাহে যে দুই খানি আশীর্ব্বাদসূচক উপহার কবিতা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব। ঐ স্নেহাশীর্ব্বাদ দুই খানি বাস্তবিকপক্ষে বিবাহের প্রীতি-উপহারের মত না হইয়া নিরর্থক বাস

কথাপূর্ণ ফচকেমী বা ভাঁড়ামী নহে। পরন্তু উহা কবিত্বের আধার এবং দীর্ঘ দেশকথায় পূর্ণ। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ প্রীতি উপহার একখানাও সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা দেখাইয়া পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিতাম।

কবি রাধামাধব দীর্ঘ জীবনের দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কাটাইয়াছেন। বাঙ্গালায় তাঁহার বহু কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং এখনও আছেন। জষ্টিশ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবির একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কবির কবিত্বের যাঁহারা খোঁজখবর রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে এবং কবির ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কবি রাধামাধব যে একাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহা অবগত ছিলেন না। তাহার প্রধান কারণ কবি রাধামাধব নামের কাঙ্গাল ছিলেন না। আজকাল যে সকল কবিনামধারী, চৌদ্দ পিঠে হন্দ হইলেও নিজের ঢাক নিজে কাঠি দিয়া নাম জাহির করিতে সদা ব্যস্ত, কবি রাধামাধব সেইরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। ইনি অতি ধার্ম্মিক, সরল ও অতি সাদাসিদে লোক ছিলেন। ইনি ধর্ম্মকথার আলোচনা করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। সপ্তাহের প্রতি রবিবার ইঁহার আবাসে সাধু সজ্জনগণ সমবেত হইয়া কীর্ত্তন ও ধর্ম্মকথার আলোচনা করিতেন। ইনি জীবনে কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়াছেন বলিয়া অপবাদ অতিবড় শত্রুও ইঁহাকে দিতে পারিবেন না। এমন নির্ম্মল স্বভাব—এমন বালকের ন্যায় সদা প্রফুল্ল ব্যক্তি আজকাল বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অতি বৃদ্ধ অবস্থাতেও ইনি বেশ চলাফেরা করিতে পারিতেন, এবং এই বৃদ্ধ বয়সেও ইনি সর্ব্বদা পড়াশুনায় কাল কাটাইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত ইনি রোগযন্ত্রণায় একেবারে অভিভূত হন নাই।

আর একটী বিষয়ে কবিবরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইঁহাদের বিডন-ষ্ট্রীটস্থিত আবাসে ক্ষুদ্র একটী নয়নানন্দদায়ক বাগান আছে। এই বাগানটী প্রকৃতির বরপুত্র রাধামাধবের স্বহস্ত-রচিত। উহাতে দেশী বিদেশী নানা ফুল শোভাদায়ক গাছগুলি এমন সুন্দরভাবে সযত্নে সজ্জিত করা হইয়াছে পাকা মালিও এরূপ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। রাধামাধব প্রত্যহ স্বহস্তে নিয়মিত ভাবে এই বাগানের কার্য্য করিতেন। রাধামাধবের যত্নে লালিত কোন গাছের একটী সামান্য ডাল পর্য্যন্ত বিসদৃশ ভাবে ঝুলিয়া পড়িতে বা কোন গাছে একটি শুষ্ক পাতা পর্য্যন্ত থাকিতে পারিত না। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃদ্ধ কবি মনপ্রাণ ঢালিয়া এই বাগানের তোয়াজ করিয়া গিয়াছেন।

কবি রাধামাধব-প্রণীত অধিকাংশ গ্রন্থই স্কুলপাঠ্য কবিতা পুস্তক। কিন্তু বর্ত্তমান কালের পাঠ্যনির্ব্বাচক বিশ্বপণ্ডিতগণের নিকটে গুণের আদর না পাইয়া যোগাড়ের জয়জয়কার হইয়া থাকে। তজ্জন্য রাধামাধবের ন্যায় গুণীর গ্রন্থ অনেক দিন হইতেই বিদ্যালয় হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান কালের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণ রাধামাধবের অতুল কবিতা পুস্তক পাঠের সুযোগ না পাওয়ায় রাধামাধবের কবিত্বসম্পদের তাহারা কোনই খোঁজ খবর রাখে না, রাধামাধবেরও খোঁজ খবর অনেকে জানে না। বলিতে কি রাধামাধবের কবিতা এবং রাধামাধবের নাম নব্য বঙ্গসমাজ হইতে লোপ পাইতেই বসিয়াছে। তজ্জন্য আমরা রাধামাধবের যতগুলি কবিতা পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার প্রত্যেক পুস্তক হইতে বাছা বাছা কবিতাগুলি ক্রমশঃ পাঠকগণকে উপহার দিব বলিয়া আশা করিতেছি। সেই সকল পাঠ করিলেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, অযত্ন ও অনাদরে কি অমূল্য রত্ন সকল লোপ পাইতে বসিয়াছে। রাধামাধবের কবিতা গ্রন্থ সকল এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। আমরা বহু চেষ্টা করিয়া এ যাবৎ মাত্র ২।৩খানা পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।

রাধামাধবের কাব্য গ্রন্থ ভিন্ন আমরা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং কবি রাধামাধব-সম্পাদিত অনেক "সংবাদ প্রভাকর"ও সংগ্রহ করিয়াছি। তাহা হইতেও অনেক অমূল্য জিনিষ পাঠকগণকে উপহার দিবার বাসনা রহিল। ঐ সকল পাঠ করিলে পাঠক তাৎকালিক বাঙ্গালা ভাষার ধারা, পদ্য ও গদ্য রচনার ধারা এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির বহু কথা জানিতে পারিবেন। আজ এই পর্য্যন্ত। ক্রমশঃ।

শ্রীরাজকুমার সেনগুপ্ত।

৺রামকৃষ্ণ পরমহংস।

(সমালোচনা)

পৌষ ও মাঘ মাসের সাহিত্যে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসসম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় লিখিত একখানি পত্র ছাপা হইয়াছিল। ঐ পত্রে পণ্ডিত মহাশয় রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস একজন সাধুপ্রকৃতির লোক বটে, কিন্তু তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতেন না, তাঁহার সমাধিও হইত না। পণ্ডিত মহাশয়ের কয়েকটি যুক্তিসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন, "আমি কোন ধর্ম্মতত্ত্ব বা উপদেশ লওয়ার নিমিত্ত তাঁহার নিকট যাই (যাই) নাই; কারণ তিনি কোন প্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং অধ্যাত্ম বিষয় বা ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয় বা তৎপ্রাপ্তি সাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না।" অতএব পণ্ডিত মহাশয়ের মতে শাস্ত্রপাঠ না করিলে অধ্যাত্মবিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়, ব্রহ্মতত্ত্ববিষয় বা তৎপ্রাপ্তি সাধনাদি কিছুই জানিতে পারা সম্ভব নহে। ইহা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয় বা ঈশ্বর লাভের পথ নির্ণয়ের পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞান মূল্যবান্ সহায়ক, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান না হইলে—কিম্বা শাস্ত্রপাঠ না করিলে যে ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না বা তাঁহাকে লাভ করিবার পথ কি, তাহা জানা যায় না, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কোন প্রমাণ গ্রন্থে এ কথা নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বরং ইহার বিপরীত কথা বহুস্থানে দেখা যায়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ১১ অধ্যায় ৪৮ শ্লোক।

"বেদ ও যজ্ঞ, বিদ্যা, অধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া, উগ্র তপস্যা প্রভৃতি উপায় দ্বারা তোমা ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি আমাকে এ ভাবে দেখিতে পারে না।"

পুনশ্চ,

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন-প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥"

১১ অধ্যায় ৫৩ ও ৫৪ শ্লোক।

"তুমি আমাকে যে ভাবে দর্শন করিলে বেদ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ দ্বারা আমাকে সে ভাবে দর্শন করা সম্ভব নহে। অনন্য ভক্তি দ্বারা আমাকে এই ভাবে জানা যায়, দর্শন করা যায়, ও আমার তত্ত্বে প্রবেশ করা যায়।" অতএব ভগবান্‌কে জানিতে হইলে, তাঁহার তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে প্রয়োজন—তাঁহাতে অনন্যা ভক্তি,—অপর কোন বিষয় ভজনা করিলে চলিবে না, সাংসারিক সুখ আশা ত্যাগ করিয়া, পার্থিব ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, কামনা বিসর্জ্জন দিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবান্‌কে ভজনা করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। শাস্ত্রপাঠ করা উত্তম এ জন্য যে, শাস্ত্রপাঠ করিয়া ভগবানে চিত্ত একাগ্র করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায় এবং ভগবানে চিত্ত একাগ্র করিবার উপায়ও কিছু জানা যায়। কিন্তু শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও ভগবান্‌কে একমনে ডাকা সম্ভব, অতএব ভগবৎতত্ত্ব জানা সম্ভব। কেহ কেহ সাধুপুরুষের উপদেশ লাভ করিয়া, কেহ বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে স্বতঃই ভগবানে একান্ত অনুরক্ত হইয়া একমনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকেন এবং এইভাবে সিদ্ধিলাভ করেন। পরন্তু শাস্ত্রপাঠ করিয়াও যাঁহারা একমনে ভগবান্‌কে ডাকেন না, তাঁহাদের ভগবৎতত্ত্ব-জ্ঞান বা ভগবান লাভ হয় না, তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠ নিরর্থক। এজন্য পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে, অধ্যয়নের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না।

ভগবান্‌কে লাভ করিয়া কি প্রকারে মনুষ্যজীবন সার্থক করা যায়, তাহা শ্রীগীতায় অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" ১৮।৬৫।

"আমাতে তোমার মন নিবিষ্ট কর, আমাকে ভক্তি কর, আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর, আমাকে প্রণাম কর। (এই উপায়ে) তুমি আমাকে পাইবে।

আমি তোমাকে সত্যপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—যে হেতু তুমি আমার প্রিয়।"

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ১৮।৬২

"তুমি সর্ব্বপ্রকারে ভগবানের শরণ লও। তাঁহার প্রসাদে তুমি পরম শান্তি এবং শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইবে। (অর্থাৎ ভগবান্‌কে লাভ করিবে)।"

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" ১০।৯, ১০

"মদ্ভক্ত পণ্ডিতগণ আমাতে প্রাণ ও চিত্ত সমর্পণ করে, পরস্পরকে আমার বিষয়ে বুঝাইয়া থাকে, সর্ব্বদা আমার কথা কহিয়া থাকে,—ইহাতে তাহারা সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করে। এই সকল ব্যক্তি সতত আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট রাখে, আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধি দিয়া থাকি,—যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে পাইয়া থাকে।"

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ৮।১৪।
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৯।৩৪।
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ১১।৫৫।
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ১৮।৫৫।

সর্ব্বত্রই বলা হইয়াছে যে, ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়।

ভগবানের তত্ত্ব অতি নিগূঢ়, অতি দুরূহ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

পুনশ্চ,—গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।

কিন্তু ভক্তিদ্বারা যাঁহারা ভগবান্‌কে লাভ করেন, তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদে

এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস-অবিচ্ছেদে সমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বর কি বস্তু, তাহা সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করা দুষ্কর বা অসম্ভব। উপনিষদও এ কথা বলিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

"এই আত্মা (ঈশ্বর) উৎকৃষ্ট বচন দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা বা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। ইনি যাহাকে বরণ করেন (অর্থাৎ যাহাকে উপযুক্ত মনে করেন) সেই ইহাকে লাভ করে, তাহার নিকট ইনি নিজরূপ প্রকাশ করেন।"

অতএব তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে বলিয়াছেন, "তিনি (পরমহংসদেব) কোন প্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং অধ্যাত্মবিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়, বা ব্রহ্মতত্ত্বাবগম বা তত্ত্বপ্রাপ্তি সাধনাদিবিষয় কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না" এ কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। ধ্রুব বা প্রহ্লাদ ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বর লাভ করেন নাই। নারদ একজন দাসীপুত্র ছিলেন, ব্রাহ্মণমুখে কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন মাত্র, রীতিমত শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও তিনি কিরূপে ঈশ্বর লাভ করিলেন?

তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছেন, "তাঁহার যে সমাধির ভাব হইতে দেখিতে, তাহা সমাধির নিয়ম অনুসারে হয় নাই; গানাদি শ্রবণমাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ হইয়া যাইত। আবার কিছুকাল পরে হঠাৎ তাহা ভঙ্গ হইত। তদ্দ্বারা এই মনে করিতে ঠিক অনুষ্ঠানের ফল বলা যায় না। ইহা মস্তিষ্কের অবস্থাবিশেষের ন্যায় হওয়াই অধিকতর সম্ভব।" নিয়ম অনুসারে হইলেই যে তাহা প্রকৃত সমাধি হইল, তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় না। নিয়ম সাধারণের জন্য, যাহারা সাধারণ, তাহাদের বন্ধনে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। বিলাত যাইবার সাধারণ নিয়ম এই যে, টিকিট ক্রয় করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া জাহাজে উঠিতে হয়। কিন্তু কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে টিকিট ক্রয় করিতে হয় না, তাঁহাদের ইচ্ছামত গিয়া জাহাজে উঠেন। সমাধিলাভের নিয়ম সম্বন্ধেও সেই কথা। সাধারণ লোকের মনের বন্ধন এত বেশী যে, সে বন্ধন কাটান অতিশয় কঠিন ব্যাপার, তাই যোগীরা "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ" বলিয়া বলিয়াছেন কিরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে, সে বন্ধন শিথিল করিয়া সমাধিলাভ করিতে পারে, মহাপুরুষদের জন্য কথা। শিষ্যদের ঈশ্বরানুরাগ অতি প্রবল, ঈশ্বরে মন আপনাই ডুবিয়া যায়, তাহাদের [illegible]

এবং তাঁহারা সমাধিলাভ করেন। তাঁহাদের সমাধি যে প্রকৃত সমাধি নহে তাহা মনে করা ভুল। মস্তিষ্করোগের সহিত কিছু বাহ্য সাদৃশ্য দেখিয়া স্থির করা উচিত নহে যে, ইহা মস্তিষ্করোগবিশেষ। যাহারা সনাতনধর্ম্মে আস্থাহীন, তাহারা নিয়মপ্রাপ্ত সমাধিকেও মস্তিষ্কের বিকার বলে; কারণ উভয় অবস্থার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পায়। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ পণ্ডিতেরও এই অসার যুক্তিপদ্ধতি গ্রহণ করিতে দেখিয়া আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

সমাধির কথা বলিয়া চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছেন, "সে সকল তত্ত্ব যাহাতে আছে, সেই অধ্যাত্মশাস্ত্র বা ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থ তাঁহার একেবারেই অবিদিত ছিল। তিনি লেখাপড়া আদৌ জানিতেন না। সে সকল তত্ত্ব এত দুরূহ যে, মীমাংসা দর্শন এবং উপনিষদ্ অধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরু উপদেশে তাহার ধারণা হয়, ইহা কোন মতেই হইতে পারে না।" সেই এক কথা। যত্ন করিয়া না পড়িলে এসকল বস্তু জানা সম্ভব নহে। কেন সম্ভব হইবে না? যাঁহারা ভগবান্‌কে লাভ করেন, তাঁহাদের ত কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না। আর তিনি উপনিষদ এবং অন্য যাবতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থ "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্"—এসকল সেই পরমপুরুষের নিঃশ্বাস মাত্র। তাঁহাকে পাইলে আর কিছুই জানা বাকি থাকে না। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন, "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্।"

চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছেন, "তিনি দেহত্যাগ করার পূর্ব্বে মাস ৫।৬ পর্য্যন্ত গলরোগের দরুণ যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক মনে ইহা কোষে উঠিতে পারিলে তাঁহাকে এ যন্ত্রণা মোটেই ভোগ করিতে হইত না।" মহাপুরুষগণ ইচ্ছা করিলে যে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারেন, কেন যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, অন্য মহাপুরুষের জীবনেও এ সকল দেখা যায়। সীতাকে হারাইয়া শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত কাতর ভাবে বিলাপ করিয়াছিলেন। যিনি স্বয়ং ভগবান্, লীলায় নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলেই সীতাহরণ নিবারণ করিতে পারিতেন, সীতাহরণ হইলেও তিনি চিত্ত স্থির রাখিতে পারিতেন। কিন্তু প্রাকৃত মানবের ন্যায় দুঃখভোগ করিলেন কেন, তাহা বলা কঠিন। হয় ত তিনি নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মানবসুলভ দুঃখকষ্টও ভোগকরা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। এবং সেদেরও বোধ হয় দৈহিক কষ্ট হইতে উদ্ধার পাওয়াই জীবনের শেষ উদ্দেশ্য ছিল না।

চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে তোমার কোন্ অধিকার আছে কিনা" আমাকে এতটুকু জিজ্ঞাসা করা অধিকার আমি তাঁহাকে দেয় (দেই) নাই।" ইহার ভাবার্থ এই যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস নিরক্ষর ছিলেন, আমি একজন পণ্ডিত ছিলাম, ওরূপ প্রশ্ন করিয়া তিনি আমার অপমান করিতে সাহস করিতে পারেন না। কিন্তু ইহা সকলেই জানেন যে, পরমহংসদেব শিশুর ন্যায় সরল ছিলেন। ধনী, উচ্চপদস্থ বা পণ্ডিত বলিয়া তিনি কাহাকেও সমীহ করিতেন না। যাহার বিষয়ে যাহা মনে হইত, তাহাই সরলভাবে বলিতেন। সুতরাং তাঁহার এরূপ কথা মনে হইলে চূড়ামণি মহাশয়ের অধিকার দিবার অপেক্ষা রাখিতেন না। তবে বাস্তবিক বলিয়াছিলেন কিনা, সে কথা স্বতন্ত্র।

প্রবন্ধের উপসংহারে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা মহাশয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার মত সমর্থন করিয়া কোন যুক্তি না দিয়া নানা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "অবতার বলিয়া প্রচার করাতে এই অনিষ্ট হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণের দেখাদেখি বঙ্গদেশময় বহু অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে।" বঙ্গদেশে আধুনিক বহু অবতারের কথা আমরা ত শুনি নাই। উপরন্তু এই যে আপত্তি ইহা ত শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বলরাম প্রভৃতিকে অবতার বলার বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায়,—এবং ব্রাহ্মরা করিয়াও থাকেন। পদ্মনাথ বাবু বলিয়াছেন, "রামকৃষ্ণ এই সকল উদ্ভট শ্রেণীর লোকের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন"। ইহা যথার্থ নহে এবং এ সম্বন্ধে উদ্ভট শব্দ প্রয়োগ করা অনুচিত হইয়াছে। পরমহংসদেব অবতার ছিলেন কিনা, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব না। আমরা শুধু ইহাই বলিব যে, ভবিষ্যতে কল্কি অবতার ভিন্ন অন্য অবতার হইতে পারে না, ইহা অনেকের ভ্রান্ত ধারণা। অবতার বহুসংখ্যক, সকল অবতারকে সকলে চিনিতে পারেন না। কারণ গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"

পুনশ্চ, "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

উপসংহারে আমরা ইহাই বলিতে চাহি যে, কেহ যদি কোন সাধুপুরুষকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস না করেন, তথাপি সাধুপুরুষ বলিয়া তাঁহার অসম্মানসূচক কথা বলা উচিত নহে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—রাঁচি।

ভাষার সাড়ে বত্রিশ ভাজা।

প্রবন্ধ আরম্ভের পূর্ব্বেই একটী প্রশ্ন। প্রিয় পাঠক, প্রশ্নটী মহাশয়কেই করিতেছি।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার "চণ্ডী" কাব্যে লিখিয়াছেন,—

হাল পিছু এক তঙ্কা, কারে না করিহ শঙ্কা,
পাট্টার নিশান মোর ধর।
নাহি দিব দাবড়ি, রয়ে বসে দিহ কড়ি,
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশ-গাড়ী, নানা বারে যত কড়ি,
না লইব গুজরাট বাসে।

সুমিশ্চ, এই কবি তাঁহার উক্ত কাব্যের আর এক স্থানে লিখিয়াছেন ;—

ফজর সময়ে উঠি, বিছায়া লোহিত পাটী,
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলি মিলি মালা ধরে, জপে পীর পগম্বরে,
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ।
দশ বিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কোরাণ।
বেনাইয়া কেহ হাটে, পীরের সিরিনি বাটে,
সাঁজে বাজে মগড় নিশান।
বড়ই পানিস বল্ল, কাহাকে না কহে ছল্ল,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।

আম্রাসের অপর কবি, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁহার "অন্নদা মঙ্গলের" উপসংহার "মানসিংহ" কাব্যে লিখিয়াছেন ;—

মানসিংহ যোড় হাতে, অন্নদা দাণ্ডিয়া আগে,
কহে দাঁইপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে, মোকাম হইল তথে,
কেবল তোমারি কেরামত।

হুকুম শাহেনশাহী, —আর কিছু নাহি চাহি,
জের হইল নিমক-হারাম।
গোলাম গোলামী কৈল, গালিম করেদ হৈল,
বাহাদুরী সাহেবের নাম।
পাতশা হইল খুশি, —কহিতে লাগিলা তুমি,
কহ রায় কি চাহ ইনাম।

এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন, খাঁটি বাঙ্গালী কবি, কবিকঙ্কণের বাঙ্গালা কাব্যে ব্যবহৃত, উপরোক্ত পাট্টা, দাবড়ী, ডিহিদার, সেলামি, ফজর, নমাজ, পীর, পগম্বর, মোকাম, বেয়াদর, কিতাব, কোরাণ, বেসাইখা, সীরনি, দানিস বন্দ, এবং রোজা শব্দ, বাঙ্গালা কি না? যদি বাঙ্গালা হয়, তবে উহাদের সংস্কৃত বা প্রাকৃত ধাতু প্রত্যয় দেখাইয়া দিউন; অথবা "দেশজ" বলে কি বলুন। কেবল "ফজর" ও "দানিসবন্দ" কথাটী এখনকার বাঙ্গালা ভাষায়,—কথোপকথনে ও লিখনে তত ব্যবহার হয় না, কিন্তু ঐ দুটী ব্যতীত উপরোক্ত আর সব কয়টী শব্দই বাঙ্গালা বলিয়া গৃহীত ও অল্লাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক-কথায়,—উহারা বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রিয় মহাশয়! পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, উহারা কি বাঙ্গালা?

অতঃপর বলুন, ভারতচন্দ্রের মার্জ্জিত ভাষায়, জাঁহাপনা, সেলামত, কদরত, কেরামত, হুকুম, শাহেনশাহী, জের, নিমক-হারাম, গোলাম, গোলামী, গালিম, করেদ, বাহাদুরী, সাহেব, পাতসা, খুসি ও ইনাম শব্দও কি সংস্কৃত বা প্রাকৃত মূলক খাঁটি বাঙ্গালা?

মহাশয় বলিতেছেন,—"না, না না, তা, কেন উহারা সংস্কৃত বা প্রাকৃত জাত বাঙ্গালা কথা নয়;—ওগুলি যাবনিক শব্দ, কিন্তু আমাদের বঙ্গভূমি জল বায়ু ও মৃত্তিকাতে বহুকাল বসবাস করিয়া বহুকালাবধি আমাদের নিজ হইয়া এখন আমাদের নিজেরই বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যের সিংহাসনের ভিতর আমরা উহাদের ভিটা বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিয়াছি; উহারা আমাদের অভিধানে, স্থান পাইয়াছে; আমাদের অন্যান্য নিজের আর ইহারাও আমাদের এখন নিজস্ব। উহাদের এবং উহাদের অন্যান্য অনেক ভ্রাতা ভগিনীর আমরা জনয়িতা, না হইলেও জনদাতা পালক পিতা। উহাদের উপর আমাদের স্নেহ মমতা জন্মিয়াছে, এত কালের পর এখন কি আর আ-

উহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারি; বিশেষতঃ ইহারা আমাদের কবিকঙ্কণের কাব্যে, ভারতচন্দ্রাদির ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া শোধিত হইয়া গিয়াছে, অতঃপর আর উহাদিগকে অবাঙ্গালা কে বলিবে?

আজ্ঞা হাঁ, ঠিক কথা। উহাদিগকে কে অবাঙ্গালা বলিতে পারে? আর চাকরাণি, দেয়াল, তাগাদা, তাগিদ, তহবিল, মাসকাবার, চাবী, কুলুপ, রোয়াক, চিক, ঝরকা, জানালা, এমারত, দালান, মনিব;—এই সকল ইহাদের মত আর শত শত শব্দকেই বা কে অবাঙ্গালা বলিতে সাহসী? আমাদের কুলের কুলবধূরাও যে ইহাদিগকে দিনের মধ্যে দুই শতবার ব্যবহার করিয়া থাকেন। তারপর,—তক্তপোষ, চাদর, তাকিয়া, বালিস, সিন্দুক, লেপ, রেজাই, বালাপোষ, বায়না, বাকীতি, জামিন, মহল, তামিল, হয়রাণি, পরেরাল, কাজু, তাবিজ, জখম, জামা, পোষাক, পাইজোর, মোজা, তামাসা, ফরমাস, ফরাস, জিনিস, জাগজ, কলম, জাহাজ, তুফান, মাস্তুল, মোকদ্দমা, মামলা, মারফত, ওজরত, গমস্তা, সেরেস্তা, সাকিন, মুনফা, মুস্কিল, মেরামত, জিলা, আতাবল, বাজার, দোকান, সওদা, কর্জ্জ, আইন, কানুন, কায়দা, ময়দা, আন্দাজ, রেকাবি, চশমা প্রভৃতি অনবদ্য কথা যদি টোল চৌপাড়ীর তাড়নায় আজ অবাঙ্গালা হইয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে ঘর গৃহস্থালী বন্ধ করিয়া বন গমন করিতে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই সকল শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃতমূলক বাঙ্গালা নহে। ইহারা বাঙ্গালা ভাষার "সাড়ে বত্রিশ ভাজা"। ইহাদের কেহ আরবী, কেহ ফারসী, কোনটা তুর্কী, কোনটা ইংরেজী, কতকগুলা বা পোর্ত্তুগিজ ভাষার শব্দ। চাকরাণি, মনিব, দেয়াল, তাগাদা, তায়দাদ, হুকুম, তামিল, ঝরকা, সিন্দুক, লেপ, তাকিয়া, জামিন, জুলুম, তাবিজ, মহল ইত্যাদি কথা আরবী; তক্তপোষ, বালাপোষ, বালিস, চাদর, রেজাই, বাজু, জখম, জামা, পোষাক, মোজা, খুসী, খোসামুদী, বাকৃতি, খুন, এ সকল কথা পারসী; রোয়াক, চিক, ইত্যাদি শব্দ তুর্কী আরব্য ও পারস্যবাসীরা তুর্কী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল; পক্ষান্তরে জানালা, চাবী, মাসকাবার, ইংরেজ, গির্জ্জা, পাদরী, নীলাম, কামরা, কেদেরা আলমারি, নিত্য ব্যবহৃত বাঙ্গালা শব্দ পোর্ত্তুগিজদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। আমাদের বোম্বেটে কথাটাও পোর্ত্তুগিজ; Bombardier. কেলেঙ্কারী কথাটা বোধ হয় ফরাসীদের প্রদত্ত। অনেক ইংরেজী কথাও বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। মাস্তুল ইংরেজী; আস্তাবল আধ-ইংরেজী, ও আধ-আরবি,—নহিলে সাড়ে বত্রিশ ভাজার "সাড়ে" পুরিতে

কিরণে, টাইম, টেবিল, ট্রেণ, মেল, স্কুল, আপিস, চেয়ার, বরাবর, স্যুট, কোট, হাওয়ালে, গুদম, কাপ্তেন, বিস্কুট, সেসাসি, গিনি, এয়ারিং, বুরুষ, ব্যাগ, ব্যাট, বল, সেলেট, পেন্‌সিল, প্লেট, ড্রেণ, পালিস, প্রভৃতি খাস ইংরেজী শব্দ ক্রমে বাঙ্গালা হইয়া গিয়া ভাষার সাড়ে বত্রিশ ভাষা বানাইতেছে।

কিন্তু আমরা যে কেবল লইয়াছি ও লইতেছি, তাহা নহে; আমরা দিয়াছি এবং দিতেছিও বিস্তর। দাতা ও গৃহীতাদিগের মধ্যে পরস্পরে সমানে আদান প্রদান চলিয়াছে। যবনেরা হিন্দুর হিন্দি লইয়া তাহা তাঁহাদের পারসীর সহিত ভেয়ান করিয়া অপূর্ব্ব উর্দ্দু ভাষা গড়িয়াছেন। ইংরেজেরাও বিস্তর বাঙ্গালা ও হিন্দি কথা ইংরেজী করতঃ নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন; ক্রমে কত লইবেন, কে জানে,—ইহারই মধ্যে কয়েকখানা এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান অভিধান লিখিতে হইয়াছে। ভাষার সাড়ে বত্রিশ ভাজা আর কাহাকে বলে! আমরা এই ভাজা বরাবরই ভাজিয়া আসিয়াছেন ও আজিতেছেন। ইহা মুখ-প্রিয়, মিষ্ট, উপাদেয় এবং উপকারী।

শ্রীঃ—

নবসৃষ্টি।

সহস্র পীড়ন মাঝে শেষ নাগ লক্ষ ফণা তুলি'
নিঃশ্বাসে ঢালিছে বিষ; বিশ্বভার উঠিয়াছে দুলি;—
ঘর ঘর কাঁপে সিংহাসন,
আজিকে উঠিছে জাগি' নিদ্রাতুর নর-নারায়ণ!

বাম বাহু প্রসারিয়া তুলে শঙ্খ তুলে নিল মুখে
অঘোষ নির্ঘোষে তার জাগে ত্রাস দানবের বুকে,
সর্ব্বনাশা ভীম প্রভঞ্জন
স্তব্ধ সিন্ধু আলোড়িয়া করিতেছে বিকট গর্জ্জন!

লগনীল নভোস্থল সহসা ছাইল মেঘে মেঘে
বিদ্যুৎ ছুটিয়া চলে সীমা হইতে সীমান্তে যে বেগে,
অবিরাম একি এ ঘর্ষণ
ধরিত্রীর দীর্ণবুকে আজি একি কলঙ্কা বর্ষণ!

নবসৃষ্টি !

পশ্চিমের রক্তাকাশ থেকে থেকে উঠিতেছে জ্বলি'
এ মহা শ্মশান মাঝে দগ্ধ হয় কোন দৃপ্ত বলী
একে একে করিয়া হরণ
লক্ষ প্রাণ নিজ হাতে ;—আত্মহত্যা এ নহে মরণ !

এই দণ্ডে অন্ধকার এই দণ্ডে আগুনের খেলা
ক্ষিপ্ত হয়ে মহাকাল চূর্ণ করে সাগরের বেলা
সম্বরিয়া ভীম প্রহরণ
ত্রস্ত দৈত্যশক্তি নিল প্রকৃতির চরণে শরণ !

চতুর্ভুজ নরশক্তি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী
বাসনা বিকাশ কল্পে লক্ষ্মী তাঁর পরিপূর্ণা নারী,
সিন্ধুবুকে প্রলয় কল্লোল
শান্তকরি' বিস্তারিল অন্তরের বসন্ত হিল্লোল !

মত্ত সিন্ধু শান্ত হয়ে সৃজনের গান গেয়ে যায়,
তরুণ অরুণ আলো দেখা দিল নভো নিলীমায়,
সৃষ্টির প্রথম মাঙ্গলিকে
আতঙ্ক হরিয়া শঙ্খ বেজে উঠে আজি সর্ব্বদিকে !

বাসনায় লীলাপদ্ম দলে দলে বিকশিয়া উঠি'
একটি মৃণাল'পরে আচম্বিতে উঠিল কি ফুটি'—?
তরুণী ধরণী দেখে চেয়ে
লাবণ্য উপচি পড়ে আজি তা'র সর্ব্ব অঙ্গ ছেয়ে !

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

(সাগ্‌রেদী)

প্রবাসী—আষাঢ়, প্রথম প্রবন্ধ 'প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদরী'; লেখক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। নূতন তথ্য আছে, কিন্তু ভাষা আড়ষ্ট। ঐতিহাসিক বিভক্তির অযথা সংস্কারের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে গবেষণার ক্ষেত্রে সীমিত হয়। সম্প্রতি 'প্রবাসী' সম্পাদক এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন; সুতরাং সে ভার তাঁহার উপরই রহিল। "এইমাত্র নিশ্চয় যে 'তাহাদেক' হত্যা করা হইল" "তাহাদেক ধরিবার পরই দুই জনের মাথা কাটিয়া ফেলা হইল" এরূপ তাবা-মধি-লিখিত সুসমাচারের বাঙ্গালা অনুবাদে মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে; কিন্তু ইদানীং কোন বাঙ্গালাপ্রবন্ধে এই প্রকারের ভাষা আমাদের চক্ষে পড়ে নাই: ইংরাজী পরের ভাষা; বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে না পারিলে অগৌরব নাই; কিন্তু মাতৃভাষায় ইংরাজীর অনুকরণ অসহ্য। শ্রীকিরণশঙ্কর রায়ের 'প্রেমী' সুলিখিত গল্প। লেখক লণ্ডনে বসিয়া এই করুণ গল্পটি লিখিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে ইংরাজীর ধাচ মোটেই নাই। গল্পের আখ্যানভাগও আমাদের বিজ্যেদের ঘরের কথা। মামুলী প্রেম, দীর্ঘ নিঃশ্বাস, বিরহ প্রভৃতি ইহাতে নাই। উপেন্দ্রনাথ বলের 'অর্থনীতি ও তাহা-পাঠের প্রণালী' বোধ হয় 'বিষয় বৈচিত্র্যের' খাতিরে লেখা ও ছাপা হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহাদের এ প্রবন্ধ হইতে শিখিবার কিছুই নাই। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা ইহার ভাষা বুঝিতে পারিবেন না। 'যদিচ অর্থই এই শাস্ত্রের সমস্ত ব্যাপারে চালাও, ইহা মানুষের অন্যান্য আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে অন্ধ নহে'—ইহা কি বাঙ্গালা? লেখক আগে কিছুদিন কয়েকখানি ভাল বই পড়িয়া তারপর প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করিবেন। 'ঘরের ডাক' ও 'রমনী গল্প'। ক্রমপ্রকাশ্য উপন্যাস, শেষ না হইলে কোন মন্তব্য করা যায় না। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর Non-co-operation পদার্থটা কী?" আড়াই পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছেন। বিনয়-কুমার সরকারের 'প্যারিসে এক শীত' সুখপাঠ্য নিবন্ধ। সুধীরকুমার চৌধুরী [illegible] (?) 'দীবাস্বপ্ন' নামক একটি 'কাব্যি' রচনা করিয়াছেন।

তাঁহার এই স্বপ্নে যখন দুখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা-ঢেড়ুই প্রজাপতি গালী সকলই আছে, তখন ইহা নিশ্চয়ই কাব্য। সে বিষয়ে সন্দেহ করিলে পরে কবি অনুতাপ করিতে হইতে পারে।

কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী আবার 'মহিলা মজলিস' ও 'শিশুসাথী পাঁচাড়ি' নামে দুইটি বিভাগ খুলিয়াছেন—প্রচা মাল চালাইবার একটা পন্থা হইল সন্দেহ নাই। দৈনিক কাগজ ও ইংরেজী মাসিক-ওয়ারীদের লেখা হইতে একটু একটু অনুবাদ করিয়াই মহিলা ও শিশুদের ফাঁকি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবশ্য ব্যবসায়বুদ্ধিতে রামানন্দ বাবুর সমকক্ষতা করিতে পারে, এমন সম্পাদক আজকাল খুবই কম। কিন্তু পাঠকেরা খিচুরীতে ডাল ও ভাত উভয়ই আছে বলিয়া ডালভাতকে খিচুরী বলিয়া গ্রহণ করিবে, এ ভরসা তাঁহার কেমন করিয়া হইল?

কষ্টি পাথরের গোড়ায়ই দেখিতেছি, শ্রীগৌরাঙ্গ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের সার-সঙ্কলন। মতলব কি? গালাগালির পর প্রকারান্তরে তোষামোদ, না—বিনা খরচায় ভারতীর নিকট হইতে কয়েক খানি 'ব্লক' যোগাড় করা।

আলোচনায়—মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া খুবই একটা কবির লড়াই হইয়া গিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চাঁইয়েরাও তবে কবির টপ্পা ভাল বাসেন, আনন্দের কথা। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রাগচীকে বলি—এ পণ্ডশ্রম কেন? রামানন্দের কলমের খোঁচায় গোলদিঘীর গোলামখানা কাটিতে পারে; কিন্তু তাঁহার গালাগালিতে মহাত্মা গান্ধীর অমলকীর্ত্তি মলিন হইবে না। রামানন্দ তাঁহাকে মহাত্মা না বলিলেও তিনি মহাত্মাই থাকিবেন। যদি গান্ধীর মত দেশপূজ্য লোককে গালাগালি দিয়া কোন সম্পাদক তাহার 'নিরপেক্ষ বিচার' বা 'স্বাধীনতা' প্রমাণ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার আশু কিছু আর্থিক লাভ হইতে পারে। কিন্তু এ চালাকী বেশী দিন খাটিবে না। বাঙ্গালী তত বোকা নহে। 'জিজ্ঞাসা'র প্রথম প্রশ্ন 'আশুবাবুর অবতারত্ব' সম্বন্ধে। প্রশ্নকর্ত্তা সম্পাদক স্বয়ং। নিরাকার ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া তিনি দেখিতেছি, বৈরি-ভাবে আশুতোষেরই চিন্তায় নিরত আছেন। পরকালের ফল হইবে। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' সম্পাদক মহাশয় কিঞ্চিৎ গবেষণা করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বেও তাঁহার মত অনেক পণ্ডিত এবম্বিধ গবেষণা করিয়াছেন এবং তাহার এত বিদ্যে কর্ম্মনাশা প্রাপ্তিও ঘটিয়াছে। গবেষণা ভাল কাজ, কিন্তু মৃত ব্যক্তির উপর আক্রমণ করিবার ঝোঁকটা রামানন্দবাবুর এত প্রবল কেন? সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

বহাশয় অতিশয় সজ্জন ছিলেন। তোমাদের মত অর্থ চিনিলে তিনি যথেষ্ট টাকা রাখিয়া যাইতে পারিতেন, আজ তাঁহার পুত্রকে লেখাপড়া ছাড়িয়া চাকুরী খুঁজিতে হইত না। তুমি সিণ্ডিকেটের কার্য্যবিবরণীর এক পৃষ্ঠা পড়িয়াই ঠিক করিলে তিনি তাঁহার ভাইপোর প্রবন্ধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র তাঁহার সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। ভোলার প্রচারিত মিথ্যা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। নিঃসঙ্কোচে লিখিয়াছি যে, যেঘনাথ সাহা প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান নাই। আমরা ত জানি পাইয়াছেন। শুধু প্রেমচাঁদ নহে—গুরুপ্রসাদ বৃত্তিও পাইয়াছেন। দেখ একটা কথা বলি, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু নহি। কিন্তু তুমি বড়ই ভুল করিতেছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল ত্রুটিগুলা দেখাইয়া দেওনা, তাহাতে সকলের মনে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার করিবার জন্য একটা দৃঢ় সঙ্কল্প জাগিতে পারে। কিন্তু নির্জ্জলা মিথ্যা প্রচার করিলে ফল হইবে উল্টা। লোকে আর তোমার কথা বিশ্বাস করিবে না। মৃত ব্যক্তিদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিও না, তাহা সুরুচির পরিচায়ক নহে। মহাত্মা গান্ধী যখন তোমার নিকট পরামর্শ চাহিতে আসিবেন, তখন যথাসাধ্য দিও; কিন্তু ততদিন পর্য্যন্ত নীরব থাকিলেও ক্ষতি নাই। তুমি যে স্বাধীনপ্রকৃতি, তাহা সকলেই জানিয়াছে। এখন কেহ তোমার নিরপেক্ষ মন্তব্য শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব নহে।

সহযোগী সাহিত্য।

অবগুণ্ঠন বা ঘোম্‌টা।

(পুনরালোচনা)

বিগত ফাল্গুন-চৈত্র যুগ্মসংখ্যক 'সাহিত্যে' উপরি-উক্ত-শীর্ষক একটি আলোচনা দেখিলাম। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে আছে, "বেদে পুরাণে মহাকাব্যে নাটকে কুত্রাপি অবগুণ্ঠনের উল্লেখ পাইবে না।" সুপ্রচলিত কাব্যনাটকে, অবগুণ্ঠনের কথা যাহা পাওয়া গিয়াছে, এস্থলে তাহার কিছুটা উল্লেখ করিতেছি।

আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণে (লঙ্কাকাণ্ড ১১৩শ অধ্যায়) মন্দোদরী-

"দৃষ্ট্বা ন খলসি ক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্।
নির্গতাং নগরদ্বারাৎ পদ্ভ্যামেবাগতাং প্রভো॥
পশ্যেষ্টদার-দাবাংস্তে ভ্রষ্টলজ্জাবগুণ্ঠনাম্।
বহির্নিপতিতান্ সর্ব্বান্ কথং দৃষ্ট্বা ন কুপ্যসি॥"

৬১-৬২ শ্লোক (বঙ্গবাসীসংস্করণ)

রাক্ষস-সমাজেই যদি এইরূপ, তবে আর্য্যসমাজে কিরূপ আদব-কায়দা ছিল, অনুমানেই বুঝিতে পারা যায়।

লেখক মহাশয় বলেন "সীতা ঘোমটা টানিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনগমন করেন নাই"—ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস, দাক্ষিণাত্যনিবাসী রবিবর্ম্মার চিত্র দেখিয়াই লেখক মহোদয় ঈদৃশ ধারণা পোষণ করিতেছেন।

এদিকে কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে (পঞ্চম অঙ্কে) শকুন্তলাকে অবগুণ্ঠনবতী করিয়া দুষ্মন্তের সমীপস্থা করিতেছেন—দূর হইতে তাহা দেখিয়া রাজা বলিতেছেন—

"কা স্বিদবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্।"

আবার দুষ্মন্তকে শকুন্তলার মুখ দেখাইতে গিয়া গৌতমী বলিতেছেন—"অয়ে মুহূর্ত্তং মালজ্জস্থ অপনেষ্যামি তে অবগুণ্ঠনং ততস্তাং ভর্ত্তা অভিজ্ঞাস্যতি" (প্রাচ্যতের সংস্কৃতানুবাদ)। ইহাতে ঘোমটার পরিমাণ ও প্রয়োজন সূচিত হইতেছে।

ভারতবর্ষেও বারবনিতাদি অনবগুণ্ঠিতা হইয়াই বিচরণ করিত—প্রাচীন নাটক মৃচ্ছকটিকে (দশম অঙ্কে) এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যখন গণিকা বসন্তসেনা নৃশংস রাজশ্যালক কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও আর্য্য চারুদত্তের প্রতি গভীর প্রণয়ের ভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল, এবং রাষ্ট্রবিপ্লব হেতু রাজশ্যালক নিগৃহীত এবং চারুদত্ত মুক্তিপ্রাপ্ত হইলেন, তখন বিপ্লবের নায়ক শর্ব্বিলক বসন্তসেনাকে—

"আর্য্যে বসন্তসেনে, পরিতুষ্টো রাজা ভবতীং বধূশব্দেনানুগৃহ্লাতি"—এই বলিয়া ঐ গণিকার মস্তকে অবগুণ্ঠন অর্পণ করিলেন। অর্থাৎ এই অবগুণ্ঠন গণিকাকে বধূত্বে পরিণত করিয়া দিল। * বিস্তরেণালম্। শ্রীপদ্মনাথ দে

* এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অধিকাংশ কথা "অবরোধ ও অবগুণ্ঠন শীর্ষক" একটি প্রবন্ধে লিখিত হইতে গৃহীত (নবযুগ নবম সংখ্যায়) সবিস্তর বলা হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, অবরোধের বা অবগুণ্ঠনের প্রথা ভারতবর্ষেরই নিজস্ব।

বৈঠকী।

লাভ-লোকসানের সিকন্দরী গজে মাপিয়া লইয়া কাব্য-গাথা পূর্ব্বে বাঙ্গালায় রচিত হইত না। সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ যিনি, তাঁহাকে এখন কমলার বলয় মণি-কঙ্কণ পরিয়া লেখনী চালনা করিতে হয়। গম্ভীর বরপুত্র অম্লানমুখে সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে যখন ছাপাখানা ও খবরের কাগজ ছিল না, তখন কবি কাব্যরচনা করিয়া, গায়কগণকে তাহা পাঁচালীছন্দে গান করিতে বলিতেন। ভূসুর, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, গৌড় প্রভৃতি পাণ্ডিত্যের কেন্দ্র স্থানে উহা গীত হইত। বিদ্বজ্জনসমাজে সে গান শুনিয়া তৃপ্তি বোধ করিলে, সন্তোষ প্রকাশ করিলে তবে তাহার প্রচার হইত, গ্রামে গ্রামে গীত হইত। ইহাই সেকালের প্রচারপদ্ধতি ছিল। দাশু-রায় পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কবিগণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই পালা রচনা করিতেন ও তাহার প্রচার করিতেন।

দুই একটা সংস্করণ বহি ছাপাইয়া প্রচার করা অপেক্ষা গানের সাহায্যে প্রচার প্রবলতর হইত। দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সবাই কাব্য-রসাস্বাদনে অবসর লাভ করিত। রামপ্রসাদের মালসী ও কালী কীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন ও পদাবলী, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, দাশুরায়ের পাঁচালী, এই উপায়ে সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইত। ইহাতে কবির খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইত বটে, পরন্তু তাঁহার ভাগ্যে বিশেষ অর্থাগম হইত না। এখন চাই টাকা; কেহ পড়ুক বা নাই পড়ুক, পুস্তক বিকাইলেই হইল! এখনকার শিক্ষা এবং সভ্যতার গুণে বিকায় কেবল রিরংসার বিবৃতি, ভাষার সাহায্যে কামের অনুশীলন।

ইহা ছাড়া আর একটা মজা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার কষ্টিপাথর যাইয়া হাজির হইয়াছে বিলাতে। টাইম্‌স্ পত্রের Literary suhplement কাগজে বা বিলাতের সাহিত্যচর্চ্চা-পূর্ণ কোন একখানা ইংরেজি মাসিক বা পাক্ষিক পত্রে

বাঙ্গালার নভেল-নাটকের কাব্য-গাথার আলোচনা না হইলে যেন পর্য্যাপ্ত হয় না। পূর্ব্বে যেমন নবদ্বীপ এবং ভট্টপল্লীর অনুমোদন না পাইলে কোন কাব্য-গাথা প্রচলিত হইত না, এখন তেমনি ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের গুরুগ্রাম ইংলণ্ডের অনুমোদন ও সমর্থন না পাইলে যেন আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য বিদ্বজ্জনসমাজে সমাদর ও শ্লাঘার আসন লাভ করে না। এই হেতু, আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালাসাহিত্যের জাতিনাশ ঘটিয়াছে। যাহা ম্যাকমিলান গ্রহণ করিবে, ইংরেজ-মুখ-নিঃসৃত বচনবর্ষায় যাহা পরিস্নাত না হইবে, তাহা যদি আধুনিক বিদ্বজ্জনসমাজের গ্রাহ্য না হয়, তবেইত প্রমাদ গণিতে হয়; কেন না এমন সামগ্রী বাঙ্গালা নহে এবং বাঙ্গালীর নহে।

* * * *

বঙ্কিমচন্দ্র এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাঙ্গালার নবীন-সাহিত্যকে এই বিপদ হইতে—এই জাতিনাশের সম্ভাবনা হইতে, রক্ষা করিতে অনেকটা পারিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শন এবং বান্ধবের সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলে তখনকার পুঁথি পুস্তক সমাজে চলিয়া যাইত। মাইকেলের মেঘনাদ লইয়া কত আলোচন-আলোচনাই না হইয়াছিল! রঙ্গব্যঙ্গ, উপহাস-পরিহাস, অনুকৃতি-কৌতুক—কত কি ব্যাপারই না মেঘনাদ এবং উহার ছন্দ লইয়া হইয়া গিয়াছে। তখন বুঝা গিয়াছিল, মধুসূদনের নূতন ছন্দ এবং লিখনভঙ্গী বিদ্বজ্জনসমাজের অঙ্গে লাগিয়াছিল, সে সকল লইয়া একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। এখন কেহ কিছুই লাগে না;—ভাল লাগুক আর মন্দই লাগুক,—তেমন মেজেজ্জা তো করিয়া লাগে না। এখন সাহিত্য-চর্চ্চা, নভেল নাটক কেবল কণ্ডূতি নিবৃত্তির নানান্তর মাত্র। এখন সাহিত্য-চর্চ্চা যেন ব্যক্তিগত কাণ্ড হইয়াছে, উহার সহিত সমাজের কোন সম্বন্ধ নাই; সমাজ-সংহতির মধ্যে যে ভাবটুকু আছে, তাহাকে আধুনিক সাহিত্য স্পর্শই করে না।

* * * *

তাই একবার ইন্দ্রনাথ রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাবু-সমাজের নবীন বঙ্গ সাহিত্যের কুন্তরাশি; উহা কেবল রমণীকক্ষেই শোভা পায়। বাস্ত হইলেও কথাটা খাঁটি সত্য। উহার কুন্তরাশিই বটে, একেবারে শূন্য—ভিতরে কিছু নাই; কলসী যেমন বাহিরে খুব চক্‌চকে, আকারে বৃহৎ; পরন্তু শূন্যগর্ভ, তা খুব হাল্‌কা। হাল্‌কা বলিয়াই রমণীর কক্ষে এবং শ্রোণীসংযোগস্থানে শোভা

কদাপি শীতল, নির্ম্মল সলিলে পূর্ণ হয় না। পক্ষান্তরে এখনকার খাসা-খাসা চক্‌চকে রঙ্গরঙ্গে বাঁধান নভেল-নাটক বহি সকল রমণীর কক্ষে আল্‌মারী ও বুক-সেল্‌ফে শোভা পায়। নারীই অবসর মতন উহা পাঠ করেন এবং ঘর সাজাইয়া রাখেন। রমণীর কক্ষে বিচারযুক্তি চলে না; চলে কেবল স্তুতির পুষ্পবর্ষা। ফলে এ সাহিত্য হুজুগে চলিতেছে। ইহার শোভা আভরণে,—ইহার প্রতিষ্ঠা কাটতির মুখে;—কাটে রমণীর আনুকূল্যে।

* * * *

যখন মেঘনাদ-ব্রজাঙ্গনা বাহির হইয়াছিল, যখন দুর্গেশনন্দিনী-মৃণালিনী প্রচারিত হইয়াছিল, যখন বঙ্গদর্শন চলিতেছে, বান্ধব দেখা দিয়াছে, আর্য্যদর্শন পঁজাইয়াছে,—তখন দাশরথি রায়ের পাঁচালীর খুব প্রভাব-প্রতিষ্ঠা। তখন রাম-নারায়ণের পঠন-পাঠন বড় বড় গৃহস্থ ঘরে চলিতেছিল। ইহার হেতু জানিবার জন্য একদা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেব বাবুকে প্রশ্ন করেন। ভূদেব বাবু এই কয়টি কথা বলিয়াছিলেন—(১) অর্জ্জুন যেমন ভোগবতীর জল টানিয়া বাহির করিয়া পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যুকালের পিপাসার নিবৃত্তি করিয়াছিলেন, দাশুরায় ও রাম-নারায়ণের কবি তেমনি সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ভাবের ধারা খুলিয়া দিয়াছেন; দাশুরায় বাঙ্গালীকে তাহার সাধের কথা তাহারই মনোমত ভাষায় শুনাইতেছে,—(২) দাশুরায়ের প্রচার-পদ্ধতি তোমাদের প্রচার-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তোমরা কেতাব ছাপাইয়া নিরস্ত হও, যাহাদের টাকা আছে, ইংরেজি লেখাপড়ার প্রভাবে তোমাদের মত রুচিপ্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহারাই তোমাদের লেখা পুঁথি খরিদ করে। দুই হাজারখানা পুস্তক বিকাইতে তোমাদের চারি বৎসর কাটিয়া যায়। দাশুরায় একটা বড় লোকের আহ্বানে গ্রামে উপস্থিত হইয়া তাঁহার রচিত নূতন পালা পাঁচালীছন্দে গান করেন। গ্রামের পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, আবালবৃদ্ধ বনিতা তাহা শ্রবণ করে এবং তৃপ্তিবোধ করে।—(৩) শেষ কথা, দাশুরায় যাহা গান করে, তাহা ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ—পুরাণ কথা; লোকে প্রাণ ঢালিয়া ভক্তিমান্ হইয়া তাহা শ্রবণ করে।

* * * *

মধু যাহা লিখিয়াছে, তাহা পুরাণ-সম্মত নহে। মেঘনাদের শব্দ বিন্যাস ও অলঙ্কার কল্পনা সংস্কৃত সাহিত্যের সনাতন আদর্শ-সম্মত হইলেও তাহার ভাব-

শ্রবণ হিসাবে কেহ মেঘনাদ পড়ে না। উহা Literature, আমাদের ভাবে আমরা উহার পঠন-পাঠন চালাইয়া থাকি। বড় লোক, বলিলে বড় থিয়েটারে মেঘনাদ অভিনীত হইলেও, তিনকড়ি রামের মতন গায়ক দলের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে উহা গান করিয়া বেড়ান না। মহাজনের পদাবলী বত্রিশ অলঙ্কারশাস্ত্রের বত্রিশ বন্ধনে আবদ্ধ; প্রত্যেক পদই অনুবাদ, বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যান, বিবৃতি বা অনুবাদ। ব্রজাঙ্গনা সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া Love এর বেদীর উপরে দাঁড়াইয়া রস ছড়াইয়াছে। উহা বৈষ্ণব-সমাজ-সম্ভূত হইতে পারে না; মনোহরসাহী কীর্ত্তনীয়া কখনই উহার গান করিয়া বেড়াইবেন না। তোমরা যাহা দিয়াছ এবং দিতেছ, তাহা বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর নহে। খাঁটি বাঙ্গালার বাঙ্গালী সমাজে—নবদ্বীপ ভাটপাড়া বিক্রমপুরে—উহার প্রচলন হইতেই পারে না।

* * * * *

ইহাই ঋষিকল্প ভূদেবের উক্তি। অক্ষয় চন্দ্র একবার সাধারণীতে, একবার নবজীবনে এই উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং মধুসূদনের কথা লইয়া ভূদেব যদি এমন উক্তি করিতে পারেন, তাহা হইলে এখনকার লেখকদিগের সম্বন্ধে যে কেমন কথা বলা চলে, তাহাও আমরা ভাবিয়া পাই না। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রাদেশিক সাহিত্যের বেদী ছিল—সংস্কৃত সাহিত্য এবং পুরাণ। বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাহিত্য ত পুরাণ ছাড়া, ধর্ম্মের গণ্ডীছাড়া কখনই বাহিরে যায় নাই। মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র এমন কি রবীন্দ্রনাথের খণ্ড কবিতাগুলি পুরাণের বেদীর উপরে বিন্যস্ত। তাঁহারা যাহাই লিখুন, যাহাই বলুন, পুরাণের চিত্র, পুরাণের চরিত্র, পুরাণের আখ্যায়িকার সূত্র ছাড়েন নাই। এখন সে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া গিয়াছে। ফলে এখনকার সাহিত্যে সমালোচনার সর্ব্বসম্মত পরিমাণদণ্ড নাই; না আছে ব্যাকরণ, না আছে অলঙ্কার।

* * * * *

বড় সাধ করিয়া শ্রীযুত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের [illegible] সকল ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, যে সাধ পূর্ণ হইবার নহে। প্রতিবাদে যাহা পাইতেছি, তাহার অধিকাংশ গালাগালি, দুই একটা নমুনাও দিয়াছি। এ বিতণ্ডা চালাইলে গালাগালির পুঁজ ছাড়া সমালোচনার পথ প্রশস্ততর হইবে না। ইহা আমাদের বাঞ্ছিত নহে; বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তেমন নির্গুণের ভাষে লেখনী চালাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার লেখায় একটু যেন "রীহবন" বিষ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

একটা পূর্ব্বস্মৃতির কথা বলিব। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে আমরা আমাদের শৈশব অবস্থা হইতে চিনিতাম এবং জানিতাম। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আমরা তাঁহার নিকটে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম, এমন কি আমাদের হস্তাক্ষর এবং বাচনভঙ্গী অনেকটা তাঁহারই অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের সঙ্গে আমরা সর্ব্বপ্রথমে পরমহংস রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সে বোধ হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। সাধু-সন্ন্যাসী-ফকীর প্রভৃতির দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তিনিই আমাদের হৃদয়ে জাগাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যাইয়া আমরা বহু বড় বড় সন্ন্যাসী ও সাধুর দর্শন লাভ করি। তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধালু ছিলেন। তাহার হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের গুরু ঠাকুর দয়ালদাস তোতাপুরীকে চিনিতেন এবং জানিতেন। তোতাপুরী পরমহংস রামকৃষ্ণের গুরু ছিলেন।

* * * * *

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরমহংস রামকৃষ্ণের জীবন আখ্যায়িকা প্রকাশ করিবার সুবিধার প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে। পরন্তু তিনি যখন পরে দেখিলেন—পরমহংসের শিষ্য সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহারা একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে—তখন তিনি ভাবিলেন, আমার লেখা পরমহংস রামকৃষ্ণচরিত তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর রোচক না হইলে আমাকে অপরাধী হইতে হইবে। যখন যোগ্য এবং সুপণ্ডিত শিষ্য সকল সমবেত হইয়াছে, তখন তাহাদের কর্ত্তব্য তাহারাই পালন করিবে; আমি অনধিকারচর্চ্চা করি কেন? এ কথাটা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আমাকে বলিয়াছিলেন। যে সকল সিদ্ধ সাধুকগুলী বা সম্প্রদায় গঠন করেন না, তাঁহাদের চরিতাখ্যান করিবার অধিকার ভক্ত ভাবুক মাত্রেরই আছে। যাঁহারা মণ্ডলেশ্বর হইয়াছেন, শিষ্য ব্যতীত তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথা প্রচার করিবার বাহিরের লোকের অধিকার নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সন্ন্যাসীর শিষ্য ছিলেন, তিনি সাম্প্রদায়িক বিধিনিষেধ অমান্য করিয়া চলিতে পারিতেন না।

* * * * *

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে আমি কিশোর কাল হইতে জানি এবং চিনি। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন-প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার প্রচারকরূপেই আমরা তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। তর্কচূড়ামণি মহাশয় সুপণ্ডিত এবং সন্ধ্যাযাতা, পরন্তু তিনি গৃহী। তিনি গহনে-দুর্গমে-বনে ঘুরিয়া

কখনই সাধু দর্শন করিবার তেমন অবসর পাই নাই। যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচলিত আছে, যাহার পঠন-পাঠন এখনও হইয়া থাকে, তিনি তাহাতেই সুপণ্ডিত। পরন্তু সন্ন্যাসী ফকীরের মধ্যে অনেক গুপ্ত ও অপ্রকট পদ্ধতি শাস্ত্র প্রচলিত আছে; তাহা আমরা জানি না, তাহার খোঁজখবর আমরা রাখি না। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় অজ্ঞেয় এবং বুঝি বা অনন্ত শাখাবিশিষ্ট। আমাদের বিদ্যার কষ্টিপাথরে সন্ন্যাসী সাধু মহন্তদিগকে কষিয়া লইবার চেষ্টা করিলে অনেক সময়ে প্রমাদে পড়িতে হয়। বলিয়াছি ত পরমহংস রামকৃষ্ণ তোতাপুরীর শিষ্য ছিলেন। তোতাপুরী যে কত বড় মানুষ ছিলেন, তাহার পরিচয় কেহ কখনও দেন নাই, দিতে পারেন নাই। পরমহংস রামকৃষ্ণ ঐ গুরু প্রদর্শিত সাধনপন্থা হইতে বিশেষ চ্যুত হন নাই; এ খবরটা আমরা ঠিক জানি এবং বিশ্বাস করি। আমরা পরমহংস রামকৃষ্ণকে সিদ্ধ সাধক বলিয়াই ভক্তি এবং পূজা করি। তবে তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় এখন কে কেমন ভাবে চলিতেছেন, তাহার খবর রাখি না; উপরন্তু তাঁহাদিকে ব্যর্থ নিন্দার নরকে কলঙ্কিত করিতে চাহি না। 'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্'—এ ভাবনা আমাদের কেন?

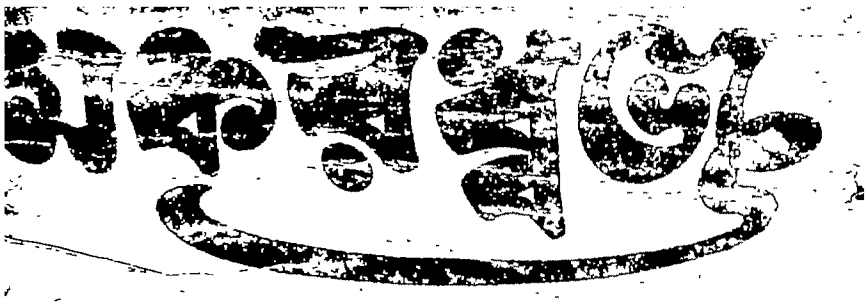

[ষড়্‌গুণবলিজারিত]

মকরধ্বজ—অনাদিকালসিদ্ধ বিশ্ববিখ্যাত মহৌষধ। ইহা মানবমঙ্গলেচ্ছু ঋষিগণের যোগপূত সূক্ষ্ম বুদ্ধির এক চমৎকার আবিষ্কার! জগতের কোন চিকিৎসাশাস্ত্র অদ্যাবধি এরূপ সর্ব্বরোগহর শক্তিমান্ ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মকরধ্বজ নিজগুণেই আজ ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ে উদ্যত! বড় বড় বিদেশী বিলেতী বিপক্ষদলী চিকিৎসক কর্ত্তৃকও ইহা এখন শতমুখে প্রশংসিত। যাঁহারা বিদেশের কাঁচিটী কাসিটী পর্য্যন্তও ভালবাসেন, তাঁহারাও আজ মকরধ্বজের গুণমুগ্ধ।

মকরধ্বজ অতি সূক্ষ্মমাত্রায় দেহে প্রবেশ করিয়া সামান্য সর্দ্দি কাসি হইতে অতি গুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত সত্বর আরোগ্য করিয়া দেয়। বিশেষ বিশেষ অনুপানযোগে সদ্যোজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া জরা-জর্জ্জরিত অতিবৃদ্ধকেও ইহা নির্ভয়ে সেবন করান যায়। ইহা নিয়মিত সেবনে মেধা, বুদ্ধি, কান্তি ও পুরুষত্ব বৃদ্ধি হয়। ক্ষীণধাতু ও ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তির পক্ষে ইহা অমোঘ ন্যায় কার্য্যকর হইয়া থাকে।

আমাদের কথা।

মকরধ্বজ আজ যত্র তত্র বিকাইতেছে! সে সব মকরধ্বজের উপকারিতা-সম্বন্ধে আমরা অবশ্যই দায়িত্ব লইতে পারি না এবং ইহা প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি যেরূপ আয়াস-সাধ্য, তাহাতে ইহা সস্তায় দিতেও আমরা অক্ষম। অথচ যত দূর সম্ভব সুলভ-মূল্যেই ইহা আমরা বিক্রয় করিতেছি। আমাদের ষড়হোরাব্যাপী পাকের মকরধ্বজ ব্যবহার করিলে বুদ্ধিমান্ মাত্রেই ইহার মহার্ঘতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

মূল্যাদি—প্রতি ভরি ১৬৲ টাকা, সাত মাত্রা—১৲ এক টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

বৈদ্যনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভৈষজ্যালয়।

৫৬ ও ৬২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওমাহা জাতির ধর্ম্ম।

"ধর্ম্মের গোড়ার কথা" নামক প্রবন্ধে (সাহিত্য বৈশাখ, ১ পৃঃ) উল্লেখ করা হইয়াছে, ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক আলোচনার যত উপাদান ভারতবর্ষে আছে, এত উপাদান আর কোথাও দেখা যায় না। এই সকল উপাদানের অনেক গ্রন্থনিচয় প্রকাশিত এবং তাহাদের ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে তবে অবশ্যই তাহা যথাপ্রয়োজন ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু সেও অনেক দূরের কথা। সকল প্রকার গ্রন্থ প্রকাশিত এবং পরীক্ষিত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে কতদিন যে অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা বলা কঠিন। সুতরাং যাহা হাতের কাছে আছে, তাহা লইয়াই আমাদের ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। এই আলোচনার থাতি প্রাচীন সাহিত্যের প্রচারের এবং বিচারের কার্য্য ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে, এমন আশা করা যাইতে পারে। অবশ্যই অসম্পূর্ণ উপাদানের বলে যে সিদ্ধান্ত করা হইবে, তাহাতেও অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে। তথাপি যখন যে পরিমাণ প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব, সেই পরিমাণ প্রমাণ যাহাতে পাঠক একত্র ধারণা করিতে পারেন, তজ্জন্য সময় সময় সিদ্ধান্তও স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার সিদ্ধান্ত মাত্রই যে প্রমাণিগ্রহনের অস্থায়ী উপায়মাত্র, একথা যদি পাঠকেরা স্মরণ রাখেন, তবে আর কোন অনিষ্ট হইতে পারিবে না।

ধর্ম্মবিজ্ঞানের উপাদানের প্রধান আকর শাস্ত্র, সাহিত্য, এবং শিল্প। শাস্ত্র, সাহিত্য এবং শিল্প এই তিনই সভ্যতার ফল। এই সকলের মধ্যে ধর্ম্ম জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহার কোন্ অঙ্গ অসভ্য পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া গিয়াছে, তাহা চিনিয়া লইতে হইলে এবং অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্য অবস্থায় উঠিবার জন্য যে সোপান ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে শাস্ত্রাদিতে ধর্ম্মজীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহার সহিত অসভ্য জাতির ধর্ম্মজীবনের তুলনা করা আবশ্যক। এইরূপ তুলনায় প্রবৃত্ত হইবার আগে আমাদের সম্মুখে অসভ্য সমাজের ধর্ম্মজীবনের একখানি অবিকল চিত্র থাকা দরকার। উত্তর আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের ওমাহা নামক জাতির ধর্ম্মজীবনের এরূপ একখানি চিত্র সংগ্রহ করিয়া এবং এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়া এই চেষ্টা করিব।

ওমাহাগণ যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত নেব্রস্কাবাসী। ভাষার হিসাবে ওমাহারা পোঙ্কা (Ponka) কান্সা (Kansa) ওসাগে (Osage), কুয়বা (Quapaw) ডেকোটা (Dakota) প্রভৃতি জাতির জ্ঞাতি। এই সকল জাতির ভাষা সিউয়ান (Siouan) শ্রেণীর সামিল, সুতরাং ইহারা সিউয়ান শ্রেণীর জাতি বলিয়া কথিত হয়। ওমাহারা আদৌ মৃগয়াজীবী ছিল। ইহারা প্রধানতঃ বন্য মহিষ শিকার করিয়া তাহার মাংস আহার করিত। ওমাহারা পাষাণের হাতের তৈয়ারি অস্ত্রের দ্বারা শিকার করিত, লোহার বা তামার অস্ত্র তৈয়ার করিতে জানিত না। শ্বেতাঙ্গ ফরাসী এবং ইংরেজ বণিকের নিকট হইতে ওমাহারা লোহার অস্ত্র পাইয়াছিল। ওমাহারা আদৌ কাপড় বুনিতে বা পরিতে জানিত না, চামড়া পরিয়া থাকিত। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে ইহারা ইংরেজের নিকট হইতে মোটা পশমি কাপড় বিনিময়ে লইয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে ওমাহারা সুতার কাপড় (catico) ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। ওমাহা ভাষায় সুতার কাপড়ের নাম "গাতলা চামড়া"। ওমাহারা আগে তাঁবু তৈয়ার করিত—মহিষের চামড়া দিয়া। ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে ইহারা কেনভাস (canvas) ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেনভাসের নাম "তাবুর চামড়া"। ওমাহারা শ্বেতাঙ্গগণের নিকট হইতে মদ খাওয়া শিখিয়াছে এবং বসন্ত, হাম, মেলেরিয়া রোগ পাইয়াছিল। ওমাহা এক সময় সংখ্যায় অনেক ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে বসন্তের অরক লাগায় এই জাতিটা প্রায় নির্ম্মূল হয়, কয়েক শত মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ওমাহারা কোদাল দিয়া মাটি কোবাইয়া ভুট্টা বুনিত, লাঙ্গল দিয়া জমী চাষ করিয়া বীজ বুনিতে জানিত না। লাঙ্গলের ব্যবহার তাহারা প্রথম শিক্ষা করে—ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধের শেষ ভাগে।

ওমাহা জাতির এলাকায় শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা অষ্টাদশ শতাব্দে বরাবরই সওদা বিনিময় করিতে যাইত। যুক্তরাজ্যের সহিত ওমাহাগণের প্রথম সন্ধি স্থাপিত হয়—সন্ধিসূত্রে ১৮১৫ সালে। ১৮৩০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ওমাহা-প্রমুখের সহিত যুক্তরাজ্যের বারবার যে সন্ধি হয়, সেই সকল সন্ধির প্রধান লক্ষ্য ছিল,—ওমাহাগণ যে বিস্তৃত ভূখণ্ডে শিকার করিয়া বেড়াইত, তাহার এক একটি অংশ সম্বন্ধে দাবী ছাড়াইয়া লওয়া বা খরিদ করিয়া লওয়া। ১৮৭১ সাল হইতে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লওয়ার পরিবর্ত্তে যুক্তরাজ্যের সরকার আপনার ব্যবস্থাপক সভায় আইন পাশ করিয়া ওমাহাগণের নিকট হইতে মূল্য দিয়া জমী কিনিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। এতদিন যে তাহারা যদিও

চাষবাস করিতেছিল, তথাপি তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের প্রধান উপায় ছিল বন্য মহিষ-শিকার। কিন্তু ১৮৭৬ সালের পরে দেখা গেল, বন্য মহিষ নিঃশেষিত হইয়াছে। সুতরাং শিকার ছাড়িয়া ওমাহাগণের পাকা গৃহস্থ হওয়ার দরকার হইল। ওমাহারা যতদিন তাহাদের চিরাভ্যস্ত শিকারে ব্যস্ত ছিল, ততদিন যে জমীতে তাহাদের বসতবাড়ী ছিল, সে জমী তাহারা চাষ করিত এবং যে বনে তাহারা শিকার করিত, সেই জমীতে ও বনের অংশে তাহাদের প্রত্যেকের কোন স্বত্ব-স্বামিত্ব আছে কিনা, যে যুক্ত রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থা তাহারা মানিয়া চলিত, সেই যুক্তরাজ্যের জনপদের অধিকার (Citizenship) তাহারা দাবী করিতে পারে কিনা, সে বিষয়ে কোন চিন্তা করে নাই। কিন্তু এমন সময় যুক্ত রাজ্যের ব্যবস্থা অনুসারে পোঙ্কা জাতির যে বিপদ ঘটিল, তাহাতে ওমাহাগণের চৈতন্য হইল। পোঙ্কারা যে খামগায় বসবাস করিতেছিল, যুক্তরাজ্যের সরকার ১৮৬৮ সালে পোঙ্কাদের অজ্ঞাতসারে তাহা আর এক জাতিকে দিয়াছিল। ১৮৭৭ সালে কর্ত্তৃপক্ষ পোঙ্কা সরদারগণকে বলিল—তাহাদিগকে সমস্ত মাইল দূরে আর এক স্থানে গিয়া বাস করিতে হইবে। পোঙ্কাসরদারগণকে সেইখানে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু তাহারা সেখানে বাস করিতে সম্মত হইল না, পূর্ব্বনিবাস স্থানে ফিরিয়া আসিল। তারপর যুক্তরাজ্যের সেনা গিয়া পোঙ্কাগণকে বলপূর্ব্বক নূতন আবাসস্থানে যাইতে বাধ্য করিল। পোঙ্কাদের পূর্ব্ব নিবাসক্ষেত্র শীতপ্রধান ছিল এবং নূতন নিবাসক্ষেত্র ছিল—গ্রীষ্মপ্রধান। নূতন যায়গায় জল বায়ুর দোষে এক বৎসরের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ পোঙ্কা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল; এবং যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা পীড়িত এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। পোঙ্কাগণের "দণ্ডায়মান ভল্লুক" (standing bear) নামক একজন সর্দ্দারের ছেলেরও মৃত্যু হইয়াছিল। "দণ্ডায়মান ভল্লুক" মহাশয় সেই ছেলের কঙ্কাল এবং নিজের অনুচরগণসহ ৫০০ মাইল হাঁটিয়া ওমাহাগণের দেশে আসিয়া জমী এবং বীজ ভিক্ষা চাহিয়াছিল। পরে "দণ্ডায়মান ভল্লুকের" আন্দোলনের ফলে পোঙ্কাজাতির মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি এবং জনপদের অধিকার পাইয়াছিল।

পোঙ্কাগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া ওমাহারা যখন, নিজেরাও পাছে নিজভূমি হইতে দূরদেশে তাড়িত হয়, এই ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন [illegible] একজন ফ্রেঞ্চার একজন আমেরিকান মহিলা জাতিবিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ওমাহা দেশে পাঠাইয়াছিলেন। [illegible] ফ্রেঞ্চার বহু চেষ্টার পর ১৮৮৯ সালে

বিধিবদ্ধ এক আইনে প্রত্যেক ওমাহাকে তাহার বথলের সকল জমীজমার স্বত্ব স্থায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ওমাহাগণকে জমীর অধিকারী করিয়া দিবার জন্য যখন মিস্ ফ্লেচার আন্দোলনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন জোসেফল ফ্লেস (Josephla Fleseche) নামক ওমাহাগণের একজন সরদার ছিল। এই ফ্লেসের পিতা ছিলেন—একজন ফরাসী সওদাগর এবং মাতা ছিলেন—ওমাহা রমণী। ফ্লেস ওমাহাগণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া কালে সরদারী পদ পাইয়াছিল। দুই শত বৎসরব্যাপী শ্বেতাঙ্গসংসর্গের ফলে অবশ্য ওমাহাগণের আচার-বিচারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পাদ্রি সাহেবেরা গিয়া গিয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৭৬ সালের পর হইতে মৃগয়া বৃত্তি ছাড়িয়া কৃষি জীবন এবং বনচরবৃত্তি ছাড়িয়া গৃহস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওমাহা সমাজে বিপ্লব আরম্ভ হইল। ১৯১০ সালে সর্ব্বসমেত ১২৭০ জন ওমাহা ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই শ্বেতাঙ্গের পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার এবং অধিকাংশেই ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৮৮২ সাল হইতে মিস্ ফ্লেচার ওমাহাগণের আচার-ব্যবহারের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ওমাহাগণের আচার ব্যবহার দিন-দিন পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিলেও তিনি এমন অনেক ওমাহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, যাঁহারা নিজেরা পূর্ব্ব আচার রীতিমত অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং পূর্ব্ব ভাবের সহিত সুপরিচিত ছিল। এই কার্য্যে তাঁহার সহযোগী ছিলেন—সরদার জোসেফল ফ্লেসের পুত্র ফ্রান্সিস্ ল ফ্লেস। এই দুই জনে ২৯ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ১৯১১ সালের আমেরিকার জাতিতত্ত্ববিষয়ক দপ্তরের (Bureau of American Ethnology) ঊনত্রিংশৎ কার্য্যবিবরণীর সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে (১৭—৬৭২ পৃঃ)।

এই মূল্যবান্ গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান আহৃত হইল।

ওমাহাগণের ধর্ম্মবিষয়ক এবং সামাজিক সকল প্রকার সংস্কারের অনুষ্ঠানের গোড়ায় ওকোণ্ডা (Wokonda) নামক পদার্থের বিশ্বাস বিদ্যমান রহিয়াছে। ওকোণ্ডার সহিত প্রেত, দেবতা, পরমেশ্বরাদি কোন প্রকার অমানুষিক জীবের ধারণার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই।

"Wakanda stands for the mysterious life power permeating all natural forms and forces and all phases of man's conscious life" (p 597)

"যে অনির্ব্বচনীয় জীবনীশক্তি নৈসর্গিক সকল বস্তুবিশিষ্ট পদার্থে, সকল শক্তিতে এবং মানব জীবনের সকল ব্যাপারে পরিব্যাপ্ত আছে, তাহার নাম ওকোণ্ডা।"

ওমাহাগণের বিশ্বাস ছিল—এই চক্ষুর অগোচর (invisible) এবং অবিচ্ছিন্ন (continuous) জীবনীশক্তি দৃশ্য অদৃশ্য সকল পদার্থে নিহিত আছে। এই শক্তি দুই আকারে প্রকট হয়। প্রথমত, এই শক্তি সকল প্রকার গতি, দেহের এবং মনের সকল প্রকার ক্রিয়া, উৎপাদন করে; দ্বিতীয়তঃ, এই শক্তি পাহাড়, পর্ব্বত, নদনদী, হ্রদ, জীব জন্তু মানুষ প্রভৃতি সকল প্রকার পদার্থের স্থিতির মূল। এই অদৃশ্য শক্তির সহিত মানুষের ইচ্ছাশক্তির সাদৃশ্য আছে; যাহা কিছু ঘটে, তাহা এই শক্তিরই ক্রিয়া। এই অব্যক্ত জীবনী-শক্তিই সকল প্রকার পদার্থের পরস্পরের মধ্যে এবং মানুষের সঙ্গে বন্ধন-সূত্র;—দৃশ্যের সহিত অদৃশ্যের, জীবিতের সহিত মৃতের, অংশের সহিত সমুদায়ের বন্ধন সূত্র। এই অদৃশ্য জীবনীশক্তির নাম ওকোণ্ডা। এই ওকোণ্ডা অব্যক্ত হইলেও ওকোণ্ডাকে উদ্দেশ করিয়া প্রার্থনা করা হইত এবং সাহায্য চাওয়া হইত, অর্থাৎ তাহাতে একপ্রকার ব্যক্তিত্ব এবং মনুষ্যভাবও কার্য্যতঃ আরোপ করা হইত। নৈসর্গিক ব্যাপারে যে নিয়মনিষ্ঠা দেখা যায়—যেমন একই অনতিক্রম্য নিয়মে রাত্রিদিনের পরিবর্ত্তন এবং ঋতুর পরিবর্ত্তন—ইহাও ওকোণ্ডার মহিমা! নিয়মনিষ্ঠা বা সত্যনিষ্ঠা, মানুষের মধ্যে সুনীতিনিষ্ঠা, ওকোণ্ডার অনুমোদিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

"An invisible and continuous life was believed to permeate all things seen and unseen. This life manifests itself in two ways. First by causing to move—all motions, all actions of mind or body are because of this invisible life; Second, by causing permanency of structure and form, as in the rock, the physical features of the landscape, mountains, Plains, Rivers, Lakes, the animals and man. This invisible life was also conceived of as being similar to the will power of which man is conscious [illegible]

দেহের লোম।

সর্ব্ব প্রকার বানর ও নরগণের মধ্যে নরগণের দেহে লোম অত্যন্ত কম। কিন্তু শৈশব অবস্থায় নরগণেরও দেহে প্রায় সর্ব্বত্রই লোম থাকে। ওষ্ঠ, হস্তের তলভাগ, পদের তলভাগ, এবং আরও দুই একটী স্থান ব্যতীত ভ্রূণের দেহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে লোমাবৃত। এ সম্বন্ধে পুংজাতীয় অথবা স্ত্রীজাতীয় ভ্রূণ মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

ভ্রূণের বয়স তিন মাস অথবা সাড়ে তিন মাস হইলে লোম হইতে আরম্ভ হয়। তখন মুখমণ্ডল এবং কপালে লোম হয়। কিন্তু গায়ের চর্ম্ম ভেদ করিয়া লোম উঠিতে পাঁচ মাসের কমে হয় না; এবং সাত মাস পূর্ণ হইয়া গেলে লোম উঠাও শেষ হয়। সর্ব্বপ্রথমে ভ্রূণের মস্তকে লোম উৎপন্ন হয় এবং সর্ব্ব শেষে বাহুতে ও পদে হইয়া থাকে।

এই লোমগুলি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কেশের ন্যায় নহে, উহারা প্রায় সাদা বর্ণের এবং অতি ক্ষুদ্র ও অতি নরম মসৃণ। জাতক ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই মস্তক ও ভ্রূ ব্যতীত দেহের প্রায় সর্ব্বস্থান হইতেই ঐ লোম অন্তর্হিত হয়; উহা দেহচর্ম্মে লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু কোন কোন শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার সময়েও দেহের দুই এক অংশে বড় বড় কেশবৎ লোম থাকিতে দেখা গিয়াছে।

যৌবন কালে ঐ লুপ্ত লোমাবলীর স্থানে কেশ জাত হয়; কিন্তু সর্ব্বত্র হয় না। গালে ও তাহার নিম্ন ভাগে, ওষ্ঠের উপরে ও অধরের নীচে, বগলে, বুকে, এবং তলপ্রেটের নিম্ন দেশে এবং গুহ্য দ্বারের চতুষ্পার্শ্বে ও উপরিভাগে কেশ জাত হয়। অন্যত্র প্রায়শঃ হয় না। কিন্তু কাহারও কাহারও পীঠে এবং বাহুতে এবং পদযষ্টিতে কেশ থাকা দেখা যায়। উহা সাধারণ নিয়ম নহে। উপরের লিখিত গাল ইত্যাদি চারিপাঁচ স্থান ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহের কোথাও লোম থাকা সাধারণ নিয়ম নহে। তথাপি ভ্রূণের দেহ যেমন প্রায় সম্পূর্ণরূপে লোমাবৃত থাকে, তেমনই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহেও প্রায় সর্ব্বত্রই লোমের মূল বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সেই মূল হইতে আর লোম জাত

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ মধ্যে স্ত্রীগণের অপেক্ষা পুংগণের দেহই অধিক লোমযুক্ত। স্ত্রীগণের গালে, ওষ্ঠে, বুকে, বাহুতে প্রায় কাহারই লোম দৃষ্ট হয় না; তথাপি কদাচিৎ দুই-একটী স্ত্রীলোকের ওষ্ঠের উপরে এবং গালের নিম্নভাগে, কেশ থাকা দেখা যায়। আমি বাল্য কালে একটী স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলাম, তাহার দাড়ি ও গোঁপ ঠিক পুরুষের মত ছিল; তৎপরেও দুই একটী ঐরূপ স্ত্রীলোক দেখিয়াছি। বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন।

দেহের কেশাবলী যেরূপভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত, তাহা বিবেচনা করিলে মনে কতিপয় প্রশ্নের উদয় হয়। প্রাপ্তবয়স্কের দেহ অপেক্ষা ভ্রূণ দেহের লোম সকল কি ভাবে সজ্জিত থাকে, তাহাই অধিকতর চিন্তনীয়। তথাপি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কেশ সংস্থানও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

কেশসংস্থানের প্রণালী এই যে (১) কতিপয় কেশের অগ্রভাগ একটী বিন্দু অথবা চক্র হইতে চারিদিকে চলিয়া যায়, (২) কতিপয় কেশের অগ্রভাগ একটী রেখার দিকে বিপরীত ভাবে চলিয়া যায়। (৩) এবং অবশিষ্ট কতিপয় কেশের অগ্র চারিদিক্ হইতে একটী বিন্দু অথবা চক্রের দিকে চলিয়া আসে। প্রথম প্রণালীর উত্তম উদাহরণ—মস্তকের উপরিভাগের চক্র [ঘূর্ণি থাকে]। মস্তকের কেশের অগ্র ভাগ এই চক্র হইতে চতুর্দ্দিকে গিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তির এই স্থানে দুইটী চক্র দেখা যায়; তাহাদিগের দুই চক্র হইতে কেশাগ্র সকল চতুর্দ্দিকে যায়। দ্বিতীয় প্রণালীর দৃষ্টান্ত—বক্ষের ও বাহুর কেশ; এই দুই স্থানে একটী কাল্পনিক রেখার দুই বিপরীত দিকে কেশাগ্র চলিয়া গিয়াছে। বক্ষের ঠিক মধ্য দিয়া একটী ঊর্দ্ধাধঃ রেখা কল্পনা করিলে বামদিকে কেশাগ্র স্থাপিত থাকা বুঝা যায়। তলপেটের নিম্নভাগেও এইরূপ। পৃষ্ঠে কেশ থাকিলে সেখানেও এই প্রণালী দৃষ্ট হয়। তৃতীয় প্রণালীর উত্তম দৃষ্টান্ত নাভি। চারিদিক্ হইতে এই চক্রের দিকে কেশ চলিয়া আসে। এই সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। যে চক্রের দিকে চারিদিক হইতে কেশাগ্র চলিয়া আসে, সে চক্রের মধ্য দিয়া দেহের বাহিরের দিকে কোনও কিছু বাহির হইতে দেখা যায়। ভ্রূণের নাভিচক্র হইতে বাহিরের দিকে একটী নল থাকে; ঐ নল অপরা নাড়ী ভূমিষ্ঠ হইলে পর কাটিয়া দিতে হয়। আরও একটী স্থানে এইরূপ রেখা তাহা মানবজাতির দেহেই লক্ষিত হয়। বা-নরদিগের প্রাপ্তবয়স্কের দেহে লক্ষিত হয়। সে স্থান মেরুদণ্ডের নিম্নে এবং দুই দ্বারের [illegible]

উপরে। ঐ স্থানে একটী ক্ষুদ্র খালের মত প্রায় সকল মানবের দেহেই আছে। যাহাদিগের ঐ স্থানে লোম থাকে [অর্থাৎ ছোট, সাদা রঙের নহে লোম থাকে] তাহাদিগের লোমের অগ্রভাগ ঐ খালের দিকে স্থাপিত। ঐ খাল ভেদ করিয়া বা-নরাদির এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী পশুদিগের লেজ বাহির হয়। ঠিক ঐ-স্থানে নরগণের একটী ক্ষুদ্র খাল; এবং সেই খালের দিকে চারিদিক হইতে লোমাগ্র চলিয়া আসে। ইহার অর্থ কি? স্থান ভেদ করিয়া কি মানবজাতির প্রাচীনতম পূর্ব্ব পুরুষের লেজ বাহির হইত? এই বিষয় নিশ্চয়ই বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। মানবের ভ্রূণ দেহে স্পষ্ট দেখা যায়, যে স্থান হইতে সমস্ত মেরুদণ্ডটী গঠিত হইবে, তাহার সর্ব্ব নিম্নভাগ সূক্ষ্ম (চোখা) হইয়া উপরের দিকে বাঁকিয়া দেহের বাহির হইয়া রহিয়াছে। এই অংশ সচরাচর ভ্রূণের চারি-বৎসর বয়সে দেহ মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিত গার্ল্যাক্ একটী মানব-ভ্রূণের চারি মাস বয়সেও ঐ বাহিরের অংশ লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই খণ্ডের এই সূক্ষ্মাগ্র-নিম্নভাগ ভ্রূণ দেহ হইতে বাহির হইয়াছে; এবং বাহিরের অংশ সমস্ত দেহের এক ষষ্ঠাংশ পরিমিত দীর্ঘ। ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম মেরুতন্তু দেখা গিয়াছে! এবং ইহার সহিত অপুষ্ট পেশীগুচ্ছও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সকল বিষয়ে এ অংশ প্রকৃত মেরুদণ্ডের ন্যায়। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়াও সূক্ষ্ম মেরুতন্তু আছে; এবং ঐ দণ্ডের প্রত্যেক অস্থিখণ্ডের সহিত পেশী ও শিরা সংযুক্ত আছে। মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্নভাগে কটির অধোদেশে যে চারিখানি খণ্ডাস্থি এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক নরগণের সকলেরই বর্ত্তমান আছে, তাহা অপুষ্ট এবং জমাট হইয়া পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। উহারা আর কার্য্য করে না। উহার অগ্রভাগ ভ্রূণের দেহে উপরের দিকে বক্র হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সচরাচর উহার সূক্ষ্মাগ্রভাগ যাহা দেহ হইতে কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া থাকে, তাহা ভ্রূণ অবস্থাতেই দেহমধ্যে লীন হইয়া যায়। এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক নরগণের মেরুদণ্ডের ঐ-শেষাংশ নিম্নগামী। সৌভাগ্যক্রমে পণ্ডিত গার্ল্যাক্ একটী মানবীয় ভ্রূণের উপরের লিখিত অংশ দেহ হইতে বাহির হইয়া ক্রমে সূক্ষ্মাগ্র হইবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অন্যান্য মানবীয় ভ্রূণেরও মেরুদণ্ডের শেষাংশ ঐরূপ; কিন্তু সচরাচর দেহমধ্যেই থাকে এবং অতিশয় অপুষ্ট ও প্রায় লয়প্রাপ্ত দেখা যায়। কিন্তু গার্ল্যাক্ মহোদয়ের লক্ষিত ভ্রূণের মেরুদণ্ডের শেষাংশ

* Wiedersheim's Structure of man p. 27.

প্রকৃত পুষ্ট, মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধতন অংশের ন্যায় লক্ষণযুক্ত ছিল। এই সকল কারণে, বিশেষতঃ উহার সংলগ্ন অপুষ্ট পেশী সমূহ থাকায়, উহাকে মেরুদণ্ড বলিয়াই বিবেচনা করিতে হয়। স্তন্যপায়ী পশুগণের লেজও মেরুদণ্ডের শেষাংশ: উহা দেহ হইতে বাহির হইয়া প্রাপ্ত-বয়সেও কার্য্যক্ষম থাকে। উহাদিগের দেহমধ্যস্থ প্রকৃত মেরুদণ্ড এবং দেহের বাহিরের লেজাংশে সর্ব্বসমেত ন্যূনাধিক ৪০।৪২ খানি * খণ্ডাস্থি থাকে। কিন্তু মানবের দেহমধ্যেই মেরুদণ্ড অবস্থিত, বাহিরে নাই। তাহার খণ্ডাস্থির সংখ্যা তেত্রিশ (৩৩)। তন্মধ্যে সর্ব্ব নিম্নের অংশে চারিখানি অপুষ্ট, জমাট ও নিরেট। উপরের নয়খানি কার্য্যক্ষম। নিম্নের চারিখানি কার্য্যক্ষম নহে। উহাদিগের সহিত সমুদায় পেশীগুচ্ছ সংলগ্ন না থাকায় উহারা নড়িতে পারে না। কিন্তু পশুদিগের লেজাংশের খণ্ডাস্থিতেও পেশী ও শিরাযুক্ত থাকায় ঐ অংশ সঞ্চালন করা যায়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, এই লেজাংশ যে স্থান হইতে দেহের বাহিরে আসিয়াছে, সে স্থানে পশুগণেরও কেশ থাকে। মানব ভ্রূণেরও ঐ স্থানে পরেরই কেশ থাকে; এবং প্রাপ্তবয়স্ক মানবের ঐ স্থানে ক্ষুদ্র একটী খাল থাকে; তাহার চারিদিক্ হইতে কেশাগ্র ভাগ ঐ খালের দিকে চলিয়া আসে। কিন্তু সকলের ঐ খালের নিকট কেশ থাকে না; তথাপি যাহাদিগের থাকে, তাহাদিগের ঐরূপ অবস্থা হয়।

সুতরাং ইহা অনুমান করা যায় যে, মানবের অতি প্রাচীনতম পূর্ব্ব-পুরুষের ঐ খালের স্থান হইতে আরও কয়েকটী [মেরুদণ্ডের] খণ্ডাস্থি বাহির হইত, তাহাকে লেজ বলা যাইত। এক্ষণ খণ্ডাস্থির সংখ্যা কমিয়া গিয়া ৩৩টী মাত্র হওয়ায়, মেরুদণ্ড সমস্তই দেহের মধ্যে থাকিবার স্থান পায়; দেহের বাহিরে আসিবার প্রয়োজন হয় না। এই হেতু এক্ষণে নরগণের লেজাংশ লুপ্ত হইয়া বলিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় ভ্রূণের লেজাংশ স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে কেশের কথা পুনরায় উল্লেখ করিতেছি। দেহের কেশসংস্থান যে ত্রিবিধ প্রণালীতে হইয়া থাকে, তাহা বলিয়াছি। তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তৃতীয় প্রণালী মতে, চক্রের দিকে কেশাগ্রভাগ অবস্থিত থাকে। ইহা হইতে বিবেচনা করা যায় যে, ঐ চক্র হইতে কোনও কিছু বাহির হয়। নাভি হইতে নাড়ী বাহির হয়; এবং গুহ্যের পশ্চাদ্ভাগের উপরের ক্ষুদ্র খাল হইতে

* ভিন্ন ভিন্ন পশুর লেজাংশের খণ্ডাস্থির সংখ্যা বিভিন্ন।

* কদাচিৎ কাহারও থাকে না।

পূর্ব্বে পৃষ্ঠবংশের অতিরিক্ত খণ্ডাস্থি বাহির হইয়া লেজ গণ্য হইত; এক্ষণে খণ্ডাস্থির সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় সেই অংশ নাই।

কেশসংস্থান হইতে আর একটী কথা প্রতীয়মান হয়। নরগণের মুখে, নখলে, বুকে, তলপেটের নীচে কেশ থাকে। মস্তক বাদ দিলে প্রধানতঃ এই সকল স্থানেই মানবদেহে কেশ থাকা দেখা যায়। কিন্তু এ সকল স্থানই দেহের অধঃ ভাগে। সুতরাং চতুষ্পদের মত হইয়া থাকিলে নীচের দিকে থাকে। উপরের দিক-পৃষ্ঠ, কটি, নিতম্ব ও পদকণ্ঠীর পশ্চাৎ ভাগ। এই সকল স্থানে সচরাচর কেশ থাকে না। চতুষ্পদের মত থাকিলে উপরের দিকে দেহের যে ভাগ থাকে, তাহার মধ্যে কেবল মস্তকের পিছের দিকে কেশ আছে; আর কোন স্থানেই থাকে না। আর মুখ, বক্ষ ইত্যাদি দেহের যে ভাগ চতুষ্পদ অবস্থায় থাকিলে নীচের দিকে থাকে, তাহাতে কেশ থাকে। নখল নীচের দিকেও না, উপরের দিকেও না; কিন্তু দেহের বাহুর মধ্যভাগে সুরক্ষিত। পৃষ্ঠ ইত্যাদি উপরের ভাগে রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু ইত্যাদি সর্ব্বদাই লাগে; কিন্তু বক্ষ ইত্যাদি নীচের দিকে ও বগলে তাহা লাগে না। এই কারণেই কি বক্ষ ইত্যাদি স্থানে কেশ থাকে এবং পৃষ্ঠ ইত্যাদি স্থানে কেশ থাকে না? চতুষ্পদ অবস্থায় পৃষ্ঠে বৃষ্টি পড়িলে দক্ষিণ ও বামভাগ দিয়া গড়াইয়া পড়ে। বস্তুতঃও দেখিতে পাই যে, রোমকণ্ডকে একটী রেখা বিবেচনা করিলে তাহার দুই পার্শ্বে বিপরীত দিকে রোমের কেশাগ্রভাগ চলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ যাহাদিগের পৃষ্ঠে কেশ আছে, তাহাদিগের ঐরূপ। বাহুর কেশ সংস্থানও ঐরূপ। যদিও এই অঙ্গে আপাততঃ একটু প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, এই অংশ উপরের লিখিত দ্বিতীয় প্রণালী মত কেশ সংস্থান হইয়া থাকে। বাহুতে যে রোমের রেখার উভয় দিকে কেশাগ্র চলিয়া যায়, তাহা মানবদেহের সম্মুখভাগে; সুতরাং চতুষ্পদের মত থাকিলে নীচের দিকে হওয়ায় উহাতে অধিক বৃষ্টিপাত হয় না, এ কথা সত্য। কিন্তু স্কন্ধে ও বাহুমূলে যে সকল বৃষ্টি পতিত হয়, তাহা বাহুর সম্মুখস্থ ভাগ দিয়াই অধিক গড়াইয়া পড়ে। পশ্চাদ্ভাগে তাদৃশ সংখ্যক পরিমাণে গড়িয়া পড়ে না। ইহা আমি বহুবার বৃষ্টির সময় লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং আপাততঃ এ সংস্কার জন্মিতে পারে যে, চতুষ্পদ অবস্থায় দেহের যে অংশ আকাশের দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে থাকে, সে অংশ সচরাচর কেশহীন হইবার কারণ বোধ হয় রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু ইত্যাদি। আর ঐ অবস্থায় দেহের যে ভাগ মাটির দিকে অর্থাৎ নীচের দিকে থাকে, তাহা বোধ হয় ঐ

সকলের অভাববশতঃ লোমশ হয়। বাস্তবিক পক্ষে যদিও ঐ তিনটীকে কারণ বলা যায় না, তথাপি কেশোৎপত্তির ও কেশ সংস্থানের প্রকৃত কারণ [অর্থাৎ শুক্র শোণিতগত] কারণ রৌদ্র বৃষ্টি ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সহায়তা লাভ করিয়া উপরিভাগকে সচরাচর কেশহীন করিয়াছে; এবং ঐ সকলের অভাব বশতঃ অথবা সহায়তার অভাবে নিম্নভাগ কেশহীন হইতে পারে নাই, লোমশ আছে;—এইরূপ বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

কেশ বস্তুতঃ ত্বকেরই বিকার। ইহার কারণ [ত্বকেরই ন্যায়] শুক্র শোণিতগত। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শুক্রশোণিতগত কারণ প্রকাশ লাভ করে, অথবা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে, এ ক্ষেত্রের অবস্থাও তাহাই।

কোন কোন ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে কেশ, এমন কি কপালেও কেশ জাত হয়, কিন্তু মানব জাতিমধ্যে তাহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কাহারও বা মস্তক ভিন্ন দেহের অন্যত্র কেশ জাত হয় না। আবার কাহারও জন্মাবধি মস্তকেও কেশ থাকে না। কেশ উৎপত্তির প্রধান কারণ যতদূর বুঝা গিয়াছে, তাহা পশ্চাৎ বিবৃত করিব।

শ্রীশশধর রায়।

প্রাচীন ও নবীন কবির প্রতি।

(১)

এস এস হে প্রাচীন, এস হে নবীন,—
এস সব আত্মীয় আমার,
তোমাদের মাঝখানে কেটে যাক্ দিন—
জীবনের পুণ্য পুরস্কার।
তোমাদের উচ্চাদর্শে কর নিয়ন্ত্রিত
আমাদের সমগ্র জীবন,
সুখে দুখে যেন নাহি হই বিচলিত,
লভি সিদ্ধি করি প্রাণপণ।

---

* আধুনিক শরীর তত্ত্বের এই মত পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পঞ্চাননতর্করত্ন মহাশয়ের নিকটেও জানিতে পারা যায়।

(২)

অতীতের দীপ্তালোকে যেন নেহারিতে—
পারি ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান,
বেঁধে দাও একখানি বাঁশরী সঙ্গীতে
কালের অখণ্ড পরিমাণ!
জগৎ-গুরুর পদে হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত
হও মানবের নিয়ামক
তোমাদের সাধনায় হ'ক সম্মিলিত
স্বর্গ মর্ত্ত্য, হে কবি সাধক।

(৩)

কে বলে মথুরা নাই, নাই যদুপতি,
নাই সেই উত্তর কোশল?
সময়ের আবর্ত্তনে ধ্বংসমুখে গতি
সবই হেথা অস্থির চঞ্চল?—
—কবির জগতে কভু খাটে না এ কথা,
সৃষ্টি যেথা অনন্ত অক্ষয়,
যেথা নিত্য খণ্ড ভগ্ন লভিছে পূর্ণতা—
যেথা নাই বিলয় প্রলয়।—

(৪)

এস তবে হে প্রাচীন, এস হে নবীন—
নিখিলের প্রিয় পুরোহিত,
জ্বালাও হোমাগ্নিশিখা চিররাত্রিদিন
নাশিবারে বিশ্বের অহিত।
দিকে দিকে মধুবায়ু হ'ক প্রবাহিত,
মধুময়ী হ'ক বসুন্ধরা,
মানবে মানবে প্রীতি হ'ক সংবর্দ্ধিত,
দূরে যাক্ দুঃখ দৈন্য জরা!

কবিভূষণাকর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ।

আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞান।

বাল্যকালে কোনও একখানি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, ভাদ্র ও আশ্বিনমাসে সাধারণতঃ জ্বরোগের প্রাধান্য হইয়া থাকে ও তাহার প্রতিবিধানের জন্য ঐ সময়ে প্রত্যহ চিরেতাভিজান জল, পলতা ও অন্যান্য তিক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত। এই বিশ্বাস অনুসারে অনেকেই চলিয়া থাকেন—আমিও বহুদিন চলিয়াছি। বাজারে যাইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বারমাস কাল, বিশেষতঃ ভাদ্র আশ্বিনমাসে, পলতা, উচ্ছে ও হিঞ্চে শাক প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, তিক্ত দ্রব্য খাইলেই পিত্তনাশ হয়—সে যে কোনও সময়ে হউক না কেন। অনেক ডাক্তারের নিকট জানিয়াছি যে, তাঁহাদের মতেও তিক্তদ্রব্য সকল সময়েই পিত্তনাশক ও যকৃতের ক্রিয়া-বিষয়ে উপকারক। অনেকেই জানেন যে, পিত্তাধিক্যবশতঃ রক্তখারাপ হয়, পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হয় ও জ্বরাদি নানারোগের উৎপত্তি হয়। চুলকানি, পাচড়া, দাদ, যা, ফোঁড়া প্রভৃতি শোণিতপীড়া পিত্তাধিক্যবশতঃই হইয়া থাকে। উল্লিখিত পীড়াদিতে অনেকেই তিক্তদ্রব্য ভক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ফল যে সকল স্থলে সন্তোষজনক হয় না, তাহা আমার নিজের জীবনের দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে।

আমার যখন ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স, তখন ভাদ্রমাসে একবার আমার চুলকানি হয়। ডাক্তার ব্যবস্থা করিলেন bitters (তিক্তদ্রব্য) খাও। আমি যতপ্রকার তিক্তদ্রব্য খাওয়া চলে, তাহাই খাইতে আরম্ভ করিলাম। ফলে পীড়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ছিল চুলকানি, হইল পাচড়া। ডাক্তার বলিলেন খুব bitters খাও। আমি তাঁহার পরামর্শ অনুসারে নিমের পাতা খাইতে আরম্ভ করিলাম। যত বেশী তিক্ত দ্রব্য খাই, পীড়া ততই বাড়ে। ক্রমশঃ এত অধিক পরিমাণে নিমের পাতা খাইতে লাগিলাম যে, আমার বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে একটা ক্ষুদ্র উদ্ভেদ সহিত তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু আমি নিরুপায় পাত্র ছিলাম না—ডাক্তারের উপদেশ প্রাণপণে পালন করিতাম। ডাক্তার সাহস দিতেন, কুছ পরোয়া নেই—bitters খাও—তোমার শরীরের

মধ্যে লুকায়িত-ভাবে যে বিষ ছিল, তাহা এক্ষণে বাহির হইতেছে। কিন্তু অবস্থা আমার দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হওয়াতে আমি বাধ্য হইয়া অবশেষে তিক্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করিলাম। তিক্ত দ্রব্যে কোনও উপকার না হইয়া বরং অপকার হইয়াছিল। কি কারণে তিক্তদ্রব্যে কোনও উপকার হইল না, ইহা তখন আমি বুঝিতে পারি নাই—আমার চিকিৎসক ও বান্ধবগণও পারেন নাই।

ইহার অনেকদিন পরে কর্ম্মসূত্রে আমাকে কিছুকাল দিনাজপুরে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তখন ভাদ্র মাস; চারিদিকেই জ্বর আরম্ভ হইয়াছে। দিনাজপুর নাকি ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থান—বিশেষতঃ ভাদ্র আশ্বিন মাসে ঐ-অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার—অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। পাছে আমারও ম্যালেরিয়া হয়, এই ভয়ে সাবধান হইবার ইচ্ছা হইল। বন্ধুবান্ধবগণ উপদেশ দিলেন—চিরেতার জল খাও, ম্যালেরিয়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিতে পাইবে না। ভয়ে ভয়ে চিরেতার জল খাইতে আরম্ভ করিলাম। ২।৪ দিন এই জলখাওয়ার পর বিষম জ্বর আসিল—আমার জীবনে সেই প্রথম ম্যালেরিয়ার আক্রমণ। এমন ম্যালেরিয়া আমাকে ধরিল যে, প্রায় এক বৎসর কাল ভুগিয়া অবশেষে দার্জ্জিলিং গিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাই। চিরেতার জল খাইয়া এইরূপ হিতে বিপরীত হইল কেন জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তার বাবু ও বন্ধুবান্ধবগণ বলিলেন, তোমার শরীরের ভিতরে ম্যালেরিয়ার বিষ ছিল—চিরেতার জলে তাহা বাহির হইয়া পড়িল। তখন সেই ব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হওয়া ভিন্ন আর কোনও উপায় ছিল না। দেখিতাম, দিনাজপুরে ভাদ্র আশ্বিন মাসে কেহবা চিরেতার জল, কেহবা চিরেতার তরলসার, কেহবা গুলঞ্চের তরলসার আর কেহবা শুক্‌নো পাটের পাতা ভিজান জল অতি আগ্রহের সহিত পান করিতেছে—ফল সেই একই। যাহারা এই প্রকারে সাবধান হইতেছিল, তাহাদেরই জ্বর অধিক হইতেছিল।

এই দুইটী ঘটনা ব্যতীত আরও দুই একটা ঘটনা আমার জীবনে ঘটিয়াছিল, যাহা হইতে আমি বুঝিতে পারি যে, তিক্তদ্রব্যে অনেক সময়ে উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়। অথচ ডাক্তার কবিরাজগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিবেন যে, তিক্তদ্রব্য অতি উপকারক—পিত্তনাশক, জ্বরনাশক ইত্যাদি। আর বাস্তবিকই আয়ুর্ব্বেদে এই প্রকার সকলই লিখিত হইয়াছে। এই প্রকার অসামঞ্জস্যের কারণ কি? অনেক কাল আমি এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাই নাই। পরে গত ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসে দৈবাৎ মুদীর দোকানের একটা মলমার চোঙার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চোঙাটি

পুলিনা দেখি উহা "আগম সংগ্রহ" নামক একখানা হস্তলিখিত পুস্তকের পাতা। উহাতে একটী শ্লোক দেখিতে পাইলাম। উহা এই—

তপ্তোদকঞ্চ শরদি তিক্তং ভাদ্রে বিশেষতঃ।
দৈবগ্রস্তশ্চ যো ভুংক্তে পিত্তং তস্য প্রজায়তে॥

ইহার অর্থ শরৎকালে বিশেষতঃ ভাদ্র মাসে তপ্তজল ও তিক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে সে ব্যক্তি দৈবগ্রস্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কেননা, তাহার পিত্ত সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

এতদিন পরে আজ আমি দৈবাৎ জানিতে পারিলাম যে, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে তিক্তদ্রব্য খাইলে বিষম পিত্তবৃদ্ধি হয়—এই সময়ে মিষ্টদ্রব্য খাওয়া উচিত; বসন্তকালে মিষ্টদ্রব্য খাইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়। ঐ সময় তিক্ত দ্রব্য খাইলে পিত্ত নাশ হয়। এতদ্ব্যতীত শরৎকালে গরম জল খাইলে ভয়ানক পিত্তবৃদ্ধি হয় ইত্যাদি। এই মুদীর দোকানের জীর্ণ কাগজখানি হইতে আমি কয়েক দিনের এক ধাঁধাঁর জবাব পাইলাম। তাহার পর কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া অতি কষ্টে সম্পূর্ণ, 'আগমসংগ্রহ', নামক পুস্তক একখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি বিস্ময় ও ক্ষোভে অভিভূত হইয়াছি। অনেক অমূল্য কথাই আমি এ পুস্তকে পাইয়াছি। বিদেশীয় সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনে আশ্চর্য্যজনক অধিকার লাভ করিয়াছি বলিয়া আমরা নিজেদেরকে কতই না গৌরবান্বিত মনে করি! কিন্তু হায়! নিজেদের সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানসম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আমাদের ঘরে যাহা আছে, তাহার মূল্য বিষয়ে আমি এস্থলে কোনও কথাই বলিতেছি না—শুধু বলিতেছি আমাদের কি আছে না আছে, আমরা তাহার কোনও সংবাদই রাখি না। স্বাস্থ্যবিদ্যা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আমাদের সম্বল ইউরোপীয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও তাহার অনুবাদ। তাহাই এক্ষণে বিদ্যালয়ে পড়ান হইতেছে। সে সকল পুস্তক পড়িয়া কি ফল হইতেছে না হইতেছে, সে আলোচনা আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাহি যে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কত অমূল্য উপদেশ সমূহ আমাদের তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে রহিয়াছে—আমরা সে সকলের দিকে একবার দৃক্‌পাতও করি না। আমি কতকগুলি উপন্যাস ও হীরক অথবা অকিঞ্চিৎকর প্রত্নতত্ত্ব—[illegible] তাহা [illegible]। ইহা অপেক্ষা লজ্জা [illegible] কি [illegible] তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের [illegible]

কবিগণ আমি বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়াছি। আমরা নিজদেশে প্রবাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছি, একথা বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। কেনও হইতেছে ঠিক যাহা হওয়া উচিত না আমরা ক্রমশঃ ব্যাধিপীড়িত, নির্জ্জীব ও অল্পায়ু হইয়া আসিতেছি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বতন রাজপ্রতিনিধি সর্জ্জ মিণ্টো যে বাঙ্গালী জাতির আকৃতি, স্বাস্থ্য ও দেহসৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, আমরা আর সে বাঙ্গালী নহি। কেন এরূপ হইতেছে, তাহা সুস্থ আমরা বুঝিবাও বুঝিতেছি না।

যদি কোনও সুযোগ্য ব্যক্তি তন্ত্র আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি হইতে একখানা স্বাস্থ্য-বিদ্যাবিষয়ক বিস্তৃত পুস্তক সঙ্কলন করেন; তাহা হইলে এই দুর্দ্দিনে একটা প্রকৃত কার্য্য করা হয়, একথা না বলিলেও চলে। আমাদের কবিরাজগণের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত—যাঁহাদের রোগিদর্শনের ফি ১৬ টাকা হইতে ৩২ টাকা—তাঁহাদের এ প্রকার পুস্তক প্রণয়ন কার্য্যে অবসর, স্বার্থত্যাগ ও অধ্যবসায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। আর অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত কবিরাজগণ কর্ত্তৃক এ কার্য্য যে হইতেই পারে না, সে কথা না বলিলেও চলে।

বিধাতা যদি কখনও দুর্ভাগ্য ও আত্মোপেক্ষিত জাতির উপর মুখ তুলিয়া চাহেন, তবেই তাহাদের মঙ্গল, নচেৎ সম্মুখে কেবলমাত্র দুর্ভেদ্য অন্ধকার ও নৈতিক নৈরাশ্য ব্যতীত কিছুই দেখা যায় না। রাজনৈতিক অধিকারলাভের চেষ্টা অপ্রশংসনীয় নহে—কিন্তু অল্পায়ু জাতির পক্ষে রাজনীতি অপেক্ষা স্বাস্থ্য-নীতি অধিক প্রয়োজনীয়—এ কথা বলাই বাহুল্য।

অধ্যাপক—শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ভূষণ এম, এ।

স্বামী বিবেকানন্দ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্বামীজি আমেরিকায় গিয়া তত্রত্য স্ত্রীলোকদের হইতে যখন খুব প্রশংসা ও মহাত্মতা লাভ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সব চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে উহাদের অতিশয় সুখ্যাতিপূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন। শিষ্যগণের নিকটে ২।১১।৯৩ তারিখের চিঠিতে আছে—"আর ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত" (পত্রাবলী ১ম ভাগ ৩১পৃষ্ঠা।) শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রের নিকটে লিখিত ২৮।১২।৯৩ তারিখের চিঠিতে আছে "* * এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। * * * এ দেশের দুয়ার যেমন খোলা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন * * * আর এদেশের মেয়েরা কি পবিত্র। ২৫।৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন, আর আমরা কি করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে নাহলে খারাপ হয়ে যাবে। আমরা কি মানুষ? * * * ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না। (পত্রাবলী ১মভাগ ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা) খেতড়ির রাজাকে ১৮৯৪ অব্দে যে পত্র লেখা, তাহাতে ছিল—"আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবনসম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি—শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের নারীর মত চাল-চলন নহে—তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল শান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও ঐ প্রকারের নানা বিভীষিকাময় কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে একবৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি, ঐ প্রকারের মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকাবাসিনী রমণীগণ তোমাদের ঋণ আমি শতজন্মেও শোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না—তাহাকে

কিরূপে তিনি অসহায় অবস্থায় ঐ সকল রমণীদের নানাপ্রকারের সাহায্য লাভ করেন, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন—পরে বলিয়াছেন—"কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি—কত শত জননী দেখিয়াছি, যাহাদের নির্ম্মল চরিত্রের—যাহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই—কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি যাহারা ভারানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্ম্মল। আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না।" তবে তিনি তাহার মন্দ ভাগও যে দেখেন নাই—তা, নয়—কিন্তু তাহার উল্লেখ কি সংযত ও সাবধানে করিয়াছেন—"তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? তাহা নহে, ভালমন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপদার্থ অসার অংশ দর্শনে সমগ্র জাতির ধারণা করিলে চলিবে না, কারণ উহারাও আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়াই থাকে; যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র, তাহাদ্বারাই জাতীয় জীবনের নির্ম্মল ও সতেজ প্রকাশ নিরূপিত হইয়া থাকে।" (বি: ২৫১-৫৩ পৃঃ) খুব উদার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু দুই বৎসর পরে আমেরিকা হইতে ইউরোপে আসিয়াই যেন "বদলিয়ে গেল মতটা।" ১৮৯৬ অব্দে বিলাতে বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—*

"The Hindus to produce a little chastity in the race, have degraded all their children by child marriage, which in the long run has degraded the race. † At the same time I cannot deny that this child marriage makes the race more chaste. What would you have? If you want the nation to

* কথাগুলি সমস্তই জানা আবশ্যক বলিয়া একটু বিস্তৃত 'কোটেশন' করা হইল। বিবেকানন্দের জীবনলেখক এই সকল কথার উল্লেখ করেন নাই—করিলে তাঁহার বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহা যে অন্ততঃ আংশিক সত্য, এটা স্বীকার করিতে হইত।

† এটা কি ঠিক? তিনি তো "My Master" বিষয়ক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—The boy (রামকৃষ্ণ) had been married at the age of about eighteen to a little girl of five. Of course such a marriage is but a betrothal. The real marriage takes place when the wife grows older when it is necessary for the husband to go and bring his wife to his own house (Notes of Collections p 21).

be more haste, you degrade men and women physically by this awful child marriage. On the other hand, are your safe on your side? No, because chastity is the life of a nation. Do you not find in the history that the first death sign of a nation has come through unchastity? When that has entered, the end of the nation is in sight. Where shall we get a solution of these miseries then? If parents select husbands and wives for their own children, then this evil of love is prevented. The daughters of India are more practical than sentimental. Very little of poetry remains in their lives. Again, if people select their own husbands and wives that does not bring much happiness. The Indian woman is very happy, there is scarcely a case of quarrelling between husband and wife. On the other hand, in the United States, where the greatest liberty obtains, scarcely is there a happy home. There may be some, but the number of unhappy homes and marriages is so large that it passes all description. Scarcely could I go to a meeting or society but I found three quarters of the women present had turned out their husbands and children. It is so here there and every where."

(Nateson's Collections. Maya and Illusion"—pp 203—204).

এই গেল আমেরিকার নারীবিষয়ক কথা। এখানে এইটুকু উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি যে, যিনি সভাপতিরূপে যিনি তদানীং অপরিচিত বিবেকানন্দকে চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় বক্তৃতার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সেই ডাঃ ব্যারোজ ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে গিয়া বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগ করেন—তন্মধ্যে আমেরিকার নারীগণের অযথা নিন্দাও একটা বিষয়। এই অভিযোগের উত্তরে স্বামীজি আমেরিকার অনেক বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাতে বলিয়াছেন—"একটা বক্তৃতায় আমি হিন্দুদের (অর্থাৎ মিশনারিদের) সম্বন্ধে ও তাদের উৎপত্তি নিয়ে দু'একটা কথা বলেছিলাম—অবশ্য ইংলণ্ডে ধর্ম্মযাজকদের বাদ দিয়ে—আর সেই সঙ্গে আমেরিকায় চার্চ্চগুলি

স্ত্রীলোকদের ও তাদের কুৎসা উদ্ধারের শক্তিসম্বন্ধে একটু উল্লেখ করেছিলাম। এটাকে নিয়ে মিস্‌রা খুব লাফালাফি করে বলে বেড়াচ্ছে, আমি নাকি সমস্ত আমেরিকার নারীজাতির নিন্দা করেছি—মতলব আর কিছুই নয়—ওদেশে আমি যে কাজটা করে এসেছি, সেটা পণ্ড করা। ইত্যাদি (বিঃ ৭৪৩ পৃঃ)। * এ সকলের সঙ্গতিবিধান পাঠকগণ নিজেরাই করিবেন। আমিতো দেখিতেছি কেবল 'মায়া ও ইলিউশন' !!

ভারতের নারীগণের সম্বন্ধেও বিবেকানন্দের দু'রোখা কথা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। সাধারণ জনগণ সম্বন্ধেও তদীয় মতামত উল্লেখযোগ্য বলে করিতেছি।

আমেরিকার পথ হইতেই চীন ও জাপান দর্শনান্তে মাদ্রাজী বন্ধুগণের নিকটে লিখিত চিঠিতে আছে—"শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে তোমরা বল দেখি ?" আবার আছে "এসো মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্তথেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ সব জাতি কেমন উন্নতিপথে চলেছে।" তারপর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মাদ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন যোগান করবে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হইয়াছে তাদের মানুষ করবার জন্যে আমরণ চেষ্টা করবে।" (পত্রাবলী ১ম ভাগ ১৩-১০ পৃষ্ঠা) তারপর ভাবতে লাগিল একদিন এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—" সংগ্রামশীলতাই জীবনের চিহ্ন, যে জাতির চেষ্টা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই, সে জাতটা মরেছে—যেমন আমাদের জাত।' (বিঃ ৬৯৮ পৃঃ) এখন পশ্চাত্য সমাজের লোকসাধারণের কিরূপ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, দেখা যাউক। মাদ্রাজী শিষ্যগণের নিকটে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চিকাগো হইতে লিখিত পত্রে আছে "এখানকার একজন রেলের কুলি তোমাদের অনেক যুবক এবং অধিকাংশ রাজা রাজড়া হইতে অধিক শিক্ষিত। আমরাও কেননা উহাদের মত শিক্ষিত হইব ? অবশ্য হইব।" আমরা দরিদ্র বলিয়া যদি ওছুহাত নেই—এই মনে করিয়া তিনি লিখিয়াছেন "মনে করিওনা

* বিবেকানন্দচরিত-লেখক মহাশয়ও বলিয়াছেন "কিন্তু ওকথা সত্য নহে। ভারতীয় কোন লোকের না হউক তাঁর আমেরিকান ভক্তগণের চিত্রকে এমনটি ভাবিতে পারিব।" ইত্যাদি (বিঃ ৫০১ পৃঃ।

আমরা দরিদ্র *; অথ জগতে শক্তি নহে, সাধুভাই, পবিত্রতাই শক্তি। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত শক্তি কিনা।" (পত্রাবলী ১ম ভাগ ৩৪ পৃষ্ঠা) এই পাশ্চাত্য "সুশিক্ষিত" কুলী প্রভৃতির জ্ঞান ও চরিত্র কিরূপ, স্বামীজির বর্ণনায় দেখা যাইবে। এক বিপ্র একদিন এক কয়লার খনিতে গিয়াছিলেন * * * জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি খ্রীষ্টকে জানো? তাহাতে শ্রোতৃবর্গের একজন বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত উত্তর করিল, আজ্ঞে তার নম্বরটা কত?" * * * এই বলিয়া স্বামীজি গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "পাশ্চাত্যের লোকেরা এশিয়ার লোকের মত ধর্ম্মপ্রাণ নহে। সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের চিন্তাই নাই। একজন ভারতবাসী লণ্ডন বা নিউইয়র্কে গেলে প্রথমেই দেখে—সেখানকার দুর্নীতিপরায়ণতা তাহার কল্পিত নরকের চেয়েও বেশী। এশিয়ার লোক যতই অধঃপতিত হউক, লণ্ডনের হাইড্‌পার্কে দিন দুপুরে যে সব কাণ্ড ঘটে তা দেখলে তারও মনে ঘৃণা হয়;" † তিনি বলিতেন, "পাশ্চাত্য দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা শুধু যে তাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ, তা নয়, এদিকে অত গোঁড়া ও অসভ্য।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন, এক কয়লার গাড়ীর গাড়োয়ান তাঁহার প্রাচ্য পোষাকের উপর একটা কয়লার চাঁই ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। (বিঃ ৮৩০-৩১ পৃষ্ঠা) তবে আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর জন্য স্বামীজির এ দরদ কি জন্য? এদের "পশুত্ব কোথায়?" দারিদ্র্য তো নিম্ন শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ নাহে—সমস্ত শ্রেণীতেই তাহা অল্পাধিক রহিয়াছে—পুরোহিতশ্রেণীতে দারিদ্র্য নিত্যসিদ্ধ। তারপর 'জ্ঞাতটা মরেছে তো' বলিয়াছিলেন—আবার তিনিই অন্যরূপও বলিয়াছেন। "যদি কেহ বলিত ভারতীয় জাতি জরাগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে", তাহা হইলে তিনি নানা উদাহরণ দ্বারা দেখাইতেন, "জাতিটা প্রাচীন হইলেও যুবার ন্যায় সবল ও সতেজ আছে, তাহার প্রমাণ

* অথচ আমেরিকার পথ হইতে প্রাগুল্লিখিত পত্রের একস্থানে আছে "চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতাসোপানে একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দরিদ্রের অতি দারিদ্র্যই তাহার প্রধান কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তাঁহার প্রাত্যহিক অভাবই তাহার মস্তিষ্ককে এতদূর আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না। (পত্রাবলী ২য় ভাগ ৮ পৃষ্ঠা।

† কিন্তু ভারতে অপরাধীর সংখ্যা অল্প বলায় নাকি তিনি সিষ্টার নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, "হা ভগবান! এরূপ না হইয়া যদি ইহার বিপরীত হইত। কারণ এই অপরাধানুষ্ঠান পরিতাপ বা অপরাধের অল্পতা এটা মৃত্যুর লক্ষণ।" (বিঃ ১৩৫ পৃঃ) এর উপর আর কথা চলে না ইহাই "ধর্ম্মপ্রচারকের" উক্তি!!

এই, এদেশের সমাজ যত শীঘ্র বিদেশের সভ্যতাকে আপন শরীরের অংশবিশেষে পরিণত করিয়া লয়, অপর কোনও সমাজ তাহা পারে না।" (বিঃ ৮২০-২১ পৃঃ)

তিনি পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করিয়া এক ইংরেজী বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"Social matters in India have not been free, but religious opinion has. Here (অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে) a man may dress any way he likes, or eat what he likes, no one says nay or objects but if he misses attending the Church Mrs. Grundy is on him." "Maya and the conception of God"—Nateson's Colection p. 222. (বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত হইল না)।

কিন্তু এই তুলনা কি ঠিক? এখানে কি কেহ কোনও পোষাকে কোনও দিন আপত্তি করিয়াছে? এই যে ইংরেজীশিক্ষিতের দল—কেহ কোট-প্যাণ্ট, কেহ চোগা চাপকান, কেহ হেট-কোট, কেহ পাগড়ী, কেহ শামলা, কেহ ক্যাপ, নানারূপ পোষাক পরেন—এজন্য কি কেহ সমাজচ্যুত হইয়াছেন? অবশ্য খাদ্যাখাদ্য বিচার একটা আছে—কিন্তু তাহাতেও কেহ ভাত, কেহ রুটি, কেহ বা মাংস, কেহ নিরামিষ ভোজন করিতেছে—তজ্জন্য কে কবে সমাজ-বহিষ্কৃত হইয়াছে? আর পাশ্চাত্যেরা এখানে আসিয়াও এই গ্রীষ্মের মধ্যেও ধুতি পরে না—তাহাদের আট-সাট পোষাকই পরিধান করে—ক্বচিৎ ভাত খায়—পরন্তু মাংসভূয়িষ্ঠ আহারই করে। ও দিকে বিদেশীয়েরা পাশ্চাত্য দেশে গিয়া যদি অনুরূপ পোষাক পরে, তবে যে বিড়ম্বনা হয়, ইতঃপূর্ব্বে স্বামীজির উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই দেখান হইয়াছে। তাঁহার একখানি পত্রে আছে:—"এদেশের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পোষাক সম্বন্ধে বড়ই খুঁৎখুতে, আর এদেশে তাহাদেরই প্রভুত্ব"—(পত্রাবলী ১ম ভাগ ২৭ পৃঃ) তবেই তো কেবল বিদেশীর নয়, ওদের দেশের লোকেরাও যদৃচ্ছা পোষাক পরিতে পারে না। আহার সম্বন্ধেও বিবেকানন্দই প্রমাণ। তিনি কাঁটাচামচের পরিবর্ত্তে শুধু হাত দিয়া খাইতে চাহিতেন, "প্রথম প্রথম ও দেশের লোকেরা তাঁহাকে শুধু হাতে খাইতে দেখিলে যেন স্তম্ভিত হইয়া যাইত—কারণ ওদেশে কাঁটাচামচে ব্যবহার না করা ঘোর অসভ্যতার চিহ্ন।" (বিঃ ৫৬৩) তা হলে স্বাধীনতা কোথায়? বরং এদেশে এইটুকু উদারতা আছে যে, বিদেশীর যাদৃচ্ছিক আহার পোষাক সম্বন্ধে কেহ কুত্রাপি কটাক্ষপাতও করিবে না।

স্বামিজী এদেশে কাহাকেও ইউরোপীয় পরিচ্ছেদ পরিহিত দেখিলে বিরক্ত

হইতেন। কতিপয় সিংহলবাসীর ঐরূপ পোষাক দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এরূপ জন্য অনুকরণ অতীব হেয়।" বিশেষতঃ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ভারতের পক্ষে অচল। কালা চেহারায় ওসব মোটে মানায় না। (বিঃ ৬৩৭ পৃঃ)। তিনি আরও বলিয়াছেন—"যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয় বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত।" (বিঃ ৯১৬) উত্তম কথা। কিন্তু তিনি যখন শেষের বার পাশ্চাত্য দেশ বেড়াইয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁর পোষাকটি কি রকম ছিল? বোম্বাই হইতে কলিকাতার পথে "স্বামীজি ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে মনোবাবুও তাঁহাকে ভালরূপ চিনিতে পারেন নাই—ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; কি জানি যদি অন্য কেহ হয়।" বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলে বাগানের মালী ছুটিয়া গিয়া মঠের লোকদিগকে সংবাদ দিল, "ওকো সাহেবো আউচি।" (বিঃ ৯৮০ পৃঃ)।

তিনি ধর্ম্মব্যাখ্যা যে ভাবে করিয়াছেন, তাহাও অনেক সময়েই আপত্তিজনক। তিনি বলিয়াছেন "প্রেতপূজাতেই হিন্দুধর্ম্মের আরম্ভ। প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের শরীরে কোন মৃত আত্মীয়ের প্রেতাত্মাকে আবাহন করিয়া তদুদ্দেশ্যে পূজা ও বলি প্রদানের প্রথা ছিল। ক্রমে দৃষ্ট হইল যে, যে সকল ব্যক্তির শরীরে প্রেতের আবির্ভাব হয়, তাহারা বড় শারীরিক দৌর্ব্বল্য অনুভব করে, সুতরাং এ প্রথার পরিবর্ত্তে কুশপুত্তলীতে প্রেতানয়নের ব্যবস্থা হইল এবং তাহারই উদ্দেশ্যে পিণ্ড ও পূজা প্রদত্ত হইতে লাগিল। বৈদিক যুগের দেবতাদির আহ্বান ও পূজাও তিনি এই প্রেতপূজারই পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।" (বিঃ ৭৮০ পৃঃ)। 'শিবলিঙ্গ' ও 'শালগ্রাম' সম্বন্ধে তিনি (প্যারিসে কোনও এক সাহেবের প্রবন্ধের আলোচনায়) বলিয়াছিলেন—"বেদে, বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদসংহিতায় যূপস্তম্ভকে পরব্রহ্মের প্রতিকৃতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা হইতেই পরে শিবলিঙ্গের প্রচলন হয়।" এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেও পারিতেন—কিন্তু তাহা নয়, আবার বলিলেন—"পরে হয় তো বৌদ্ধদিগের আমলে এই শিবলিঙ্গপূজার পদ্ধতি আরও স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; কারণ ঐ সময়ে বৌদ্ধেরা যে সকল 'স্তূপ' নির্ম্মাণ করিত, তন্মধ্যে স্বয়ং বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কোন একটি স্মরণ-চিহ্ন রক্ষিত হইত এবং ঐ স্তূপকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। দরিদ্র বৌদ্ধেরা ধনাভাবে অতি ক্ষুদ্র স্তূপাকৃতি শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশে অর্পণ করাতে কালে সম্ভবতঃ ঐ ক্ষুদ্রাবয়ব

মারকণ্ড গণ্ড পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে ও মারকণ্ডপের প্রতি সম্মান স্তম্ভাকার শিবলিঙ্গপূজায় পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম 'ধাতুগর্ভ।' স্তূপ মধ্যস্থ শিলাকরণ্ড মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদিগের ভস্মাদি রক্ষিত হইত। শালগ্রাম শিলা উক্ত অস্থি ভস্মাদি রক্ষণ শিলার প্রাকৃতিক প্রতিরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধপূজিত হইয়া কালে বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।" (বিঃ ১৫৯-৬০)।

স্বামীজি যখন প্রায় জীবনপ্রান্তে পৌঁছিয়াছেন, তখন একদিন তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন,—"খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্প ক'রে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একে ত এই dyspeptic (পেটরোগা) রোগীর দল—তাতে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কালসহিষ্ণু উচ্চ সাধনার অনুকরণে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি দেখ বি খোল করতালই বাজ্‌ছে। * * ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানুষি বাজনা শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হ'য়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? * * যে সব musicএ (গীতবাদ্যে) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছু দিনের জন্য এখন বন্ধ রাখ্‌তে হবে।" ইত্যাদি। তবে কি করিতে হইবে, তিনি বলিতেছেন "ঢাক ঢোল দেশে কি তৈরী হয় না? তূরী ভেরী কি ভারতে মিলে না—ঐ সব গুরু গম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। * * ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের বুলন্দিতে তুলতে হবে "মহাবীর মহাবীর" ধ্বনিতে এবং হর হর বোম্ বোম্ শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত কত্তে হবে। * * বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণ সঞ্চার কর্ত্তে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে।" ইত্যাদি (বিঃ ১০৪৯—৫০ পৃঃ)। "খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্প করিলে পেট রোগা হইতে পারে কি না—এ বিষয় ৺গিরিশ ঘোষকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়। চৈতন্যলীলার বোধ হয় তিনি জগাই মাধাই দ্বারা বলাইয়াছেন, সারারাতি কীর্ত্তন করিয়া ওরা কিদে বাগিয়ে নেয় আর দিস্তায় দিস্তা লুচি শাবাড় করে।" বৈরাগী

* এইরূপ কথা কোনও সাহেবের মুখ হইতে বাহির হইলে বরং সহনীয় হইত। একজন সন্ন্যাসবেশধারী ধর্ম্মপ্রচারক—প্রসিদ্ধ হিন্দুর পক্ষে এরূপ ব্যাখ্যা কিরূপ শোভন—সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। (ধর্ম্মের অপব্যাখ্যা এরূপ আরও দুএক স্থলে দেখা গিয়াছে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।)

বর্ণনায় পণ্ডিত করিও ত বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তন পতনে মল্লশরীর।" আর তুমি ভেরীর আওয়াজে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকদের—বিশেষতঃ শিশুদের পেশে চমকাইবে না কি? 'কামগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরণে' দেশ যদি তমসাচ্ছন্ন হয়, আর ডমরু সিঙ্গা বাজাইয়া 'মহাবীর' (অর্থাৎ হনুমানজীর) সৃষ্টি করিলে দেশটা খুব সাত্ত্বিক হইবে। (হনুমানের রাজসিক প্রকৃতি কে পাইবে—একমাত্র স্বামীজিই ইহার প্রমাণ।) স্বামীজি চান দেশে কেবল একতান—তা তালই বাজুক আর বৈষ্ণব ভাব তিরোহিত হউক। এই কি শেষ সমন্বয়!!

ফলকথা স্বামীজির ভাব স্বভাব সন্ন্যাসিস্বের বিরোধী—তিনি প্রকৃত ত্যাগী ছিলেন—তাহা সন্ন্যাসীর সাজে আবৃত ছিল মাত্র—কিন্তু বাক্যে ও কার্য্যে তাহা সতত্বই প্রকট হইত। সেই সম্বন্ধেই এখন আলোচনা করিব।

তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলিতেছেন—"তাঁহার চরিত্রে দুইটি অসমঞ্জস প্রকৃতি অতি সুসমঞ্জসরূপে পরস্পর বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিত—একটি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব, অপরটী আনন্দের শুদ্ধবিগ্রহরূপে জগৎ-রস আস্বাদনের ভাব।" (বিঃ ৯৩পৃঃ) এটা সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বের কথা হইলেও, তাঁহার সমগ্র জীবনেই এই দুইটি ছিল—তবে জীবনচরিতকার যে ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেভাবে নয়। মুখে ও পোষাকে ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসী, কিন্তু আচার আচরণে পূর্ণ "জগদ্ররসাস্বাদনের ভাব।" এই দুইটিতে 'সমন্বয়' (?) যদি হয়—তবে এতদিনই হইয়াছে। ত্যাগের মধ্যে এই মাত্রই দেখা যায় যে, তিনি বিবাহ করেন নাই—কিন্তু বিবাহ করিলেই যে সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট—ভোগের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, এটাও বিবেচ্য। সাংসারিক কর্ম্ম করিলে তিনি হয়তো একটা "দুষ্ট উকীল" (পত্রাবলী ১ম ভাগ—১৩ পৃষ্ঠা) হইতে পারিতেন কিন্তু, সন্ন্যাসী সাজায় যে ব্রাহ্মণ ও রাজরাজড়ার দ্বারা পদসেবা করান যায় * এটাও আদত কায়েতের ছেলে বিবেকানন্দ বিলক্ষণই বুঝিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী সাজিয়া

* এ স্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও কায়স্থ গৃহস্থ গিরীশ বাবুকে প্রণাম করিয়াছেন (বিঃ ৬৯০) ও নাগ মহাশয়কে পত্রে 'অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ' জানাইয়াছেন (পত্রাবলী ১ম ভাগ ৭০ পৃঃ) এবং সাক্ষাৎকালে প্রণাম (বিঃ ২১৮) করিয়াছেন। [এই নাগ মহাশয় সম্বন্ধে স্বামীজি বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু নাগমহাশয়ের মত মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না। (বিঃ ২২৫) অথচ পাওহারিবাবা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "রামকৃষ্ণদেবের পরই পাওহারি বাবার স্থান।" (বিঃ ৮৫১ পৃঃ) তবে কি নাগ মহাশয় পরমহংসদেব ও পাওহারি বাবা অপেক্ষাও বড় ছিলেন?]

বিবেকানন্দ ত্যাগ যে কতটা করিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখা যাউক। চা, চুরুট, মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ ত চলিতই—'লঙ্কা' প্রিয়তার জন্য মধ্যে মধ্যে মিথ্যা ওজুহাতও দিতে হইত। এক স্থলে আছে—"লঙ্কামরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য স্বামীজির বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেন—পাশ্চাত্য দেশে সন্ন্যাসীদের দেশবিদেশে নানাপ্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়, তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ নিবারণের জন্যই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকেন। আমিও সেই জন্য লঙ্কা খাই।" (বিঃ ২৯৬) আমেরিকায় অবশ্যই "নানাপ্রকার দূষিত জল পানের" আশঙ্কা ছিল না—সেখানের অজুহাত শুনুন—"তিনি তরকারিতে এত ঝাল দিতেন যে, আর কেহ তাহা খাইতে পারিত না। তিনি নিজে ঝাল ভালবাসিতেন বলিয়া যে দিতেন শুধু তাহাই নহে, অনেক সময়ে দেখিতেন অপরের জিহ্বায় কতটা ঝাল মসলা সহ্য হইতে পারে। তিনি বলিতেন যে, ঐরূপ ঝাল মসলা তাঁহার শিক্ষারের পক্ষে ভাল।—বস্তুতঃ কিন্তু ঠিক তার বিপরীত।—তবে তাঁহার মুখে ভাল লাগিত বলিয়া তিনি ঝাল দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না।" (বিঃ ৫৬৬)। [তাঁহার জীবনচরিতলেখকও এখানে কি বলিতেছেন, দেখুন।] আর ঝাল খাইবার জন্য আগ্রহ কত, হইটজারল্যাণ্ডে "লুসারণ হ্রদের ধারে তিনি একদিন খুব ঝাল লঙ্কা দেখিতে পাইলেন। পাশ্চাত্য দেশে গিয়া অবধি এরূপ লঙ্কা দেখেন নাই। তাঁহাকে কতকগুলি কাঁচা লঙ্কা চিবাইতে দেখিয়া বিক্রেতা অবাক্ হইয়া রহিল, কিন্তু তিনি মহাপরিতৃপ্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার এর চেয়ে ঝাল লঙ্কা আছে?'"

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

কট্বম্লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ। ১৭

স্বামীজির প্রকৃতি ইহা হইতেই ধরা পড়িতেছে—রজোগুণ তাঁহাতে প্রবল ছিল—তাই "গায়ের জোরের কথা এত শুনিতে পাই। সংযম অভ্যাস সন্ন্যাসীর ধর্ম। কিন্তু সামান্য 'ঝাল' বা 'লঙ্কা' খাইবার প্রকৃতিটা দমন করিতে পারিলেন না। মেথরের হাত হইতে কলকে নিয়া তামাক খাবার গল্প শুনিয়া নাটককার গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন—'তুই গাঁজাখোর, তাই নেশার ঝোঁকে মেথরের কলকে টেনেছিলি।" (বিঃ ১৮৭ পৃঃ) স্বামীজি অবশ্য অন্যরূপ জবাব দিয়া

ছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় গিরিশ বাবুই ঠিক বলিয়াছিলেন। [কেননা এডেনেও তিনি এক হিন্দুস্থানী পালওয়ানের কাছে গিয়া 'ভেইয়া তোমরা ছিলুনঠো মো' বলিয়া কলিকা লইয়া মহাদুর্তিতে টানিয়াছিলেন। ১ (বিঃ ৬২৫ পৃঃ) চামারের প্রস্তুত রুটি খাইবার ওজুহাত দিয়াছিলেন—'সে সময়ে আমি সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে অগ্নিস্পর্শ করি না।' (বিঃ ৩৪৯ পৃঃ) কিন্তু রুটি—তামাক 'সে সময়' ছাড়িয়াছিলেন কি? তাহাতে তো অগ্নিস্পর্শ হইত। জুনাগড়ে তো "তিনি রন্ধনাদি কার্যে সুপটু ছিলেন—এবং অতি উত্তম রসগোল্লা প্রস্তুত করিতে পারিতেন।" (বিঃ ২৬৫ পৃঃ)। এইরূপ তিনি বহীপুরে বলিয়াছিলেন—"রাজন্! আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি পরিব্রাজক অবস্থায় অর্থস্পর্শ বা কোনও দ্রব্য সঞ্চয় করিব না।" তবে কি আমেরিকা ইত্যাদিতে যাওয়ার কালে 'পরিব্রাজক' অবস্থাটা বুচিয়া গিয়াছিল? কেননা বাবার নিকটে যে অর্থ কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইয়াছিল, সেটা পত্রাবলী হইতেই জানিতে পারা যায় (প্রথম ভাগ ৪ নং পত্র দ্রষ্টব্য)। আমেরিকায় তো বক্তৃতা দিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া বেলুড়মঠ নির্মাণে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। (বিঃ ৮০৩ পৃঃ)।

বিলাসিতার ভাব তাঁহার জীবনে বহুশঃ দেখা গিয়াছে—অন্ততঃ একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে এরূপটা অবাঞ্ছনীয়। কখন শ্রীযুত হরিপদ মিত্রের আবাসে (বেলুগাওয়ে) গেলেন, সঙ্গীয় জিনিস মধ্যে একখানি মাত্র পুস্তক ছিল—সেখানি ফরাসি সঙ্গীতসম্বন্ধীয়। (বিঃ ২৯১ পৃঃ) ফরাসীদের সঙ্গীতে বৈরাগ্যের উদ্দীপক উপাদান আছে কিনা জানি না। নবেলের প্রেমে আমিনীতে যে বিলক্ষণ রুচি ছিল—তাহা তাঁহার কথা হইতেই জানিতে পারি—"তোমরা কি জানো যে, আজকাল আমি উপন্যাসের প্রেমকাহিনী পর্যন্ত পড়তে পারি না" (বিঃ ৬২৫)—এই উক্তি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময়ে—বোধ হয় ১৩০৪ সালে। তিনি রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর লোকে অতিশয় অস্থির হইয়া ইহার (নটুকৃষ্ণ নামক শিষ্যের) নিকটে একখানি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট প্রার্থনা করায় ইনি (নটুকৃষ্ণ) বলিয়াছিলেন, "কি গুরুজি বিলাসে চুকেছ

---

১ জীবনচরিতকার অবশ্য ইহাতে 'অমায়িকতা' মাত্রই দেখিতে পাইয়াছেন—তাই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

২ তিনি এই লেখকের নিকটে ফ্রেঞ্চ নভেল পড়িবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ('আমাদের বিবেকানন্দ' প্রবন্ধ 'সাহিত্য' ফাল্গুন চৈত্র ১৩২৯-৩০ দ্রষ্টব্য।) তখন তাঁহার শেষ ভাগ (১৩০৮ কোঠা)।

নাকি ?" (বিঃ ৭৮৫ পৃষ্ঠা)। 'বিলাস' আমেরিকার নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ্রের সময়েও দেখা গিয়াছে—তথায় প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেন। আমেরিকায় নাকি কানাডা ব্যতীত আর কুত্রাপি ফাষ্ট ক্লাস ছাড়া গাড়ী নাই। এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সুতরাং আমাকে ফাষ্টক্লাসে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে * * আমি কিন্তু উহার পুলমান গাড়ীতে চড়িতে ভরসা করি না।" কারণ পত্রেই ছিল,—"এগাড়ীতে (ফাষ্ট ক্লাশ) বড়ই আরাম * * * তুমি যেন হোটেলেই আছ বোধ করিবে; কিন্তু বেজায় খরচ।" (পত্রাবলী ১ম ভাগ ৪র্থ পৃষ্ঠা।) ভ্রমণকালে রাজা রাজড়াদের অতিথি হইয়া "রাজকুমারদের সহিত অশ্বারোহণ বা অন্যান্য ক্রীড়ায় যোগ দিতেন। (বিঃ ২৭৪ পৃঃ)। ইউরোপ-আমেরিকায় স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবেই মেলামেশা করিয়াছেন—ফ্রান্সে অভিনেত্রী ও গায়িকার সঙ্গে কেবল ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই—পরন্তু গায়িকার সঙ্গে একত্র ভ্রমণও করিয়াছেন। (বিঃ ৯৭১ ও ৯৭৯ পৃষ্ঠা)। আমেরিকায় নাকি তাঁহাকে "সভ্যসমাজের রীত্যনুযায়ী কখনও কখনও নৃত্য করিতে হইয়াছিল; তিনি ওদেশের নাচের অনেক বোলও শিখিয়াছিলেন।" (বিঃ ৭৭ পৃঃ ফুটনোট।) ধন্য বিবেকানন্দ! তুমি না গিরিশ ঘোষকে বলিয়াছিলে "ঠিক্ ঠিক্ সন্ন্যাসব্রত রক্ষা করা মহাকঠিন, কথায় ও কাজে একচুল এদিক্ ওদিক্ হবার যো নাই। (বিঃ ১৮৭ পৃঃ) আর তোমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভূয়োভূয়ঃ স্ত্রীলোকের সংস্রব সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। "সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখিবে না। * * * সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রিয় হলেও লোকশিক্ষার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবে না—ভক্তলোক হইলেও বেশী ক্ষণ আলাপ করবে না।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ৪র্থ ভাগ—২৯ পৃঃ।

ফলতঃ বিবেকানন্দের সন্ন্যাসধর্ম্ম একটা বাহ্য আবরণ মাত্র। সন্ন্যাসী শোক দুঃখে অবিচলিত—স্তুতিনিন্দায় নির্বিকার হইবেন। এদিকে ফচ্‌কে হওয়াও অনুচিত। কাশ্মীরে ভ্রমণের সময় একজন তাঁহার ফাষ্ট নষ্ট বা চাপল্য দেখিয়া আপত্তি করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"আমরা জ্যোতির সন্তান,

* আমেরিকায় বিবেকানন্দসম্বন্ধে একটা কুৎসিত অভিযোগ উঠিয়াছিল যে, তিনি কোনও গৃহস্থের এক পরিচারিকার সঙ্গে 'অসংযত আচরণ' করেন (বিঃ ৫৬৯ পৃঃ) কথাটা মিথ্যা হইলেও স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলা মেশা হইতেই এই অপবাদ উদ্ভূত হইতে পারিয়াছিল। "মূলং বা সত্যং বা হবতি মহিমানং ধ্বনয়বঃ।"

আনন্দের তনয় আমরা কেন মুখ অন্ধকার করে থাকবো' (বিঃ ৮৯০-৯১ পৃঃ) অর্থাৎ চাপল্যেই কেবল উচ্ছলমুখ হয়। প্রশান্তচিত্ত ব্রহ্মানন্দ উপভোগপরায়ণ মহাত্মগণের বদনে যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসি ফুটিয়া উঠে—তাহাই লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ফষ্টি-নাষ্টিতে চিত্তবিক্ষেপই সূচিত হয়। এদিকে বলরাম বাবুর মৃত্যু সংবাদে যখন স্বামীজি রোদন করিতেছিলেন—তখন এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন—'আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এত শোকাকুল কেন? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোকপ্রকাশ অনুচিত।" তখন এই তার্কিকচূড়ামণি বলিয়া উঠিলেন—"বলেন কি, সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া হৃদয়টা বিসর্জ্জন দিব? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং আরও অধিক কোমল হওয়া উচিত। [illegible] যে সন্ন্যাসে হৃদয়কে পাষাণ কর্ত্তে উপদেশ দেয়, আমি সে [illegible] গ্রহণ করি না।" (বিঃ ২০৩-৪ পৃঃ) 'গ্রন্থ' যে করেন নাই—ইহাই কি? এদিকে বেলুড়মঠ স্থাপিত হইলে "নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেন। "চলতি নৌকায় আরোহিগণের মুখ দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিতে [illegible] মুষ্টিত হইল না, কিন্তু স্বামীজি বলিতেন—

হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকারয়ে হাজার।
সাধুনকো দুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার॥" ইত্যাদি

(বিঃ ১৬৮ পৃঃ)

বেশ কথা। কিন্তু কাজ কি হইল? মঠে প্রতিমা আনিয়া দুর্গোৎসব করা হইল—"বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়ার পরিচিত, অপরিচিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল"; [illegible] "তদবধি [illegible] প্রতি কাহারও পূর্ব্ববিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া ধারণা জন্মে যে, মঠের সন্ন্যাসীরা কিরূপ সন্ন্যাসী।" (১০৪১-৪২ পৃঃ) 'অভীঃ' মন্ত্রের প্রচারক ভগবানের নিকট মাথা নুঁইলেন।*

* না-ই বা করিবেন কেন? "মাকে পাউরুটী প্রস্তুতের জন্য গমভাঙ্গা [illegible] পাথরে লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন [illegible] তাহা করেন নাই। (বিঃ ১০০ পৃঃ) নাম মঠ কিন্তু 'পাউরুটী' প্রস্তুতি [illegible]

- তিনি একদা [illegible] নিবেদিতার বাসায় এক দিবসে তামাকু সম্প্রদায়ের [illegible] কেন না কোন লোকের কোন কোন ধারণা ছিল, "তিনি নাকি বেডকার্য্যালয়ের সৃষ্টি [illegible] [illegible] [illegible]

এখন এই আলোচনার উপসংহার করিতে হইবে। যে জীবনচরিতখানি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়াছে—তাহাতে অত্যুক্তিবাদ কিছু আছে—এবং জীবনচরিতে এরূপ থাকেই। তবে এ সকলের অনেকগুলিই প্রতিবাদযোগ্য; কিন্তু প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতি ভয়ে কেবল একটিমাত্র (নমুনা স্বরূপ) দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। স্বামীজি আলমোড়ায় হিন্দী ভাষায় একটী বক্তৃতা দেন; তদুপলক্ষে চরিতকার বলেন, "হিন্দী ভাষাও সুললিত বক্তৃতা-প্রদানোপযোগী বলিয়া পূর্ব্বে কাহারও ধারণা ছিল না।" ইত্যাদি (বিঃ ২য় খণ্ড ৭৩ পৃষ্ঠা)। আর কাহারও কথা আমি বলিতে পারিব না,—কিন্তু ইহা নিশ্চিতভাবেই অবগত আছি যে, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাঙ্গালী হইয়াও হিন্দী ভাষায় অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারিতেন এবং সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার ঐ ভাষায় উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় সনাতন ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

বিবেকানন্দ শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই—এবং তাঁহার বাগ্মিতাও অসাধারণ ছিল। বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ এবং তর্কশক্তি খুব প্রখর ছিল। ইংরাজীতে তাঁহার অসামান্য দখল ছিল,—সংস্কৃতেও তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। নানা বিষয়েই তিনি অল্পপ্রতিষ্ঠ ছিলেন—বিশেষতঃ ইউরোপীয় ও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল। এরূপ ব্যক্তি কালাপানি পার হইয়া তাঁহার পূর্ব্বে ইউরোপে ও আমেরিকায় অতি কমই গিয়াছেন। অতএব ঐ সকল দেশে তাঁহার নাম যশঃ হওয়া প্রত্যাশিত বিষয়ই ছিল। তিনিও তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ঐ সকল দেশে সীমাবদ্ধ রাখিলে, আমার বোধ হয়, জগতের সমধিক উপকারই হইত। কিন্তু ভারতবর্ষ ইউরোপ বা আমেরিকা নহে যে, এখানে তিনি যাদৃচ্ছিকভাবে ধর্ম্ম-প্রচার করিবেন—আর লোকে তাহা 'নূতন একটা কিছু' বলিয়া গ্রহণ করিবে। এদেশে 'বেদান্তের' বাণী অনেকশঃ নানাভাবে শ্রুত হইয়াছে। এখানে তিনি যাহা প্রচার করিবার জন্মতঃ অধিকারী ছিলেন এবং রজোগুণাধিক্য যাতে দরকার—তাহা ছিল 'রাজনীতি' এবং তিনি স্বয়ং যাহাই বলুন না কেন, তাঁহার দ্বারা পাকে প্রকারে রাজনীতি' ভাবই প্রচারিত হইয়াছে। প্রবন্ধে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার

---

* "কাপুরুষতা কি রাজনৈতিক বীরত্বাদির সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি রাজনীতি মোটেই বিশ্বাস করি না।" ইত্যাদি (শিষ্যাদের নিকট লিখিত পত্র)—বিঃ ৫২৫ পৃঃ।

দ্বারাই বোঝা যাইবে—তিনি (এদেশে অন্ততঃ) ধর্ম্মপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণের অনধিকারী ছিলেন।

তবে আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ স্কুল কলেজের ছেলেরা কোনও রূপ ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা পায় না—তাই ধর্ম্মের নামে যাহাই খুব চোট্‌পাটের সহিত শুনে বা পড়ে, তাহাই অবিচারিতভাবে গ্রহণ করে—বিশেষতঃ ইউরোপ আমেরিকা দিগ্বিজয় করিয়া দু'একজন সাহেব বিবি শিষ্য করিয়া বিবেকানন্দ তাহাদের তরুণ হৃদয়ে তৎপ্রতি একটা প্রশংসানুরাগের ছাপ মারিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বিশেষতঃ তরুণবয়স্কদের ভাবপ্রবণ চিত্তে বিচারক্ষমতা স্বল্প থাকায়—তাঁহার সমগ্র লেখা ও বক্তৃতায় যে পরস্পর বিরোধী নানা বিষয় আছে, তাহা উহারা ধরিতে পারে না—শিক্ষার অভাবে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না থাকায় তাঁহার উক্তির অশাস্ত্রীয়তাও বুঝিতে পারে না। এই নিমিত্তে বিবেকানন্দভক্ত অনেক বালক এবং বালকোপম যুবক এবং প্রৌঢ় দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সময়েও এইরূপই ঘটিয়াছিল। সেই স্রোত যেমন ফিরিয়াছে, আশা করি ভগবদিচ্ছায় এই বিবেকানন্দী মোহও ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে।

বিবেকানন্দ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বহুশঃ গালি দিয়াছেন—আমরা যদি আবেগবশতঃ তাঁহার উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কটু বলিয়া থাকি, আশা করি তাহা ক্ষমার যোগ্য হইবে।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

মিলন।

যবে মধুপ্রাতে তোমাতে আমাতে
হইবে মিলন প্রিয়,
এত কাঁদাকাঁদি এত ডাকাডাকি
সার্থক করে নিও!

তিক্ত যা' কিছু করিও মধুর,
গরল করিও সুধা,
মিটাইয়া দিও তৃষ্ণা হিয়ার
এই রাক্ষসী ক্ষুধা!

কৈশোর হ'তে দুঃখ আমার
বক্ষে বেঁধেছে বাসা,
সত্য তাহার লভি আজি মোর
সার্থক ভালবাসা।
অশ্রুর নদী গিয়াছে বহিয়া
মর্ম্মের কূলে কূলে—
করিয়া গিয়াছে হৃদয় ক্ষেত্র
উর্ব্বর ফলে ফুলে।
দগ্ধ মরুতে কুঞ্জের ছায়া
আজি কে দিয়াছে রচি'?
কণ্টক ঘেরা কিরীটে আমার
রত্ন দিয়াছে খচি'।
কুজ্ঝটি ভেদি ফুটিয়া উঠেছে
উষার স্বর্ণ রেখা,
শোণিতের মাঝে হেরি আজিকার
শুভ্র সুরতি লেখা!
তপ্ত বাতাস বহিয়া আনিছে
গঙ্গার হিমকণা,
ক্রূর অজগর মস্তক মণি
দিতেছে—নোয়ায়ে ফণা।
রৌরব মাঝে দিব্য রাগিণী
বাজিয়া উঠিছে নিতি,
অশুভের মাঝে উঠিছে ভরিয়া
তব মঙ্গল গীতি!
তবু কাঁদে প্রাণ মিলনে তোমার
লভিতে চরম মম—
এখানে অসিবৃত্ত—আকার
সেখানে পূর্ণতম!

কবিরঞ্জনাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ।

মিথ্যা অভিযোগ।

গত বৈশাখ মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "স্বামী বিবেকানন্দ" নামে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ঐ-সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই।

লেখক লিখিয়াছেন,—পরমহংস রামকৃষ্ণদেব নিজেকে অবতার মনে করিয়া গর্ব্বিত হওয়াতে তাঁহার ১২ বার বৎসরের তপস্যার ফল নষ্ট হয় ও তাহার শাস্তিস্বরূপ তিনি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করেন। তাহা হইলে লেখক বলিলেন কি যে, গর্ব্বিত হইয়াই শঙ্করাচার্য্য কঠিন ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হ'ন, বুদ্ধদেব রক্তামাশয় রোগে প্রাণত্যাগ করেন, শ্রীরামচন্দ্র ১৪ চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে নির্ব্বাসিত হ'ন এবং যীশুখ্রীষ্ট অকালে ক্রুশে বিদ্ধ হ'ন? এটা শাস্ত্রযুক্তি বটে! কিন্তু আমরা জানি, রামকৃষ্ণদেব আপনাকে অবতার বলিয়া মনে করিতেন না। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, "ভগবানের কি Cancer হয়?"

লেখক বলেন, রামকৃষ্ণদেব শেষকালে পূর্ব্বজীবনের আদর্শানুযায়ী জীবন যাপন করিতে পারেন নাই। হইতে পারে, কিন্তু আমরা জানি সিদ্ধিলাভ করিবার পর সাধনের প্রয়োজনীয়তা থাকে না এবং যদি কেহ পূর্ব্ব সাধনার অনুকরণ করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তিনি লোকশিক্ষার জন্য করিতেছেন। কিন্তু পরমহংসদেব আপনাকে লোকশিক্ষক মনে করিতেন না। আর শিষ্যের গুরুদেবের অতিস্তুতি করিলে বা তাঁহাকে অবতার বলিলে গুরুকে গালি দেওয়া কিছুতেই অনুমত।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কেন যে রামকৃষ্ণদেবের জীবনী প্রকাশিত করিতে নিরত হইলেন, তাহার কারণ আমাদের কাণে ধরিয়া বলেন নাই এবং সম্ভবতঃ তিনি লেখকের প্রতিও সেরূপ ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং এ-সম্বন্ধে কোন অনুমান প্রকাশ করা ন্যায়বিরুদ্ধ।

লেখক স্বামী বিবেকানন্দকে এশিয়ার গৌরবস্থল আপনার সহিত তুলনা করিয়া কবিত্বশক্তির বেশ পরিচয় দিয়াছেন। যথা, চিকাগো বক্তৃতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা পড়িয়া লেখক প্রথমে বুঝিলেন—"এ ব্যক্তি যে সে লোক নহে"

"অদম্য উৎসাহ, দৃঢ় অধ্যবসায়, ব্রহ্মচর্য্য ও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে প্রগাঢ় অধিকার" ইত্যাদি। লেখক দিব্যনেত্রে দেখিলেন—"ধর্ম্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়া, বিজয়মাল্যে বিভূষিত হইয়া" স্বামীজি "এক অতি মহান পুরুষসিংহরূপে আবির্ভূত। সমগ্র ভারতে স্বামীজির জয়ধ্বনি হইতে লাগিল, স্বামীজি সর্ব্বত্র রাজোচিত অভ্যর্থনালাভে আপ্যায়িত হইলেন"। আর রক্ষা নাই, তবে শূদ্র। তাই লেখক পরছত্রেই পরোক্ষভাবে "পাশ্চাত্যের একান্ত অনুকরণে গঠিত, প্রাচ্য-আধ্যাত্মিকতা বিবর্জ্জিত, চাকচিক্যময় সভ্যতার অনুকরণকারী, নিজের স্বার্থের ষোল (১৬) আনা সংরক্ষক", শেষে "প্রবঞ্চক" ইত্যাদি বিশেষণে উভয় জাপান ও স্বামিজী উভয়কেই সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন। কথাটা অত ঘুরাইয়া বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? যাক'—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ করিয়া অন্য কেহই যে স্বামীজী অপেক্ষা অধিক প্রাচ্যভাবসম্পন্ন হইতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ স্বামীজীরচিত "বীরবাণী"র প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে, প্রতি অক্ষরে দেখা যায়। আর তাহা যদি থাকিত, তবে আজভাগ লেখকের মত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের গোময়লিপ্ত কুটীরে অপক্ক কদলীসিদ্ধ ও আতপান্ন খাইয়া নিজেদের আধ্যাত্মিকতা রক্ষা না করিয়া অস্পৃষ্ট ম্লেচ্ছপরিচালিত ইউনিভার্সিটিতে M. A. বিদ্যারত্ন প্রভৃতি 'চাকচিক্যময়' অসার উপাধি লাভের জন্য লালায়িত চেষ্টা করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতেন না।

লেখক স্বামীজির বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিদ্বেষিতার প্রমাণস্বরূপ যে সব উদাহরণ দিয়াছেন, সে গুলি নিতান্ত ছেলে। যথা, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ। লেখকের মত এই যে, যেহেতু স্বামীজী জাতিতে শূদ্র, অতএব তাঁহার প্রাণে সংসারত্যাগের প্রবল বাসনা জাগিলেও এবং তাঁর শ্রবণে মুক্তির ডাক পৌঁছিলেও, তিনি কামিনীকাঞ্চন সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া সেই প্রবল বৈরাগ্য অনল নির্ব্বাপিত করিতে বাধ্য। ইহা কি রামরাজ্যের শূদ্রকোপাখ্যানম্? স্বামীজি শূদ্র, তাঁহার গলায় গোটাকতক সুতার হালি নাই—অতএব সন্ন্যাস লইবেন কিসের জোরে? অর্থাৎ এখন হইতে যাঁহার প্রাণ ভগবানের জন্য কাঁদিয়া উঠিবে, তিনিই বীরভাবে বিচার করিবেন—"তাঁর পিতামাতা উপনয়ন দিয়াছেন কি না এবং তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন কি না"—যদি না করিয়া থাকেন, তবে গৃহে উপনীত হইয়া দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া প্রত্যহ তিনদিন পথ চাহিয়া রাখিয়া "ভগবান্‌কে ডাকতে চল্লুম" বলিয়া সংসার ত্যাগ করিবেন। লেখক বয়, অন্ধাদের মত সেইরূপই হরি

কোথা, কৃষ্ণ কোথা এবলিয়া মুছিত হইলেন তখন নীরব রোদনকে [illegible] আত্মানুমোদিত।

লেখক "অধিকারী" "অনধিকারী" কথা দুটী চালা দিয়াছেন কেন জানি না। মানুষ মাত্রেই, যাহার তীব্র ইচ্ছা আছে, যাহার অদম্য সাধনা আছে বা গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই মুক্তির অধিকারী। সকলেই ভগবানের সন্তান, জাতির গৌরব সেখানে নাই। যথা—দৈত্যরাজ বলি, ভোলাশেখ কবীর, মুসলমান ফকির হরিদাস। যে বলে ব্রাহ্মণ আমিই অধিকারী, তুমি শূদ্র অনধিকারী, সে নাস্তিক, মূর্খ বা প্রতারক।

লেখক বলিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণদেব "একদিনেই" স্বামীজীকে "বৈরাগ্যবান" ও "নিরহঙ্কার" স্থির করিয়া তাঁহাকে সৈনিক বসনে সাজাইয়াছিলেন। কি সূক্ষ্ম দৃষ্টি !! স্বামীজী অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাঁর স্বভাব চরিত্রের বিষয় পরমহংসদেব পূর্ব্বে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন, এবং প্রায়ই কেবল স্বামীজীর কথাই ভাবিতেন। তাঁহার উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম স্বামীজী সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারিবেন, এই বিশ্বাসে এবং স্বামীজীকে সংসারের প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার মানসে পরমহংসদেব স্বামীজিকে গেরুয়া বসনে সাজাইয়াছিলেন। স্বামীজি শখ করিয়া সাজিতে যান নি। আর পরমহংসদেব স্বপ্নের বচন মুখস্থ না করিলেও অথবা স্বামীজীকে শাস্ত্রপ্রণালীতে দীক্ষা না দিলেও সাধারণের বিশেষ কি ক্ষতি হইয়াছে, জানি না। তিনি নিরক্ষর ছিলেন সত্য, কিন্তু যথাকালে 'অক্ষর'কে যথার্থই চিনিয়াছিলেন। মূর্খ আমরা তাই ৪০ বৎসর পরে পরমহংসদেবের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিয়া নিজের অধোগতির ব্যবস্থা করিতেছি।

লেখক বলেন—বিবেকানন্দ "রাজরাজড়ার মাথায় পা দেওয়াত অল্প কথা—ব্রাহ্মণকে পর্য্যন্ত শিষ্য করিয়া তাঁহার দ্বারা পদসেবা করাইয়াছেন" স্বামীজি শূদ্র, তাই তিনি রাজার মাথায় পা দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণ হইলে রাজাদের গলায় পা দিয়া চাপিতে বোধ হয় দ্বিধা বোধ করিতেন না আর রাজারা মাথা নত না করিলে তিনি কখন মই দিয়া উঠিয়া রাজাদের মাথায় পা ঝুলাইয়া দেন নাই। রাজবাড়ীতে তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, বেহায় যান নাই। ইহা স্বাধীনচিত্তের পরিচয়। পরন্তু তিনি ৺কালীঘাটের ক্রিয়াকাণ্ডহীন, দক্ষিণা, অর্থলিপ্সু কতকগুলি ব্রাহ্মণের [illegible] রান্নার ভার প্রাপ্ত হইয়া স্বস্ত্যয়ন করেন নাই। [illegible]

হইয়া বিলাতের সাহেবের জাতটা ধর্কারের সিন্দুর দিতে যান নাই। স্বামীজী জোর করিয়া ব্রাহ্মণকে শিষ্য করেন নাই। মুক্তিপ্রার্থী স্বেচ্ছায় তাঁহাকে বরণ করিয়াছিল; ইহা ভালবাসারই বিনিময়। শিষ্য গুরুর জাতি বিচার করে না। তা ছাড়া সন্ন্যাসীর জাতি থাকে না।—অধিচ স্বামীজি জাতিভেদ মানিতেন না। তাই তিনি উপনয়নের সূত্র দিয়া প্রিয় শিষ্যবর্গকে একত্রে বাঁধিয়াছিলেন।

লেখক লিখিয়াছেন "স্বামীজীর অভিধানে ব্রাহ্মণশব্দ দুষ্ট পুরুত দ্বারা অভিহিত" তিনি দেখিতেছি স্বামীজীর জীবনসম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। স্বামীজী ব্রাহ্মণ নামের উপযুক্ত সকল ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখাইতেন। প্রমাণ তাঁহার গুরু পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি "প্রেম" না থাকিলে তাঁহারা স্বামীজীর আশ্রিত শিষ্য হইতে আসিতেন না। কিন্তু আজকাল বর্ত্তমানের আড়ালে যে সব তথাকথিত ব্রাহ্মণ (যথা কুলপুরোহিত ও তীর্থের পাণ্ডারা) অসংখ্য অকথ্য পাপাচার করিতেছে, যে সকল নিরক্ষর শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, সন্ধ্যাগায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণ আপনাদিগকে সর্ব্বদা ভৃগু-বশিষ্ঠের তুল্যই মনে করিয়া থাকেন এবং যাহারা স্বয়ং ক্রোধ লোভ হিংসায় দগ্ধ হইয়া যজমানের নিকট হইতে ভক্তিপ্রীতি বদান্যতা-বারি সিঞ্চনের অন্যায় আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, সেই সকল ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, শাস্ত্রবিমুখ, আত্মপ্রবঞ্চক ব্রাহ্মণদিগের চির-বিদ্রোহী ছিলেন।

লেখক নিজে মানেন, বেদ, ব্রহ্ম লইয়াই ব্রাহ্মণ। এখন কোথায় বা বেদ, কোথায় বা ব্রহ্ম; কিন্তু ব্রাহ্মণ ভাবেন—তিনিই অক্ষয় বট হইয়া ব'সে আছেন। তাঁহার গায়ত্রী জপ করিবার সময় নাই। 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই ব্রহ্মসাক্ষাৎলাভ মনে করেন।

লেখক জানিতে চাহেন—স্বামীজী 'নিজনামের কতটা অধিকারী'। ইহা নিতান্ত অসার, কিন্তু স্পর্দ্ধার কথা। আমরা বলি লেখকের 'পদ্মে'র উপর যতটুকু অধিকার, স্বামীজীর স্বীয় নামের উপর তাহাপেক্ষা অনেক অধিক অধিকার ছিল। অর্থাৎ লেখকের বুদ্ধিতে কপিল-মুনির কটা বড় ছিল।

লেখক বলেন—স্বামীজী নিজের নাম বারংবার পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজের প্রকৃতির অনেকটা পরিচয় দিয়াছেন।—ইহার অর্থ কি? স্বামীজী কাহারও পত্নী বা কন্যা চুরি করেন নাই যে, ভয়ে তিনি নাম বদলাইতেন। শাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসী ইচ্ছামত নিজের নাম রাখিলে কোন্ শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া জগতের কি অনিষ্ট সাধিত করেন, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিই বলিতে পারেন।

দুই নোটের একস্থানে লেখা আছে—"গুরু গুরুদাস বলিয়াছিলেন যে, যদি স্বামী বিবেকানন্দ না বলিয়া নরেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন দেন, তাহা হইলে আমি সভাপতি হইতে পারি"। আমার মনে হয় কথাগুলি সত্য কি মিথ্যা অথবা জিজ্ঞাস্য করি—এই কথা দ্বারা লেখক মহাশয় স্বামীজীর প্রতি কি মিথ্যারোপ করিতে চান?

পরিশেষে আমার বক্তব্য যে, ঐরূপ অযৌক্তিক, ভ্রমপূর্ণ, অনুমানবহুল, ভ্রান্তিপূর্ণ ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ আমি কখন কোন গ্রন্থে পড়ি নাই। স্বামীজীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি শিষ্টাচার-সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। লেখকের যে ব্রহ্মতেজঃ আজ কথঞ্চিৎ ধূসরিত দেখা যাইতেছে, তাহা কি বৎসর পূর্বে স্বামীজির জীবিতকালে কি জমিয়া ঠাণ্ডা বরফ হইয়াছিল? নতুবা তখন শাস্ত্রবিচারে কোন পণ্ডিতই স্বামীজীকে বিচারে আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই কেন? এখন লেখকের হুংকার—অরণ্যে চীৎকার মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ সামান্য গয়লার ছেলে বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া ভগবদ্গীতা পড়িলে যেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বুঝা যায়, আমাদের অনুরোধ—সুধী পাঠকবৃন্দ ও লেখক মহাশয় ক্ষুদ্র বলিয়া স্বামীজির প্রতি রোষ দ্বেষ না দেখাইয়া অরচিত "বীরবাণী" নামে একটী ক্ষুদ্র পুস্তক পড়িলেই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইবেন। ইতি—

২রা শ্রাবণ, ১৩২৮। প্রতিবাদী।

ছাত্রী বেথুনকলেজ।

স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রতিবাদ।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়!

বিগত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় "স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সাহিত্যের ন্যায় একটী সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় এইরূপ প্রবন্ধের সন্নিবেশ দ্বারা তাহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও কলুষিত দেখিয়া কে না মর্ম্মাহত হইবে? তাই মনের আক্ষেপে প্রতিবাদ আমার সামান্য দুই একটী কথা আপনার পত্রিকায় মুদ্রণের জন্য পাঠাইলাম।

[illegible]

আমরা সচরাচর স্থূল দৃষ্টিতে যে পদার্থ যেরূপ দর্শন করি, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা অনেকাংশে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বিমানস্থিত গ্রহ-নক্ষত্রাদি আমরা খোলা চোখে যেরূপ ক্ষুদ্র দেখিতে পাই, সূক্ষ্ম দর্শনে তাহারা তাহা হইতে এত বেশী বড় যে, সহজে তাহা বিশ্বাস করা যায় না। পাহাড়ের পাদস্থিত কোন ব্যক্তি অভ্রংলিহ শিখরাবস্থিত কোন বৃহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র পক্ষী অথবা পতঙ্গবৎ দেখিবে, অথবা তাহার কিছুই দেখিতে পাইবে না। এইরূপ চোখের স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব দ্বারা আমরা একটী বিষয়কে ভয়ানক দোষাবহ অথবা নির্দ্দোষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। কোন ব্যক্তির কতকগুলি অলৌকিক কার্য্য অবলোকন করিয়া আমরা তাহার অতীব গর্হিত একটী কার্য্যকেও অমানুষিক রহস্য মনে করিয়া সান্ত্বনা পাই। যেমন শ্রীরামচন্দ্রের বালিবধ। যুক্তির চক্ষে দেখিলে তাঁহার এই কার্য্য অতীব নিন্দার্হ; কিন্তু তাঁহার অলৌকিক ও অবতার-বাদ মনে উদয় হইলেই "দেব ব্যাপারের আমরা কি বুঝিব" ভাবিয়া তাঁহার কার্য্য নিষ্কলঙ্ক বলিয়া স্থির করি। ৺পরমহংসদেবের অবতার বাদ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে চাহি না। তবে, তাঁহার ধর্ম্মাসন যে তাৎকালিক এতদ্দেশস্থ সাধু মহাপুরুষ ও পণ্ডিতবর্গ হইতে উন্নত ছিল, তৎসম্বন্ধে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। কারণ তাঁহার জীবদ্দশায় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন—যাঁহার অলৌকিক বাগ্মিতায় সুদূর ইউরোপ পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়—যাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তেজস্বিতা স্বয়ং গবর্ণমেণ্টকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল—বঙ্গের কবিকুলচূড়ামণি ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—যাঁহার লেখনীর সামান্য একটু হিল্লোলে, উক্ত সমালোচকের মত সহস্র সহস্র লেখক ভাসিয়া যায়—প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়—যাঁহার উপদেশে এ দেশের বহু পাপ জঞ্জাল দূরীভূত হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ও যুক্তি তর্কের কাছে তাৎকালিক সমস্ত লোকের যুক্তি তর্ক—স্রোতে তৃণবৎ ভাসিয়া যাইত। এই সকল মহাত্মারা যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব একবাক্যে স্বীকার করিতেন,—এ হেন মহাত্মা অবতার না হইলেও যে মহাপুরুষ, তৎসম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার আছে কি? অতএব পরমহংসদেব সম্বন্ধে লেখকের স্থানে স্থানে কটাক্ষ অমার্জ্জনীয় অপরাধ সন্দেহ নাই।

সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া কোন সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ে যে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা, এই প্রবন্ধের অক্ষরে অক্ষরে তাহা সূচিত

হইয়াছে। ভক্তির প্রগাঢ়তার সহিত ধর্ম্মভাবের যত উৎকর্ষ সাধিত হইবে, ততই লোকের দোষদর্শন ও নিন্দারাব চিত্ত হইতে স্খলিত হইবে। চিত্ত বিমল হইলেই হৃদয়ে ভগবৎসত্তার উপলব্ধি হয়। এইরূপ অবস্থা হইলে মনের রিপু দূরীভূত হইয়া চিত্তের সমাধি হয় এবং অপরের মানসিক অবস্থা অবগত হইবার সামর্থ্য জন্মে। তাঁহার চক্ষে গৃহ, অট্টালিকা, বন, পর্ব্বত প্রভৃতি দর্পণবৎ আচ্ছাদিত পদার্থকে প্রতিবিম্বিত করে। তাই পরমহংসদেবের জ্ঞান-সার্চ্চলাইট স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিল। তাহার মর্ম্ম,—বিষয়ের জটিলতা কুটিলতা ও দাম্ভিকতা-সমাচ্ছন্ন, অপ্রস্তচিত্ত মানব কি বুঝিবে? তাই লেখক পরমহংসদেবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—"এবংবিধ নানাপ্রকার কথা পরমহংস বাবা কথিত, এইরূপ প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার প্রতি আপনাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কি পরিমাণ অব্যাহত থাকিতে পারে, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।" পরমহংসদেব সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি তাঁহার মত লেখকের লেখনী হইতেই সম্ভবপর। বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তকস্বরূপ স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ যাহার সম্মুখে উপস্থিত হুই একটী কথায় আপনাদের পাণ্ডিত্য ভুলিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকিতেন, তাঁহার গৌরবের খর্ব্বতা সম্পাদন করিতে সঙ্কীর্ণহৃদয় একজন লেখকের লেখনী ধারণ করা বড়ই প্রগল্‌ভতার বিষয় সন্দেহ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন মহাপুরুষ, এ বিষয়ে ভারতের—কেবল ভারতের কেন—সুদূর আমেরিকা ইয়োরোপ প্রভৃতি বহুস্থানের আবালবৃদ্ধবনিতার এই ধারণা। একটী নগণ্য ক্ষুদ্র-সমালোচকের বিদ্বেষপূর্ণ—বাক্যাড়ম্বরে টলিবার বিশ্বাস কাহারই নহে। বরং এতদ্দ্বারা বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হইবে। সত্য যাহা, তাহা স্বপ্রকাশ,—তাহা কি শব্দপুঞ্জ-সমন্বিত একখানা কাগজের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে পারা যায়? সত্যের বাতাসে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা কোথায় উড়িয়া যাইবে স্থিরতা নাই। স্বামীজি আমিষ ভোজন ভারতে কল্যাণকর বলিয়াছেন। একথার বিরুদ্ধে লেখক গীতার দোহাই দিয়া স্বাত্ত্বিকাদি বিবিধ আহারের বিধান দেখাইয়াছেন। লেখকের বুঝা উচিত ছিল, সেই গীতাখানির মর্ম্ম স্বামী বিবেকানন্দের অপরিজ্ঞাত ছিল না। পাঠকদের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত আছেন। লেখকের মত বহু প্রতিবাদক্ষম বাঙ্গালী এদেশে ঘরে ঘরে আছেন। স্বামীজির আমিষ ভোজন অনুরোধের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াই কেহ এযাবৎ উহার প্রতিবাদ করেন নাই। তাঁহারা প্রতিবাদ

করেন নাই কেন ? তাঁহারা বুঝিয়াছেন—স্বামীজি ভারতের বর্ত্তমান পরাধীনতার মধ্যে কিঞ্চিৎ রজোগুণের প্রাধান্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াই আমিষ ভোজনের উপদেশ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও ভাষাচাতুর্য্যে লেখকের তিরস্কারের তীব্রতা অনুমিত হয় না। কোন পরলোকগত পূজ্যাপূজ্য সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত লোকের বিরুদ্ধে সমালোচনায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যথেষ্ট থাকিলেও তাহার সমাজগত গৌরব ও সদমর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হওয়াই ধীরবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্য। আমাদের নব্য লেখক সে গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার ধারণা—তাঁহার শক্তি অসীম ;—তাই হস্তে হস্তিশুণ্ড ধরিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও আমাদের মধ্যের ব্যবধান আকাশ ও পাতাল। এই পার্থক্য একজন্মের অর্জ্জিত নহে। বহুজন্মের সঞ্চিত পুণ্যরাশি তাঁহাকে এত উন্নত করিয়া রাখিয়াছে যে, তদ্রূপ উন্নতি অর্জ্জন করিতে আমাদের কত জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। তাঁহার কার্য্যে গুণ ব্যতীত দোষ দর্শন করিবার অধিকার আমাদের নাই। অতএব তাঁহার খাদ্যাখাদ্যের অবিচার জন্য তাঁহাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করা তো দূরের কথা—তৎসম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াও আমাদের সীমাবহির্ভূত।

খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিতেন না বলিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, এ সিদ্ধান্তও ভ্রমাত্মক। লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ জাতিস্মর ছিলেন। জাতিস্মরের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য শেষ হইলেই তিনি চলিয়া যান ;—বিবেকানন্দও তাহাই করিয়াছিলেন। খাদ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেও তাঁহার নিয়মিত কাল অতিক্রম করিয়া ইহলোকে থাকা সম্ভবপর ছিল না। তা ছাড়া—মন নির্ম্মল ও ভগবানে নির্ভরশীল হইলে—প্রচলিত প্রথারিগর্হিত কার্য্যেও দোষ স্পর্শে না। সমাজশাসন সংরক্ষণের নিমিত্ত যে সকল নিয়ম, তাহা সাধারণের জন্য—অসাধারণের নিয়ম তাঁহার নিজস্ব। সাধারণের সহিত তাহা মিলিবে কেন ? প্রহ্লাদ বিষ খাইয়া হজম করিয়াছিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত ব্যক্তি শুনিয়াই এ কথা বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু সাধারণ লোক প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করিবেন না।

এতদ্ব্যতীত—সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার জাতিবিচারের প্রয়োজন কি ? পরন্তু যাঁহার একটী কথায় এক একটী নির্জ্জীব জাতি সজীব হইয়াছে—জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে—যাঁহার অলৌকিক কার্য্যকলাপ স্মরণ

করিয়া আজও সহস্র সহস্র লোক তাঁহার গুণকীর্ত্তনে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেছে—তাঁহার আচার ব্যবহার রীতিনীতির সমালোচনার প্রয়াসের মত শুদ্র সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শী লোকের হস্তক্ষেপ করা—প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহু বামনের ন্যায় উপহাসের বিষয় সন্দেহ নাই। লোক যতই উন্নত হইতে থাকিবে, ততই তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অপসৃত হইবে—ইহারই সর্ব্বোন্নতাবস্থা বিষ্ঠাচন্দনে তুল্য জ্ঞান। তাই "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।" গীতার এই বাক্যের সার্থকতা বর্ত্তমান যুগে তিনিই রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বাস্তবিক পণ্ডিত ও ঋষিতুল্য লোক ছিলেন। এ হেন স্বামী বিবেকানন্দকে পরমহংসদেবই চিনিয়াছিলেন। সমালোচক জানেন না যে, এলোমেলো কেশপাশের মধ্যে বেশভূষাবিরহিত অমার্জ্জিত ধূলি-ধূসরিত অতি মনোহর মূর্ত্তি লুক্কায়িত থাকিতে পারে। প্রকৃত সুন্দরী বহির্ভূষায় ভূষিত হইতে চান না। কিন্তু সৌন্দর্য্যের জহুরীর নিকট ধরা পড়েন। লেখকের মত স্থূলদর্শনে সে সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয় না। অন্তর্দর্শী পরমহংসদেব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুবিগর্হিত আচার আবর্জ্জনার মধ্যে তাঁহার অন্তস্তলনিহিত অলৌকিকত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সন্ন্যাসগ্রহণের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াই তদ্বিষয়ে অনুমতি দিয়াছিলেন। কেবল ভিক্ষা দ্বারা অভিমান-বর্জ্জন লক্ষ্য করিয়া নহে। এতদূর স্থূলদর্শন হইলে নিরক্ষর পরমহংসদেব বেলান্তের সূক্ষ্ম মীমাংসক বলিয়া সাধারণে পরিচিত ও পূজিত হইতে পারিতেন না।

স্বামী বিবেকানন্দের "পুরুত" বিদ্বেষ সম্বন্ধে সম্প্রতি আমি কিছুই বলিতে চাই না। তবে ঘরের স্ত্রীর ব্যভিচার মানের ভয়ে আমি নিজে চাপিয়া গেলে পরের কটাক্ষ বন্ধ করিতে আমার অধিকার কি?

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"

যে সকল লোকের উপর কোটি কোটি লোকের অটল বিশ্বাস, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব্ব করিতে লেখকের এত প্রয়াস কেন? ইহার পুরস্কার কি? এইরূপ লেখনী দ্বারা সাহিত্যের ন্যায় একটী সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকার অঙ্গ ক্ষত এবং স্বীয় সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেওয়া ব্যতীত আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? তবে হঠাৎ নাম করিতে হইলে হাতী কি বাঘ ঠেঙ্গান দরকার, নয়ত হৈ চৈ পড়িবে না, নামও ফাটিবে না।

শ্রীমধুসূদন সেন কবিশেখর, কবিরাজ

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী।

রামদাস শিবাজীর গুরু, বন্ধু ও উপদেষ্টা, আর ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী পেশবা প্রথম বাজীরাওএর গুরু। শিবাজী 'হিন্দু পাদশাহী' বা হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, আর বাজীরাও সেই 'হিন্দু-পদ-পাদশাহী'র বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং রামদাসের সহিত ব্রহ্মেন্দ্রের তুলনা করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী বঙ্গদেশে তেমন সুপরিচিত নহেন। সংসার ত্যাগ করিয়াও সংসারীর হিতচিন্তা করেন, লোকালয়ে থাকিয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধন করেন, রাজনীতিকে পরিহার করা কর্ত্তব্য মনে করেন না, এমন সন্ন্যাসী এদেশে সকল যুগেই বিরল। রামদাস কিন্তু সংসারবিরাগী হইয়াও সংসারীর হিতচিন্তায়ই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ভগবৎচিন্তার সহিত দেশের হিতকামনাও করিয়াছিলেন, আর ধর্ম্মনীতির সহিত রাজনীতিরও চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সহিত, মহারাষ্ট্রবাসীরা—যাঁহারা তুলনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মেন্দ্রের জীবন কাহিনী আলোচনা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

বেরারের অন্তর্গত দুধেবাড়ী গ্রামে মহাদেব ভট্ট নামক একজন ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম উমাবাই। এই মহাদেব ভট্টের ঔরসে উমাবাইর গর্ভে ১৬৪৯ সালে এক বালকের জন্ম হয়। বালকের পিতৃদত্ত নাম বিষ্ণু। এই বিষ্ণুই উত্তরকালে ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু বাল্যে পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ না করিতেই তিনি পিতা মাতা উভয়কেই হারাইলেন। তখন রাজুরী নামক স্থানে গিয়া তিনি গণপতির আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। প্রতি বৎসর শ্রাবণের শুক্ল প্রতিপদ হইতে ভাদ্রের শুক্ল চতুর্থী পর্য্যন্ত তিনি নির্জ্জনে সমাধিস্থ হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতেন। ১৬৬২ সালে তিনি কাশীধামে গিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। বিষ্ণুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী।

সন্ন্যাসী ব্রহ্মেন্দ্র হিমালয় হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। দেশ ভ্রমণকালে রামদাসের অন্তর যেরূপ তাঁহার স্বদেশবাসীর দুঃখ দারিদ্র্য দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিল, বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রহ্মেন্দ্রের চিত্তও সেরূপ ব্যথিত হইয়া-

ছিল কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। যদি হইয়া থাকে, তবে বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় নাই। তীর্থপর্যটন শেষ হইলে তিনি চিপলুনের নিকট পেড়ে গ্রামের পরশুরামের মন্দিরে গেলেন এবং নিকটস্থ ধামনীর বনে তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন।

এইখানে বালগৌরী নামক এক গোপালক প্রথম তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করে। ব্রহ্মেন্দ্রের উৎকট সাধনা সরল রাখালের চিত্ত আকৃষ্ট করিল এবং শীঘ্রই মুখে মুখে তাহার তপোবলের অপূর্ব্ব কাহিনী চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ স্বামীর তপোবলের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। স্বামী তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'মহৎ পদারোহণের' আশীর্ব্বাদ করেন। তাঁহার এই আশীর্ব্বাদ সফল হইতে বিলম্ব হয় নাই। সামান্য পল্লীসমিতির কর্ম্মচারী মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়াছিলেন। ইহার পর কীর্ত্তিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য ও ভক্তসংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ছত্রপতি শাহু ও তাঁহার স্বর্গী সতীসাধ্বী ও সকওয়ারবাই, পেশবা বালাজী বিশ্বনাথ ও তাঁহার পুত্র বাজীরাও, সুপ্রসিদ্ধ নৌ-সেনাপতি আঙ্গ্রিয়া, ইহারা সকলেই ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। ধনী ও উচ্চ পদস্থ শিষ্য বৃদ্ধি করিতে ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীও মোটেই শক্তিহীন ছিলেন না। এইখানেই রামদাস ও সমকালীন অন্যান্য সাধু সহিত ব্রহ্মেন্দ্রের প্রভেদ। রামদাস কখনও শিষ্যের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—শিষ্যের নিকট কিছু প্রার্থনা করা আমার রীতি নহে। শিবাজীর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সাম্রাজ্য তিনি তাঁহাকে হেলায় প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। সাধু তুকারামও শিবাজীর মত রাজার দরবারেও যাইতে সম্মত হন নাই। তিনি শিবাজীকে শিখিয়াছিলেন।—

যাব যে তোমার কাছে কি ফলিবে ফল?
পণ্ডশ্রম মাত্র মোর ঘটিবে কেবল।
সর্ব্ব অন্তর্যামী দেব তোমারে সদয়,
তাই লিখিতেছি হেন লিপি সবিনয়।
তা না হলে যিঠ্ঠলের সেবক যে জন,
কৃপার ভিখারী সে কি হয় কদাচন?
রক্ষক পালক মোর প্রভু ভগবান,
কে বা আছে এ জগতে তাঁহার সমান।

চিতে তোমার কাছে নাহি কিছু আশ,
শূন্য করিয়াছি ছিল যত অভিলাষ।
ত্যজিয়া বিষয়-সাধ সংসারের কাম,
লভিয়াছি বিনা করে নিবৃত্তির গ্রাম।
সতী যথা চাহে মাত্র নিজ প্রাণেশ্বরে,
তেমতি ব্যাকুল প্রাণ বিঠ্ঠলের তরে।

* * * *

মুক্ত আছে ভিক্ষাপথ, হবে সুধানাশ ;
লজ্জা নিবারিতে পথে আছে ত্যক্ত বাস।
পাষাণ উত্তম শয্যা করিতে শয়ন,
আকাশ হইবে মোর অঙ্গ-আবরণ।
পর-অনুগ্রহ তবে চাহিব কি আশে,
আয়ুমাত্র ক্ষয় হয় ভোগ-অভিলাষে।
সম্মানপ্রয়াসী জন-রাজগৃহে যায়,—
কিন্তু, বল, শান্তি কভু মিলে কি তথায় ?

আর পরবর্ত্তী কালে আর একজন মহারাষ্ট্রীয় সাধু সোহিরোনাথও এমনি ভাবে মহাদর্পী সিক্কিয়াকে বলিয়াছিলেন—

অবধূত নহি গরজ তেরী হম্ বেপরোয়া ফকীরী।
তুম্ হায় রাজা মম হায় জোগী-পথর পথর ক্যা কুরী।
চার কেটে জহাগীর-তুমারী। ওহী পহ হমরী॥
সোনা চাঁদী হম নেই চহিয়ে অনথ ভুবনকো বাসী।
মহাল মুলুখ সব ঝাঁট বরাবর হয় গুরুনাথ উপাসী॥
তুম ঢালীবন্দ হম ঝোলীবন্দ চার কোট জহাগীরী।
ত্রিকালমো তুয়ার কিরতী ঘর-ঘর অলখ-কুকারী।
তুম্ বী ডুবে হমবী ডুবায়ে তেরা হম ক্যা লিয়া।
কহে সোহিবা সুনো মহাদজী প্রকাশ জোগ গমায়া॥"

এই বলিয়া সোহিরোবা নাথ চলিয়া যাইতেছিলেন। মহাদজী তাঁহাকে আবার বসিতে অনুরোধ করিলেন। সোহিরোবা পুনরায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বলিলেন—

* শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুবাদ।

দৌলত দেখ দিবানা নেহী। অপনা সোজেন করলা কেয়া॥
কোই দিন চলযাকে ভুকানে। কোই দিন পর্ব্বতপর ঠীকানে॥
তনকে করত কারভার। হামারে ছত্তিশ বিজমতগার॥
মন পবনকী পাগা। সোহেঁ পাল খানেকী জাগা॥
করম কারগানা। হমারী নশীব জামদারখানা॥
জব সোহিরা তপ তপর বৈঠে। তব সব দুনিয়া ঁ উপর বৈঠে॥

পুণী তুকারাম ও সন্ন্যাসী সোহিরোবানাথ যে নিস্পৃহতা দেখাইয়াছেন সন্ন্যাসী ব্রহ্মেন্দ্র স্বীয় মাহাত্ম্য প্রচার হইবার পর তাহা দেখাইতে পারেন নাই। শ্রাবণের শুক্ল প্রতিপদ হইতে ভাদ্রের শুক্ল চতুর্থী পর্য্যন্ত তিনি সমাধিস্থ ও উপকর্ণ্যায় রত থাকিতেন, কিন্তু বৎসরের বাকী কয়েক মাস বাহির হইতেন ভিক্ষাটনে। তাঁহার শিষ্যেরা প্রায় সকলেই সম্পন্ন ব্যক্তি। মারাঠা সাম্রাজ্যের তখন উন্নতির দিন। তিনি রাজার সেনাপতি ও অমাত্যদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন আর তাঁহাদের নিকট প্রণামী ও দক্ষিণা লইতেন। এই সন্ন্যাসীর মুষ্টি কিন্তু অল্পে পরিপূর্ণ হইত না। তাঁহার ভিক্ষার আয় ছিল বার্ষিক ১৬০০০৲ টাকারও উপরে। মূল্যের হিসাবে সে কালের ১৬০০০৲ এখনকার ২০,০০০৲ এর চেয়ে বেশী বই কম হইবে না। তারপর ব্রহ্মেন্দ্রের শিষ্যেরা যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, তখন পরশুরামের নামে তাঁহাদের নিকট তিনি বিবিধ দ্রব্য চাহিয়া পাঠাইতেন। সেজন্য যে জিনিসটি ভাল পাওয়া যায় পঞ্চাস্ত কণ্ঠুরী, মণিমুক্তা, বহুমূল্য শাটী, শাল, দোশালা হইতে ঘণ্টা, লবঙ্গ, তুলা, ঘাস, চিনি, সকলই স্বামী তাঁহার দিগ্বিজয়ী ভক্ত শিষ্যগণের নিকট চাহিয়া লইতেন। এইভাবে তাঁহার মঠের দ্রব্যসঞ্চয় বিপুল হইয়া উঠিয়াছিল। মুকুন্দদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তাঁহার এই বিপুল ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদিগকে ইচ্ছামত উপহার দিতেন। ভিক্ষার নিমিত্ত তিনি নরপতির নিকটই হাত পাতিতেন। ব্রাহ্মণ পেশবা ও ক্ষত্রিয় ছত্রপতি যেমন তাঁহাকে অর্থ ও গ্রাম দান করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তেমনি প্রতিবেশী মুসলমান নরপতিও তাঁহার পরশুরামের সেবার্থ দুই খানি গ্রাম ইনাম দিয়াছিলেন। তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যেমন নিত্য যুদ্ধ বিগ্রহ হইত, তেমনি পরস্পরের ধর্ম্মস্থান দেবস্থানের প্রতিও উভয় ধর্ম্মাবলম্বী নরপতিদিগেরই সমান শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। শিবাজী মুসলমানের মসজিদ ও পীরস্থানের জন্য ইমামগাও দিয়া

গিয়াছেন, আর জঞ্জিরার হাবশী রাজাও ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে পরশুরামের মন্দিরের জন্য গ্রাম দক্ষিণা দিয়াছিলেন।

ভিক্ষালব্ধ টাকায় ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী মহাজনী ও অন্যবিধ ব্যবসা করিতেন। এই ব্যবসাসূত্রে প্রায় সকল মারাঠা সরদারের উপরই তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেকালে মারাঠা সরকারের ও সরদারদিগের টাকার বড়ই টানাটানি ছিল। শাহু সাতারার সিংহাসনে বসিবার আগে কোলাপুর-শাখার সহিত তাঁহার অনেক লড়াই করিতে হইয়াছিল। দেশে ঘরোয়া বিবাদ। বাহিরে মুসলমানের সহিত যুদ্ধ। যুদ্ধের খরচ রাজসরকার হইতে পাওয়া যাইত না, কারণ ভাণ্ডার শূন্য। তাই রাজসেনাপতিগণ যুদ্ধের খরচ চালাইতেন, যুদ্ধলব্ধ আয়ের দ্বারা। কিন্তু অভিযানে বাহির হইবার পূর্বেই তাঁহাদের টাকার দরকার হইত। এই টাকা তাঁহারা কাহারও নিকট উচ্চ সুদে ঋণ করিতেন, আর যুদ্ধান্তে পরিশোধ করিতেন। ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীই ছিলেন—তখনকার সর্বাপেক্ষা বড় মহাজন। ভিক্ষার টাকা সুদে খাটাইয়া তাঁহার আয় নিতান্ত কম হইত না। শ্রীযুত গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই বলেন যে, কেবলমাত্র সুদ হইতেই ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর বার্ষিক ছয় হইতে দশ হাজার টাকা আয় হইত। এতদ্ব্যতীত মহারাষ্ট্রের প্রত্যেক গ্রাম হইতে শ্রীভার্গবের নামে 'ভার্গব পট্টা' নামক কর আদায়ের কল্পনাও স্বামীর ছিল; কিন্তু এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

সুদ আদায়ের জন্য স্বামীজির তম্বি-তাগাদার ত্রুটি ছিল না। ব্রহ্মেন্দ্রের শিষ্য রাঙ্গারাওয়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা কোন কালেই ছিল না। ঋণের দায়ে তাঁহার জীবনে শান্তি ছিল না। কিন্তু স্বামীর তাগাদার বিরাম নাই। তাই তিনি অনন্যোপায় হইয়া স্বামীর নিকট লিখিয়াছিলেন—এই জীবন মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইচ্ছা হয় লইতে পার। পত্র পাইলে এখানেই জীবন ত্যাগ করিব অথবা স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রাণ দিব।

ভিক্ষায় এবং সুদে যাহা আয় হইত, ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী তাহা নিজের ভোগসুখের জন্য ব্যয় করিতেন না। তাঁহার সমস্ত আয় ব্যয়িত হইত ধর্ম্মনির্ম্মাণে, জলাশয়খননে ও রাস্তা পথ ঘাটের সংস্কারে ও নির্ম্মাণে। শ্রীযুত সরদেশাই সত্যই বলিয়াছেন যে, স্বামী ছিলেন—সেকালের "পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট"।

বাসনীর রম্য কাননে ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী চির জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। সিদি সাত নামক একজন মুসলমান রাজপুরুষ সাবনূরের নবাবের

হইতে একটি হাতী উপহার পাইয়াছিলেন। সেকালে ভিনিসপত্র হাতী
ড়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন নাটিতে মাল
বহিতে হইত। স্বামীকে সে সময়কার সকল রাজপুরুষই খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা
করিতেন; সুতরাং স্বামী এই হাতীটি সিদ্ধি সাতের নিকট পৌঁছাইবার ভার
লইলেন। সন্ন্যাসীর এইরূপ কাজে লিপ্ত হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল না। কিন্তু
তিনি সকলেরই যাতির রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এবারে কিন্তু বিপরীত
হইল। স্বামী কোহ্লাপুরের রাজার দস্তক লইয়া তাঁহার রাজ্যের ভিতর দিয়া
বিনা শুল্কে হাতী লইয়া আংগ্রিয়ার এলাকায় প্রবেশ করিলেন। আংগ্রিয়া
তাঁহার শিষ্য; সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্বাহ্নেই দস্তক সংগ্রহ করা
প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আংগ্রিয়ার কর্ম্মচারিগণ কিন্তু সামান্য সন্ধান
রক্ষা না করিয়া হাতীটি আটক করিল। ইহা লইয়া সিদ্ধি সাতের সহিত
আংগ্রিয়ার লোকদের একটা ছোটখাট লড়াই হইয়া গেল। সিদ্ধি মনে করিলেন,
হাতী আটকের মূলে স্বামীর হাত আছে। তিনি স্বামীর আশ্রম ও পরগুরামের
মন্দির লুণ্ঠন করিলেন। স্বামী তাঁহার হাতী তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া
দিলেন বটে; কিন্তু আংগ্রিয়া ও জঞ্জিরার হবশী নবাবের একান্ত অনুরোধ
সত্ত্বেও আর হাবসীর মুলুকে বাস করিলেন না। তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট
কাল অতিবাহিত করেন—সাতারা হইতে ছয় মাইল দূরে বাওরবী নামক গ্রামে।

১৭৪৫ সালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণাতীরে স্বামী তাঁহার চির প্রচলিত সমাধির
অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন। হঠাৎ নবম দিবসে সমাধি ভঙ্গ করিয়া বাহিরে
আসিয়া তিনি দর্ভাসনের উপর নৃপতির ন্যায় বসিলেন। তারপর রাম নাম
উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি সেইখানেই দেহ রক্ষা করিলেন। সাহু ছত্রপতি
তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া স্বামীর নিকট
আসিলেন। তারপর সভলে পাল্কীতে করিয়া স্বামীর দেহ বাওরবীতে আনিয়া
সমাধিস্থ করিলেন। সাহু নরপতি ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর সমাধির নিকট নহবৎ-
এক সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এখন দেখা যাউক রামদাসের সহিত ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর তুলনা হইতে পারে
কি না? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামদাসের নিস্পৃহতা ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীতে ছিল না।
তিনি চাহিতেন—লৌকিক সম্মান। সেইজন্য দরিদ্রের ন্যায় তাঁহার চিঠিপত্রে
বড় দেখা যায় না। রামদাস শিবাজীর দুর্ব্যসনী পুত্র সম্ভাজীকে যেরূপ কড়া
ভাষায় চিঠি লিখিয়া চরিত্র-সংশোধনের উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্রহ্মেন্দ্র তাঁহার

কেনি [illegible] শিষ্যকে এরূপ উপদেশ দিতে পারেন নাই। তাই রাজারাজড়াকে তিনি মন্ত্রীদের সহিত অবৈধ প্রেমের জন্য কখনও ভৎর্সনা করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে শিষ্যের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি তাঁহাকে বীর, 'চিরঞ্জীব রঘুপতি', 'রঘুনাথজী', 'রামসেবক হনুমন্ত', 'ভার্গব সেবক', 'একবচনী', 'সত্যবন্ত', 'গঙ্গাজল আচারে পুণ্যশীল ভক্তরাজ' প্রভৃতি গৌরবযুক্ত সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী সুলেখক ছিলেন। অসংখ্য পত্রে তাঁহার লিপিকুশলতার পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রামদাসের মত তাঁহার এই অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতা সাধারণের শিক্ষায় প্রযুক্ত হয় নাই। তিনি চিঠি লিখিতেন রাজা মহারাজার নিকট। আর সে চিঠিতে থাকিত—বিবিধপ্রকার চাটুবাক্যের সহিত অর্থযাচ্ঞা।

রামদাস ছিলেন—দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ। তাই তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা দিতে, কর্মের পথে নিয়োজিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মেন্দ্র এ সকল বিষয় তেমন বুঝিতেন না। তিনি জানিতেন মন্দিরে নন্দনে পুণ্য আছে, তাহার জন্য অর্থ আবশ্যক। অর্থের জন্য বড় লোকের দরবার করিতে হইবে। সে বড়লোক হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক। তাঁহার চেষ্টায় মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের যে একটুও বিস্তার হয় নাই, তাহা নহে। তাঁহারই প্ররোচনায় রাজারাও জাঞ্জিবার হবশীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের মূল কারণ রাজনৈতিক নহে। একজন হবশী ব্রহ্মেন্দ্রের মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল, তিনি তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। তাই এই যুদ্ধ। নতুবা সমুদ্রের সমগ্র উপকূল জয় করিয়া প্রচণ্ড নৌশক্তি স্থাপনের কল্পনা কখনও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি শিবাজীর জঞ্জিরা অভিযানের কথা নিশ্চয়ই জানিতেন, কারণ তিনি শিবাজীর সমকালীন ব্যক্তি। কিন্তু তথাপি শিবাজীর উদ্যোগের প্রকৃত মর্ম তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

রাজ্য শাসন-ব্যাপারেও ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী হস্তক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাহাতে যে অপেক্ষা কুফল হইয়াছে বেশী। কারণ স্বামী রাজ্য অপেক্ষা শিষ্যের মঙ্গল কামনাই বেশী করিতেন। তাঁহার শিষ্য দোষী হইলেও তিনি তাহাকে শাস্তিভোগ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। আবার তিনি যাহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইতেন, তাহাদিগকে আক্রমণে শাস্তি দিবার প্রয়াস হইতেও বিরত থাকিতেন না। শিষ্যদিগকে অন্তের সম্পত্তি পাওয়াইয়া দিবার জন্য তিনি

রাজদরবারে প্রবেশ করিতে কসুর করেন নাই। এই জন্যই বাজীরাও তীক্ষ্ণধী পুত্র বালাজী বাজীরাও পিতৃগুরুর প্রতি তাদৃশ ভক্তি রাখিতে পারেন নাই।

মারাঠা সাম্রাজ্যে তখন দুইটি প্রবল দল। ব্রহ্মেন্দ্র চেষ্টা করিলে, তাঁহার মধ্যস্থতায় এই দুই দলের মনোমালিন্য দূর হইতে পারিত। কিন্তু তিনি সে চেষ্টা কখনও করেন নাই। তিনি করিয়াছেন—পেশবার স্বার্থরক্ষার চেষ্টা। সুতরাং তাঁহার দরবারে ব্রহ্মেন্দ্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তির ফলে পেশবার প্রাধান্য রক্ষিত হইলেও সমগ্র মারাঠাসাম্রাজ্যের মঙ্গল হয় নাই। এক কথায় স্বদেশপ্রেমে, ত্যাগে, দূরদর্শিতায় ব্রহ্মেন্দ্র রামদাসের সমকক্ষ ছিলেন না। বোধ হয় রামদাসের সহিত এ সকল বিষয়ে তাঁহার তুলনা করাই অসঙ্গত।

মহারাষ্ট্রে একদল যেমন ব্রহ্মেন্দ্রকে অযথা বাড়াইয়াছেন, আর একদল আবার তাঁহাকে তেমনই অযথা ছোট করিয়াছেন। ব্রহ্মেন্দ্র আদর্শ ব্যক্তি নহেন। সে কালের ও একালের অন্যান্য বহু সন্ন্যাসীর মত তিনিও একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। সাধারণ মানুষের মত প্রিয় ব্যক্তির হিত ও অপ্রিয় ব্যক্তির অহিত কামনা করিতেন। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি মত ধর্ম্মাচরণ করিতেন। তাহার ফলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে সাধারণের উপকার হইয়াছে, আবার তাহার প্রভাবে রাজ্যের অমঙ্গলও হইয়াছে। কিন্তু সেই জন্য তাঁহাকে ভণ্ড, কাপট ও ক্রোধী বলিয়া গালি দেওয়া উচিত হইবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

দ্রৌপদী।

অয়ি দেবি দ্রুপদনন্দিনি দ্রৌপদি,
ভারতের রমণী রতন, কিবা তেজে,
কি গাম্ভীর্য্যে, কি দয়া দাক্ষিণ্যে তব চিত্র
সর্ব্বত্রই পবিত্র উজ্জ্বল! লক্ষ্য ভেদে
পিত্রালয়ে দেখিনু তোমায় যেই দিন,
একটি কথায়, বুঝিনু সেদিন হ'তে,
হবে তুমি ভারতের ভাগ্যবিধায়িনী।—

স্বয়ম্বর স্থলে যবে কর্ণ মহারথ
উঠিলা ক'র্ণ হস্তে—সভায় যখন
বুঝিলা সকলে, এইবার লক্ষ্য ভেদ
হইল নিশ্চয়। বলিলা সগর্ব্বে তুমি,—
"নীচ কুলোদ্ভব সূত-পুত্রে মাল্যদান
করিবে না পঞ্চালনন্দিনী পাঞ্চালী।"
পাশায় তোমারে পণে হারিলে পাণ্ডব,
কেশে ধরে দুঃশাসন অবরোধ হ'তে
আনিলা যখন, ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরের
সম্মুখে সভায়! রাজসূয় যজ্ঞকারী
পাণ্ডব ঘরণী তুমি, যে প্রশ্ন করিলা—
তোমাতেই সাজে তাহা,—"পাণ্ডব হারিলা
যদি অগ্রে আপনায় পণে, তবে পুনঃ
কেমনে তাহারা ধরিলা রমণী পণে?"
এপ্রশ্ন শুনিয়া নির্ব্বাক হইল সভা।
যে প্রতিজ্ঞা দুঃশাসন-কৃত অপমানে
করিলা সভায় তুমি, সে নির্ঘোষ শুনি
বীর হৃদি থরথরি কাঁপিল সভয়ে।—
"দুঃশাসন-রক্তদিয়া বাঁধিবে দ্রৌপদী
মুক্ত কেশ, অন্যথায় বিমুক্ত রহিবে!"
এ প্রতিজ্ঞা চিরদিন শয়নে স্বপনে
জাগায়েছ পাণ্ডবের বৈর-নির্য্যাতন,
করেছে ভীষণতর ভীষণ হইতে
ভীমার্জ্জুনে, মুক্ত কেশ হেরি দ্রৌপদীর
অবিরত ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাসে।
এ প্রতিজ্ঞাফল—কুরুক্ষেত্র—ভীষ্ম দ্রোণ
কর্ণের নিধন, দুর্য্যোধন উরুভঙ্গ,
দুঃশাসন রক্ত পান—কৌরব পতন।
অষ্টদিকে পাণ্ডবের সসাগরা ধরা।

শ্রীভুবনমোহন রায় গুপ্ত কবিশেখর।

অধম-তারণ।

গ্রীষ্মকাল। রাত্রি প্রায় ৮ টা। বৌবাজারে হরনাথ বোসের গলিতে রামচন্দ্র স্বর্ণকার সোণা গলাইতেছে। তাহার সামনে টুলের উপর বসিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তামাকু সেবন করিতেছেন ও একখানি ভাঙ্গা পাখা লইয়া মধ্যে মধ্যে নিজের গায়ে ও রামচন্দ্রের গায়ে বাতাসটুকু লাগে, এই ভাবে হাত নাড়িতেছেন। ভদ্র লোকটি গৌরবর্ণ, বেশ সুপুরুষ, তাঁহার পরিচ্ছদ সাদা-সিধে, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বুকে একটি সোণার গার্ড চেন দেখা যাইতেছে, তায় এক অঙ্গুলিতে একটি হীরার আংটি ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

হুঁকায় একটি জোর টান্ দিয়া এবং নাক দিয়া প্রচুর ধোঁয়া বাহির করিয়া তিনি বলিলেন—

"ওহে রামচন্দ্র, এই বার একটু সাবধান, হাতের একটু নাড়াচাড়ায় সোণা আগুনে পুড়বে।"

কথাটা বলার একটু উদ্দেশ্য ছিল। এই রামচন্দ্র কারিগর ভাল, কিন্তু তাহার একটু দোষ ছিল। সোণা গলাইতে হইলে তাহার হাত ঠিক থাকিত না। মুচি কাত হইয়া যাইত। তাহার পর সোণা ওজনে কম হইত। অনেকে বলিত যে, রামচন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই এরূপ করিত, কিন্তু রামচন্দ্র কখনই এ কথা স্বীকার করিত না।

ভদ্র লোকটির কথা শুনিয়া রামচন্দ্র একটু অভিমানের সুরে বলিল—"আইজ্ঞিয়া কর্ত্তা আজ পচিশ বচ্ছর গহনা গরাইছেন, কাম কি খারাপ পাইচেন? এই রামচন্দ্রের হাতের গয়না দশ বচ্ছর পরে ভাঙ্গিয়া যদি খারাপ যান্ ত বলেন যে হা।" এই উত্তর শুনিয়া ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন "বেশ হে, বেশ। আজ নয়, কাল নয়, দশ বছর পরে গয়না ভাঙ্গব। তখন তুমিই বা কোথা থাকবে আর আমিই বা কোথা থাকব, তার ঠিকানা নেই। আর গয়না ভেঙ্গে যদি কিছু ভেজাল্ বেরোয় তা'হলে আর কিছু কর'ব না, কেবল বলবো 'হা'। হাঃ হাঃ হাঃ বেশ হে বেশ!

এমন সময় নিকটবর্ত্তী কোন বাটী হইতে স্ত্রীলোকদিগের কান্নার শব্দ শুনা গেল, ও বাহিরে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া ভদ্র লোকটি তাড়া-

তাড়িখানা হইতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, দুই খানি বাড়ীর পরে এক খানি ছোট বাড়ীর রোয়াকে অনেক লোক জড় হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতেছে "ও! ব্যাটা কি চামার! কে বলিতেছে "ইচ্ছে করচে যে, ব্যাটাকে যেখান থেকে পাই টেনে এনে জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দি"। কেহ বা বলিতেছে "উঃ কি কশাই! পয়সার জন্যে একটা ব্রাহ্মণের জাত মাল্লে মশাই! বক্তারা যুবক, বোধ হয় পাড়ার ছেলেরা। দুই চারি জন প্রবীণও সেখানে আছেন। আর একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি সেই রোয়াকের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। বসিয়া আছেন বলা বোধ হয় ঠিক হয় না—তিনি যেন ঢলিয়া পড়িয়াছেন। চেষ্টা করিয়াও তিনি চক্ষের জল বন্ধ করিতে পারিতে ছিলেন না, একটির পর আর একটি ফোঁটা পরে পরে আসিয়া তাঁহার গণ্ডদেশ ভাসাইয়া দিতেছিল।

সেকরার দোকান হইতে যে ভদ্রলোকটি রাস্তায় আসিয়াছিলেন, তিনি যে যুবক বেশী উৎসাহ করিয়া মারপিটের ব্যবস্থা করিতেছিল, তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েচে বাবা?" যুবক উত্তর করিল, আর ম'শাই! ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ। আজ ওঁর মেয়ের বিয়ে, গায়ে হলুদ হয়ে গেছে, আর বরকর্ত্তা কি না বেশী টাকা নিয়ে আর এক জায়গায় ছেলের বিয়ে দিতে নিয়ে গিয়েছে। শুনেছেন মশাই এ রকম অত্যাচার? ও! ব্যাটাকে পাই ত—

ভদ্রলোকটি কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, ও হে থাম থাম। তোমরা হ'লে ঠিক বেরুল কি না। তোমাদের রক্ত গরম। অত রক্ত গরম করলে কি কাজ হয়, বাবা? কথাটা আগে বুঝতে দাও। ঐ যিনি বসে আছেন, উনি কি মেয়ের বাপ?"

হাঁ মশাই। ঐ বাঁড়ুয্যে মশাই যে কি ভদ্রলোক তা বলা যায় না। হাজার হ'ক ব'নেদি ঘরের ছেলে কি না। এখন না হয় অবস্থা খারাপ হয়েছে। কিন্তু তবু, মশাই, লোকের বিপদে আপদে এ পাড়ায় ওঁর মতন কেউ নেই। আহা, কত কষ্ট ক'রে এমন কি বাড়ীতে যা কিছু সোণা রূপো ছিল, সব বিক্রী করে, বাঁধা দিয়ে, এই ছোট মেয়ের বিয়ের সব যোগাড় ক'রে ছিলেন। ভারা যা চেয়েছিল, সব দিতে রাজী আর পাঁচশো টাকা বেশী পেয়ে ছেলের বাপ চুপি চুপি অন্য জায়গায় ছেলের বিয়ে দিতে গেছে। আমরা এই তাদের বাড়ী থেকে ফিরে এলুম। আমরা অল্পে ছাড়চিনি মশাই, আমরা চাঁদা করে ব্যাটাদের বাসে মকদ্দমা চালাব, আর বাড়ী থেকে টেনে বার করে—

ভদ্রলোক বলিলেন "থাক্ বাবা এখন ও সব কথা। চল দেখি একবার মেয়ের বাপের কাছে। কিছু বিহিত হয় না কি দেখতে হবে ত"। এই বলিয়া তিনি যেখানে কন্যার পিতা বসিয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মশাই আপনার বিপদের কথা শুনে এলুম, কিছু মনে কর্‌বেন না, আমিও ব্রাহ্মণ। আমার নাম শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বাড়ী সিদ্ধেশ্বর মিত্রের গলি, চাঁপাতলা। আমি শিবাচার্য্য ঠাকুরের স্কুল মেস, ভঙ্গ, চার-পুরুষে। আপনি আমার পাল্টি ঘর কিনা জান্‌তে চাই। আপনার নামটি কি?"

"আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি আপনার পাল্টি ঘর।" এই বলিয়া তিনি নিজের বংশ-পরিচয় দিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ বলিলেন "মশাই, আমার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন আমার একই ছেলে, বি, এ, পাস ক'রে এম, এ, প'ড়ছে, বয়স ২১ বছর। আমার স্বর্গীয় কর্ত্তার জাহাজের বেনিয়ানি কাজ ছিল, আমিও সেই কাজ করি, আর আমার ছেলে বিজয় এম, এ টা পাস ক'রলেই সেও আমার আফিসে বেরুবে। সে আফিসের কাযটা বুঝে নিলেই, ম'শাই বুঝলেন কিনা, যে ক'টা দিন আর বাঁচি হরিনাম ক'রে কাটিয়ে দি।"

শিবদাসবাবু কথা কহিতে পারিলেন না। উঠিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে উমাপ্রসাদ বাবুর পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। "হাঁ, হাঁ, কি করেন কি করেন" বলিতে বলিতে উমাপ্রসাদ বাবু সযত্নে তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। তাঁহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন "ভাই ব্রাহ্মণের গতি ব্রাহ্মণ, তোমার বিপদে আমি, আমার বিপদে তুমি। এ আর বেশী কথা কি? আমার গাড়ী তৈয়ার আছে, আমি এখনি ছেলেকে আন্‌ছি। লগ্ন কটা পর্য্যন্ত?

শিবদাস বাবু বলিলেন "আজ্ঞে সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত একটা লগ্ন ছিল, সে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। আবার ১১টা থেকে ২টা পর্য্যন্ত শুভ লগ্ন আছে।"

উমাপ্রসাদবাবু বুক-পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন "সাড়ে বারোটা বাজতে ছুড়ি মিনিট। আমি সাড়ে দশটার মধ্যে বর নিয়ে আসব আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আর বাড়ীর ভিতর খবর দিন, মেয়েদের শাঁখ করুন। এই বলিয়া তিনি অদূরে যেখানে তাঁহার গাড়ী ছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। শিব বাবু তখন হাত যোড় করিয়া বলিলেন "মশাইকে একটা কথা নিবেদন করি। আপনার ঘরের তুলনা নেই, আপনি আমার

সাক্ষাৎ ভগবান্। কিন্তু একবার আমার মেয়েটিকে দেখবেন না? বিয়ের আগে একবার মেয়েটিকে দেখে পছন্দ করলে আমি নিশ্চিন্ত হতুম।" শিবরাম বাবুর কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ বাবু হাঃ হাঃ হাঃ শব্দে এমন এক উচ্চ হাসি আরম্ভ করিলেন যে, সেই হাস্যের রোলে পথে লোক দাড়াইয়া গেল। হাসি থামিলে উমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন "আমরা জাহাজের কাপ্তেন চরিয়ে খাই। আমাকে কি আপনি এত বোকা মনে করেন? আপনি এমন সুপুরুষ আর আপনার মেয়ে কি কুশ্রী হবে? আর যদি কানা খোঁড়া কুজো হ'তো, তা হলে কি আপনার মতন ভদ্রলোক সে কথা লুকিয়ে রাখত? যান্ মশাই যান, বিয়ের সব ঠিক করুন গে।" এই কথা বলিয়া তিনি দ্রুতপদে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া কোচম্যানকে বলিলেন "জলদি ঘর যাও।" পাড়ার ছেলেরা এতক্ষণ অবাক্ হইয়া সমস্ত কথা বার্ত্তা শুনিতেছিল। যখন উমাপ্রসাদ বাবুর গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহারা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—সকলে সমস্বরে পুনঃ পুনঃ চিৎকার করিতে লাগিল "বন্দে মাতরম্, জয় উমাপ্রসাদ বাবুর জয়।"

২

বাটীতে উপস্থিত হইয়াই উমাপ্রসাদ বাবু কোচমানকে গাড়ী হাজির রাখিতে বলিলেন। দেউড়িতে দরওয়ান ভুখন সিং দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে বলিলেন "আজ ভোনরা দাদা লাবুক সাদি, তুম জলদি অপনা উরদি-পাগড়ী চড়াকে তৈয়ার রহো।" বাহিরের ঘরের একজন বৃদ্ধ সরকার খাতা লিখিতেছিল, তাহার নিকট গিয়া বলিলেন "চক্রবর্ত্তী মশাই আজ রাত্রেই বিজয়ের বিয়ে দিতে হবে। নইলে এক ব্রাহ্মণের জাত যায়। আপনি এখনি ভট্টাচার্য্যি মশাইয়ের বাড়ীতে একখানা ঠিকা গাড়ী লইয়া যান্। তাঁকে কি তাঁর ছেলেকে—যাকে পান—নিয়ে খোস্তা নাপিতের বাড়ী গিয়ে তাকে সঙ্গে করে এখনি নিয়ে আসুন। সাড়ে দশটার ভিতর বর নিয়ে কনের বাড়ীতে যাওয়া চাই মনে রাখবেন। তহবিল থেকে টাকা নিয়ে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ুন।

অন্দরে গৃহিণীর নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন "দেখ গো, চিরকাল কাপ্তেন্দের এক গিনিতে একটা বেল্ বিক্রী ক'রেই এসেছি, আর সেই রকম টাকাতেই আমাদের সংসার চ'লেছে। কখন একটা ভাল কায করেছি বলে ত মনে হয় না। আজ ভগবান্ নিজে এক সুযোগ দিয়েছেন। আর তাতে কিছু কষ্টও করতে হবে না। কেবল এক ব্রাহ্মণের জাত রক্ষে করা। আজ বিজয়ের বিয়ে দিয়ে এস একটু পুণ্য করা যাক।" তাহার পর সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত

ঘটনা স্ত্রীকে বলিলেন। স্বামীর আগ্রহ দেখিয়া সাধ্বী স্ত্রী আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "বেশ ত, খুব ভালই হয়েছে। তুমি যা ক'রবে তার ওপর আবার কথা কি? তবে—হাঁ গা, মেয়েটি দেখতে কেমন, আর তারা দেবে থোবে কি?" উমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন, মেয়ে ডানাকাটা পরী না হলেও মেয়ে ভালই হবে। সুধু রূপ নিয়ে ত ধুয়ে খাবে না, গুণ চাই। সে বনেদি ঘরের মেয়ে, তাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে দেখে-নিও। সে এক পুরুষে বড় মানুষের নাক-উঁচু-করা মেয়ে নয়। আর পাওনা? মহাভারত! মহাভারত! তুমি কি পাটা বিক্রী ক'রবে নাকি? তোমার কিছু অভাব আছে? আজ যে এক বাক্স ধরে বিজুর বৌয়ের জন্য রকমারী গয়না গড়িয়েছ, সে সব গয়না পরে তার গায়ে জায়গা থাকবে কি? এত প্রাক্তেও আবার পরের কাছে ভিক্ষা কেন? লোকে ব'লবে কি? ছিঃ ছিঃ এমন কাযও করে? নাও, এখন সিন্দুক খুলে তোমার সব গয়না বের ক'রে দাও। পরিয়ে কাল বাড়ী নিয়ে আসব। আমি বিজুকে ডাকতে যাচ্চি। সে বোধ হয় বাইরের ঘরে পড়চে।

বাহিরের ঘরে বিজু ওরফে শ্রীবিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় একখানি চেয়ারে বসিয়া এক মনে অধ্যয়ন করিতেছিল। এমন দুই একটী ছেলেও আছে যাহারা ষোল বৎসর বয়স পার হইলেও নভ্ নোভাস প্রভৃতি জিনিষের ধার ধারে না। পিতা-মাতার এক মাত্র পুত্র! এই একুশ বৎসর বয়সেও সে মার কোলে বসিয়া দুধের বাটিতে চুমুক দিত। আহার নিদ্রায় আট ঘণ্টা, অধ্যয়নে আট ঘণ্টা, ব্যায়ামে চারি ঘণ্টা, সন্ধ্যা আহ্নিকে দুই ঘণ্টা, এবং তাহার debating club এ দুই ঘণ্টা সময় দিয়া দিন কাটাইত। অন্য বিষয়ে চিন্তা করিবার তাহার সময় ছিল না। স্বাস্থ্যে এবং দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যে তাহার মতন যুবক দুর্লভ।

বিজয় এক মনে পড়িতেছিল। স্কন্ধে পিতার সস্নেহকরস্পর্শে সে ফিরিয়া চাহিল ও তাঁহাকে দেখিয়া তখনি আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। উমাপ্রসাদ বাবু তখন ধীরে ধীরে বলিলেন "বাবা বিজয়, তুমি এম, এ, পাস্ করিলে তোমার বিবাহ দিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের লীলা বুঝা ভার। আজ তোমাকে এক ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। রাত্রি এগারটার মধ্যে তোমার বিবাহ। শীঘ্র প্রস্তুত হও।"

(৩)

রাত্রি ঠিক সাড়ে দশটার সময় উমাপ্রসাদ বাবু পুত্র, পুরোহিত, পরিচারক ও বরোচিত সঙ্গে কন্যা-কর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বরযাত্রের রূপ দেখিয়া

প্রকাণ্ড ক্যাস্-বাক্স দেখা গেল। আলো নাই, বাজনা নাই, কেবল গলির মোড় হইতে বিবাহ-বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পাড়ার ছোট বড় যত ছেলে ফুলের মালা ও তোড়া সংগ্রহ করিয়া দুই শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বর পুষ্প-বৃষ্টির ভিতর দিয়া সভায় উপস্থিত হইল।

কন্যা সম্প্রদানের পূর্ব্বে দরওয়ানের নিকট হইতে বাক্সটি নিজে হাতে লইয়া উমাপ্রসাদ বাবু তাহা কন্যার পিতার হাতে দিয়া বলিলেন "বেহাই ম'শাই, আমার একটি অনুরোধ আছে। আপনি কোন গয়না দিতে পারিবেন না। একটি হরিতকী মাত্র দিয়া কন্যা দান করিবেন। এই বাক্সতে যে সব গয়না আছে, তাই পরিয়ে বৌমাকে আনুন। এর ওপর আর কথা কইবেন না। যান আর দেরী করবেন না। আমার কথা না শুনলে আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখ হবে।

কিছু পরে শিবদাস বাবু কন্যার হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে, যেখানে সম্প্রদানের আয়োজন করা হইয়াছিল, উপস্থিত হইলেন। গোলাপ ফুলের মতন একটি মেয়ে একখানি লাল বেনারসী কাপড় পরিয়া আসনে বসিল। তাহার রূপের ছটায় সমস্ত ঘরটি যেন উজ্জ্বল হইয়া গেল। তাহার উপর উমাপ্রসাদ বাবুর আনীত জড়োয়া গহনাগুলির চাকচিক্যে দর্শকদিগের চক্ষু ঝলসাইয়া যাইতেছিল। কন্যাটিকে দেখিয়া উমাপ্রসাদ বাবু হাঃ হাঃ শব্দে তাঁহার সেই অভ্যস্ত হাসিতে সম্প্রদানের ঘরখানি সরগরম করিয়া তুলিলেন। হাসির চোটে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল বাহির হইয়া গেল, এবং একটা বিষম লাগিয়া হঠাৎ তাঁহাকে একটু কাবু না করিলে তিনি যে কতক্ষণ হাসিতেন তাহা বলা যায় না। বিষম থামিলে তিনি শিবদাস বাবুকে বলিলেন "বেহাই, ব'লে ছিলুম ত, শর্ম্মা কিছুরই পাত্র নয়। মা আমার যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। এমন বৌ যে করবে, তার অনেক সৌভাগ্য।"

তাহার পর সভাস্থ সকলের অনুমতি লইয়া বিবাহ আরম্ভ হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মন্ত্র পড়াইবার পূর্ব্বেই উমাপ্রসাদ বাবু উভয় পক্ষের পুরোহিত দুইজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মশাই, আমার একটি নিবেদন আছে, আগে শুভদৃষ্টি, তারপর মন্তর পড়াবেন। কথাটা এই যে—বুঝলেন কি না—আমার যখন পৈতে হয়েছিল, তখন আমি "শিশু-বোধক" প'ড়ে একশো আট চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ করেছিলুম। তাইতে আমি নিজেই চাণক্য পণ্ডিত মনে করতুম। কিন্তু মশাই, পৈতের সময় যে মন্তর প'ড়ে ছিলুম, আর তারপর এক বচ্ছর

ধরে যে সাপের মন্ত্রগুলো [illegible] মুখস্থ করেছিলুম, তার [illegible] যদি বুকে থাকে তা হলে আপনারা আমায় ক্ষমা ক'রে যাবেন। [illegible] আমার পনের বছর বয়সে বিয়ে হয়। তখন আমার দ্বিতীয় ভাগ [illegible] বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্ত। বিয়ের সময় বরের যে কি মহত্ত্ব ছিলো তার এক বিন্দুও বুঝতে পারি নি। তারপর বরাবরই [illegible] একখানা মাসিক পত্রিকায়—বোধ হয় 'সন্ধিক্ষণে'—এই বিষয়ে [illegible] কি একটা ব্যাখ্যা পড়েছিলুম। ও! সে কি চমৎকার, মশাই, [illegible] সে কি ভাবোচ্ছ্বাস! আর এই মাসিক পত্রিকাগুলো আমাদের [illegible] বেই কচ্ছে!—তাই বলছিলুম—হবেন কি না—এই মহৎ ভাবোদয় [illegible] আপনারা ক'লে আপনারা বলতে পারবেন। [illegible] বোঝে, কিন্তু মেয়েদের জন্যে ঐ টক্ কষ্ট আপনাদের নিতে হবে। আমি আপনাদের এই কষ্টের জন্য আগাম ধন্যবাদ দোব। তা আপনারা [illegible]

এই দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করিয়া উমাপ্রসাদ বাবু হাতে যে [illegible] তাহাতে সজোরে টান দিতে আরম্ভ করিলেন। অতিকায় ভঁড়ি যে [illegible] নিষ্কাশিত, তাহা তাঁহার টান দিয়া [illegible]।

পরদিন প্রাতে দশটার সময় উমাপ্রসাদ বাবু [illegible] আসিলেন। নব-দম্পতি বাহিরে আসিলে, তিনি পকেট হইতে [illegible] বাঁধা কি একটি জিনিস বাহির করিলেন। সকলে দেখিল, [illegible] খোলা খুলিয়া এক জোড়া পাকা সোণার নিরেট বালা বাহির [illegible] বালা দুটী বহুকালের বাবজত বলিয়া মনে হইল। সেই বালা [illegible] পুত্রবধূর হাতে পরাইয়া দিয়া বলিলেন,—মা! এই বালা [illegible] মা পঞ্চাশ বছর হাতে পরে একটা একবোয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন। [illegible] শুদ্ধ খুলে আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন। এ বালা আমি [illegible] রেখেছিলুম। মনে করেছিলুম যে মেয়ে যদি কখন মানুষ [illegible] তাকে আবার পরিয়ে দেব। আজ আমি আমার আশীর্ব্বাদ [illegible] আশীর্ব্বাদ করছি এবং পুত্রবধূর চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন,— [illegible] তোর ছেলে হবে, কিন্তু তার হাতে আবদার [illegible] এ বুড়োর আবদার সহ্য হবে না। আমার [illegible]

আমি সেই প্রাচীনা ফের [illegible]

তাহার পর চক্ষের জল মুছিয়া পাড়ার ছেলেদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাবা সকল, তোমাদের দৌলতে আজ আমি মা পেয়েছি। তোমরা একদিন ভাল করিয়া না খাইলে—বুঝিলে কি না—আমার তৃপ্তি হবে না। সেইজন্য এক শত টাকা ও তোমাদের লাইব্রেরী, সভা প্রভৃতি বাবদ পঞ্চাশ টাকা বেহাই মহাশয় তোমাদের দেবেন—তার সদ্ব্যবহার করো—নইলে বড় দুঃখিত হব।" ইহা শুনিয়া ছেলেদের পাণ্ডা, এক চশমাধারী যুবক অগ্রসর হইয়া বলিল—"মশাই আপনার মতন লোকের নিকট আমরা এক পয়সাও নেবো না। আপনি এককড়া কাণা কড়িও নেন নি। ছেলের বিয়ে অমনি দিলেন, আর আমরা আপনার কাছে টাকা আদায় ক'রবো—কখনও না।" উমাপ্রসাদ বাবু হাঃ হাঃ শব্দে আবার তাঁহার সেই বিরাট হাস্য আরম্ভ করিলেন। পরে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"বটেই ত, বটেই ত, তোমরা ইয়ং বেঙ্গল কি না, তোমাদের ইস্পিরিট আছে। আমরা হ'লে এ টাকাটা এক্ষুনি নিতুম। তবে—বুঝলে কিনা—টাকাটা খাতায় পরচ লিখে ফেলেছি আর জমা ক'রতে পারবো না। তোমরা একটা না হয় কাজ কর না—টাকাটা নিয়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় লাগিয়ে দাও। তাতে কিছু দোষ আছে কি?"

ছেলেটি বলিল,—"আচ্ছা মশাই, বেশ, আমরা টাকা নেব, কিন্তু তার আগে আপনি আমাদের মাথায় আপনার পায়ের ধুলো দিন, আমরা পবিত্র হই।" কথা শেষ না হইতেই সেই যুবক ও তাহার সহিত তাহার সঙ্গীরা একেবারে উমাপ্রসাদ বাবুর পায়ের নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িল। উমাপ্রসাদ বাবু "হাঁ, হাঁ, কি কর, কি কর, নর-নারায়ণ—বিষ্ণবে নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ," বলিতে বলিতে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কোঁচার কাপড় দিয়া নিজের পা-দুখানি ঢাকিয়া ফেলিলেন।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, এম্, ডি,
(নিউ ইয়র্ক)

সহযোগী সাহিত্য।

মধ্যযুগে প্রাচ্য ভারতে তক্ষণশিল্প।

শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় এবং মানবতত্ত্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতাস্থ ভারতীয় চিত্রশালায় (Museum) তিনি মধ্যযুগে প্রাচ্য ভারতের তক্ষণশিল্প সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা Journal of the Department of Letters vol III এবং স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এই বক্তৃতায় চন্দ মহাশয় যে কেবল পুরাবস্তুর সাহায্যে ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধানে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের এবং ভারতীয় সভ্যতার বিকাশধারার সন্ধানে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে একটা কথা বলা নিতান্তই আবশ্যক। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করিয়া থাকেন। এই পদ্ধতিতে ভাবের বা পূর্ব্বগঠিত সংস্কারের স্থান নাই। বরং ঐ সকল ভাব ও সংস্কারকে মন হইতে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করিয়া কেবল প্রাপ্ত বস্তুর ও ভাবসঙ্গত অনুমানের সাহায্যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কার্য্যটি বড়ই কঠিন। মন হইতে ভাব ও সংস্কার উভয়কে ঠেলিয়া দূরে ফেলা বড় সহজ ব্যাপার নহে। রমাপ্রসাদ বাবু সে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। তাই তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি অনেক সময় সুন্দর হইয়া থাকে। আলোচ্য বিষয়ে তিনি সেইরূপ বিচক্ষণতার ও নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এ স্থলে তাঁহার সন্দর্ভের সমস্ত কথার পরিচয় প্রদান সম্ভবে না। তাই আমরা কেবল তাঁহার সিদ্ধান্তের আভাস মাত্র প্রদান করিলাম।

রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন, প্রাচ্যভারত অর্থে প্রাচীন কালের প্রাচ্যজনের অধ্যুষিত দেশ। প্রয়াগের (এলাহাবাদের) প্রাচিমাবর্ত্তের পূর্ব্ব দিকেই ইহা অবস্থিত ছিল। মনু মধ্য দেশের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, প্রয়াগের প্রাচিমাবর্ত্তই তাহার পূর্ব্ব সীমা। মধ্যযুগ অর্থে উত্তর ভারতীয় ইতিহাসের গুপ্ত সাম্রাজ্যের আবির্ভাব সময় হইতে মুসলমান বিজয়ের সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত ব্যাপী সময়কে বুঝিতে হইবে।

শুঙ্গরাজগণের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে পশ্চিম অঞ্চলে দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত ভাস্কর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; কুশান যুগের মাথুর সম্প্রদায় এবং গান্ধারের গ্রীকো-বৌদ্ধ সম্প্রদায়। এই দুইটী স্বতন্ত্র লক্ষণাক্রান্ত ভাস্কর বিদ্যার সহকারেই প্রাচ্য ভারতে একটি দেশীয় ভাস্করবিদ্যা প্রবলভাবে গড়াইয়া উঠিয়াছিল; সার জন মার্শাল এই মৌলিক ভাস্করবিদ্যাকে জাতীয় ভাস্কর্য্যবিদ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচ্য ভারতের এই প্রাচীন ভাস্করবিদ্যার প্রশাখা মধ্য ভারতের সাঁচি এবং দক্ষিণে অমরাবতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহা বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত রাজত্বকালীন মধ্য-যুগের ভাস্কর-শিল্পের অভ্যুদয়ের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল, সেইজন্য মধ্য যুগের ভাস্কর-শিল্পের স্বরূপ বুঝিবার জন্য প্রাচীন জাতীয় ভাস্কর্য্যের সহিত পরিচয় করা আবশ্যক। কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত প্রাচ্য ভারতের সমস্ত প্রাচীন ভাস্করকীর্ত্তি বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তিতেই দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—বুদ্ধ গয়ার বোধিদ্রুমের চতুষ্পার্শ্বস্থ রেলিঙে এবং ভরহুটের, সাঁচির ও অমরাবতীর স্তূপে উহা দেখিতে পাওয়া যায়; সেইজন্য ইহা প্রাচীন বৌদ্ধ ভাস্কর শিল্প বলিয়া পরিচিত। এই প্রাচ্য ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ-ভাস্করশিল্পের প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহাতে বুদ্ধমূর্ত্তি নাই। তাঁহার সিংহাসন শূন্য রাখা হয়, অথবা বড় জোর তিনি অশরীরী মূর্ত্তিতে তথায় বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদত্ত থাকে। ডাক্তার ফৌচার লিখিয়াছেন যে, এই সমস্ত নির্ব্বাচিত নিদর্শন হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাচীনকালের ভাস্করগণ বোধিসত্ত্বের বা বুদ্ধের মনুষ্যমূর্ত্তি তক্ষণ করিত না। বৌদ্ধ-শিল্পের ইতিহাসিকে প্রথমেই এই রীতিবিরুদ্ধ ও অবিসংবাদিত তথ্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। চন্দ মহাশয় বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র ভারতীয় ভাস্কর শিল্প-প্রসার ইতিহাসের জন্যই যে উহার কারণ নির্দ্দেশ আবশ্যক, তাহা নহে,—কিন্তু ইহা প্রথম ও মাধ্য যুগের ভারতীয় ভাস্করবিদ্যার মূল বনিয়াদ; ইহা ঠিকমত না বুঝিতে পারিলে উত্তর-ভারতের ভাস্করবিদ্যার ইতিহাস বুঝা যাইবে না।

ডাক্তার ফৌচার ইহার একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। সে কৈফিয়ৎ বিশেষভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন যে, যদি তাহারা ঐরূপ বৌদ্ধ মূর্ত্তি রচনা নাই করিত, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের ঐরূপ করিবার রীতি ছিল না। তিনি বলিয়াছেন যে, খৃষ্টধর্ম্ম যেরূপ বহু দিন ধরিয়া প্রতিমা-পূজাবিদ্বেষী দেশে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম সেরূপ প্রতিমাপূজাপ্রবণ

দেশে বিকাশ লাভ করে নাই। এই বিখ্যাত ফরাসী-পণ্ডিত তাঁহার এই সিদ্ধান্তের কোন সমর্থক প্রমাণ প্রদান করেন নাই। পালিনিকায়ও বৌদ্ধাগম জৈনদিগের অঙ্গ ও উপাঙ্গ সমূহে এই উপস্থাপিত প্রসঙ্গের কিম্বদন্তীমূলক প্রমাণ আছে। এই সকল গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের এবং মহাবীরের উক্তির মর্ম্ম লিখিত আছে, এবং বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মাবলম্বীরা উহা অপরোক্ষ ও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগের সমালোচকগণ বলেন, উহা যথার্থ বলিয়া সমর্থন করা যায় না। কিন্তু ঐ সকল নিকায় ও পিঠক যে স্মৃতিস্তম্ভ হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী,—অর্থাৎ সাঁচি এবং বরহুটের রেলিং নির্ম্মিত হইবার বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে এ কথা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। সাঁচির এবং বরহুটের রেলিঙে উহার প্রদাতাদিগের পরিচয় "পচনিকায়", অর্থাৎ পাঁচনিকায়ে পাওয়া এবং "পেঠক্কিন", অর্থাৎ পিঠক জানা বলা হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য ঐ পঞ্চনিকায় আমরা যে আকারে পাইতেছি,—কীর্ত্তিস্তম্ভাদি নির্ম্মাণের যুগে উহা ঠিক সেইরূপ আকারেই ছিল ইহা বুঝা যায় না সত্য, কিন্তু ইহা ত বিশ্বাস করিতে হইবে যে, নিকায়গুলিতে বুদ্ধদেবের যে পাঁচপ্রস্থ কথাবার্ত্তা লিপিবদ্ধ আছে, সেই পাঁচ প্রস্থ কথোপকথন তখনও সংগৃহীত ছিল। চন্দ মহাশয় দিঘনিকায় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহাতে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা ঐ সকল ভাস্করকীর্ত্তি রচিত হইবার বহু পূর্ব্বেও পরিজ্ঞাত ছিল। সুতরাং পালিভাষায় লিখিত বুদ্ধসূত্র এবং জৈন অঙ্গ-ও-উপাঙ্গগুলিতে যাহা লিখিত আছে, তাহা যে সময় ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই প্রাচীন প্রাচ্য ভারতের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অনেক যথার্থ কিম্বদন্তী জানিতে পারা যায়।

চন্দ মহাশয় বলিয়াছেন যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ হইতে ৪র্থ শতাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যুগে প্রাচ্য ভারতের প্রতিটি ধর্ম্ম-জীবনে তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। যথা—

(১) সর্ব্বোপরি নানা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম।

(২) তাহার নিম্নে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বা বৈদিক যাগযজ্ঞ।

(৩) সাধারণের ধর্ম্ম।

এই তিনটি স্তর পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক লেখক প্রাচ্য ভারতে ঐ সময়ে মূর্ত্তিপূজা ছিল কি না, তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

(১) জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের এবং গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সন্ন্যাসী ছিল। মহাবীরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিল। ইহা বিলক্ষণ সম্ভব যে,

প্রাক্যবংশীয় গৌতম বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত শক্য পুত্তিয় শমণ-নামধেয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিল। মহাপদান সুত্তন্তে যে পাঁচজন পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধের জীবনকথা বিবৃত আছে, বরহুটের পার্শ্বস্থ স্তূপিতে তাহা চিত্রিত আছে, ইহার কথা রমাপ্রসাদ বাবু পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। ঐ সকল বৌদ্ধ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কথা বিনয় পিটক, সুত্তভিভঙ্গে উল্লিখিত আছে। বুদ্ধ ককুসন্ধ, কোনাগমন ও কশ্যপ প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসীদলের অস্তিত্ব জ্ঞাপক কয়েকটি গৌতম বুদ্ধের উক্তি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন অন্যান্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, উহারা প্রতিমাপূজক ছিল না। বহুদেবতার উপাসকরাই পৌত্তলিক হইয়া থাকে।—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীরা হয় একেশ্বরবাদী বা অদ্বৈতবাদী (Pentheast) ছিলেন। ভারতীয় একেশ্বর বাদ পৌত্তলিকতার পোষক নহে। জ্ঞানমার্গের উপর ভক্তিমার্গ প্রভাব বিস্তৃত করিবার পূর্ব্বে হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে মূর্ত্তিপূজক হইবার সম্ভাবনা আরও অল্প ছিল।

ঐ সকল পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ছাড়িয়া গৃহস্থদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই উচ্চ বর্ণের যাগ যজ্ঞই ধর্ম্ম ছিল। দেবতার খাদ্য ও পানীয় অগ্নিকুণ্ডেই নিক্ষিপ্ত হইত। তাহাতে মূর্ত্তিপূজা হইত না। সজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণে অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠানে হিরণ্যপুরুষের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা পূজার জন্য নহে। গৃহ্যসূত্রে দেবতার মূর্ত্তি ও প্রতীকের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার পূজা গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল না। ইহার কতক অংশ ভাস্কর কীর্ত্তি আরব্ধ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের না হইতেও পারে।

বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের পর প্রাচ্য ভারতে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ হইতে চতুর্থ শতাব্দে জনসাধারণের পক্ষে চৈত্যের উপাসনা ও সন্ন্যাসীদিগকে ভোজন করানই জনসাধারণের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। রমাপ্রসাদ বাবু অনেক গবেষণাপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, ঐ সকল চৈত্য দেবতাসম্বলিত দেবমন্দির ছিল না, উহা ন্যগ্রোধ প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল। অতঃপর লেখক দেখাইয়াছেন যে, উচ্চ দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাব হইলেও পরে তথায় মনুষ্যমূর্ত্তিতে দেবতার পূজা করা হইত। গ্রীকরা বহু দেবতারাদী ছিল। সাঁচি ও বরহুটের তোরণ ও স্তূপাদির নির্ম্মাণকার্য্য খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে আরব্ধ হয়। তখন প্রাচ্য ভারতের অধিবাসীরা ব্যাকট্রিয়ার শিল্পকুশল গ্রীকদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। সাঁচির অত্যন্ত সান্নিধ্যে খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে তক্ষশিলা হইতে আগত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী জনৈক গ্রীক কর্ত্তৃক একটি গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মিত

হয়। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সম্মিলন প্রাচ্য ভারতের স্বদেশী ভাস্কর্য্যবিদ্যাকে নূতন বল দিয়াছিল। তখনও প্রতিমাপূজা আরব্ধ হয় নাই। গুহার প্রধান দেবতা বুদ্ধের মূর্ত্তি তখনও প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু ইতর সাধারণের উপাস্য দেবতা যক্ষ নাগ বৌদ্ধের উপাসক বলিয়া বৃত্তি পাইয়াছিল। কিন্তু ইহাদিগের অতি মানুষিক ভাব মূর্ত্তিতে প্রতিবিম্বিত করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। ইহাই মূর্ত্তি পূজা প্রচলনের প্রথম ধাপ। ঐ সকল মূর্ত্তির আকৃতি ও মুখের ভাব ঠিক মানুষের মত করিয়া রচিত করা হইত।

অমরাবতীর স্তূপ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরব্ধ হয় এবং অন্ততঃ চারিশত বৎসর ইহার নির্ম্মাণকার্য্য চলে। প্রথম আমলের ভাস্করকীর্ত্তিতে বৌদ্ধ মূর্ত্তি নাই। শেষ আমলের ভাস্করকীর্ত্তিতে ঐ মূর্ত্তি আছে। কিন্তু মূলস্তূপ প্রভৃতিতে অতিমানুষিক বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

রমাপ্রসাদ বাবু এ পর্য্যন্ত যে যুগের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধের সময় হইতে বুদ্ধের পর দ্বিতীয় শতাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সময় নানা জাতির মিশ্রণ ঘটে। গুপ্ত-রাজগণের আমলে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময় মূর্ত্তি পূজা আরব্ধ হইয়াছে।

পুরাবস্তু হইতে সংগৃহীত প্রমাণ হইতে কোন্ সময়ে কি ভাবে প্রাচীন ভারতে মূর্ত্তিপূজা প্রবেশ করিয়াছে, চন্দ মহাশয় তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, লক্ষ্ণৌএর যাদুঘরে একটি বৌদ্ধ মূর্ত্তি আছে। উহা মথুরার চৌরাসী ডাঙ্গালে প্রথম পাওয়া যায়। ইহাতে লিখিত আছে, হবিষ্কের রাজত্বের ৩৯ বৎসরে ত্রিপিঠকজ্ঞ ভিক্ষু বালার অন্তেবাসিনী ভিক্ষুণী ধনবতী কর্ত্তৃক মথুরবণকে একটি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মথুরবণকে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, মূর্ত্তিটি মথুরায় ছিল। মথুরা অনেক বলিয়াও পরিচিত। কলিকাতার যাদুঘরে এক একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে, উহা সাহেথ মাহেথে পাওয়া যায়। ঐ স্থানটিতে প্রাচীন শ্রাবস্তীনগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহাতে যে ক্ষোদিত লিপি আছে, তাহাতে প্রকাশ যে, কণিষ্কের রাজত্বকালের ১৯ম বর্ষে ত্রিপিঠকজ্ঞ ভিক্ষু বল কর্ত্তৃক একটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, একটি ছত্র ও দণ্ড প্রদত্ত হইল। সাহনাথেও একটি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি ও ছত্রদণ্ড ভূগর্ভ হইতে বাহির করা হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, কণিষ্কের রাজত্ব কালের তৃতীয় বর্ষে ত্রিপিঠকজ্ঞ ভিক্ষু বল বারাণসী ভ্রমণে আসিয়া একটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি ছত্র ও ছত্রযষ্টি দান করিলেন। সাহনাথ, শ্রাবস্তী ও মথুরায়

যে ভিক্ষুরূপের নাম আছে, তিনিই যে একই ব্যক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মূর্ত্তিগুলি মথুরার বেলে পাথরে নির্ম্মিত, মথুরার শিল্পিগণ কর্ত্তৃক উহা ক্ষোদিত। নাচিতে যে প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও মথুরার বালুকা প্রস্তর নির্ম্মিত ও তথাকার ভাস্কর সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ক্ষোদিত। ইহাতে যে লিপি আছে, তাহাতে প্রকাশ কুষণরাজ সহি বসিষ্কের রাজত্বের ২০ম বর্ষে জম্বুচ্ছায়া শৈল গৃহস্থ ভগবতের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে এবং ভারতের ধর্ম্মবিশ্বাসের তদানীন্তন অবস্থা হইতে চন্দ মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উক্ত রাজগণের আমলেই প্রাচ্য ভারতে মূর্ত্তি পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। মূর্ত্তি নির্ম্মাণের সহিত ভক্তি ধর্ম্ম যোগ দিয়া এই মূর্ত্তি পূজা প্রচারের বনিয়াদ পত্তন করেন। রমাপ্রসাদ বাবু তাহার সন্দর্ভে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ ভাবে পুরাবস্তুর ও ভাবের দিক হইতে কেহ এই বিষয়ের আলোচনা করেন নাই।

স্মৃতির সাধনা।

কত স্মৃতি চারিধারে উঠে উথলিয়া
এই গৃহ, এই পথ, এই ফুল-বন,
পবিত্র নিঃশ্বাসে তার রয়েছে ভরিয়া
সে ফেলেছে কতবার এখানে চরণ!

যখন যে দিকে চাই তারে পড়ে মনে
এখানে সে বসিয়াছে, এখানে দাঁড়ায়ে
বলেছে সে এই কথা, হেথা নিরজনে
অধরে হৃদয়ে গেছে কি সুধা ছড়ায়ে!

সকলি সজীব যেন! তারি মধু হাসি,
তার কথা, তার খেলা, তার পরশন,
এখনো পরাণে মোর বাজাইছে বাঁশী—
বুঝি না সে হয়ে গেছে অতীত কখন!

স্মৃতির এ পীঠভূমে একা বসে হায়,
আজ আমি ডুবে গেছি তারি সাধনায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ওঁ

নূতন খাতা।

শিক্ষার সংঘর্ষ।

বর্ত্তমান যুগে গান্ধী-বিধৃত জাতীয় বিদ্যালয় ও আশুতোষ-প্রতিষ্ঠাবান্ স্কুল কলেজ লইয়া যেমন একটা তুমুল সংঘর্ষ চলিতেছে, পূর্ব্ব পৌরাণিক যুগেও ইহার অনুরূপ ঘটনা একেবারে যে না হইয়াছে তাহা নয়। পূর্ব্বেও এককালে বিদ্যার আধার কাশীক্ষেত্রকে লইয়া আশুতোষ বিশ্বনাথের সঙ্গে গাধিসুত বিশ্বামিত্রের কম প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে নাই। একদিকে বিশ্বনাথের কাশী, আর অন্যদিকে বিশ্বামিত্রের বা গাধি বংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত নূতন বাসকাশী। নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্বামিত্রের কাশীতে মহা মহা ব্যাসেরা আসিয়া যোগ দিলেও শেষে কিন্তু বিশ্বনাথের কাশীরই জয় হইয়াছিল।

স্বর-সাধনা।

ভগবানের রাজ্যে সঙ্গীতের বিরাম নাই। যুগে যুগে নব নব সুরে গান চলিয়াছে। আমাদের ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে নূতন ভাবে স্বর-সাধনা চলিয়াছে দেখিতেছি। সেই যে স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হইল, লর্ড কর্জ্জন সেই যে বঙ্গ-বীণার তন্ত্রীতে পার্টিশনরূপ পর্দ্দায় অঙ্গুলীর নিক্ষেপে এক ঝঙ্কার তুলিয়া দিলেন, সেই ঝঙ্কার হইতে এই নূতন সঙ্গীতের সূত্রপাত। এই অভিনব স্বর-সাধনায় স্বদেশী আন্দোলনকেই প্রণব 'সা' সুর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 'সা'র পরে 'রে' বা রেখাব সুর। রেখাব শব্দ প্রকৃতপক্ষে ঋষভ শব্দ। ঋষভ অর্থে বৃষ বা ষাঁড়। বৃষভেরা যেমন রজ্জুবদ্ধ

ব্যাসকাশী যে গাধিবংশীয় বিশ্বামিত্র প্রতিষ্ঠিত কাশী, তাহা অন্যত্র প্রমাণিত হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের নাম হইতে "বিশ্ব কাশীর" অপভ্রংশ হইয়াও ব্যাসকাশী হইতে পারে। ব্যাসকাশীর নিকটবর্ত্তী "গাজীপুরের" প্রকৃত নাম "গাধিপুর।" গাজীপুরের নামকরণ নানা কীর্ত্তির নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়।

বন্ধ হয়, যেইরূপ রেখাব সুরের কানে ইটর্ন আদি বন্ধন-ভয়ের ধুম পড়িয়াছিল। বর্ত্তমানে গান্ধির সুর চলিয়াছে। গান্ধির সুরকে গা বা গান্ধারস্বর বলা যেতে পারে। স্বর-সাধনায় ভারতের কণ্ঠে সুর ধাপে ধাপে উচ্চে উঠিতেছে দেখিতেছি। রেখাব ও গান্ধারের বিশেষত্ব কোমলত্বে। রেপাবের যেমন কোমল রেখাব আছে, গান্ধারের তেমনি কোমল গান্ধার আছে। কড়ি রেখাব বা কড়ি গান্ধার নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে সেই সুর আসিতেছে যাহা মধ্যম সুর; যাহার কোমল নাই কেবলি কড়ি-মধ্যম আছে। আমাদের ভয়, এই সুরের আমলে দেশে বুঝি বা বড়ই কড়াকড়ি ভাবে কার্য্য চলিবে। মধ্যমের উপরে যে পঞ্চম স্বর তাহার ত কথাই নাই। সে এক নিজেই চড়া সুর। তাহার কড়িও নাই কোমলও নাই। পঞ্চম স্বর বড় সোজা নয়। পঞ্চম নামেই তাহার পরিচয়। "নৃত্যুর্বা বিতি-পঞ্চমঃ" আগে মধ্যম পর্য্যন্ত স্বরসাধনা চলুক, তৎপরে পঞ্চম-ধৈবত ও নিখাদের কথা বিশেষভাবে বলা যাবে।

চায়ের পেয়ালা।

আসাম প্রদেশটি যেন পাহাড়ে ঘেরা-ঘোরা চিত্র বিচিত্র একটি সুন্দর চায়ের পেয়ালা। বাঙ্গলা দেশ তাহার তলায় যেন চায়ের একখানি পিরিচ। এই যে রেল ও ষ্টীমার যাহারা চা বহন করিয়া আনিয়া লোকদের যোগান দিতেছে, ঐগুলি হচ্ছে চায়ের চামচা। চা-করদের অবিরাম পরিশ্রম উহার গরম জল। বিদেশ হইতে আগত চা-কুলীরাই উহার ক্ষীর বা দুধ। এবং কুলিদের প্রতি মিষ্ট ব্যবহারই চায়ের চিনি। এই সব উপকরণ লইয়া চা তৈয়ারী কর—চা পানে পরিতৃপ্ত হবে।

বাঁশঝাড় ও নারিকেল গাছ।

ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও হিন্দুদের পূর্ব্বপ্রচলিত প্রাচ্য শিক্ষা এই দুই শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিক্ষা এই দুই শিক্ষা প্রণালীকে দুইটি গাছের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বাঁশের সঙ্গে এবং পুরাকালের প্রাচ্য শিক্ষাকে নারিকেল গাছের সঙ্গে তুলনা দিলে ঠিক হয়। বাঁশ ও নারিকেল দুইটি গাছই মানবের উপকারী। বাঁশ যেমন ঘর দোর প্রস্তুত প্রভৃতি সংসারের নানাবিধ কাজে উপকারে লাগে, সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষাও সংসারের নানা বিষয়ে উপকার দেখায়। এই যে স্কুল কলেজ থেকে নিত্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ

পাশ হইতেছে, ইহারা বাঁশঝাড়ের মত গজাইয়া উঠিয়া বাঁশবনে পরিণত হইতেছে। বাঁশ গাছের ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষার হাওয়া কিন্তু বড়ই খারাপ। এই যে সব নাস্তিক্য ভাব—রাজদ্রোহিতা-আদি দেখা দিয়াছে, এ সকল ঐ বদ হাওয়ার গুণে। সকলেই জানেন বাঁশবনের হাওয়ায় সব জ্বালাইয়া দেয়।

নারিকেল গাছ—এমন মহোপকারী পাদপ আর দেখা যায় না। উহা বৃক্ষের মধ্যে গাভী তুল্য। নারিকেলের হাওয়া কোনরূপে অনিষ্টকারী নয়। হিন্দুর শিক্ষাপ্রণালী গুরু-প্রসূত। সদ্‌গুরুর শিক্ষার ফল যদিও নারিকেল গাছের ন্যায় বিলম্বে ফলে; কিন্তু পরিণামে উহা যে জগতের অশেষ কল্যাণ আনয়ন করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সূত্র।

ব্রাহ্মণেরা কি কম বুদ্ধিমান্ ছিলেন? অত সূক্ষ্ম বুদ্ধি পৃথিবীতে আর কোন জাতির ছিল কিনা সন্দেহ। এক সূত্র হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে যে সূত্র সূত্র করিয়া দেশব্যাপী হাহাকার উঠিতেছে, গরীব ব্রাহ্মণদের প্রথানুসারী হ'লে আর সে হাহাকার উঠিত না। তাঁহারা সূত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া সূত্রকে রত্নালঙ্কারের ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। ঘরে ঘরে তখন সূত্র তৈয়ারী হ'ত। এমন কি সূত্রের জন্য কার্পাস গাছ ঘরে ঘরে দেব-উদ্দেশে রোপিত হইত। একটি কার্পাস গাছে আমরা দেখেছি একটি পরিবারের বস্ত্রাদি বেশ কুলাইয়া যায়।

এই পরিধেয় বস্ত্রের সূত্রকে ব্রাহ্মণরা কেমন করিয়া যে আহারে, লোকসেবায় এবং সর্ব্বোপরি জ্ঞানের কার্য্যে নিয়োগ করিলেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। খাওয়া পরা এবং ধ্যান ধারণাকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাঁহারা যে কি মহাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বলা যায় না! তাঁহারা এই সূত্রকে পারমার্থিক কার্য্যে নিয়োগ করিয়া যেমন ব্রহ্মসূত্ররূপে বরণ করিয়াছিলেন, তেমনি খাওয়া পরা লোকসেবা প্রভৃতি ব্যবহারিক কার্য্যে, যজ্ঞকার্য্যে নিয়োগ করিয়া উহাকে যজ্ঞসূত্ররূপে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরিধেয় সূত্র, যজ্ঞসূত্র ও ব্রহ্মসূত্র এই তিন সূত্রকে একত্রে আনয়ন করিয়া জগতে সূত্রের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীঋভেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চুটকা।

১। কালরং সাটীন পরিষ্কার করিবার নিয়ম—

প্রথমে ৪ আউন্স নরম সাবান, ৪ আউন্স মধু, ডিমের কিছু সাদা অংশ এবং ডিষ্টিল্ড স্পিরিট (Distilled spirit) মদের মাসের মাপের একগ্লাস লইবে। উক্ত দ্রব্যসমূহ একত্রে মিশাইবে ও যাহা পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহা ঐ জলে কেলিয়া একখানি কড়া বুরুষ দিয়া ঘসিতে থাকিবে, পরে উহা ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া লইবে ও তুলিয়া জল ঝরিতে দিবে। পরে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হইয়া যাইলে ইস্ত্রী করিয়া লইবে।—

২। ফিতা পরিষ্কার করিবার নিয়ম, অথচ রং খারাপ হইবে না ঃ—

প্রথমে জলে সামান্য বোরাক্স (Borax) দিয়া সাবানের বেশি ফেনা করিবে, এক্ষণে ফিতাগুলি এমন সতর্কভাবে উহাতে ঘসিবে যেন জড়াইয়া না যায়, পরে অপর একটি পাত্রে জল দিবে ও তাহাতে এক চামচ (Tea spoon) ভিনিগার (Vinigar) মিসাইয়া লইবে। একটি ইস্ত্রী উত্তম রূপ তপ্ত করিয়া রাখিবে। এক একটী ফিতা উপর নীচে কাপড় দিয়া তাহার মধ্যে ফিতা রাখিয়া ইস্ত্রী করিবে। দেখিবে কেমন রং সহ পরিষ্কার হইয়াছে।—

৩। গরম কাশ্মীরা ইত্যাদি জামা কাপড় হইতে তেলের বা ময়লা দাগ তুলিবার নিয়ম ঃ—

প্রথমে যে স্থানটী পরিষ্কার করিতে হইবে, তথায় কিছু ভাল টার্পিন (Terpentine) তৈল লাগাইবে, ও এক টুকরা পরিষ্কার (Flannel) দ্বারা তৎক্ষণ অবধি না সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক হইয়া যায়, ঘসিতে থাকিবে, যদি পরিষ্কার না হয় পুনরায় ঐ রূপ করিবে ও বুরুষ দিয়া ঘসিয়া বাহিরে হাওয়ায় ঝুলাইয়া দিবে।

৪। কাপড় হইতে তেলের রং তুলিবার নিয়ম ঃ—

এক টুকরা ছেঁড়া তুলায় লেপ Rect spiritএ বেশ করিয়া ভিজাইয়া যে স্থানটিতে রং লাগিয়াছে উহার উপর রাখিয়া, একটি ভারী লৌহ খণ্ড উহার উপর চাপাইয়া রাখিবে, ২।৩ ঘন্টা পরে উহা তুলিয়া দেখিবে যে রং লাগা স্থানটী সহজে পরিষ্কার হইয়া যাইবে, তাহার পর ঐ স্থানটী Benzine দিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।—

৫। আলপাকার জামা পরিষ্কার করিবার নিয়ম :—

১ সের চাউল ২ গ্যালন জলে উত্তম রূপে সিদ্ধ করিবে, উহা হইলে একটি পাত্রে যে দ্রব্য পরিষ্কার করিবে, তাহা ইস্ত্রী করিতে যতটুকু আবশ্যক হইতে পারে, আন্দাজ করিয়া রাখ। বাসী মাড় যাহা থাকিবে, উহা কিছু ঠাণ্ডা করিয়া উহাতে আলপাকার দ্রব্য ধৌত করিবে। সাবান ব্যবহার একেবারে করিবে না। ধৌত করিয়া উত্তমরূপে নিংড়াইয়া পূর্ব্বে ইস্ত্রী করিবার জন্য যে মাড় রাখা আছে, তাহা দিয়া অতি সত্বর অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করিয়া লইবে, উহা হইলে ঠাণ্ডা ইস্ত্রী দিয়া ইস্ত্রী করিয়া লইবে।

৬। কোন স্থান হঠাৎ পুড়িয়া যাইলে, তাহার জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করিতে হইলে, পাতলা গুড় বিশেষ উপকারী বা চুণের জল ও লিনসিড তৈল সমান পরিমাণ লইয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া পোড়া স্থানে লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। সামান্য রূপ পুড়িয়া গেলে ঠাণ্ডা জল দিয়া ভিজাইয়া পোড়া স্থানে সাবান দিয়া আস্তে ঘসিবে ও পরে এক টুকরা গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে।

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগমনী।

সকল রসের উৎসরূপিণী এস মা ঈশানী এস,
সকল হৃদয় মধুর সরস করি'।
তুমি কৃপাময়ী জগৎজননী এস মা অভয়া এস,
করুণাধারায় ভাবনা-বেদনা হরি॥
শান্তরসের তুমি মা প্রতিমা এস মা শারদা এস,
শারদ-যামিনী বোধন-রাগিণী ভরি'।
বিভীষিকাময়ী ভীমা করালিনী এস মা রুদ্রাণী এস,
অধম সুতের জীবন-শ্মশান পরি॥
বীরের জননী বীর প্রসবিনী এস মা বরদা এস,
হীনতা দীনতা পড়ুক সভয়ে সরি'।
মহাসাগরের কল্লোল তুলি, এস মা ভবানী এস,
ভাষার অকূলে আজিকে মানস-তরী॥
বীর ও রৌদ্র রসের মূরতি তুমি মা শিবানী এস,
জড়িমা-আঁধারে আলোক-চেতনা গড়ি'।
এস মা, এস মা সঙ্গীতময়ী, তৃষিত আকুল প্রাণে

মাসিক সাহিত্য সমালোচনী।

(শাগ রেদী।)

প্রবাসী শ্রাবণ—প্রথম প্রবন্ধ নলিনীকান্ত গুপ্তের 'যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি।' বক্তব্যের চেয়ে ভূমিকা লম্বা হইলে দ্বিতীয় বক্তব্যের অভাব না হয় গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতার অভাব সূচিত হয়। প্রবাসী সম্পাদক বোধ হয় আজ কাল ইংরেজীর অনুবাদেই বাঙ্গালা রচনারীতির আদর্শ স্থির করিয়াছেন, তাই বাছিয়া বাছিয়া অবোধ্য ইংরেজীগন্ধী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধটিকে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম স্থান দিয়াছেন। লেখক মহাশয় বলিতেছেন—ফলে, মানুষের অঙ্গের ইন্দ্রিয়ের আছে যে-সব স্বাভাবিক ক্ষমতা তাহা ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে না, অনভ্যাসের অথবা বিগর্হীত অভ্যাসের দরুণ সে-সব শুকাইয়া মরিয়া যাইতেছে।'—এই একটি পদের ভিতরেই ক্রিয়ার সংস্থানে দুইটি বিভিন্ন রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে। 'মানুষের অঙ্গের যে সব স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে' লিখিলে যে কি মহাপাতক হইত, তাহা বুঝিবার সাধ্য আমাদের নাই। আর ক্রিয়াটাকে পিছু হটাইয়া দিলেই যদি 'গদ্য কাব্য' হয় তবে 'তাহা পাইতেছেনা ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ' লেখা হইল না কেন? আবার 'বাস্তব বস্তু'টা কি রকমের বস্তু, তাহা গুপ্ত মহাশয় অথবা তাঁহার মুরুব্বি প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে খোলসা করিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দিবেন কি? ইংরাজীতে ত দেখিলাম বন্ধনীর মধ্যে facts লেখা রহিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে এখন এমন অনাচার ঢুকিয়াছে যে, পশ্চিমে বলশেভিজম্ বাদের তাণ্ডব নর্তন সত্ত্বেও তাহার প্রতি আর উদাসীন থাকা চলে না। ফরাসী দেশের একাডেমির মত একটা সংঘ গঠন এখানেও একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

ঋষিপতির 'ঘরের ডাক' ও সম্পাদক-দুহিতার 'রজনীগন্ধ' চলিতেছে, সুতরাং নৌরভের যাচাই করিবার সময় এখনও হয় নাই। শ্রীযুত সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'গ্রাম' সুলিখিত প্রবন্ধ। এই প্রকার রচনার সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত লেখকের অভাব। অনেকে ইংরেজী [illegible]

ব্রাক্ সেও মন্দের ভাল। সকলের ত আর লাহার পাণ্ডিত্য নাই। 'চতুর্থ পক্ষ' ভাল গল্প। 'প্যারিসে একশীত' চলিতেছে—সুখপাঠ্য।

মহিলা মজলিসের নারীলিখিত প্রবন্ধগুলির সমালোচনা করা নিরাপদ নহে। সমালোচকের কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে মহিলার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিবার অভিযোগ হইতে পারে। শ্রীহীন চারুচন্দ্রও দেখিতেছি শুষ্ক মুণ্ডল করিয়া বেমালুম মহিলামহলে মিশিয়া গিয়াছেন। অতএব সব গুণে তিনিও সমালোচনার অতীত। কিন্তু কৌতূহলের নিবৃত্তির জন্য তাঁহাকে একটি প্রশ্ন মাত্র জিজ্ঞাসা করিব। 'চেঁড়ো কেশব' নামটি তিনি কোথায় পাইলেন? দেবনাগর অক্ষরে অধ্যাপক কার্ণের নামত দেখিয়াছি খোদ্ত কেশব। বোধ হয় ইংরাজী রূপান্তরের বাঙ্গালা অনুলিখন। তাই না হইলে পাণ্ডিত্য আর কি?

জিজ্ঞাসার ভিতরে দেখিলাম সম্পাদক মহাশয়ের অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নের জবাব আসিয়াছে। আশুতোষের অবতারত্বের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সম্পাদকীয় মন্তব্য নাই যে? কৃশিয়ার অসমছন্দের কবিতার নমুনা দিয়া কে মন্তব্য করিতেছেন—"এই অভিনব 'প্রাণখোলা' কবিতা পড়িয়া আমাদের প্রাণ ভয়ে কাঁপে। কেন এস ছোকরারা শনি দুরন্ত, বেপরোয়া হয়ে বিচাও হে, এখন বন্ধ কি? গাছে গাছেইত উহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আর পুরুষ তোর উচ্চ করে নাচা" ইত্যে বলিলে ত তার পর দন্ত খিঁচাইবেই।

ঔরঙ্গজীবের কলঙ্কমোচনে নূতন তথ্য আছে। সকলেরই পাঠ করা উচিত।

আলোচনায় বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সহিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এক হাত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য জিত রামানন্দেরই, কারণ যে নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়াও বিজ্ঞতার ভাণ করে, তাহার পরাজয় এযুগে হইবে না। বলি ওহে সর্ব্বজ্ঞ, পরীক্ষকের যে তালিকা দিয়াছে তাহাতে Anthropology পণ্ডিত আমরাত দেখিতে পাইয়াছি। কে বলিলে বোধ হয় আপত্তি উঠিবে। ঐ যে বর্গীর দেশের ভাণ্ডারকর উহাকেই বোম্বাই সরকার ethnographical surveyর সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন শ্রীমান্ বিরজাশঙ্করের তোমার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় প্রবাসীর জন্মের বহু পূর্ব্বে। Foreign elements in Indian population নামক নিবন্ধটির নাম শুনিয়াছ কি? না শুনিয়া থাক পুরাতন Indian Antiquary হইতে তোমার আকিলে খাটকে খুঁজিয়া দিতে বলিও। তবে সে প্রবন্ধ তোমার মত সর্ব্বজ্ঞ ও বিশেষ

সঙ্কের বোধগম্য হইবে কিনা বলিতে পারি না। এত দিন পরে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দলীপ সিংহকে বন্দনীয় ধর্ম্মবীর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ভ্রম ও অজ্ঞতার জন্য 'দুঃখিত ও অনুতপ্ত' হইয়াছেন। একটু খোঁজ খবর লইয়া তার পর কলম ধরিলেই ত অনুতাপের কারণ থাকে না। তোমার স্বাধীন মতটা প্রকাশে একটু দেরী হইলে বাঙ্গালার কোন ক্ষতি ত হয়ই না, বরং তোমার এবং প্রতিবাদকারিগণের কিছু কালী ও কাগজ বাঁচে। কাগজের দুর্ভিক্ষের দিনে তাহা কম লাভের কথা নহে। তবে এই আলোচনায় যে কয় পৃষ্ঠা পূর্ণ হয়, তাহার জন্য পঠিতব্য প্রবন্ধ সংগ্রহের ক্লেশ তোমাকে, সহিতে হইবে বটে।

বিবিধ প্রসঙ্গে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বাদ যায় না। কিন্তু হিসাবের প্রণালীটি অপূর্ব্ব। বিদ্যালয়ের ছেলেদের মোটের উপর গড়পরতা খরচ দেখান হইয়াছে। আর কলিকাতার খরচ দেখান হইতেছে—এক একটি বিষয় ধরিয়া। 'যারি অরি পারি যে কৌশলে।' রামানন্দী রীতিতে হিসাব করিলে কেম্ব্রিজে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রতিমাসে ছাত্র প্রতি কখনও কখনও হাজার টাকা খরচ পড়ে, সে তুলনায় কলিকাতায় সংস্কৃতে ৬২ ও পালিতে ১৮৫ নিশ্চয়ই বেশী নহে। ইংলণ্ডের প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃতের একাধিক অধ্যাপক আছেন; তথায় দুই তিন বৎসর অন্তর একটি কি দুইটি ছাত্র পাওয়া যায়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক সময় শিক্ষকতা করিয়াছেন। শিক্ষার কথা তিনি বুঝেন ভাল, তাই এ শিক্ষাসম্পর্কীয় বিষয়ের এক তরফা বিচার করেন এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সত্যকে মিথ্যা বানাইয়া দেন। ইহাতে তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী ক্ষমতার তারিফ করিতে হয় বটে। কিন্তু বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নীতির পক্ষপাতী না হইলেও এই কথা লিখা প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ আমাদিগকে করিতেই হইবে।

দুই একজন লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, জগতে তাঁহারাই একমাত্র সাধুতা, সদাচার, বিদ্যা ও বুদ্ধির আধার; অপর কাহারও এ সকল গুণ নাই। 'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয়ও বোধ হয় এই দলের। কারণ তিনি স্থির করিয়া মনে করিলেন যে, শিক্ষিত জননায়কেরা পতিতা নারীদিগকে লইয়া ভলান্টিয়ারের দল গঠন করিতে পারেন। প্রবাসী সম্পাদকের ইহা লিখিতে শঙ্কা হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বাস করিতে অপ্রবৃত্তি হয় নাই। একটু স্থির ভাবিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের হানি হইত

কি? দুই দিন পরেই ত সকল দৈনিক কাগজে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। কেবল বিশ্বাদিগণ হইলেই হয় না, একটু ধৈর্য্যও চাই, কেবল সাধু হইলেই সুবিচার করা যায় না, বিচারকের সহানুভূতিও দরকার।

মানসী ও মর্ম্মবাণী শ্রাবণ, প্রবন্ধ গৌরবে মানসী বাঙ্গালা মাসিক সঙ্ঘের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। মানসীর প্রবন্ধগুলিতে পাণ্ডিত্য আছে, লিপিকুশলতা আছে, নাই কেবল অযথা ঘুরাইয়া বলিবার, দীর্ঘ ভূমিকার আড়ম্বর। প্রথম প্রবন্ধ 'প্রাচীন ভারতের প্রসাধন' সুলিখিত সুপাঠ্য। শ্রীবীরেশ্বর সেনের 'পুলিনের গল্প' ও শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটকের 'লিডি প্রেমের বিচার' সকলেরই ভাল লাগিবে। ইন্দিরা দেবীর স্রোতের গতি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। পল্লীশব্দ ও ঋষিবাক্য পূর্ব্ব সাহিত্যে বস্তুপক্ষে দুইটিতেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। তবে শ্রীযুক্ত সুধরঞ্জন রায় ভাষার কসরত করিতে চেষ্টা না করিলেই ভাল হয়। যাহা সরল, তাহাই স্বাভাবিক। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিলেই কবিত্ব হয় না। ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রবন্ধ তিনটি একটি মহিলালিখিত; অপর দুইটি লেখক শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য ও শ্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। উভয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ তিনটি প্রবন্ধই সুখপাঠ্য। ক্রমপ্রকাশ উপন্যাস দুইটির সমালোচনা এখন করিব না। মানসীতেও দেখিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচার চলিতেছে এবং একদিকে রামানন্দ বাবু। তিনি বলিয়াছিলেন—(তাঁহার ছাত্র) শরৎ বাবুকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা offer করেন নাই। এখন বলিতেছেন formal offer করা হয় নাই। তাহা হইলে একটা informal offer হইয়াছিল কি না খোলসা করিয়া বলিলে দোষ আছে কি? না বুঝিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য বলিবার প্রয়োজন নাই। মন্ত্র পঞ্চ বিষয়ে অনন্তবাবুর সমর্থন করিয়াছেন, রামানন্দ সংহিতায় তদধিক আর একটি বিষয় পাওয়া গেল—যেখানে মিথ্যা বলিলে অথবা আংশিক সত্য (?) বলিলে পাপ নাই। সাধু!

বৈঠকী।

একটা কথা ভাবিয়া বুঝিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিব। হিন্দু-হিন্দু—বল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে শ্লাঘা কর, বঙ্গদেশে হিন্দুয়ানী আছে কি? ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সে প্রসার আর দেখিতে পাও কি? পুত্র-কন্যার বিবাহ এবং বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কোন সামাজিক বা ধার্ম্মিক কর্ম্ম হয় কি? পূজাপাঠ দোল-দুর্গোৎসব—সে সবত উইলের কর্ম্ম; বুড়া বাপ-ঠাকুরদাদা উইল করিয়া লিখাছেন বার্ষিক দোল-দুর্গোৎসব না করিলে জমীদারী যে উপভোগ করা চলে না; কাজেই সে সকল নমোনমঃ করিয়া শেষ করিতে হয়! অবশ্য কর্ত্তব্য হিসাবে,—নিত্য কর্ম্ম হিসাবে কয়জন দোলদুর্গোৎসব এবং দশবিধ সংস্কার সম্পন্ন করেন?

* * *

ইহাত গেল একদিকের কথা। অন্য দিকে পুরোহিতের কাজ করিতে এখনকার ব্রাহ্মণসন্তান বড়ই নারাজ। একটু ইংরেজি অক্ষর পেটে পড়িলেই সকলেই Respectable বা পদস্থ হইতে চাহে। ইংরেজি নবীশমহলে "পুরুৎ" বড়ই হেয় পদ ও কর্ম্ম, বিশেষতঃ "জাতি-পুরোহিত" যাঁহারা, তাঁহারাত সে কথা গোপন করিতে পারিলে ছাড়ে না। পূর্ব্বে সকল জাতিরই গুরু পুরোহিত ছিল; ব্রাহ্মণেতর জাতির পৌরোহিত্য যে সকল ব্রাহ্মণে করিত, তাহাদিগকে শূদ্রযাজী বলা হইত। ইহা ছাড়া জাতি পুরোহিত ছিল—যেমন তিলি-তাম্বুলির পুরোহিত; সুবর্ণবণিকের পুরোহিত, নমঃ শূদ্রের পুরোহিত ইত্যাদি। এই জাতি-পুরোহিত প্রায় লোপ পাইয়াছে।

* * *

গুরু তিন রকমের ছিল—তান্ত্রিক, বৈদিক বা স্মার্ত্ত এবং বৈষ্ণব গোস্বামী। তান্ত্রিক, কৌল গুরু সর্ব্ব জাতির গুরুগিরি করিতেন, এজন্য তাঁহাদের জাতি বাধিত না, তাঁহারা সমাজে পতিত হইতেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তান্ত্রিক গুরুর প্রাধান্য বাঙ্গলায় খুব প্রবল ছিল। স্মার্ত্ত ও বৈদিক গুরু যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই শূদ্রযাজী হইতেন না। নবদ্বীপ, শিবপুরের

ও ভট্টপল্লীতে এই শ্রেণীর গুরুর আবাস ছিল। রাজা রাজবল্লভের সময় হইতে ইহাঁদের দুই চারিঘর বৈদ্য শিষ্যও করিয়াছিলেন। ইহাঁরা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও আচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং আচারধর্ম্মের প্রচার করিতেন। বৈষ্ণব গোস্বামিগণ সর্ব্বজাতির গুরু হইতেন, বিশেষতঃ পতিত জাতি সকলের গুরুগিরি শেষে ইহাঁদের একচেটিয়া হইয়াছিল। তান্ত্রিক কৌলদিগকে ইহাঁরা অনেকটা কোণঠ্যাসা করিয়াছিলেন।

* * *

এই সকল গুরু এবং পুরোহিত বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজকে সংহতিশক্তি দিয়া কতকটা সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে গুরু-পুরোহিতের ব্যবসায় অনেকটা হেয় হইল এবং ব্যবসায়গত লাভ একেবারে রহিল না। ফলে, বুদ্ধিমান পুরোহিত-পুত্রগণ ইংরেজি শিক্ষা করিয়া উকীল ব্যারিষ্টার হইতে আরম্ভ করিলেন। অনেকে ভট্টাচার্য্য উপাধি পরিহার করিয়া কুলীনের উপাধি চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় হইলেন। তাহার উপর ইংরেজি সভ্যতার প্রভাবে সমাজে বড় লোক ছোট লোকের ভেদ নির্দ্দেশ হইতে লাগিল। ছোট লোকদের গুরুগিরি বা পৌরহিত্য যেন অনেকের পক্ষে বিষম লজ্জাজনক হইয়া উঠিল। যাহার দ্বারা সমাজ সংহত ছিল, যাহাদের চেষ্টায় সমাজ সঞ্জীবিত ছিল, তাহা এলাইয়া পড়িল, তাহারা নিষ্ক্রিয় দাঁড়াইল।

* * *

অথচ শত-শতবর্ষের কর্ম্মসংস্কার এক কথায় ত দূর হইবার নহে। বাঙ্গালী ধর্ম্মপিপাসা ত এক মুহূর্ত্তে অপসারিত হইবার নহে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, জাতকের জাতকর্ম্ম করিবার পুরোহিত নাই। জনক স্বর্গারোহণ করিলেন, তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ করিবার যোগ্য পুরোহিত নাই। গুরু আর গৃহপ্রাঙ্গণে পদার্পণ করেন না। নূতন নূতন ছেলে-মেয়ে বড় হইল, গৃহস্থালীর ভার তাহাদের স্কন্ধে পড়িবে, অথচ তাহারা অদীক্ষিত এবং অশুদ্ধ রহিয়াছে! এমন ভয়ানক অবস্থা ত বাঙ্গালী বহুদিন সহ্য করিয়া থাকিতে পারে না। তাই পরে বাঙ্গালী গ্রামীণগণ ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। মুসলমান সমাজে এখনও গুরু পুরোহিতের সংখ্যা কম নহে, মোল্লেমগণ ধর্ম্মিক কর্ম্ম নিয়মিত ভাবে করিয়া থাকে। ফলে দলে দলে বাঙ্গালী মুসলমান হইতে

আরম্ভ করিল। শেষে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রসারও কম হয় নাই। গত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সমধর্ম্ম গণনায় বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যায় মোট দেড় কোটি মুসলমান ছিল, আজ ক্ষুদ্রতর বাঙ্গালায় প্রায় আড়াই কোটি মুসলমান এবং প্রায় ত্রিশ লক্ষ খৃষ্টান। ইহাদের সংখ্যাগত এতটা সঙ্কোচে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ সমাজপতিগণ কোনরূপ প্রতিবিধানের চেষ্টা করিয়াছেন কি?

* * * *

হিন্দুর সংখ্যাগতি এতটা সঙ্কোচের যে অন্য হেতু নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু ধর্ম্মহীনতা যে প্রথম ও প্রধান কারণ, তাহা বলিবই। এ তথ্যটা আধুনিক কোন সমাজ-সংস্কারক, কোন পতিত জাতির উদ্ধারসাধক তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। বাইশ-তেইশ বৎসর পূর্ব্বে ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার এ সম্বন্ধে একটু আন্দোলন তুলিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজকে এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যাউক, সে পুরাতন কথা। এখন বাঙ্গালার হিন্দুদিগের সম্মুখে একটা বড় সমস্যা উপস্থিত। যে হারে সমগ্র বাঙ্গালায় মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে, যে ভাবে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুগণ সমাজ-ধর্ম্ম এবং সাধন-ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইয়াছেন,—ধনী যাহারা কলিকাতা নগরে থাকিয়া ভোগায়তন দেহের তুষ্টি-পুষ্টি লইয়া ব্যস্ত, নিজেদের পুত্র কন্যাগণকে ধর্ম্মশূন্য ভোগী করিয়া তুলিতেছেন,—দরিদ্র যাহারা তাহারা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় হা-হা করিয়া বেড়াইতেছে, সংসারের কোন চিন্তা তাহাদের মনের কোণে ঠাঁই পায় না,—তাহাতে আমাদের শঙ্কা হয় যে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় হিন্দু ধর্ম্মের, কর্ম্মের, এবং হিন্দুত্বের কোন চিহ্নই থাকিবে না। ব্রাহ্মণ-শাসিত, স্মৃতিসম্মত হিন্দু সমাজও টিকিয়া থাকিবেও না; তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব হিন্দুও ক্রমে বিরল হইয়া পড়িবে। যে "কিশোরীভজন" "কর্ত্তাভজা" "সহজ ধর্ম্ম" প্রভৃতির যে ভাবে সম্প্রসারণ হইতেছে, তাহাতে মনে হয় বৌদ্ধ বৈষ্ণব সমাজের কিঞ্চিৎ চিহ্ন থাকিলেও থাকিতে পারে। পরন্তু তাহাতে হিন্দুয়ানী রক্ষা পাইবে না।

* * * *

তবে বাঙ্গালার রামকৃষ্ণের সেবকগণ সেবাধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এই ভাঙ্গনের মুখে বন্যা ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। ভবদেব এবং রঘুনন্দনের শাসনশাসিত হিন্দুধর্ম্মকে খাড়া করিতে চেষ্টা করিলে কুলাইবে না। শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত

বৈষ্ণব সমাজের শাসন রঘুনন্দন করিতে পারেন নাই; সে জন্য হরিভক্তি-বিলাসের রচনা প্রয়োজন হইয়াছিল। তেমনি রামকৃষ্ণের শিষ্যশাখার কর্ম্মের পরিমাণ রঘুনন্দনী গজে হইবে না। দেখিতে হইবে, ইহারা ভাবসের পুঁটুলির বস্তা ফেলিয়া, স্রোতোমুখ অন্য পথে চালাইতে পারিতেছেন কি না। দেখিতে হইবে ইহাদের কর্ম্ম-প্রভাবে ভাঙ্গন কতকটা স্থগিত হইতেছে কি না। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে শতমুখে ইহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিব। স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা খুব ভাল করিয়া চিনিতাম এবং জানিতাম। আজকালকার যুবজন না জানিতে পারেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ যে কয়জন পুরাতন ব্যক্তি এখনও বেলুড়ে আছেন, তাঁহারা জানেন স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কতটা প্রিয়জন ছিলেন। সমাজসম্বন্ধে তাঁহার সহিত যে আলোচনা আমাদের হয় নাই, তাহা নহে। অক্ষয়চন্দ্রের সামাজিক আলোচনা ১ খুঁটকে আমরা বসুমতীতে চালাইয়াছিলাম। স্বামীজীও সে সময়ে আমাদের কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। পুরাতন নোটবহি হইতে একটা কথোপকথনের এক অংশ তুলিয়া দিলাম।

* * * *

৺ গিরিশচন্দ্র বোষের গৃহে বসিয়া আলোচনা হয়। স্বামী জিজ্ঞাসিলেন—পাচু, এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে? উত্তরে আমরা বলিলাম—শ্রীভগবান্। স্বামী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—

দূর; খাঁটি বামুনের মত উত্তর দিলি! তোদের বামুনের দোষই এই, তোরা কিছুতেই বামনাই ভুলতে পারিসনে। ওরে হনুমান ইংরেজি শিক্ষার সভ্যতার সংস্কার ছাড়িবি কেমন করিয়া! Iconoclasm এর ঠেলায় যে ভগবানের বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে; ভগবানটা মৌখিক আলাপের বিষয় হয়েছে।

পাঁচু—তবে তোমরা ধর্ম্মপ্রচারক হয়েছ কিসের জন্যে? গেরুয়া পর কেন? ধর্ম্মে কর্ম্মে চিন্তায় ব্যসনে সজীব ভগবানটাকে যদি আমদানী করিয়া বসাইতে না পার; তবে প্রচার করিলে কি? বাঙ্গালায় বা ভারতবর্ষে ভগবান্ ছাড়া কাজ হয়?

স্বামী—কথাটা খুলিয়া বল্‌লি! এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে—জানিস? আমি—আমি বিবেকানন্দ কেবল নহি। এই আমরা যে ছয়সাত জন এখানে বসে আছি, আমাদের পরমাত্মা আমিটা জাগিয়া উঠিলে তবে তরঙ্গ রুদ্ধ হইবে। আমি জাগিয়া উঠিব, আমি কর্ম্মময় হইব। কর্ম্ম করিতে করিতে যখন আমি

জগতে সকল আমি অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিবে যে, আমি ছাড়া আর একটা বড় আমি আছে, সে বড় আমির শক্তি অসীম, সে অসীম শক্তির আনুগত্য না করিতে পারিলে কোন কর্ম্ম ঠিকমত করা চলে না, তখনই শ্রীভগবান্ আসিয়া প্রকট হইবেন। জাতি বর্ণ ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে চাই আমিটাকে প্রকট করিতে। বেদান্ত ছাড়া এ কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে না। যাহাকে হেয় বলিয়া আমরা রামুন-কায়েত, এতদিন দূরে রাখিয়াছি, তাহাদিগকে কোলে তুলিতে হইলে চাই বেদান্ত। আর সবটাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে না পারিলে—প্রত্যেক আমি জাতীয় বিশাল 'আমিতে' পরিণত হইতে না পারিলে—কোন কাজই হইবে না।

তোমার তন্ত্রের বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের যুক্তিতর্ক এই ইয়োরোপীয় সভ্যতাবিদগ্ধ সমাজে চলিবে না। চাই বেদান্ত—উহার সনাতন সত্য বাণীর প্রচার। কি বলিস্? পাচু—তা বটে। বেদান্তটাকে বৌদ্ধ ফিলজফির উপর উপনিষদের মহাবাক্যের সমন্বয় মনে করি। রামানুজ শঙ্করের মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বা শূন্যবাদ বলিয়াছেন। তা বেদান্তের সহিত বৌদ্ধ সেবাধর্ম্মটা জড়াইয়া দিলে সকল লক্ষ্য দূর হয়। ইংরেজি লেখাপড়া জানা বুদ্ধিতে এ বেদান্ত লাগছে ভাল। এরপ "আমি" জাগিবে কি? দেবীসূক্তের "আমি" ফুটাইতে পারিবে কি? আমি পারি, 'শিষ্যস্তেঽহং।'

* * * *

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সন্দর্ভগুলি ছাপাইয়াছি—আলোচনা এবং বিচারের উদ্দেশ্যে, প্রতিবাদের ভঙ্গী দেখিয়া, গালাগালির বহর বুঝিয়া, সাহিত্যকে বয়কট করিবার আয়োজন ওলিয়া বুঝিলাম—তাহা হইবার নহে। কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ পক্ষে সমর্থন করিলেন না, কোন প্রতিবাদী আগাগোড়া সবটা পড়িয়া ঠিকমত উত্তর দিল না। অতএব পদ্মনাথ শর্ম্মার অশেষ পরিশ্রমজাত এই সংগ্রহ থাকুক সাহিত্যের বৃত্তান্ত সঞ্চিত। যদি আবার জীবন হয়, আবার মানুষ দেখা দেয়, তখন ইহার প্রকৃত উত্তর পাইব। আজ কেবল আমাদের চিন্তার ধারাটা পত্রস্থ করিয়া রাখিলাম। এই ধর্ম্ম এবং সমাজসম্বন্ধে কথা হইলে যে কত দিক হইতে কত সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহারই একটু সামান্য ইঙ্গিত দিয়া রাখিলাম। কেবল ব্যষ্টি চিন্তার বিষয় নহে, গোষ্ঠী এবং সংসদের চিন্তা না করিতে পারিলে সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথার মত কথা বলা চলে না। পদ্মনাথ শর্ম্মা যে দিক্ দিয়া কথা কহিয়াছেন, তাহা কেবল ব্যষ্টিগত; গোষ্ঠীগত

কথা কহিতে হইলে সমাজের কোন্ পক্ষের ইতিহাস জানিতে হইবে, প্রতিবেশ প্রভাবের কেমন খোঁজ করিতে হইবে, তাহারই একটু পরিচয় দিয়া রাখিলাম। পরে প্রয়োজন হইলে সবিস্তর ব্যাখ্যা করিব।

* * *

শ্রীযুত পদ্মনাথের চিঠির এক অংশ প্রকাশ করিলাম :—

"আমরা রামকৃষ্ণ দলের প্রতিবাদপত্রও ছাপাইয়াছি—বরং তাহাতে গালাগালির অংশ যাহা আছে—তাহাও (বাদ দেওয়া উচিত হইলেও) বাদ দেওয়া হয় নাই। ভবিষ্যতেও প্রতিবাদ ছাপাইতে প্রস্তুত আছি। ৺সুরেশ চক্র সমাজপতি জীবিত থাকিলে আমাদের বিশ্বাস, তিনি এই সকল প্রবন্ধ উপেক্ষা করিতেন না,—তিনি রামকৃষ্ণভক্ত হইলেও গোঁড়া ছিলেন না। বরং পণ্ডিত পদ্মনাথ যখন লিখিয়াছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন—তবে তাহা স্বামীজীর তেমন গৌরবজনক হইবে না—বিশেষতঃ তিনি তাঁহার ভক্তও নহেন।"—তদুত্তরে ৺সুরেশ লিখিয়াছিলেন :

"আমি বিবেকানন্দের পরমভক্ত বটে, কিন্তু আর কাহারও অভক্ত হইবার অধিকার নাই, তাহা মনে করি না। ইহাও বোধ হয় বিবেকানন্দেরই শিক্ষা। সে যাহা হউক, প্রবন্ধটি পাঠাইবেন।" ইত্যাদি (ফাল্গুন, চৈত্র ১৩২৭ সাহিত্য ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ফুটনোট দেখুন)। এ অবস্থায় ৺সুরেশের মৃত্যুর পরে আমরা বিবেকানন্দের বিষয়ে আলোচনা ছাপাইয়া কি অন্যায় করিয়াছি? অন্ততঃ আমাদের বিশ্বাস যাঁহারা মনোযোগের সহিত এ সকল প্রবন্ধ পড়িবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, পণ্ডিত পদ্মনাথ যদিও বিবেকানন্দের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, তেমনই বিবেকানন্দের যে যে বিষয়ে বিশিষ্টতা ছিল—তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। ("আমাদের বিবেকানন্দ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভক্তদের প্রতি পুনশ্চ বলিতেছি—কণ্ঠাভজাগিরি ভাল নয়, এ যুগে চোক্ বুজিয়া কেহ কিছুই গ্রহণ করিবে না। পণ্ডিত পদ্মনাথের যুক্তিতর্কে প্রতিবাদ থাকে—আইস তাহা আমরা সাদরে ছাপাইব—তবে গালাগালি ছাপাইব না। বয়কটের ভয় দেখান যুক্তিতর্ক নহে—ইহা দুর্বলত্বের পরিচায়ক। ৺তিলকের শোকে যখন সমগ্র ভারত মুহ্যমান—তখন ষ্টেটস্‌ম্যান তিলকের ব্যক্তিগত নিন্দা করিয়াছিলেন—তাহা এক কথা। আর বিবেকানন্দ প্রায় কুড়ি বৎসর হইল স্বর্গগত হইয়াছেন—তাঁহার উপদেশানুসারে সমাজে যথেচ্ছাচারের পথ প্রশস্ত হইতেছে ভাবিয়া এ

ব্রাহ্মসমাজে আহারাদি ভদীয় মতগুলির অযৌক্তিকতা (তাঁহারই পত্র, বক্তৃতা ও জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়া) যদি প্রদর্শন করে—তাহা এমন কি দোষাবহ হইবে যে, একজন পত্রসম্পাদক তাহা প্রকাশিত করিলে তাঁহার "বয়কট" করিতে হইবে?

আশা করি ঐ প্রবন্ধগুলি সকলেই পড়িয়া দেখিয়া স্বীয় মতামত ধীরভাবে গঠন করিবেন ইত্যাদি।

সাহিত্য, ২১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৩১৮।

শেখ মসলেউদ্দীন সাদী।

(জীবন-কথা)

সর্ব্বদেশের কবিরাই আত্মশ্লাঘাদোষে দুষ্ট। আমাদের জয়দেব বলিয়াছেন,—

"মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।"

আবার,

"যদ্গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবম্
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎকাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎসর্ব্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ,
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥ ২৮॥
সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি,
দ্রাক্ষে দক্ষাস্তি কক্ষাস্বমৃত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে।
মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাব-
দ্ভাবং শৃঙ্গার সারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিশ্বগ্বচাংসি॥ ২৯॥"

মহাকবি মিল্টন তাঁহার Paradise Lost কাব্যের প্র বলিয়াছেন—

* * * * I Thence
In rose thy aid to my adventurous song,
That with no middle flight intends to soar,
Above the tonian mount, while it pursues
Things unattempted yet in prose or rhyme.

আবার Comus কাব্যে কবি কিরূপ আত্মশ্লাঘাভরে বলিয়াছেন শুনুন

"For I will tell you now.
What news yet was heard in tale or song
From old or modern bard, in hall or bower.

আমাদের মধুসূদন এইরূপ আত্মশ্লাঘাপূর্ণ স্বরেই "রচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" বলিয়া মেঘনাদ-বধ কাব্যের রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যের পাণ্ডুলিপি কবি তাঁহার বন্ধু রাজনারায়ণ বাবুকে পাঠ করিতে দিয়া মহান্ আত্মশ্লাঘার সহিত বলিয়াছিলেন "My dear Raj! this will surely make me immortal."

"আমার কবিতা এত মধুর যে, আকাশমণ্ডল আমার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া সুধা বর্ষণ করিতেছে।"

কবি হাফিজের পিতৃব্য কবি শেখ সাদীও তাঁহার জনৈক বন্ধুকে এইরূপ আত্মশ্লাঘার সহিত বলিয়াছিলেন :—

"প্রকৃতি দেবীর স্বহস্তরচিত গোলাপবাগান স্বভাবের নিয়মানুসারে শীতের কঠোর পবন ও হিমকণাস্পর্শে পত্রপুষ্পশূন্য হইয়া যাইবে, কালে ইহার পুষ্পপ্রসবিনী শক্তি লোপ পাইবে, কিন্তু আমার গুলিস্তা বা গোলাপবাগানে সর্ব্বঋতুতে পত্রপুষ্পশোভিত থাকিবে; শীতঋতুর প্রখরতায় আমার গোলাপবাগানের একটি তরুও সঙ্কুচিত বা পত্রপুষ্পশূন্য হইবে না; অথবা আমার গোলাপবাগানের পুষ্পপ্রসবিনী শক্তিরও কখনও ক্ষয় বা লোপ হইবে না।"

শুধু ইহাই নহে, কবি আরও বলিয়াছেন যে, আমার কবিত্বের সৌরভে পারস্যদেশ এতই আচ্ছন্ন মগ্ন যে, তাহারা পারস্যের অমূল্য যুগনাভি ফেলিয়া আমার কবিত্বসৌরভের অনুগামী হয়। আমার কবিতার প্রত্যেক ছত্র মধুর রসপূর্ণ খর্জ্জুরের মত। যতই চিবাইবে, ততই সত্যশিব সুন্দরের মধুর রসে মগ্ন হইবে।

যে কবি আত্মশ্লাঘা-প্রণোদিত হইয়া উপরি উক্ত প্রকার কথা বলিয়াছিলেন এবং যে কবির সম্বন্ধে পরবর্ত্তী যুগের কবি মৌলানা হালি একটি কবিতায় লিখিয়াছেন, "যদিও পয়গম্বর মহম্মদ বলিয়াছেন 'লা নাবিয়া বা আদি' অর্থাৎ আমার পর আর কোন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিবে না, তথাপি কবিত্বের মধ্যে ভগবৎপ্রেরিত তিনজন কবি ভগবৎপ্রেরণায় কাব্যশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিবে; ফার্দ্দুসি বীররসে, আনওয়ারী বিষাদ-রসে ও

ও সাদী গজল বা গীতিকাব্য রচনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন যে কারণে পরবর্ত্তী যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান মীর নৈয়দআলি পারস্য কাব্যকুঞ্জের বুলবুল বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন, সেই মহাকবি শেখ সাদীর জীবন-কথা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

কবিশ্রেষ্ঠ সাদী বঙ্গদেশে সুপরিচিত। এমন এক সময় ছিল, যখন বাঙ্গালা শিক্ষিত সম্প্রদায় কাব্যের আলোচনা করিতেন; এই আলোচনায় আমরা কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও কবি চারুচন্দ্র মিত্রকে পাইয়াছি।

শেখ সাদীর কবি-জীবনকে আমরা পাঁচটি স্তরে বিভক্ত দেখিতে পাই। প্রথম স্তরে কবিত্ব-বীজকে উর্ব্বর নব বৃন্দাবন ভিন্ন শিশু জীবনের দ্বিতীয় স্তর।

বংশের কোন কঠোর সাধনার দ্বারা বিদ্যার্জ্জন করিতে দেখি। এই সাধনায় কবিত্ব সিদ্ধিলাভ করে। দ্বিতীয় স্তরে ভক্ত প্রেমিক কবিকে ভিস্তিরূপে মক্কাতীর্থে দেখিতে পাই; কবির ভিস্তিমূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় প্রেমপিপাসু কবি বাঞ্ছিত সন্ধানে মক্কাতীর্থে আসিয়া বাঞ্ছিতের প্রীতির জন্যই ভিস্তি হইয়া তৃষ্ণাতুর পথিকদের প্রীতির জলদান করিতেছেন, মক্কার চতুঃপার্শ্ব রাজপথে জল সিঞ্চন করিতেছেন। জলদেবতা খিজর ঐ ভক্ত প্রেমিক কবির সাধুকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া "আবেহায়াৎ" অর্থাৎ স্বর্গমন্দাকিনীর পবিত্র পানীয় দিতেছেন, কবি সাদী প্রাণ ভরিয়া অঞ্জলি পুরিয়া সেই পবিত্র বারি পান করিতেছেন।

তৃতীয় স্তরে পর্য্যটকরূপে কবিকে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করিতে দেখি। চতুর্থ স্তরে তাঁহাকে কবিরূপে প্রতিভাত দেখিতে পাই; কবিত্বের সৌরভে স্বর্গ, পারস্য, ইরাণ, তুরাণ, সৌরভাকুল হইয়াছে। আর কবি প্রতিভার মূর্ত্তী অবতাররূপে জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান। পঞ্চম স্তরে কবিকে ঐশীশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মসাধকরূপে দেখি।

১১৭৫ খৃষ্টাব্দে পারস্যের পূর্ব্বতন রাজধানী সিরাজ নগরে শেখ সাদী জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার প্রকৃত নাম মসলেউদ্দিন অর্থাৎ সত্যধর্ম্মের বিচারক।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মহম্মদের জামাতা আলি ইঁহাদের বংশের আদি পুরুষ। সাদীর পিতার নাম শেখ আবদুল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরের দাস। সিরাজনগর বিদ্বান ও দার্শনিকের জন্মভূমি বলিয়া বিখ্যাত

(১) Nightingal of a thousand song, tending to express that in every branch of poetry it displayed the perfection of genious.

Prof. Eastwick.

সিরাজ এত স্বাস্থ্যপ্রদ যে, সিরাজে বাসকালে দিবারাত্র পাঠ বা চিন্তা করিলেও মস্তিষ্ক অবসন্ন হয় না। সিরাজের একজন প্রসিদ্ধ কবিও বলিয়াছেন "জিমন্তেও (স্বর্গেও) রকণাবাদ্দ নদীর তটভূমি ও মুসাল্লার পুষ্পোদ্যান পাইবে না।

সিরাজের কথা

মস্তিষ্কের এই অসাধারণ স্বাস্থ্যের ফলে সিরাজ-প্রদেশে এত বিদ্বান্ দার্শনিক ও কবি উৎপন্ন হইয়াছেন যে, তাহাদের বোধ হয় সমস্ত ইরাণের অন্য অংশে উৎপন্ন হন নাই।(১)

এই সময় পারস্যে আতাবক তুকলা বংশীয় রাজন্যবর্গ রাজত্ব করিতেন। সাদীর পিতা শেখ আবদুল্লা নশলহ এই রাজপরিবারের একজন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি অতিশয় বিচক্ষণ, কর্ত্তব্যানুরাগী, ধর্ম্মভীরু, সৎসাহসী ও ঈশ্বর পরায়ণ ছিলেন। সাদীর মাতার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

পিতা মাতা

বোস্তা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সাদীর মাতা পুত্রকে কঠোর শাসনের আবরণে রাখিতেন। সাদীর মাতৃবংশ পণ্ডিতের বংশ। পাণ্ডিত্যের জন্যই তাঁহারা বিখ্যাত। সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান মোল্লা কুতব অলেমা সাদীর মাতুল ছিলেন।

দৌলত সাহ বলেন, কবির পিতৃপ্রদত্ত নাম শরফ উদ্দিন, উপাধি মুশফুহ; কিন্তু কবি সাধারণের নিকট শেখ মুসলেউদ্দিন সাদী সিরাজী নামেই সুপরিচিত। কোন কোন পুস্তকে

কবির নাম

লিখিত পাওয়া যায় যে, ইহা ছাড়া কবির আরও নাম ছিল—যথা—সাদী তখল্লুস, মুসলেহুদ্দিন। সাদিবংশীয় রাজন্যবর্গের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কবি 'সাদী' উপাধি গ্রহণ করেন।

সাদী উপাধি গ্রহণ

বাল্যকাল হইতেই সাদী অতিশয় পাঠানুরাগী ছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবন সৎসঙ্গেই অতিবাহিত হয়। কবি অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন। বাল্যকালেই সাদীর তরুণ হৃদয়ক্ষেত্রে যে ঈশ্বরপরায়ণতা, সত্যবাদিতা, ধর্ম্মে একান্তিকী নিষ্ঠার বীজ অঙ্কুরিত হয়, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহা মহান্ মহীরুহে পরিণত হয়। সাদী বাল্যকাল হইতেই নামাজ উপাসনাদি ক্রিয়া কর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। এই সময় হইতেই ব্রত উপবাস ও রাত্রি জাগরণ

বাল্য কথা

করিয়া হাদিস্ ও তপ্সীর অর্থাৎ মুসলমান স্মৃতি শাস্ত্র ও কোরাণের অনুযায়ী ক্রিয়া কর্ম্মাদি অভ্যাস করিয়াছিলেন। পিতার

(১) নুসরী ও বঙ্গবাণী ৭ম খণ্ড ১৩২৫।২৬

ধর্ম্মে একান্তিকী নিষ্ঠা, পিতার সাধু প্রকৃতি বালক সাদীর তরুণ হৃদয়কে ধর্ম্মের দিকে অন্তরের হইতে উৎসাহিত করিয়াছিল। একদিবস বালক সাদী অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার পিতার সহিত বসিয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় অধিকাংশ শ্রোতা নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। কিন্তু সাদী চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই, অনন্যমনা হইয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছেন। ক্রোড়ের উপর ধর্ম্ম পুস্তকখানি রহিয়াছে। ধর্ম্ম প্রসঙ্গ শেষ হইবার কিছু পরে সাদী চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে, সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। ইহা দেখিয়া সাদী তাঁহার পিতাকে বলিলেন, "দেখ বাবা, ইহারা কেহই প্রার্থনার জন্য মাথা তুলিল না, ইহারা যেরূপভাবে ঘুমাইতেছে, ইহাদিগকে মৃতও মনে করা যায়।" সাদীর পিতা পুত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রিয় পুত্র পরের নিন্দা করা অপেক্ষা তোমার নিদ্রিত থাকাই উত্তম।" এই উক্তি হইতে কবির পিতৃপ্রকৃতি কিরূপ ছিল বেশ অনুমান করিতে পারা যায়। সাদীর বাল্যকালে বিদ্বান ও সাধুদের মধ্যে তুমুল বাগবিতণ্ডা চলিতেছিল। কবির পিতা বিদ্বান অপেক্ষা সাধুদের পক্ষপাতী ছিলেন। কবি প্রথম জীবনে পিতার উপদেশ মত সাধুদলের পক্ষপাতী হন; পরে যখন বিদ্যার্জ্জন করেন, তখন বিদ্বানগণেরই অনুরাগী হইয়া পড়েন। সাদী বাল্যকাল হইতে সুফির দলে যাতায়াত করিতেন। কবি জামি তাঁহার "নাফাত-উল্ আনিস্" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সাদী তাঁহার জীবনে সুফীদলভুক্ত হইয়া পড়েন ও নিজে সুফীগণাগ্রগণ্য হয়েন।

সাদী তাঁহার মাতুল শ্রেষ্ঠ বিদ্বান মোল্লা কুতব আলেমার নিকট প্রথম নিজামি-পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতুলই বিদ্যারম্ভ শাস্ত্রে সাদীর প্রথম দীক্ষাগুরু ছিলেন।

বোস্তাঁ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কিশোর বয়সেই কবির পিতৃবিয়োগ হয়। সাদীর পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। রাজবাটী হইতে উপাজ্জিত ও স্বীয় পরিবার প্রতিপালন করিয়া যাহা কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হইত, তৎসমুদয় তিনি সাধুসেবায় ব্যয় করিতেন; সুতরাং মৃত্যুকালে তিনি রক্ষিত অর্থ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সাংসারিক এরূপ অবস্থায় কবির পিতৃ-বিয়োগ ঘটে।

১০৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অল্প অরসলানের মন্ত্রী রাজা নিজাম-উল্-মুল্ক হিরাট, নয়শাপুর, ইস্পাহান, বসোরা ও বাগদাদে পাঁচটী মাদ্রাসা স্থাপন

করেন। তদানীন্তন প্রায় এই পাঁচটী মাদ্রাশাই বিদ্যাপীঠস্থানরূপে প্রসিদ্ধ ছিল।

বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাশা

ইহাদের মধ্যে বাগদাদের মাদ্রাশাই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করে। এই পাঁচটী মাদ্রাসার ছাত্রগণের মধ্যে অনেক বিদ্বান, দার্শনিক, জ্যোতির্ব্বিদ ও কবিরূপে জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসা হইতে সাদীর উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ হয়। সাদীর জ্ঞানপিপাসা এতই বলবতী ছিল যে, তিনি অতি দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়িয়াও মুহূর্ত্তের জন্য কখনো জ্ঞানার্জ্জনের কথা ভুলেন নাই। জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তির জন্যই সাদি জন্মভূমি সিরাজ ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণের নিকট পাঠ গ্রহণের জন্য বাগদাদ যাত্রা করেন। এই সময় বাগদাদ প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের মিলনস্থানরূপে পরিণত হইয়াছিল। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মত কঠোর সাধনার দ্বারা কাল বিসর্জ্জন করেন।

সাধনায় সিদ্ধি

এই কঠোর সাধনায় সাদীর সিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ সাদীকে ইদরার্ অর্থাৎ সভ্য (Fellow) রূপে নির্ব্বাচিত করিয়া সম্মানিত করেন।

বাগদাদে আসিয়া সাদী বড়ই অর্থ কষ্টে পড়েন। নিজামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্পমা আবুলকাসেম আবদুল রহমান শামসুদ্দিন বিন জৌজি সাদীর তীক্ষ্ণ মেধা, বুদ্ধি, পাঠানুরাগ ও বিনয়নম্র ব্যবহারে সাতিশয় মুগ্ধ হন। প্রকৃষ্ট বৎসর বয়সে সাদী একটী প্রবন্ধ রচনা দ্বারা শিক্ষাগুরু শামসুদ্দিনকে সম্যক্ চমৎকৃত করেন। এই রচনাই কবির

প্রথম রচনা

সাহিত্য জীবন যাত্রার পাথেয়স্বরূপ হয়। সাদীর অপূর্ব্ব রচনাশক্তি দেখিয়া আচার্য্য শামসুদ্দিন সাদীকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়াছে দেখিয়া তিনি প্রিয় ছাত্র সাদীর জন্য একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইহাতে কবির দুরবস্থা অপনীত হয়। আবুল শারাজ আবদুল রহমান বিনজৌজির নিকট সাদি সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। গুলিস্তাঁর উনবিংশ উপাখ্যানে গুরুভক্তির নিদর্শনস্বরূপ কবি শিক্ষাগুরু শামসুদ্দিনের উদ্দেশে ভক্তিশ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন।

সাধন পরিবর্ত্ত হইতে জ্ঞানান্বেষী সাদী বিদ্বান্ মণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান করিতেন। ছাত্রজীবনেই সাদীর সহিত সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান সুফীশ্রেষ্ঠ শেখ সাহাবুদ্দিন আবুহাফস্ হামাস্ উমর বি মহম্মদ অল্ বকরি অম্ সুরওয়ার্দির (১)

(১) ইনি একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ভাববাদী (Vedic) বাঙ্গার দেশে ১১৪৫ খৃষ্টাব্দে জ

ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক ও আলোচনা হয়। সাদী মুসলেহ্ উদ্দিন সুর ওয়াদির নিকট সুকীমত বাস গ্রহণ করেন।

সিরাজের বাদশা আতাবক্ আবুবকর বিন্সাদ বিন্জঙ্গীর নামে কবি আপনার গ্রন্থসমূহ অর্থাৎ ভণিতা সাদী রাখেন। গুলিস্তাঁ উপক্রমণিকাতে কবি বাদশার অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। কবির কোন নিকট আত্মীয় বাদশার উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় কবি বাদশাহের অনুগ্রহ দৃষ্টি লাভ করেন। ত্রিশ বৎসর কাল মাদ্রাসার সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কবি চল্লিশ বৎসর বয়সে

বাদশাহের অনুগ্রহ দৃষ্টিলাভ

বাগদাদ ত্যাগ করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে জ্ঞানসঞ্চয় ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ভ্রমণে বহির্গত হন। কবি হজ করিতে চৌদ্দবার মক্কাতীর্থে গমন করেন। তন্মধ্যে দ্বাদশবার পদব্রজে গমন করেন।

পর্য্যটন

গিলান দেশস্থ মহাজ্ঞানী পীরশেহ আবুল ফারেজের সহিত কবি প্রথমবার মক্কা যাত্রা করেন। পীরশেহ ফারেজের নিকট সাদী ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। কবি এসিয়ামিনর, আবিসিনিয়া, মিসর, ত্রিপলী, সিরিয়া, ফিলিষ্টাইন, আরমিনিয়া, আরবের নানা প্রদেশ, সমগ্র পারস্য, তুরাণের অনেক নগর, সমরখণ্ড, কাশগড় ভারতবর্ষ, ইউরোপের ইটালি, রোম, পর্ত্তুগাল প্রভৃতি নগর ভ্রমণ করেন।

তিনি যে যে দেশের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন, সেই সেই দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই সকল ভাষায় কবিতা রচনা করেন। কথিত আছে, সাদী সর্ব্ব আটারটী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এই আটারটী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া প্রভূত যশলাভ করেন। ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে লাটিন ভাষায় কবি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিশেষতঃ রোমক অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সেনেকার (Seneca) গ্রন্থাবলী বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।*

গ্রহণ করেন ও ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। সুরওয়ার্দি তাঁহার পিতৃব্য যাব ও বাস্তুর এসুফুর ওয়াদি কর্ত্তৃক ভাববাদী হন। শেখ সাহাবুদ্দিন একজন বিখ্যাত সাহিত্যসেবী ছিলেন। ইহার রচিত আউ আর্-ই-মুল মথা-র্-ইন্ (স্বর্গেরহান) নামকপুস্তক সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

* "That Vider Egyptiah of Italian, and that he was much skilled in the oriental languages; may that he had studied the Latin tongue, and had deligently perused the works of Seneca."

তিনি একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসরকাল ভ্রমণ করেন। এই সময় তাঁহাকে কখনও স্বচ্ছল অবস্থায়, কখনো বা অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ পর্য্যটনকাহিনী কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কঠিন পর্য্যটনকাহিনী তাঁহার কঠোর পরিশ্রম, অর্থাভাব, কষ্ট ও ধৈর্য্যশীলতার পরিচয় দেয়। এই সমস্তার একটি মাত্র কাহিনী আমরা এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

একবার সাদী পদব্রজে মিশরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। অর্থাভাব প্রযুক্ত জুতা কিনিতে পারেন নাই; নগ্নপদেই চলিয়াছেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া নিকটস্থ একটি মস্‌জিদে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এই স্থানে বসিয়া তিনি জুতার অভাবের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বারবার বলিতেছিলেন, আর ত নগ্নপদে মিসরের উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া চলিতে পারি না। জুতার অভাবে পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। আর বোধ হয় হাঁটিতে পারিব না। ঠিক সেই সময় একটি লোক অতিকষ্টে ধীরে ধীরে সেই স্থানে আসিল। এই লোকটির দু'টি পা'ই ছিল না। এই হতভাগ্যকে দেখিয়া কবির জুতার দুঃখ মিটিয়া যায়। সাদী মনে মনে পরম দয়ালু ভগবানের উদ্দেশে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মনে মনে বলেন, মেহেরবান আল্লা, আমার প্রতি তোমার কত দয়া! আমার ত দু'টি পা আছে, এ হতভাগ্যের দু'টি পা'ই নাই।

দামিস্কস্ ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পথে সাদি ক্রুসদিগের হস্তে বন্দী হন এবং পূর্ব্ব ত্রিপলীতে ইহুদিদাসগণের সহিত বিক্রীত হন। এই সময় তাঁহার ক্লেশের সীমা ছিল না। আলপ্পোনিবাসী জনৈক বণিকবন্ধু দশ দীনার (১) পরিবর্ত্তে কবিকে ক্রয় করেন। বণিক্ কবিকে উদ্ধার করিয়া নিজ বাটীতে আশ্রয় দেন। কিছুকাল পরে বণিক সাদীর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন।

প্রথম বিবাহ দাম্পত্য-জীবনে অশান্তি ও স্ত্রীর মৃত্যু

এই বিবাহে কবি সুখী হইতে পারেন নাই। তাই স্ত্রীর সম্বন্ধে সাদী গুলিস্তাঁর একবিংশ উপাখ্যানে লিখিয়াছেন "সাধু ব্যক্তির সংসারে মন্দ স্ত্রী ঢুকিলে তাহাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।" এই উক্তি হইতে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কবির দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। যাহা হউক বেশী দিন তাঁহাকে দাম্পত্য জীবনের অশান্তি ভোগ করিতে হয় নাই। সত্বর তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়।

(১) স্বর্ণ মোহর বিশেষ। প্রত্যেক দীনার মূল্য পনর টাকা।

১২২৬ খৃষ্টাব্দে সাদ্‌বিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবুবকর্ বাদশা হন। ইনি পিতার মত রাজ্য-উচ্ছেদকারী ছিলেন না। পক্ষান্তরে ইনি শান্তিপ্রিয় ও প্রজাবৎসল ছিলেন। পূর্ণ উদ্যমে নবীন বাদসা সিরাজের উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সিরাজের ঘরে ঘরে সুখ শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। নবীন বাদশার অক্লান্ত পরিশ্রমে সিরাজের পূর্ব্বগরিমা ফিরিয়া আসিল।

এই সময় সাদি সিরিয়া প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। জন্মভূমি সিরাজের পূর্ব্ব গৌরব ও শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া সাদিরও আনন্দের সীমা রহিল না। স্বদেশে ফিরিবার জন্য কবির মন অস্থির হইয়া উঠিল। ইহার কিছুদিন পরেই সাদী জন্মভূমি সিরাজ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন

সাদী স্বভাবতঃ বড়ই আমোদপ্রিয় ও পরিহাসরসিক ছিলেন। অনেক সময় পরিহাসের সুযোগ পাইলে কি বালক, যুবক, বয়োবৃদ্ধ সকলেরই সহিত আমোদ ও পরিহাসে মাতিতেন। তাঁহার পরিহাস রসিকতা হাসির মধ্যে শ্রোতারা উপদেশরত্ন লাভ করিত। হাস্যরসের সহিত জ্ঞান বিতরণ করিতে তৎকালে সাদীর সমকক্ষ কেহই ছিল না। কবি এতই রসিক ছিলেন—যে অত্যন্ত গম্ভীর, অত্যন্ত বিমর্ষ বে কখনো হাসে নাই, সে একবার কবির সাহচর্য্য লাভ করিলে তাহাকে হাসিমুখে ফিরিতেই হইত।

কবি কখনো কখনো প্রকাশ্য হানে অথবা মস্‌জিদে বক্তৃতায় উপদেশ দিতেন। তাঁহার সভায় বিস্তর লোক সমাগম হইত। অন্যান্য বিদ্বানগণের মত তিনি কখনো কাহারও নিন্দা করিতেন না। ভ্রম গোঁড়ামি তাঁহার সাধু চরিত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই; হৃদয়ের প্রশস্ততা, উদারতা, তাঁহার রচনাবলীর সহিত একত্রে গ্রথিত। তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিলে ইহা বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সাদীর মত বিদ্বান্ বাগ্মী, দেবত্বের পবিত্র ব্যাখ্যাতা, (an unsullied instructor of divinity) সিরাজনগরে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি এতই উদার ছিলেন যে, তাঁহার জীবনীলেখকেরা তাঁহাকে কোন্ সম্প্রদায় ভুক্ত স্থির করিতে না পারিয়া অনুমানে কেহ তাঁহাকে সুন্নী, কেহ বা তাঁহাকে সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জনসাধারণ যে কবিকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

বক্তৃতা

উদারতা

বস্তু, তাঁহা তাঁহার দৃঢ়তার (consistency) জন্য নহে, পরন্তু কবির হৃদয়ের প্রশস্ততা ও সার্ব্বভৌমিক উদারতায় (catholicity) মুগ্ধ হইয়া সার্ব্বজনীন প্রীতি উদারতাই সাদীর সর্ব্বজনপ্রিয়তার (popularity) কারণ হইয়াছিল।

আত্মসম্মান

সাদীর আত্মসম্মান জ্ঞান এতই প্রবল ছিল যে, তিনি অতিকষ্টে পড়িলেও কখনো আত্মসম্মান বর্জ্জন করিতেন না। নিম্নলিখিত ঘটনাটী কবির আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। একবার তিনি দরবেশের বেশে দামস্কের কোন মস্‌জিদে উপস্থিত হন। সেই সময় দামস্কনগরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। গৃহস্থেরা অর্থাভাব হেতু দরবেশগণের সেবা করিতে পারিত না। নগরের এক ধনবান্ নপুংসক এক সময়ে দরবেশগণের সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মস্‌জিদের সমস্ত দরবেশ নপুংসকের বাটীতে আহার করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা যাইবার সময় সাদীকে ডাকিল। সাদী নপুংসকের বাটীতে আহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন "পশুরাজ সিংহ ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইলেও কখনো কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেন না।"

ভারতে আগমন

বোস্তাঁপাঠে জানা যায় যে, কবি ভারতে আসিয়াছিলেন। শুনা যায়, এই সময়েই দিল্লীর প্রসিদ্ধ কবি আমীর খস্রুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাদী খস্রুকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

গুজরাটের সোমনাথের মন্দির দর্শন করিয়া কবি সাতিশয় প্রীতিলাভ করেন, কিন্তু মন্দিরের পাণ্ডাগণের ব্যবহারে বড়ই ক্ষুব্ধ হন।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, কবি অতি হীন অবস্থায় পতিত হইলেও কখনও আত্মসম্মান জ্ঞান বর্জ্জন করিতেন না। ইহা যে তাঁহার দৃঢ় চরিত্র ও অসাধারণ মানসিক বলের পরিচয়, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি একদিকে যেমন অসাধারণ কবি, অন্যদিকে তেমনি অসাধারণ বিদ্বান্, বক্তা সাধু বলিয়া বিশেষরূপে পূজিত ও সম্মানিত ছিলেন। এত গুলি সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াও সাদী

দৈয়দ-উল-মুতক্কারণ পাঠে জানা যায় যে, সাদীর সময়ে অত্যাচারী বাদসা হুলেকুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পারস্যের যে সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় পারস্য ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে চলিয়া যান, তন্মধ্যে কবি আমীর খস্রু ও আমীর তোফেন এই দুই কবি সাদীর বাদসা সুলতান মহম্মদের পিতা গিয়াসুদ্দিন বোলবনের রাজত্ব সময়ে পারস্য-সীমান্তবর্ত্তী মুলতানে আগমন করেন।

সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার ছিলেন। বিদ্বজ্জনসমাজ কবিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, কবিও যে শুধু আপন কবিত্ব প্রতিভা জনসাধারণের হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন—তাহা নহে। তিনি তাঁহার অমায়িকতা, মাধুর্য্য, উদারতা, শিশুর মত সরল ব্যবহার, পুষ্পকোমল কবিপ্রকৃতি ও সাধু চরিত্রবলেই কি স্বদেশবাসী কি বিদেশবাসী, সকলেরই হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কি কবিত্ব সৌরভমুগ্ধ ভক্ত, কি জ্ঞানপিপাসু, কি ধর্ম্মোপাসী ভক্ত, কি বাদক, উক্তির বণিক, ধনী, নির্ধন, সকলেরই মস্তক সাদীর কবিত্ব ও পূতচরিত্রের নিকট আপনা-আপনি শ্রদ্ধাভরে নত হইত। সর্ব্বসাধারণেই কবির উদারহৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে প্রীতি স্নেহ লাভ করিয়া ধন্য হইত। কবির প্রকৃতি ও চরিত্র এমনই মধুর ও উদার ছিল।

পৃথিবীর সকল সভ্যদেশবাসীই বেশভূষার আদর করিয়া থাকেন। মনুষ্য সমাজের সকলেই বেশবিন্যাসের পক্ষপাতী। সমাজের মধ্যে যাঁহারা বেশবিন্যাসের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, ইহাদের মধ্যে জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু ও কবিগণকেই বিশেষ উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। (১) এই নিস্পৃহতার জন্য ইহাঁরা সময়ে সময়ে প্রথম ইহাঁদের সমুচিত সম্মান প্রাপ্ত হন না। সভ্যতাদীপ্ত সমাজ অপরিচিতের গুণের অপেক্ষা বেশবিন্যাসের দিকে সমধিক দৃষ্টি রাখেন। সাদীও বেশবিন্যাসের বিষয়ে বড়ই উদাসীন ছিলেন। সাদীকেও সময়ে সময়ে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঘটনাটী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।—

বেশবিন্যাসে নিস্পৃহতা

একবার সাদী তাব্রিজের প্রসিদ্ধ কবি খাজা হামামুদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কবি হামামুদ্দিন পোজাব সহিত সাদীর পূর্ব্ব বা প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না; কিন্তু উভয়ে উভয়ের কবিত্বে মুগ্ধ ছিলেন। কবি হামামুদ্দিন সাদীর হীন বেশ দেখিয়া কবিকে সামান্য ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে স্বীকৃত হইলেন না। পরে শেখ যখন একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়া আত্মপরিচয় দিলেন, তখন কবি হামামুদ্দিন খাজা সাদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হস্ত চুম্বন করিয়া সাদরে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করেন।

কবি হামামুদ্দিন খোজা ও সাদী

(১) পারস্যের অন্যতম কবি হাফেজ ইংলণ্ডের কবি কাউপার, টেনিসন, বাংলার কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কবির জীবনকথায় উদাহরণস্বরূপ কবিগণের নাম উল্লেখ করিলাম।

আর একবার এক বিদ্বৎসভা সাদীর হীন বেশ দেখিয়া কবিকে সাধারণ ব্যক্তি মনে করিয়া অসম্মান করিয়াছিল। ঘটনাটী এইরূপ :—

এক ধনী কাজীর বাটীতে এক বিদ্বৎসভার অধিবেশন হয়। সাদী দরিদ্রের বেশে তথায় উপস্থিত হন এবং সেই সভায় বিদ্বানগণের বসিবার উচ্চাসনে নিজ আসন গ্রহণ করেন। সামান্য ব্যক্তিকে পণ্ডিতগণের নির্দ্দিষ্ট সম্মুখস্থ উচ্চাসনে বসিতে দেখিয়া গৃহস্বামী কাজী অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং কোন কর্ম্মচারী দ্বারা সাদীকে তথা হইতে উঠাইয়া গৃহের সর্ব্বশেষের আসনে বসিতে বলেন। সাদী ইহাতে কিছুই বলেন নাই। কাজীর নির্দ্দেশ মত আসনে বসিলেন।

কাজী ও সাদী

সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। বিদ্বান মহাশয়েরা মোরগের যুদ্ধের অভিনয় করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ প্রশংসার করতালি লাভ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপ চীৎকার করিয়া বিদ্বান মহাশয়েরা পরিশ্রান্ত হইলেন বটে, কিন্তু তর্কের কোন প্রকার মীমাংসা হইল না। সভার শেষের দিক হইতে সেখ কিছু বলিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গৃহস্বামী দরিদ্র ব্যক্তির অসম্ভব স্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রোধে ও ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু কবির বিনয়-নম্র-বচনে মুগ্ধ হইয়া কাজী অনুমতি প্রদান করেন। সামান্য কথায় সরলভাবে সাদী যখন সেই অমীমাংসিত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন, তখন সভাগৃহের চারিধারে ধন্য ধন্য রব উঠিল। গৃহস্বামী কাজী অনুতাপ করিয়া বলিলেন, বিজ্ঞবর! আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই; আপনার দীন বেশ দেখিয়া আপনাকে সামান্য ব্যক্তি মনে করিয়া পাণ্ডিত্যের উচ্চাসন হইতে নামাইয়া আপনার যে অসম্মান করিয়াছি, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পূর্ব্বে আপনার পরিচয় পাইলে কখনই এরূপ ঘটিত না।" এই বলিয়া কাজী নিজ মস্তকস্থিত মূল্যবান্ রেশমী পাগড়ী খুলিয়া সম্মানের উপহারস্বরূপ কবির মস্তকে পরাইয়া দিবার জন্য কোন কর্ম্মচারীকে আদেশ দিলেন। কাজীর আদেশমত কর্ম্মচারী সাদীর মস্তকে পাগড়ী পরাইতে আসিলে, সাদী তাহাকে নিরস্ত করিয়া কাজীকে বলিলেন, "আমি দরিদ্র ব্যক্তি, পাগড়ীর আবশ্যক নাই, আপনার ও পাগড়ীর এমন একটা বিশেষগুণ আছে যে, উহা যে মস্তকে উঠে, তাহারই মস্তকে অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া দেয়। পাগড়ীধারীর হিতাহিত বিচারের কোন ক্ষমতা থাকে না। মানুষের জ্ঞানভার মস্তিষ্কেই থাকে, শতহস্তপরিমিত রেশমী পাগড়ীর মধ্যে থাকে না। গর্হিত রেশমী পোষাক পরিধান করিলেও সে

পদভই থাকে। সুতরাং এরূপ বিশেষ চিহ্নবিশিষ্ট পাগড়ী মস্তকে ধারণ করিয়া আমি পথ হইতে ইচ্ছা করি না।" এই বলিয়া সাদী সভাগৃহ ত্যাগ করেন।

সাদী যে কেবল বেশবিন্যাসের সম্বন্ধেই নিস্পৃহ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নহে। সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার নিস্পৃহতা ও বৈরাগ্য প্রকাশ পাইত। সুফী-ধর্ম্মজীবনের সমস্ত লক্ষণই তাঁহার চরিত্রে প্রকাশমান ছিল। কত শত ভক্ত কত অর্থ কত শত মূল্যবান্ দ্রব্য সম্ভার কবিকে উপহার দিত। কবি এই সমস্ত অর্থ বা দ্রব্যাদি নিজে ব্যবহার করিতেন না, সমস্তই দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন।

পারস্যের নরপতি আবাবার রাজস্বসচিব শ্যামসুদ্দিন (১) সাদীর একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। শ্যামসুদ্দিন কবিকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। (২) ভক্ত শ্যামসুদ্দিন কবিকে দশ সহস্র মুদ্রাপূর্ণ একটি থলি উপহার দেন। কবি এই থলির একটি মুদ্রাও নিজ কার্য্যের জন্য ব্যবহার করেন নাই, পরন্তু এই অর্থ দ্বারা সাধুসেবা ও একটি অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই সকল ঘটনাবলী হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, সাদী জীবনযাত্রার কার্য্যে আয়োজনে কিরূপ নিস্পৃহ ও ত্যাগে কিরূপ আত্মবিস্মৃত ছিলেন। সাদী নিজেই বলিয়াছেন; "যে ঈশ্বরপরায়ণ, সে অধিপেটা খাইয়া তাহার সর্ব্বস্ব সাধু সন্ন্যাসীকে দান করে।" একথা সাধুচরিত্র সাদীর সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য, এমন আর কাহারও সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে।

---

* সুফী মতবাদ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

(১) ইনি তাব্রিজের কবি আলাউদ্দিনের ভ্রাতা।

(২) সাদি পবিত্র মক্কাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া তাব্রিজ যাত্রা করেন। তত্রত্য দার্শনিক ও ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ করিয়া প্রীতিলাভ করেন। ভক্ত শ্যামসুদ্দিন ও তাহার ভ্রাতা কবি আলাউদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সাদী প্রণয় করিয়াছিলেন। দেখিতে পান যে, উভয় ভ্রাতা সুলতানের সহিত অশ্বারোহণে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি অশ্বারোহণ হইয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় দুই ভ্রাতা কবির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। সুলতান এই দৃশ্য দেখিয়া শ্যামসুদ্দিনকে এই ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। শ্যামসুদ্দিন বলিলেন, ইনি আমাদের পিতা। সুলতান সবিস্ময়ে বলিলেন, আমি আপনাদিগকে কতবার আপনাদিগের পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু আপনারা ত আপনাদের পিতার পরিচয় কখনো বলেন নাই। উভয় ভ্রাতা সমস্বরে বলিলেন, "সুলতান ইনি আমাদের পিতা অপেক্ষা পূজ্য শেখ সাদী।" ইহাই কবির সৌভাগ্য সুবিধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও সুলতানের কর্ণগোচর হইয়াছে। সুলতান সাদীর নাম

সাদীর প্রকৃতি যেমন মধুর, হৃদয় যেরূপ কোমল সৌন্দর্য্যপূর্ণ ছিল, তাঁহার শারীরিক গঠন-প্রণালী তদ্রূপ সুকুমার ও সুঠাম আকৃতি ছিল না। কবি সুপুরুষ ছিলেন না; সিরাজবাসি-গণের মত তাঁহার মস্তকে টাক ছিল। তিনি শীর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি ছিলেন।(৩)

প্রথমাপত্নীর মৃত্যুর পর সাদী পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। এই বিবাহ ক্রীট্ আরব-দেশের ইয়ামানের রাজধানী সানা প্রদেশে সাধিত হয়। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে। পুত্র সন্তানটি শৈশবেই ইহলীলা সম্বরণ করে। পুত্রশোকে সাদী বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। বোস্তাঁর নবম ও দশম অধ্যায় পুত্রবিয়োগে কবির বিয়োগবিধুর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতেছে। সাদীর জীবনীলেখক হাজি লতিফ্আলি তাঁহার 'আটিশ কাদা' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, এই কন্যাকে সাদী কবি হাফিজের সহিত বিবাহ দেন।

কবি তাঁহার সমসাময়িক কবি ও সাহিত্যিকগণের সহিত পরিচিত ছিলেন, ধ্যানবসিক (mystic) কবি জেলালুদ্দিন রুমি* হাকিমি নিজামি ও খাজা হামামুদ্দিনের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সমসাময়িক কবি ও সাহিত্যিক খোলা-সী-উল-আস্হর্ নামক পুস্তকে সাদীর সহিত এই সকল কবির পরিচয়ের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে।—আমরা কেবলমাত্র কবি নিজামির সহিত পরিচয়ের গল্পটি এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। কবি নিজামি ও কবি সাদী সিরাজের বাজারে এক ফলবিক্রেতার দোকানে ফল কিনিতে আসিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে কেহই কাহাকে চিনিতেন না, কিন্তু উভয়ে উভয়ের কবিত্বের সহিত পরিচিত ছিলেন। সাদী যেরূপ রহস্যপ্রিয় ছিলেন, কবি নিজামি, কবি সাদী অপেক্ষা কম রসিক ছিলেন না। সরল কথাবার্ত্তায় উভয়ে উভয়কে কবি বলিয়া চিনিতে পারেন। কবি নিজামি সাদীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিতে পারেন কিনা; ইহার উত্তরে সাদী

(৩) সাদির মত বাংলার কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও দেখিতে কদাকার ছিলেন; অনেক বিষয়ে সাদির সহিত মজুমদার কবির সাদৃশ্য আছে।

* সাধারণতঃ ইনি মুলোউই মনোই (নবমী হাকিম অর্থাৎ (mystical) নামে প্রসিদ্ধ। সাদি ও জেলালউদ্দিন উভয়েই মন্ত্রী খানইদ্দিনের পৃষ্ঠপোষিত ছিলেন। উভয় কবির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও কেহই কাহারও সম্বন্ধে নিজ পুস্তকে কোন প্রকার উল্লেখ করেন

কবি নিজারির কবিতার মাতলা জগৎ প্রথম শ্লোক (Shanga) আবৃত্তি করেন। সাদী কবিভ্রাতা নিজারিকে মহাসমাদরে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। মহা আড়ম্বরের সহিত কবি বন্ধুকে সম্মানের জন্য সাদী এক প্রীতি ভোজনের আয়োজন করেন। এই প্রীতিভোজনে সাদীর অনেক অর্থ ব্যয় হয়। কিছুকাল পরে সাদী খোরাসান গমন করিলে কবি নিজারির সহিত কবি সাদীর পুনঃ মিলন হয়। কবি নিজারি মহা সমাদরের সহিত কবি ভ্রাতা সাদীকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। সাদীর আড়ম্বরপূর্ণ প্রচুর আহার্য্য দ্রব্যের আয়োজনে ব্যয়বাহুল্য প্রকাশের জন্য কবি নিজারি তাঁহাকে বড়ই ঠাট্টা করিয়া প্রথম দিবস একটী মৃন্ময়পাত্রে একটু লবণ ও একখণ্ড রুটি প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিন একখানি ভজ্জিত মাংস, তৃতীয় দিন সিদ্ধমাংস আহার করিতে দিয়া সাদীকে বলেন, বন্ধু! আমার গৃহে এই সামান্য আহারীয় তোমাকে সারা বৎসর যোগাইতে পারি; কিন্তু তুমি অতিরিক্ত খরচ করিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত যে প্রচুর মূল্যবান্ খাদ্যদ্রব্য আয়োজন করিয়াছিলে, ওরূপ খাদ্যের আয়োজন বেশী দিন চলে না।

কি স্বদেশ, কি বিদেশ; কি ধনী নির্ধন, সুলতান বাদশা, উজীর মহাজনের গৃহে কি রাজদরবারে সর্ব্বত্রই গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ পঠিত হইতে লাগিল। কবির কবিত্বের প্রশংসা হইতে লাগিল। ধনী, নির্দ্ধন, সুলতান বাদশা, উজীর মহাজন সর্ব্বসাধারণে দলে দলে সর্ব্বত্রই আসিয়া কবিকে অভিনন্দন প্রদান করিতে লাগিল। কেহবা কবিত্বসৌরভে মুগ্ধ হইয়া, কেহবা কবির মুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণের আশায় কেহবা জ্ঞানপিপাসা নিবারণের জন্য, কেহ বা কবির সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে আসিত।

সাদির কবিত্বসৌরভ এতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, দিল্লীর বাদশা সুলতান মহম্মদসাহ কবির কবিত্ব, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ও সরল রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া কবির প্রতি বাদশাহ শ্রদ্ধানিবেদনের চিহ্নস্বরূপ অনেক মূল্যবান্ উপঢৌকন নিমন্ত্রণ পত্র সহ একজন প্রধান কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। এই পত্রে সুলতান কবি সাদীকে দিল্লীর রাজকবিরূপে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শেখ সাদী সুলতানের উপহারে পরিতুষ্ট হইয়া নিজহস্তে গোস্তা ও গুলিস্তাঁ লিখিয়া বাদশাকে সম্মানের উপহার দেন এবং বলিয়া পাঠান যে, বৃদ্ধবয়সে (কবির বয়স নব্বই বৎসর) স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে কবি অপারগ।

সাদী যে কোন দৈব প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাব্যকলায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে;—দৈব প্রেরণায় ঐশীশক্তি দ্বারা অনেক অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডও সাধারণ করিতেন। সাদীর জীবনীলেখক দৌলত সাহ বলেন, সুদীর্ঘকাল পর্য্যটনের পর কবি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন, সেই সময় ভক্তগণ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া কবিকে উপহার দিত। কবি ইহার কিয়দংশ গ্রহণ করিতেন; উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে বণ্টন করিয়া অবশিষ্টাংশ সিরাজের দরিদ্র কাঠুরিয়াগণের জন্য তুলিয়া রাখিতেন।

সাদী যে শুধু বক্তৃতা বা উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে তিনি যে সমস্ত বিষয় উপদেশ দিতেন, সেই সমস্ত কার্য্য তিনি ধর্ম্মজ্ঞানে স্বয়ং কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার উপদেশাবলীর সার মর্ম্ম এই যে, অপরের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিলেই তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা হইল। জন সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করাই ধর্ম্ম; জপের মালা ঘুরাইলেই ধর্ম্ম কার্য্য সম্পন্ন করা হয় না। কবি ধর্ম্মের ভাণ অথবা সাধুর ভণ্ডামি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি চির-দিনই ভণ্ড সাধুর শত্রু ছিলেন। সাধুদের সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন,—সাধুরা আত্ম-মুক্তির জন্য একান্ত চিন্তিত থাকেন, তাহাতে পতিতের উদ্ধারের দিকে তাঁদের মোটেই দৃষ্টি থাকে না। গুলিস্তাঁর একটী উপাখ্যানে কবির সাধুবিদ্বেষ স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির ভণ্ড সাধুবিদ্বেষ টিলটুকু আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

কবির ধর্ম্মমত

কবির সাধুবিদ্বেষ।

একরাজা রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মানসিক করিলেন যে, শীঘ্র রোগ মুক্ত হইলেই সাধুদের ধন দান করিবেন। রোগমুক্ত রাজা এক ক্রীতদাসের হস্তে প্রচুর অর্থ বিতরণ করিতে পাঠাইলেন। সে সমস্ত দিন পরে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া রাজাকে জানাইল "প্রভু, নগরে একটী সাধু পেলাম না!" রাজা সক্রোধে বলিলেন, সে কিরে! আমিত বেশ ভাল রকমই জানি যে, আমার রাজ্যে অন্ততঃ চারিশত সাধু আছে। ক্রীতদাস বলিল, জনাব! যাহারা সাধু, তাহারা আপনার অর্থ স্পর্শ করে না, আর যাহারা অসাধু তাহারাই অর্থ গ্রহণ করে। রাজা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, কথাটা কিন্তু সত্য।"

কবি সাদী নির্জ্জনপ্রিয় ছিলেন। সুদীর্ঘকাল পর্য্যটনের পর স্বদেশে প্রত্যা-গমন করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত কবি নির্জ্জনে ধর্ম্ম ও কাব্যালোচনাতেই অতি-

বাহিত করেন। কবির এই সময়ের মানসিক অবস্থা ঈশ্বরমুখী ছিল। উষার পূর্ব্বাকাশের অরুণিমার ন্যায় ভক্ত কবিহৃদয় ঈশ্বরসমাধির পূর্ব্বরাগ-রঞ্জিত ছিল।

নির্জ্জন প্রিয়তা ও কবির ঈশ্বর-সমাধির পূর্ব্বাবস্থা

সিরাজের যে নির্জ্জন মনোরম স্থানটীতে কবির বাসগৃহ ছিল, সেই স্থানটীর সৌন্দর্য্য ও সুষমা স্বর্গের নন্দনকাননের তুল্য ছিল।

কবি জামি তাঁহার 'নাফ—হাত উল—থানাল' নামক গ্রন্থে সাদীর ঈশ্বরানুগ্রহলাভ ও ঐশীশক্তির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, পবিত্র মক্কাতীর্থে অবস্থানকালে সাদী ভিস্তি হইয়া মক্কা সহরের রাস্তায় জল সেচন করিতেন, জলদান করিয়া তৃষ্ণাতুর পথিকগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। উক্ত সাদীর এই সাধুকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া জলদেবতা নিজ অঙ্গ কবি সাদীকে পারিতোষিক দান করেন।

কবির ঐশীশক্তি সম্বন্ধে আত্মীয় স্বজনের সন্দেহ ও অবিশ্বাস

এই পবিত্র বারি পান করিয়া সাদী কাব্যশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পারদর্শিতা লাভ করেন। সাদীর এক আত্মীয় এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনার কথা শ্রবণে মনে মনে বিশ্বাস করিত না, পরন্তু অবিশ্বাস করিত। তাহাতে জলদেবতা ঐ অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে তাহার সন্দিগ্ধ চিত্ততার জন্য স্বপ্নে অতিশয় তিরস্কার করেন। স্বপ্ন দর্শনের পর ঐ ব্যক্তির চৈতন্যোদয় হয়।

কবির অবিশ্বাসী আত্মীয়গণের প্রতি দেবতার তিরস্কার

সাদির বাক্‌সিদ্ধি লাভের যে নিদর্শনস্বরূপ আমরা একটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, সুদীর্ঘ পর্য্যটনের পর কবি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, জনসাধারণ, বাদসা, উজীর, কবিকে দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিতে আসিতেন এবং সকলেই কবিকে শ্রদ্ধার উপহার-স্বরূপ প্রচুর অর্থ ও নানাবিধ মহামূল্য দ্রব্যাদি উপহার দিতেন। একদিন একটী ঘটনা ঘটিল; এক চোর মূল্যবান্ দ্রব্যাদি চুরি করিবার জন্য কাঠুরিয়ার বেশে সাদীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সুযোগ বুঝিয়া চোর চুরি করিবার জন্য হাত উঠাইবামাত্র তাহার হাত ঊর্দ্ধে রহিয়া গেল। সে কোন মতেই হাত নামাইতে পারিল না। ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে

কবির বাক্‌সিদ্ধি লাভের নিদর্শন চিত্র

* ভক্ত প্রবরেষু কবি চণ্ডিদাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ প্রথমে অবিশ্বাস করিতেন। পরে দেবতার দৈবাদেশ তিরস্কারে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হয়।

লাগিল। চোর অতি কাতরভাবে সাদীকে বলিল, "শেখ, আর যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। আমাকে রক্ষা কর"। কবি চোরের কাতরোক্তি শুনিয়া বলিলেন, "তুমি যদি কাঠুরিয়া হও, তোমার হস্তে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই কেন? আর যদি দস্যুই হও, তোমার বাহুতে বল ও হৃদয়ে সাহস নাই কেন?" যাহা হউক কবি চোরের জন্য প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চোর যন্ত্রণামুক্ত হইল ও তাহার হাত ধীরে ধীরে নামিল।

কাঠুরিয়া বেশী চোর ও কবি-সাদী

"নাকাতুল আসাদ" নামক গ্রন্থে আর একটি অলৌকিক ঘটনা লিখিত আছে—এক দরবেশ সাদীকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিত। সে সাদীকে ভক্ত কবি বা বিদ্বান্ বলিয়া স্বীকার করিত না। একদিন রাত্রিকালে এই দরবেশ স্বপ্নে দেখিল, যে দেবদূতগণ আলোকবর্ত্তিকা ও পাত্রি-জাতমালাহস্তে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতেছে; দরবেশ দেবদূতগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল,—কবি সাদী এমন একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন, যাহার জন্য আমরা তাঁহার সম্মানের জন্য এইভাবে যাইতেছি। দরবেশ জাগ্রত হইয়াই সাদীর গৃহাভিমুখে ছুটিল। কবিকে নিজ স্বপ্নবৃত্ত শুনাইল। দরবেশ যে সময় কবি সাদীর ভবনে উপস্থিত হইল, ঠিক সেই সময়ে কবি সাদী সেই কবিতাটির রচনা শেষ করিয়া গুন্ গুন্ স্বরে আবৃত্তি করিতেছেন।—আমরা নিম্নে সেই কবিতাটির মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম; "হে মিত্র, সেই কেবল শ্যামল পল্লবপূর্ণ বৃক্ষপত্রে স্রষ্টার সৃষ্টিসৌন্দর্য্য রহস্য দেখিতে পায় ও বুঝিতে পারে—সৃষ্ট বস্তুর চারিধারে স্রষ্টার কত বুদ্ধি ও শক্তির জ্যোতি বিরাজমান।"

দরবেশের স্বপ্ন

সাদী সর্ব্বশুদ্ধ দশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে চারিখানির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) পন্দনাস সাদী অর্থাৎ সাদীর উপদেশাবলী
(২) গুলিস্তাঁ অর্থাৎ গোলাপবাগান
(৩) বোস্তাঁ অর্থাৎ গন্ধস্থান, ফুলবাগান
(৪) কুল্লিয়াৎ সাদী অর্থাৎ সাদীর কবিতা ও বিবিধ গল্প।

গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ র জন্যই কবি জগদ্বাসীর নিকট বিশেষভাবে সম্মানিত ও সম্পূজিত। জগৎকবিসভায় কবি শেখ সাদি চিরপূজ্য আসন লাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

সাদীর যে সমস্ত মূল্যবান্ রচনা দ্বারা পারস্যসাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে তন্মধ্যে বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ বিশ্ব সাহিত্যে সর্ব্বত্র পরিচিত ও আদৃত। ৮২ বৎসর বয়সে কবি বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ।
রচনা করেন। তৎপর বৎসর গুলিস্তাঁ রচনা করিতে তাঁহার জীবনের শেষ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, কবি সমগ্র জীবন-সঞ্চিত জ্ঞান পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার কথা এই কাব্যমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবি এই কাব্যখানি পারস্যের সুলতান আবুবকর সাদ্‌দিন জঙ্গীর নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

গুলিস্তাঁ রচনা করিয়া কবির ধারণা হইল, তাঁহার অনিত্য জীবনের শেষ হইবে, দেহ ধূলায় ধূসরিত হইবে, কিন্তু কবির অমূল্য উপদেশপূর্ণ কাব্য তাঁর অক্ষয় স্মৃতিরক্ষায় সহায় হইবে। যদিও তিনি জানিতেন যে, পার্থিব কোন বিষয়ের স্মৃতি চিরস্থায়িনী নহে—তবুও কবি আশা করেন, যে তাঁহার পারত্রিক কার্য্যের জন্য কেহনা কেহ কবির আত্মার কল্যাণ কামনা করিবে।

গুলিস্তাঁ প্রকাশ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—যাঁহারা দীন লেখকের দোষসমূহ গোপনে রাখেন এবং অধীনগণের ছিদ্র অন্বেষণ কবির আত্মকথা—
করেন না,—সেই সকল উদারহৃদয় ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি এই কাব্য প্রচার করিতে সাহসী হইলাম।

গুলিস্তাঁ কাব্য—

(১) রাজকীয় ব্যবহার
(২) নরবেশগণের গুণাবলী
(৩) সন্তোষের উপকারিতা
(৪) মৌনাবলম্বনের উপকারিতা
(৫) যৌবন ও প্রণয়
(৬) জরা ও দুর্ব্বলতা
(৭) শিক্ষার উপকারিতা
(৮) সামাজিক কর্ত্তব্য

এই আটটি অধ্যায়ে এই অধ্যায়গুলি কতকগুলি পুরাতন প্রাচীন উপাখ্যান, জনশ্রুতি, গল্প, কবিতা ও পূর্ব্বতন বাক্যগণের রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে রচিত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের মর্ত্ত গুলিস্তা। গদ্য ও পদ্যে গঠিত।

১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ হিজরীর ৬৫৫ ও ৬৫৬ বৎসরে কবি বোস্তা ও গুলিস্তা পর্যায়ক্রমে রচনা করেন। গ্রন্থশেষে কবি বলিয়াছেন, কবিতা-মধু দিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল প্রশ্নের মীমাংসা ও নীতিপূর্ণ উপদেশ দান করাই আমার এই কাব্যদ্বয়ের উদ্দেশ্য।

গুলিস্তার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, রূপক অলঙ্কার ও উপমাবহুল। বোস্তার রচনা সুখপাঠ্য ও পবিত্রতাপূর্ণ। যে ঈশ্বরানুরাগ, ও সাধুতা, সাদী-চরিত্রের স্বাভাবিক লক্ষণ, বোস্তার প্রতিকবিতা সেই পবিত্রভাবে পূর্ণ। গুলিস্তার কবি নীতিপূর্ণ উপদেশ, অতীন্দ্রিয় জগতের কথা, ও সরস হাস্যরসের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছেন। জগবাসী অঞ্জলি পুরিয়া এই পবিত্র ভাব-ধারা পান করিয়াও তাহা কোন কালে নিঃশেষ করিতে পারিবে না। বোস্তার হাস্যরস কিছু সংযত। বোস্তার প্রতি কবি-ভার প্রেম-ভক্তির ঈশ্বরানুরাগের শাশ্বত ভাবধারা তর তর বেগে বহিয়া গিয়াছে।

গুলিস্তা ও বোস্তার ভাবধারা

কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যদ্বয় গুলিস্তা ও বোস্তার মধ্যে গুলিস্তার সমধিক প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপের আমষ্টার্ডম্ সহরে গুলিস্তার প্রথম লাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার পর মুসো আন্দ্রে ডুরিয়ার নামক জনৈক ফরাসী-সাহিত্য-সেবী গুলিস্তার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। জর্ম্মণদেশের বিখ্যাত সাহিত্যরসিক ব্যারণ ভন হোমর পারগষ্টল একটী জর্ম্মণ অনুবাদ প্রকাশ করেন।

প্রকাশে গুলিস্তা ও বোস্তার

গুলিস্তার অনুবাদ

ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহার উপর্য্যুপরি গুলিস্তা ও পরে বোস্তার বিস্তর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

৬৯০ হিজরীর শাওয়াল মাসের (আশ্বিন ও কার্ত্তিক) শুক্রবার দিন সন্ধ্যার সময় করি ১২০ বৎসর বয়সে মরজগতে তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তিস্মৃতি রাখিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করেন। কবির বয়স সম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ আছে। কাহারও মতে, ১০২, ১১০, ও ১২০ চান্দ্র) বৎসর। দৌলত সাহ ও ইব্রাহিম খাঁর মতে ১২০ বৎসর বয়সে মহাত্মা শেখ সাদীর মৃত্যু হয়। কিন্তু দৌলতসাহের

সমসাময়িক কবি জামি, কবিভ্রাতা কবি শেখ সাদীর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে

সাদির জন্ম ও সমাধি

বলেন, সাদী ৫৭১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন, ৬৯০ হিজরীর শাওয়াল মাসে ১২০ (চান্দ্র) বৎসরে পরলোক গমন করেন। কবির বয়সসম্বন্ধে কারবামি ও দৌলতসাহ একমত। দৌলতসাহ বলেন, "মুজার শিলগড় নামে বিন সালি বিন জঙ্গীর পুত্র আবুবক্ মহম্মদ-সার রাজত্ব সময়ে ৬৯০ হিজরীর শাওয়াল মাসের শুক্রবার দিন সন্ধ্যার সময় কবি শেখ সাদী সিরাজ সহরে মহাপ্রস্থান করেন।

সমাধি-মন্দির

সিরাজ নগরের পূর্ব্বপ্রান্তদিকে কবির মনোমত একটি নির্জ্জনস্থানে কবির প্রস্তর সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হয়। কথিত সমাধি-মন্দিরে তাঁহার একখানি ছবি ও কবির রচিত জীবনের নশ্বরতাসূচক কয়েকটি কবিতা আছে। এই সমাধি-মন্দির সম্বন্ধে দৌলতসাহ বলেন, সিরাজের যে মনোরম স্থানটীতে কবির সমাধিমন্দির প্রস্তুত হয়, তাহার চারিধারে ঝরনার ঝর ঝর বারিধারা অবিশ্রাম গতিতে বহিতেছে। এই নির্জ্জন পবিত্রস্থানটি তীর্থক্ষেত্র অপেক্ষাও পবিত্র ও শ্রদ্ধার সহকারে পরিগণিত। ইব্রাহিম খাঁ বলেন, এই পবিত্র স্থানটী জনসাধারণের নিকট "সাদিয়া" নামে পরিচিত।

সাদিয়া

কবির মৃত্যুর ৪৯১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে cal Franklin কার্নেলফ্রাঙ্কলিন নামক একজন ইংরাজ কাব্য-রসিক কবির সমাধি-মন্দির পরিদর্শন করিতে সিরাজ যাত্রা করেন। কার্নেল সমাধি-মন্দির সম্বন্ধে বলেন, "যে চতুষ্কোণ প্রস্তর সমাধি-মন্দির মধ্যে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন, সেই মন্দিরটী দেখিলেই মনে হয়,

বিদেশী কাব্য-রসিকের কবির সমাধি-মন্দির পরিদর্শন

তাঁহার (সাদীর বয়স সম্বন্ধে তিনটি প্রবাদ আছে—৬২, ৬৩, ও ১২০ (চান্দ্র) বৎসর। বোধ হয় ১২০ বৎসরই ঠিক হইবে, কেননা তিনি স্বয়ং ইলেমেলোকে ভবদেশের কথা কবিকে স্থানে লিখিয়াছেন। তিনি যজ্ঞমার নিকট হদিশ ও তপশীর পড়িয়া কিসম মধ্যে [illegible] ছিলেন। অল্পমা কবিকে সৃষ্টির দলে পান [illegible] নিবেদ করিতেন। কবি লিখিয়াছেন, "যৌবনের আবেগে তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বকুনি যাই তাম।" ৬৫৫ হিজরির (১২০০ খৃষ্টাব্দ) অর্থাকেবির মৃত্যুর ৯০ চান্দ্র বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। অতএব কবির বয়স ১২০ বৎসরই হইবে। ১০২ হইলে অল্পমার মৃত্যুর সময়ে কবির বয়স ৯০ বৎসর, ১১০ বৎসর হইলে ১৩০ বৎসরের হয়। এই বয়সের পূর্ব্বে যৌবনের তাড়নায় পড়ে তাঁহাকে যাইয়া বকুনি যাওয়া এবং হদীস ও তপশীর মুখস্থ করা অসম্ভব।

নবিসী ও মর্ম্মবাণী ১ম খণ্ড ১৩৪১-২২

সৌন্দর্য্যে এই মাত্র সমাধিস্থ করা হইয়াছে। কবির চিত্র সম্বন্ধে cal Franklin বলেন, কবি নীল রঙের খিলকা

কবির চিত্র

মশক পরিধান করিয়া দরবেশের বেশে চিত্রিত। কাহারও মতে টুপি, একহস্তে ভিক্ষাপাত্র ও অন্য হস্তে একখানি কুড়ুল আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী

২২ নং ছুতার পাড়া লেন, কলিকাতা।

নামাবতার হরিদাস।

আপন হইতে "নাম" বড়, এই জানি,
পরম আত্মা হ'তে নামে বিচ্ছিন্ন করিয়া,
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ-পতি কহিলেন তবে ;—
"ধরাগ্রামে অবতীর্ণ হও মোর আগে ;
নাম-রসে সিক্ত করি শুষ্ক বঙ্গভূমে
করহ বপন নাম-বীজ ;—নামাঙ্কুর
হইবে তাহাতে ত্বরা ; পরে আমি আসি
যতনে করিব তায় বৃক্ষে পরিণত,—
নাম-রূপী মহাবট। সে বটের ছায়ে
লভিবে আরাম চির, স্নিগ্ধ, সুশীতল,—
সংসারের তপন-তাপিত প্রাণী যত।"
তেজঃপুঞ্জাকৃতি "নাম" খসিয়া পড়িল,
তারা যেন। উজলিল দশ দিক্ ক্ষণ,
পুষ্পবৃষ্টি হইল গগনে, মহানন্দে।

শ্রীদীননাথ সান্যাল

স্মৃতি ও সমাজ।

দেশভেদে স্মৃতিভেদ, দেশভেদে শাখাভেদ, দেশ্যপ্রভাব।

দেশভেদে আচারভেদ লক্ষিত হয়। তাহার কারণ এই যে, স্মরণাতীত কাল হইতে যে সকল আচারপদ্ধতি তত্তদ্দেশে প্রচলিত ছিল, স্মৃতিশাস্ত্রে সেইগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র। এমন কি, অনেকগুলি আচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া বিরচিত হইয়াছে; কিন্তু সমাজ সেইগুলি পরিত্যাগ করে নাই। মীমাংসকদিগের অনেকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারের অপ্রামাণ্য ঘোষণা করিয়াছেন, কেহ বা ন্যূনতা স্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে একটু বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। বৌধায়ন সংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, দক্ষিণ প্রদেশে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যে এবং উত্তর প্রদেশে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে পাঁচপ্রকার বিরুদ্ধাচার দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দক্ষিণ প্রদেশের অনাচার অনুপনীতের সহিত ভোজন, ভার্য্যার সহিত ভোজন, পর্য্যুষিত বস্তু ভোজন, মাতুলের কন্যা বিবাহ করা এবং পিসির কন্যা বিবাহ করা; উত্তর দেশের অনাচার—মেষলোম বিক্রয়, সীধুপান, (মদ্যপান) উভয়দিকে অর্থাৎ দুপাটে যাহার দাঁত আছে, (যেমন ঘোড়া গাধা প্রভৃতি) সেই সকল জন্তুর দ্বারা ব্যবহার, অর্থাৎ অর্থোপার্জ্জন, অস্ত্রধারণবৃত্তি এবং সমুদ্র-যাত্রা। এই সকল অনাদিলোকপরম্পরা-প্রাপ্ত অনাচার। তত্তদ্দেশে এই সমস্ত অনাচার দোষাবহ নহে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যবাসী যদি উত্তর দেশে বাসকালে মাতুল কন্যাদি পরিণয় করেন, তবে দোষী হইবেন। আর আর্য্যাবর্ত্তবাসী যদি দক্ষিণ দেশে যাইয়া সীধুপান করেন, তবে দোষী হইবেন, নিজ নিজ দেশের এই সকল অনাচারে দোষ হইবে না। কারণ এই আচার দেশনিবন্ধন, অর্থাৎ তত্তদ্দেশে অনাদিলোকপরম্পরাপ্রাপ্ত (১৭) মাধবাচার্য্য পরাশরভাষ্যে

---

(১৭) তত্র—বৌধায়নঃ—পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তির্দক্ষিণতঃ, অনুপনীতেন ভার্য্যয়া চ সহ ভোজনং পর্য্যুষিতভোজনং, মাতুলদুহিতৃপিতৃষ্বসৃদুহিতৃপরিণয়নমিতি, তথোত্তরতঃ—ঔর্ণবিক্রয়ঃ, সীধুপানং, আবুধীষ্ণকং সমুদ্রযানমিতি। ইতশ্চ ইতরস্মিন্ ক্ষুর্ব্বান্ দৃশ্যতে, ইতশ্চ ইতস্মিন্ তদ্দেশে প্রামাণ্যাৎ ইতি। এইস্থলে মাধবাচার্য্যের ব্যাখ্যা—ইতরো দাক্ষিণীত্য ইতরস্মিন্ উত্তরদেশে মাতুলসবর্ণং কুর্ব্বন্ দৃশ্যতে স্ম স্বদেশে। তথোত্তর উদীচ্য দক্ষিণ দেশে সীধুপানাদিকং কুর্ব্বন্ দৃশ্যতে স্ম স্বদেশে। কুতঃ দেশপ্রামাণ্যাৎ দেশনিবন্ধনাচারত্বেতার্থঃ। পরাশরমাধব—১ অঃ।

মাতুলকন্যাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন প্রসঙ্গে প্রদর্শিত বৌধায়ন বচনের ব্যাখ্যা করিয়া অনাদিলোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারেরও সমর্থন করিয়াছেন। এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মাধবাচার্য্য "বৌধায়ন সূত্রের" যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার পরবর্ত্তী অংশেই বলা হইয়াছে "মিত্যৌতদিতি গৌতম উভয়মেব নাদ্রিয়তে শিষ্টস্মৃতিবিরোধাৎ" গৌতম ঋষি বলেন যে, এই উভয় আচারই মিথ্যা, অর্থাৎ বৈদিক শাসনরহিত; কারণ শিষ্টসমাদৃত স্মৃতির সহিত এই উভয় আচারের (আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্যের প্রদর্শিত অনাচারের) বিরোধ দেখা যায়। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের ঋষি বৌধায়ন স্বকীয় দেশের সর্ব্বত্র মাতুল কন্যা বিবাহ প্রভৃতি নির্ব্বিবাদে চলিতেছে দেখিয়া, সেইগুলির অপরিহার্য্যতা মনে করিয়া প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়াছেন; এবং আর্য্যাবর্ত্তের প্রাদেশিক অনাচারগুলিকেও প্রসঙ্গতঃ গ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তবাসী ঋষি গৌতম বৌধায়নের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। কারণ তিনি দেখিতে পান যে, আর্য্যাবর্ত্তের সীধুপান প্রভৃতি অনাচারগুলি প্রাদেশিক, অর্থাৎ কোন কোন দেশে শিষ্ট সমাজে সীধুপান প্রচলিত আছে, সুতরাং ইহা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে গ্রাহ্য হইতে পারে না। ন্যায়মালাবিস্তারে—"মাতুলকন্যা বিবাহপ্রভৃতি কাসুচিদ্ দেশাচার দেখা যায়, তাহা প্রমাণ কি অপ্রমাণ,—এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, সমাধান করা হইয়াছে যে,—এই আচার প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, স্মৃতিমূলকত্ব নিবন্ধনই শিষ্টাচার প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়, কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে প্রত্যক্ষ স্মৃতির দ্বারা অর্থাৎ মাতুলকন্যা বিবাহ নিষেধক স্মৃতিবাক্যের দ্বারা শিষ্টাচার দর্শনানুমেয় স্মৃতি বাধিত হইবে। (১৮) ন্যায়মালার সিদ্ধান্তের সহিত পরাশর ভাষ্যের সিদ্ধান্তের বিরোধ হইতেছে। একই মাধবাচার্য্য দুই স্থলে দুই অভিমত প্রকাশ করিলেন; সুতরাং তাঁহার নিজের বাক্যই পরস্পরবিরুদ্ধ হইল। এই আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়া, পূজ্যপাদ উপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ন্যায়মালা

(১৮) যো মাতুলবিবাহাদৌ শিষ্টাচারঃ স মানবঃ।
ইতরাচারবন্মান্যমাধ্যঃ স্মৃত্যবাধনাৎ॥
স্মৃতিমূলো হি সর্ব্বত্র শিষ্টাচারস্ততোঽত্র চ।
অনুমেয়া স্মৃতিঃ সৈব বাধ্যা প্রত্যক্ষয়াপি সা॥ ইতি
উক্তঞ্চ—আচারাচ্চ স্মৃতিঃ স্মার্ত্তা স্মৃতেস্তু শ্রুতিকল্পনম্।
তেন হ্যস্মাদৃতং তেষাং প্রামাণ্যং পরিকল্পতে॥

১ম অ। ৩ পাদ। ১ম অধি।

সংগ্রহে প্রবৃত্ত মাধবাচার্য্য—বাস্তবিকপক্ষে মাধবাচার্য্যের মত সংগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অভিমত মাতুলকন্যাবিবাহের অপ্রমাণ্যবোধক শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে—পরাশরভাষ্যে মাতুলকন্যাবিবাহবোধক মূলে প্রতীক স্মৃতিবাক্য বুঝিতে পারিয়া নিজের অভিমত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।"

যাহা হউক—বিভিন্ন দেশের সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, "শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারের প্রামাণ্য নাই, এই সিদ্ধান্ত একালেরদিগের নিকট অলঙ্ঘ্য অপ্রাকৃতের ন্যায় রহিয়াছে মাত্র। ইহা সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। যে মুনি যে দেশের অধিবাসী ছিলেন, তিনি সেই দেশের অপরিহার্য্য অসদাচারকেও একেবারে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই। কার্য্যটা অন্যায়, এমত বিবেচিত হইলেও তাহা সমর্থিত হইয়াছে। কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বদেশেষনাচারা স্মৃত্যা তাম্বূলচর্ব্বণম্" রাস্তায় গমন সময়ে চর্ব্বণ সমস্ত দেশেরই অনাচার। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, স্মৃতিশাস্ত্রের মূল বেদে প্রতিষ্ঠিত, তবে ইহাতে এমত বিরুদ্ধ আচার কেন হইল? তদ্বিষয়ে একটু বিশেষ রূপ আলোচনা আবশ্যক। অবতারিত প্রশ্নের উত্তর বলা নাইতে পারে যে, বেদের অবলম্বনে স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হইয়াছে, বেদই বিভিন্ন সর্ব্ব দেশের কুল আচার বেদ নির্দ্ধারিত হয় নাই। চরণব্যূহপরিশিষ্টের ভাষ্যে প্রবন্ধবদ্ধ প্রমাণের দ্বারা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন যে, নর্ম্মদানদী পৃথিবীর মধ্যরেখা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণোত্তর ভাগে (দক্ষিণোত্তরদিক) বেদশাখা রক্ষিত হইয়াছে। নর্ম্মদার দক্ষিণভাগে আপস্তম্বী, হিরণ্যকেশী, বারাহী, ও পিপ্পলা শাখা। নর্ম্মদার দিল্লী, শাঙ্খায়নী কৌথুমী ও শৌনকীশাখা নর্ম্মদার উত্তরভাগে অবস্থিত। কি তদপ্রভৃতি দেশেও অতিপ্রাচীন কালেই বেদশাখা বিভক্ত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ের প্রমাণও চরণব্যূহেই দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী ও গুর্জ্জর এই কয়টী দেশে বাজসনেয়ী অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখা প্রচলিত হইয়াছিল।(১৯)

অতি পুরাকালে প্রচলিত আচারই যে গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীনস্মৃতির

১৯। পৃথিব্যা মধ্যরেখা চ নর্ম্মদা পরিকীর্ত্তিতা। দক্ষিণোত্তরভেদেন শাখা বেদস্য তিষ্ঠতি॥ নর্ম্মদাদক্ষিণে ভাগে আপস্তম্বহিরণ্যকেশীনী। বারাহী পিপ্পলাচ যজ্ঞকর্ম্মণি বিভাগিনঃ॥ দাক্ষিণাত্যা শাঙ্খায়নী কৌথুমী শৌনকী তথা। নর্ম্মদাঽনন্তরভাগে চ যজ্ঞকর্ম্মবিভাগিনঃ॥ প্রকল্পকলিঙ্গাশ্চ কাশীনো গুর্জ্জরস্তথা। বাজসনেয়ী শাখা চ মাধ্যন্দিনী প্রতিষ্ঠিতা॥

ভিত্তি, তাহা তত্তদ্গ্রন্থপাঠেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য মনীষিগণও গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থগুলিকে অতিপ্রাচীন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু প্রসঙ্গতঃ আমরা একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, তাঁহারা প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিয়া ও প্রমাণাভাসের উপর নির্ভর করিয়া যে সকল গ্রন্থের যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা গণ-পদার্থবিৎ ভারতীয় সুধীবৃন্দের অভিমত নহে। এমন কি, মীমাংসাভাষ্যে শবরস্বামী কল্পসূত্রগুলি, সকর্তৃক কি অকর্তৃক, অর্থাৎ বেদের মত এই সূত্রগুলিও অপৌরুষেয় কি, পুরুষবিশেষ কর্তৃক প্রণীত, এই প্রকার বিচারের অবতারণা করিয়া কল্পসূত্রের সকর্তৃকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে কল্পসূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত প্রাচীনতম সূত্রগ্রন্থেও অনেক বিষয়ে কেবল প্রাদেশিক আচারেরই প্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইতে দেখা যায়। পারস্করের গৃহ্যসূত্রে কথিত হইয়াছে যে, বিবাহ-কার্য্যে গ্রাম বচন করিবে (১) অর্থাৎ গ্রামবাসী প্রাচীন মহিলাগণ যাহা করিতে উপদেশ করেন, তাহা করিতে হইবে। যেহেতু বিবাহে এবং শবদাহকার্য্যে গ্রামবচনই পাল্লীয় (২) এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে যে, বিবাহে শবদাহকার্য্যে গ্রামবাক্য প্রমাণ (২৯) প্রদর্শিত তৃতীয় সূত্রের অর্থ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বেদবাক্য লোকাচারেরই প্রমাণ্য ঘোষণা করিয়াছে, এবং আদিম হিন্দু-সমাজের অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃবর্গ এবং পুরস্ত্রীবর্গ সমাজের হিতকল্পে যে সকল নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেইগুলিই গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে কুলাচার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মহিলাদিগের উপদেশ এবং নেতৃবর্গের তদনুযায়ী আচরণ, এতদুভয়ের সমন্বয়েই কুলাচারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গোভিল-প্রভৃতির গৃহ্যসূত্রে এবং মন্বাদি সংহিতায় অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ প্রভৃতি সংস্কারে কুলাচারের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বিধোষিত হইয়াছে। (২১) গৃহ্যোক্ত সংস্কার-সম্বন্ধে প্রণিধান করিলে, ইহাতে প্রভূত দেশপ্রভাব প্রতিভাত হয়। সীমন্তোন্নয়নের কাল সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, ষষ্ঠমাসে অথবা অষ্টম মাসে এই সংস্কার কর্ত্তব্য। (২২) লোকাক্ষি বলিয়াছেন, গর্ভসঞ্চারের তৃতীয় মাসে সীমন্তোন্নয়ন

২৮। গ্রামবচনঞ্চ কুর্য্যুঃ। ২। বিবাহশ্মশানযোর্গ্রামং প্রবিশতাৎ। ৩। তস্মাত্তয়োর্গ্রামং প্রমাণমিতিশ্রুতেঃ। ৩।

(২১) চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে॥ মনু। ২। ৩৪।

(২২) ষষ্ঠেঽষ্টমে বা মাসেঽব্দে॥

করিবে। আশ্বলায়নের মতে গর্ভসঞ্চারের চতুর্থ মাসে এই সংস্কার কর্ত্তব্য। বৈজবাপ বলিয়াছেন, গর্ভসঞ্চারের চতুর্থ পঞ্চম অথবা ষষ্ঠমাসে এই সংস্কার কর্ত্তব্য। সাংখ্যায়ন গৃহ্যে কথিত হইয়াছে যে, প্রথমগর্ভে সপ্তম মাসে সীমন্তোন্নয়ন কর্ত্তব্য। শঙ্খ বলিয়াছেন, গর্ভস্পন্দন হইতে (চতুর্থ মাসে গর্ভের স্পন্দন হয়) প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে সীমন্তোন্নয়ন করিবে। মাধবাচার্য্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত কাল সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই, সামান্যতঃ বলা হইয়াছে মাত্র, সুতরাং এই সমস্ত কাল সম্বন্ধে বিকল্প বুঝিতে হইবে। (২৩) অর্থাৎ যে কোন কালে করিতে পারিবে। ইহার নাম (ইচ্ছা বিকল্প) অথবা একসময়ে অসমর্থ হইলে অন্যকালে করিবে। ইহা ব্যবস্থিত বিকল্প। মাধবাচার্য্যের এই অভিমত মীমাংসান্যায়ানুযায়ী। কিন্তু ঐতিহাসিকের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, স্বতই যেন প্রতিভাত হয়, যে মুনি যে দেশের অধিবাসী ছিলেন, তিনি সেই দেশের আচারই গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং যে স্থানে প্রাদেশিক বিভিন্নাচার দেখিয়াছেন, সে স্থানে "স্বদেশে মঙ্গলংকুলে" বলিয়া স্বস্বকুলক্রমাগত আচারের মঙ্গলজনকতা ঘোষণা করিয়াছেন। দেশপ্রভাবের অপ্রতিহতত্ব সম্বন্ধে ঋষিদিগের এবং নিবন্ধকারদিগের সম্পূর্ণ ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। পরাশর ভাষ্যে দেবল ঋষির একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতে জানা যায়—যে দেশে যে পুরে ত্রিবেদবিৎ পণ্ডিত-যুক্ত যে গ্রামে ও যে নগরে যে ধর্ম্ম (আচরণ) বিহিত অর্থাৎ পূর্ব্বাচার্য্যকর্ত্তৃক কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মকে বিচালিত করিবে না। (২৪) অনেকাংশে ইহার সমানার্থক দুইটি দেবলবচন হেমাদ্রিনিবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। বচনদ্বয়ের অর্থ বিশ্লেষ করিয়া হিন্দুসমাজের প্রতি আদেশ করিতেছে যে, যে দেশে যে দেবতা এবং যেরূপ ব্রাহ্মণ আছেন এবং যে দেশে যেরূপ

(২৩) সীমন্তোন্নয়নস্য যাজ্ঞবল্ক্যোক্তকালাদন্যেঽপি কালা মুনিভির্দর্শিতাঃ। তত্র লোকাক্ষিঃ—"তৃতীয়গর্ভে মাসি সীমন্তোন্নয়নং কার্য্যম্" ইতি।

আপস্তম্বোঽপি—"প্রথমে গর্ভে চতুর্থে মাসি" ইতি। বৈজবাপোঽপি "অথ সীমন্তোন্নয়নং—চতুর্থে পঞ্চমে ষষ্ঠে বাপি" ইতি। সাংখ্যায়ন গৃহ্যোঽপি—"সপ্তমে মাসি প্রথমে গর্ভে সীমন্তোন্নয়নম্" ইতি।

শঙ্খোঽপি—"গর্ভস্পন্দনমারভ্য সীমন্তোন্নয়নং, যাবদ্ধ ন প্রসবঃ" ইতি। বিশ্বোদ্রমনাসর্ব্বেষ্বপ্যেতে বিকল্পান্তে। পরাশর মাধব দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ। আচারকাণ্ড। ৪৩৯ পৃঃ।

(২৪) যস্মিন্ দেশে পুরে গ্রামে ত্রৈবিদ্যোনগরেঽপি বা।
যো যত্র বিহিতো ধর্ম্মস্তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ॥ পরাশর মাধব-২য় অধ্যায়ঃ।

জল এবং যেরূপ মৃত্তিকা, যে স্থানে যেরূপ পেচ ও যেরূপ ধর্ম্মাচার আছে, তত্তৎস্থানে সেই সমস্তকে অবজ্ঞা করিবে না; কারণ তত্তৎস্থানের জন্য সেইরূপ ধর্ম্মই সৃষ্টিতে হইবে। (২৫)

এমন কি, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অতি বিস্ময়কর কুলাচারেরও পরিচয় পাওয়া যায়। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে প্রস্থানকালে শ্মশানসমীপস্থ একটী শমীবৃক্ষে স্বকীয় অস্ত্র নিধান করিয়া সেইগুলিকে নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে, সেইবৃক্ষে একটি মৃতশরীর বন্ধনপূর্ব্বক গোপাল এবং মেষ-পালদিগের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন যে, আমাদের মৃতা বৃদ্ধামাতাকে এইবৃক্ষে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, ইহা আমাদের কুলধর্ম্ম, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও এই ধর্ম্মের আচরণ করিয়া গিয়াছেন। (২৬) প্রত্যেক দেশীয় নিবন্ধেই—"দেশানুবিধিঃ কুলধর্ম্মনথ্যং গোত্রধর্ম্মং নহি সংত্যজেচ্চ" এই শ্রেণীর বচন দেখিতে পাওয়া যায়, যেহেতু এই আচারের প্রতিপালনও অদ্যাপি বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

(২৫) যেষু দেশেষু যে দেবা যেষু দেশেষু যে দ্বিজাঃ।
যেষু দেশেষু যদ্ভোয়ং যা তত্রৈব মৃত্তিকা॥
যেষু দেশেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ।
তত্র তান্নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ॥ মেহাদ্রিপরিশিষ্টে ৩ও ১০ অঃ ৯৮৫ পৃঃ।
এসিএটিক্ সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক।

(২৬) অশীতিশতবর্ষেয়ং মাতা ন ইতিবাদিনঃ।
কুলধর্ম্মোঽয়মস্মাকং পূর্ব্বৈরাচরিতোঽপি চ॥ বিরাট পর্ব্ব।

রুসিয়ার বিপ্লববাদ

(জেনিভা ও সুইজর্লাণ্ড)

ইয়ুরোপের প্রায় সকল দেশেই বিপ্লববাদিগণের এক একটী দল আছে, তাহারা গোপনে বিপ্লববাদের প্রচার করিয়া থাকে। ইউরোপীয় বিপ্লববাদীদের মধ্যে রুসিয়ার নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত। রুসিয়ার তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইলেও তাহারা আপনার রাজদণ্ডের ভয়ে স্বদেশে বাস করিতে সাহস করে না, রুসিয়ার বাহিরে তাহাদের জীবন নিরাপদ নহে বুঝিয়া সুইজর্লণ্ডে তাহাদের প্রধান আড্ডা সংস্থাপিত করিয়াছে। জেনিভা নগর কেবল নিহিলিষ্ট নহে, ইয়ুরোপের প্রায় সমুদয় বিপ্লববাদিগণের আশ্রয়স্থল ও ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র; এই জন্য কোন সুবিদিত করাসী বিচারপতি জেনিভাকে "ইউরোপের দুষ্টব্রণ" (Cancer of Europe) নামে অভিহিত করিয়াছেন। অবস্থাবিবেচনায় ইহা অত্যুক্তি মনে হয় না; বস্তুতঃ পৃথিবীর আর কোন নগরে এত বিপ্লববাদীর একত্র সমাবেশ দেখা যায় না। ভূতপূর্ব্ব রুসীয় সম্রাটের হত্যার ষড়যন্ত্র সর্ব্বপ্রথমে জেনিভানগরেই কল্পিত হইয়াছিল এবং ষড়যন্ত্রকারীরা এই নগর হইতেই সেই লোমহর্ষণ দুঃসংকার্য্য সংসাধনের জন্য রুসিয়াতে যাত্রা করিয়াছিল। এমন কি এই ষড়যন্ত্রের নেতৃস্থানীয়া এক মহিলা রুসীয় পুলিশের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অপূর্ব্ব চাতুর্য্যপ্রভাবে রুসিয়া হইতে জেনিভায় পলায়ন করে। অতঃপর দীর্ঘকাল এই নগরে নিরাপদে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সুইস সাধারণতন্ত্র তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদানে কুণ্ঠিত হয় নাই।

পাঠকগণের মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, পৃথিবীতে এত স্থান থাকিতে জেনিভানগরই বিপ্লববাদিগণের প্রধান লীলাক্ষেত্র হইল কেন? মেৎসিনী ও ডিনামাইটের সহায়তায় যাহারা স্বদেশের উদ্ধারসাধনে কৃতসংকল্প এই স্থানটির প্রতি তাহাদের এত মমতা কেন? জেনিভার ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করিলেই ইহার কারণ বুঝিতে পারা যায়। জেনিভা হইতে একটু পাহাড়ের

সেই রাজ্যসীমায় উপস্থিত হওয়া যায়, এবং যে কোন ব্যক্তি এই নগর হইতে পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে ইটালী বা জর্ম্মণ রাজ্যে পলায়ন করিতে পারে। মনে করুন, কোন লোক জর্ম্মণীতে অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে জেনিভায় পলায়ন করিল, তাহার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জর্ম্মাণ পুলিসের হস্তগত হইলে তাহারা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সুইস গবর্মেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিবে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অপরাধী কর্ত্তৃক ঘণ্টার মধ্যেই হয় ফ্রান্সে না হয় ইটালীসীমায় পলায়ন করিবে; জর্ম্মণ-পুলিশকে তখন নিকপায় হইয়া ইত্যালীয় গবর্মেণ্টের নিকট গ্রেপ্তারী পরোয়নার জন্য প্রার্থনা করিতে হয়, কিন্তু প্রার্থনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অপরাধী দেশান্তরে অদৃশ্য হয়।

এতদ্ভিন্ন আরও একটা কথা আছে। কোন ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিয়া কাহারও ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া অন্য দেশে পলায়ন করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ, কোন সম্রাটের বা কোন মুকুটধারী স্বাধীন নরপতির হত্যাকারী রাজনীতিক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা তত সহজ নহে; কারণ বিদেশী রাজনীতিক অপরাধিগণকে ইউরোপে প্রায় সকল গবর্মেণ্টই কিঞ্চিৎ অনুগ্রহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাহাদিগকে আশ্রয়দান করেন, এবং সহজে ভিন্ন গবর্মেণ্টের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মঞ্জুর করেন না। ইউরোপে রাজনীতিক অপরাধীদের সাত খুন মাপ। কেন এরূপ হয় তাহা অনুমান করা কঠিন। সম্ভবতঃ দেশোদ্ধারের ধুয়া তুলিয়া তাহারা যে নৃশংশাচারের প্রশ্রয় প্রদান করে, অধিকাংশ ইউরোপীয় গবর্মেণ্ট তাহা মার্জ্জনীয় মনে করেন। এ বিষয়ে সুইজর্লণ্ড ও ইংলণ্ড ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী, আর এইজন্যই লণ্ডন ও জেনিভার্য ইউরোপের অসংখ্য রাজনীতিক অপরাধী নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছে। এই দুই নগরে বাস করিয়া তাহারা ইউরোপের বহুদেশে কি নিদারুণ অশান্তি ও সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিতেছে, তৎপ্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না।

জেনিভানগরটি সুবৃহৎ নহে, জনসংখ্যাও একলক্ষের কম। কয়েক শত বৎসর হইতে এই নগরের বহু উন্নতি সাধিত হইতেছে, নগরের পরিধিও বর্দ্ধিত হইয়াছে। জেনিভার প্রাকৃতিকদৃশ্য পৃথিবীর অধিকাংশ নগর অপেক্ষা মনোহর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইংরাজ, ফরাসী বা ইয়োরোপের কোন শক্তিশালী জাতির অধিকার ভুক্ত হইলে সুবিস্তীর্ণ হ্রদ প্রান্তবর্ত্তিণী গিরিরাণী জেনিভার শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হইত। এরূপ নয়নরঞ্জন প্রাকৃতিক দৃশ্য ইউরোপের আর কোন নগরে দৃষ্টিগোচর হয় না। যে হ্রদের উপর এই নগর অবস্থিত, তাহা ২৮ ক্রোশ দীর্ঘ, ইহার

দক্ষিণে চিরতুষারসমাচ্ছন্ন সমুন্নত ধসর পর্ব্বতশ্রেণী, পূর্ব্বে সুবিশাল তুষার অরণ্যানী, দূরে চিরতুষারকিরীটা নগরাজ অল্পসের শুভ্র শিরস্ত্রাণস্বরূপ মণ্টব্লাঁ, তাহার শুভ্রশির নীলাকাশ চুম্বন করিতেছে। সকল ঋতুতেই এই স্থানটির শোভা অতুলনীয়, বিশেষতঃ শীতকালে সমগ্র পার্ব্বত্য প্রকৃতি তুষাররাশিতে সমাচ্ছন্ন হইলে ইহার যে সৌন্দর্য্য নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়—লেখনী মুখে তাহার বর্ণনা সম্ভব নহে। রোননদের সুগভীর সুনীল সলিলরাশি এই নগরের চরণ চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহার অরণ্যে নানাজাতীয় বৃক্ষ তাহাদের হরিৎপত্রশ্যামল দুর্ব্বাদল, এবং শত শত জাতীয় সুরভি কুসুমের উদ্যান নগরের নয়নাভিরাম শোভা সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু বৃক্ষচিত্রে এইরূপ অতুলনীয় হইলেও জেনিভা এখন ইউরোপের "দুষ্টব্রণ" নামে অভিহিত।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জেনিভার আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল, এবং ইহা সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল; কিন্তু এখন সেই প্রাচীরের অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়; বহু দুর্গম সঙ্কীর্ণ ও অসমতল পথে এই নগর পরিপূর্ণ, দরিদ্রের গৃহগুলি অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধদূষিত ও অস্বাস্থ্যকর।

আধুনিক কালে প্রাচীন জেনিভার সহরতলী ধ্বংস করিয়া নগর বিস্তৃত করা হইয়াছে, পথগুলি অপেক্ষাকৃত সমতল হইয়াছে, এবং রোন নদের উপর ছয়টি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া নগরটিকে অপেক্ষাকৃত সুগম করা হইয়াছে।

জেনিভার আদিম অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত বিরল, অধিকাংশ অধিবাসীই ইটালি, ফরাসি ও জর্ম্মণ বংশোদ্ভূত; ইহারা ফরাসি রীতি নীতির পক্ষপাতী। ইহারা অন্য দেশের লোকের সংস্রবে আসিতে চাহে না, ইহাদের অতিথি-পরায়ণতারও বড় অভাব; তবে মৌখিক সৌজন্যে ইহারা কৃপণ নহে। সুইজলণ্ডের কিয়দংশ জর্ম্মণীর অধিকৃত; সেই অংশের অধিবাসিগণকে অপর অংশের লোক বিদেশী বলিয়া ঘৃণা করে। জেনিভায় অনেক বৈদেশিকও বাস করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে রুসের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; পূর্ব্বে জেনিভায় তিন চার হাজার ইংরাজও বাস করিত, কিন্তু নানা কারণে তাহারা নগর ত্যাগ করিয়া এখন হ্রদের অন্য প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

জেনিভায় যে সকল প্রবাসী রুস বাস করে, তাহাদের মধ্যে প্রায় পনের আনা রাজদ্রোহী; রুস সম্রাটের সর্ব্বনাশ ও রুসীয় রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধন তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত; ইহারা নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সকল নিহিলিষ্টের স্বতন্ত্র রাজনীতিক সমাজ আছে; তাহাদের সংবাদপত্র স্বতন্ত্র, মুদ্রাযন্ত্র স্বতন্ত্র,

এমন কি হেঁয়ালিগুলিও স্বতন্ত্র। এই সকল নিহিলিষ্টের জীবন দুর্ভেদ্য রহস্য-জালে সমাচ্ছন্ন; ইহাদের মধ্যে সরলপ্রকৃতি রসিক লোকের সংখ্যা একান্ত বিরল; প্রায় সকলেই মিতভাষী, গম্ভীর, কর্ম্মঠ ও তেজস্বী; কিন্তু তাহাদের যে, ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল, এরূপ বোধ হয় না, নরশোণিতপাতে বসুন্ধরা কলঙ্কিত করা যাহাদের উদ্দেশ্য, উত্তেজনায় বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে উদ্যত, তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান কতদূর প্রবল, ইহা নির্ণয় করাও কঠিন; কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে তাহারা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্রতের উদ্‌যাপনে তাহারা হৃদয়শোণিতপাতেও কুণ্ঠিত নহে; রাজনীতিক সংকল্প সাধনে তাহারা বদ্ধপরিকর, পরস্পরের সহায়তা করে। রুসীয় সাম্রাজ্যের রাজতন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্য তাহারা স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছে; এবং অসীম ধৈর্য্য ও অসাধারণ আত্মত্যাগের সাহায্যে তাহারা প্রতিনিয়ত রুসসাম্রাজ্যে এরূপ ভীষণ বিপ্লবের দাবানল প্রজ্বালিত করিয়াছে যে, সেই অগ্নি সহজে নির্ব্বাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইউরোপপ্রবাসী নিহিলিষ্টগণের মধ্যে রুসিয়ার অতি সম্ভ্রান্ত বংশে অনেকের জন্ম। তাঁহাদের অনেকেই রাজদণ্ডে নিগৃহীত হইবার ভয়ে স্বদেশ হইতে পলায়ন-পূর্ব্বক জেনিভার আশ্রয় লইয়াছেন; কেহ কেহ রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত হইয়া জেনিভায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যথেচ্ছাচারী রুস সম্রাটের অত্যাচার হইতে সাম্রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিবেন, সেই অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন সুবিস্তীর্ণ দেশে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিয়া বিশাল রুস জাতিকে সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি সম্পন্ন ও সাম্যবাদী করিয়া তুলিবেন, সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি ও নীতির প্রতিষ্ঠা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত; কিন্তু দীর্ঘ কালের চেষ্টাতেও তাঁহাদের এই স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তথাপি তাঁহারা ক্লান্ত না হইয়া একান্ত সহিষ্ণুতার সহিত স্বদেশে বিপ্লববাদের প্রচার করিতেছেন, এবং একপুরুষের অন্তর্দ্ধানের পর ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা পিতৃ পুরুষের স্থান অধিকার করিয়া বিপ্লববহ্নিতে ইন্ধনপ্রদান করিতেছেন। নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের গুপ্ত কথা সম্প্রদায়বহির্ভূত কোন লোকের জানিবার উপায় নাই; এবং যদি কোন নিহিলিষ্ট কোন কারণে তাহাদের সাম্প্রদায়িক গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে, তাহা হইলে সেই হতভাগ্যের আর নিস্তার নাই, সে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে পলায়ন করিলেও অন্য নিহিলিষ্টের হস্তে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

জেনিভার নিহিলিষ্টরা কোনিয়েফ, সৌকিন্নিকফ ডাইমামিটার্ড প্রকৃতি জন্তার

বিপ্লববাদিগণের ন্যায় তাহাদের রাজনীতিক মতামত ও উদ্দেশ্য লইয়া সমিতি, বক্তৃতা, উল্কলরব প্রভৃতি কিছুই করে না, এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বহির্ভূত কোন কার্য্যে যোগদান করে না; স্বদেশ ও স্বদেশীয় ব্যাপার ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট নহে। তাহারা যে সকল কার্য্য সাম্প্রদায়িক কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, তাহা যতই দুরূহ ও দুঃসাধ্য হউক, তৎসাধনে তাহারা প্রাণপাত করিতে কুণ্ঠিত নহে, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতাচরণেও সঙ্কুচিত নহে। তাহাদের একমাত্র সঙ্কল্প, পৃথিবী ধ্বংস হয় হউক, সুবিস্তীর্ণ রুষীয় সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত নরশোণিতে প্লাবিত হয় হউক, সম্রাটের প্রাসাদ হইতে দরিদ্র প্রজার জীর্ণ কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানে নরকানল প্রজ্বলিত হয় হউক, তাহারা দেশ উদ্ধার করিবে! সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া দেশোদ্ধারের এই অদ্ভুত সঙ্কল্প কখনও সুসিদ্ধ হইবে কিনা, তাহা মানববুদ্ধির অগোচর।

নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত সকল লোককেই মন্ত্রগুপ্তির প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকিতে হয়। কেহ সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে, স্ব সম্প্রদায়স্থ কাহারও প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য; এমন কি, অন্যায় সন্দেহেও অনেকের প্রাণ যায়—; বিগত পঞ্চবিংশতি বর্ষাধিককাল নিহিলিষ্টগণের দ্বারা ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে কত গুপ্ত হত্যা সংঘটিত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে? বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে যে সকল নিহিলিষ্টের প্রাণ যায়, তাহাদের মৃতদেহ এমনভাবে বিকৃত করা হয় যে, হতব্যক্তির পরমাত্মীয়ও সহজে সনাক্ত করিতে পারে না।

নিহিলিষ্টেরা স্বদেশ নিরাপদ নহে বলিয়াই জেনিভা নগরে শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে; যদি কোন কালে তাহাদের জীবনের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয়, তবে তাহা রুষিয়ার পক্ষে মঙ্গল কি অমঙ্গলের কারণ এ বিষয়ে দৈববাণী করা অসম্ভব। কিন্তু নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরির ন্যায় বিস্তৃত ভাবে কাল যাপন করিলেও একদিন যে তাহারা সহসা সুপ্তোত্থিত ভিসুভিয়সের জ্বালাময়ী গলিত ধাতু স্রোতের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যে কালানলের বিস্তার করিবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। বৎসরের পর বৎসর ইহাদের শক্তি ও বজ্র সঙ্কল্প ইহাদের অত্যাচার পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, এবং রুষীয় সমাজের সর্ব্বত্র ইহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে। কত সুন্দরী যুবতী, কত বুদ্ধিমান সাহসী যুবক নিহিলিষ্টগণের ইন্দ্রজালে আকৃষ্ট হইয়া প্রতি বৎসর বিদ্রোহী দলের পুষ্টিসাধন

বিধান করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই সকল অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতী একবার নিহিলিষ্টের দলভুক্ত হইলে, আর তাহাদের নিস্তার নাই; বিপ্লব-বেব প্রচার ও সামাজিক শৃঙ্খলার ধ্বংস সাধন যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা কখনও সুখে ও শান্তিতে কাল যাপন করিতে পারে না; সুতরাং অল্প-দিনের মধ্যেই তাহাদের মনের সুখ, জীবনের শান্তি, হৃদয়ের প্রফুল্লতা ও সন্তোষ সমস্তই অন্তর্হিত হয়; অনেকে সুতীব্র অনুশোচনাবলে দগ্ধ হইয়া হতাশহৃদয়ে অকালে দেহত্যাগ করে; রাজপুরুষগণের হস্তে নিগৃহীত হইবার ভয়ে—সন্দেহের ছায়াপাত মাত্র প্রাণ লইয়া তাহারা দেশ হইতে দেশান্তরে পলায়ন করে, এবং কতকষ্টে ও কি অসুবিধায় তাহারা অজ্ঞাতবাসে জীবন যাপন করে, তাহার কাহিনী শ্রবণ করিলে অতি কঠিন হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হয়।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, জীবন এইভাবে ব্যর্থ করিবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও দলে দলে লোক প্রতিমাসে এমন কি প্রতি সপ্তাহে নিহিলিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করিতেছে,—রুসিয়া দেশের সর্ব্বত্র নিহিলিষ্টের অস্তিত্ব বর্ত্তমান; উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে কে নিহিলিষ্ট, কে নিহিলিষ্ট নহে, তাহা কেহই বলিতে পারে না; বস্তুতঃ সমরবিভাগে, নৌ-বিভাগে, ভজনালয়ে এবং ভূস্বামিগণের মধ্যেও নিহিলিষ্টের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় নিহিলিষ্টও হীন-বংশোদ্ভব দরিদ্র মূর্খ নিহিলিষ্টকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করেন। ইহা প্রেমের বন্ধন কিনা বলা যায় না। কিন্তু সামাজিক বন্ধন বটে; এই সম্প্রদায়ে জারপ্রতির বংশধর ও দরিদ্র কারকপুত্র উভয়েরই সমান অধিকার। এক আকাঙ্ক্ষায় উভয়ে অনুপ্রাণিত —একই উদ্দেশ্যে উভয়ে পরিচালিত।

রুস গবর্মেণ্ট এই ক্রমবর্দ্ধিত অজেয় শক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য রাজ-কোষের বিপুল অর্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেছেন; কেবলমাত্র নিহিলিষ্টগণের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য অসংখ্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে; কিন্তু বেত্রদণ্ড, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, প্রাণদণ্ড, এমন কি প্রাণদণ্ড অপেক্ষা কঠোর-তর নির্ব্বাসনদণ্ডেও এই শক্তির ধ্বংস নাই; প্রতিবৎসর দলে দলে নিহিলিষ্ট হুস্তর সাইবেরিয়ার চিরতুষারসমাচ্ছন্ন নরকতুল্য প্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়া রাজদ্রোহ অপরাধের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে, তথাপি ইহাদের উৎসাহ শিথিল হইতেছে না, সঙ্কল্পও শিথিল হইতেছে না, দলে দলে নূতন লোক শূন্যস্থান পূরণ করিতেছে। ইহাদের উৎসাহের—ইহাদের নির্ভীকতা ও আত্মত্যাগের অসাধ্য সাধনে ইহাদের তৎপরতার পরিচয় পাইলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।

কোন্ গুপ্তশক্তি কোন্ সুদূর লক্ষ্য কেন্দ্রে বসিয়া অসাধ্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প—এই [illegible] সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যপথে পরিচালিত করিতেছে, তাহা [illegible] এসিয়ার অধীশ্বর রুষ সম্রাটেরও অপরিজ্ঞাত। সহস্র চেষ্টাতেও তিনি [illegible] গুপ্ত রহস্যভেদে অসমর্থ। এই সুবিপুল ও মহাশক্তিশালী সম্প্রদায় [illegible] সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইলেও জেনিভানগর তাহাদের প্রধান কেন্দ্র ও সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত রহস্যের উদ্ভবমেক্ত্র।

নিহিলিষ্টরা সর্ব্বদা বিশেষ সাবধানে থাকিলেও গবর্নমেণ্টের ধূর্ত্ত [illegible] চক্ষুতে সকল সময় ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে না, সেইজন্য অনেক সময় তাহারা ধরা পড়ে, যাহাদের অপরাধ নিতান্ত অল্প, তাহারা কারাগারে কঠোর দণ্ড ভোগ করে; অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধিগণকে সাইবীরিয়ার প্রান্তরে চিরনির্ব্বাসিত করা হয়। এই নির্ব্বাসনদণ্ডের ন্যায় ভয়ানক দণ্ড পৃথিবীর অন্য কোথাও প্রচলিত আছে কিনা সন্দেহ। যে সকল নিহিলিষ্টের প্রতি চিরনির্ব্বাসন [illegible] ব্যবস্থা হয়, তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া সাইবীরিয়ার বিভিন্ন [illegible] প্রেরণ করা হয়। আমরা এক একজন শাসনকর্ত্তার অধীন সাইবীরিয়ার বিভিন্ন প্রান্তরকে 'জেলা' বলিলাম বটে, কিন্তু রুষিয়াদেশে সরকারী ভাষায় তাহা 'গবর্মেণ্ট' নামে অভিহিত। এক একটি প্রধান নগরের নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন 'গবর্মেণ্টের' নামকরণ হইয়াছে। সাইবীরিয়া এইরূপ পাঁচটি গবর্মেণ্ট বা জেলায় বিভক্ত; তন্মধ্যে ইর্থটাস্ক সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই গবর্মেণ্টের প্রধান নগর ইর্থটাস্ক নগরে বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। বৈকাল হ্রদের ন্যায় বৃহৎ হ্রদ সাইবীরিয়ায় আর দ্বিতীয় নাই। কাস্পিয়ান হ্রদ 'সাগর নামে' পরিচিত, সুতরাং তাহার কথা ছাড়িয়া দিলে বৈকাল হ্রদের ন্যায় সুপরিসর হ্রদ ভিন্ন এরূপ বৃহৎ হ্রদ পৃথিবীতে আর নাই।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম হইতে এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত বৈকাল হ্রদের সুবিস্তীর্ণ জলরাশি দারুণ শীতে জমিয়া প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হয়, সেই সময় হ্রদের উপর দিয়া শকটযোগে পণ্য দ্রব্যাদি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নীত হয়। শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই এই ভয়ঙ্কর প্রদেশ মনুষ্যবাসের অযোগ্য।

সাইবীরিয়া প্রদেশের শাসনপ্রথা অত্যন্ত বর্ব্বরতাপূর্ণ। অধিবাসিগণ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, উদ্ধত, সাহসী ও ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য। পৃথিবীর [illegible] সুসভ্যজাতিসমূহের মধ্যে সুশিক্ষার ও জ্ঞানের যে [illegible] প্রচারিত হইয়াছে, এই সকল লোক তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই প্রদেশে [illegible]

কাশই প্রকৃতি দেবীর অতিরুদ্র সংহারমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ যে সময় উত্তর হইতে মেরুপ্রদেশপ্রবাহিত তুষার-শীতল বায়ু লক্ষ ক্রুদ্ধ নাগিনীর ন্যায় শন্‌শন্ শব্দে অতিভয়াল জ্বালাময় শ্বাসত্যাগ করে, তখন জনপ্রাণীও গৃহ-ত্যাগ করিতে পারে না। এই সময়ে শীতের প্রাদুর্ভাব এত অধিক হয় যে, কোনও কক্ষের কবাট মুক্ত করিলে গৃহাবরুদ্ধ আর্দ্রবায়ু মুক্তদ্বারপথে বাহিরে আসিবামাত্র জমিয়া বরফ হইয়া যায় ও ভুলারাশির ন্যায় মৃত্তিকায় পতিত হয়।

নিহিলিষ্টদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য সাইবীরিয়ায় যে কয়েকটি আড্ডা আছে, তন্মধ্যে ইর্থটার্ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য হইলেও সাইবীরিয়ায় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য স্থান নহে। যে সকল সৌভাগ্যবান্ নিহিলিষ্ট সাম-রূপদণ্ডে নির্ব্বাসন ফল লাভ করে, ইর্থটস্কে কেবল তাহাদিগকেই নির্ব্বাসিত করা হয়, কিন্তু যে সকল নিহিলিষ্টের অপরাধ গুরুতর, অর্থাৎ যাহারা সম্রাট, তাঁহার কোনও সেনাপতি বা অমাত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, নগর বা গ্রাম ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে, সৈন্যদলে বিদ্রোহ প্রচারে রত হয়,—তাহাদিগকে ইর্থটাস্ক নগরের অনেক উত্তরে অন্য আড্ডায় নির্ব্বাসিত করা হয়। নির্ব্বাসিতের পক্ষে সেখানে জীবন বহন করা নিদারুণ কষ্টকর। এক হইতে তিন বৎসরের মধ্যেই অপরাধীদের ইহলীলার অবসান হয়। যে কঠোর উৎপীড়নে ও পথশ্রমে তাহারা এই সকল আড্ডায় উপস্থিত হয়, তাহাতেই তাদের পরমায়ুর হ্রাস হয়, তাহার পর কোন প্রকারে দুইতিন বৎসর টিকিয়া থাকে। এই কারণে এই প্রদেশে মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক।

নির্ব্বাসিত অপরাধিগণের প্রতি যথেষ্ট নির্য্যাতনও চলে। সে নিষ্ঠুরতা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, তাহা পিশাচের প্রকৃতিসিদ্ধ। শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয় নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিতা রমণীগণও এই অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পায় না, তাহাদের প্রতিও বিন্দুমাত্র সদয় ব্যবহার করা হয় না; সদয় ব্যবহার করা দূরে থাক, রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করে, যে ভাবে তাহা-দের লজ্জাশীলতার হানি করে, নরচর্ম্মধারী পশু ভিন্ন তা অন্যের অসাধ্য; এই অত্যাচারকাহিনী শ্রবণ করিলে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান শত্রুর হৃদয়ও করুণায় বিগলিত হইতে পারে।

অনেকে দীর্ঘকাল প্রাকৃতিক বিড়ম্বনা, ও কষ্ট সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া উন্মাদ হইয়া উঠে; কিন্তু তাহাদিগকেও কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র অব্যাহতি প্রদর্শিত হয় না। আহারপানে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন হইলেও, তাহাদের [illegible]

চর্ম্মদণ্ড বর্ষিত হয়। যাহারা রোগে শয্যাগত হয়, তাহাদের কাহারও স্বদয়বিদারক। তাহারা ঔষধ পায় না, পিপাসায় জল পায় না, ক্ষুধার কোনরূপ পথ্যের ব্যবস্থা নাই। অতি কষ্টে, অযত্নে রোগীর প্রাণ যায়। সামান্য অপরাধে চয়ণে কঠোর বেত্র দণ্ড; অপরাধ কিঞ্চিৎ গুরুতর হইলে প্রহরীরা গুলি করিয়া কুকুরের মত তাহাদিগকে হত্যা করে; তাহার পর মৃতদেহ তুষারস্তূপের নিম্নে সমাহিত করে। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই ভয়াবহ স্থানেও নির্ব্বাসিত রমণীগণের মধ্যে কোন কোন রমণী সন্তান প্রসব করে, প্রসবের অল্পক্ষণ পরেই সন্তানগুলি অনাবৃত স্থানে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, গলা টিপিয়া মারিবার আবশ্যক হয় না, এবং কখনও আবশ্যক হইলে দয়ার অবতারেরা তাহাতে অণুমাত্র দুষ্টিত হয় না।

মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম নাই; সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী এই নরকতুল্য সাইবীরিয়ার প্রান্তর হইতেও শতকরা বিশ পঁচিশ জন নিহিলিষ্ট দেশান্তরে পলায়ন করে। তাহারা কিরূপে যে এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন করে, ইহা আমাদের ধারণাতীত। একজন নিহিলিষ্ট পাঁচ বৎসর নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগের পর সাইবীরিয়া হইতে পলায়ন করিয়া সভ্য রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল; সে মঙ্গোলিয়ার পথে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে যে পথকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, মৃত্যুকবল হইতে তাহাকে শতবার যে ভাবে মুক্তি লাভ করিতে হইয়াছিল, সেই ভয়ঙ্কর বিবরণ কোন ইংরাজলেখক তাহার মুখে শ্রবণ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন; সুতরাং এই বর্ণনা কেহ অবিশ্বাস্য ও মিথ্যা মনে করিবেন না। এই নিহিলিষ্টের বয়স তেত্রিশের অধিক হয় নাই, কিন্তু সাইবিরিয়া হইতে প্রত্যাগমন করিলে দেখা গেল, তাহার সমস্ত কেশ পাকিয়া গিয়াছে, মুখের চর্ম্ম এমন শিথিল ও শোণিত-সম্পর্ক-বিহীন হইয়াছে যে, সেই তেত্রিশ বৎসরের পুরুষকে ষাট বৎসরের বৃদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

সাইবীরিয়ায় যে সকল বন্দী নির্ব্বাসিত হয়, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইলেও, প্রথমতঃ তাহাদিগকে কিছুদূর একই পথে যাইতে হয়। আমরা এই স্থানে সেই সুদূর নির্ব্বাসন-পথের কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রকাশিত করিব; তাহাদিগকে কি ভীষণ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ইহাতে পাওয়া যাইবে।

রুসিয়া হইতে অপরাধিগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া ইউরাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়; পথ এপর্য্যন্ত তেমন দুর্গম নহে, কতক পথ রেল

কতক ইমারে পার হইতে হয়। রুসিয়ার বিভিন্ন নগর হইতে অপরাধিগণকে প্রথমে মস্কৌ নগরে একত্রিত করা হয়, মস্কৌ হইতে নিজনি নবগরদ্ পর্য্যন্ত যে রেলপথ প্রসারিত আছে, সেই পথে তাহাদিগকে নবগরদে নামাইয়া দেওয়া হয়; রেল হইতে নামিয়া ভল্গা নদীতে তাহারা জাহাজে চাপে, সেখান হইতে তাহার মাইল দূরে গিয়া পার্মনামক স্থানে অবতরণ করে, সেখান হইতে আবার রেল, সেই রেল পথে ইউরাল পার হইয়া তাহারা একাটারিণবার্গ নগরে উপস্থিত হয়, এই নগর হইতে সাইবীরিয়ার সীমা আড়াই শত মাইল দূরে অবস্থিত।

একাটারিণবর্গ হইতে সাইবিরীয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত তিন সহস্র মাইল দীর্ঘ একটি ইষ্টকবদ্ধ রাজপথ আছে, এরূপ সুদীর্ঘপথ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। কলিকাতা হইতে পেশওয়ার অথবা এলাহাবাদ ও জব্বলপুরের ভিতর দিয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত যে সুবিস্তীর্ণ রেলপথ প্রসারিত রহিয়াছে—এই সাইবিরীয় রাজপথের তুলনায় তাহা ক্ষুদ্র। নির্ব্বাসিতগণকে এই পথ পদব্রজে অতিক্রম করিতে হয়, এই পথে তাহাদের যে কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহার তুলনা নাই। কেবল চলৎশক্তিরহিত রুগ্ন কয়েদী ও রমণীগণকে এক প্রকার শিংহীন শকটে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

ইউরাল গিরিমালা ইউরোপীয় ও এসিয়াস্থ রুসিয়ার সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে, এই গিরিমালা অতিক্রম করিয়া নির্ব্বাসিত অপরাধীরা বিভিন্নদলে ভিন্ন ভিন্ন আড্ডার অভিমুখে নীত হয়। একদল ঠিক উত্তরে যায়। যাহারা সাইবিরীয়ার উত্তরাংশে নির্ব্বাসিত হয়, তাহাদের কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই অঞ্চলে লোকালয় নাই বলিলেও চলে, তাহা মৃত্যু ও স্তব্ধতার রাজ্য। একদল উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে যায়, অন্য দল পূর্ব্বাভিমুখে নীত হয়। পনের ষোল জন প্রহরী এক একদল বন্দীর সঙ্গে চলে, এই প্রহরীগণের দলপতি কাপ্তেন নামে অভিহিত। অতি সাহসী কষ্টসহ বলবান্ ও বিশ্বাসী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও কাপ্তেনের পদ প্রদান করা হয় না। প্রহরীগণের সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, তাহাদের সঙ্গে ফলও সঙ্গীন থাকে, তদ্ভিন্ন সকলেই এক একটা ছয়নলা পিস্তল রাখে, কোন বন্দী পলায়নের উপক্রম করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলি করিয়া মারা হয়।

এই সুদীর্ঘপথ পদব্রজে অতিক্রম করা কিরূপ কষ্টকর, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। পৃথিবীতে এরূপ দুর্গম ও মরুতুল্য পথ আর দ্বিতীয় নাই। এই সীমাহীন মহাপ্রান্তরে বৎসরের মধ্যে নয় মাসকাল যেরূপ শীতের প্রাদুর্ভাব হয়, সেরূপ শীত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক কল্পনা করিতেও পারে না। যদিও

এই প্রদেশে সূর্য্যের কিরণ অত্যন্ত প্রখর ও জ্বালাময়, তথাপি তাহাতে তুষারপাত বিগলিত হয় না; কারণ এই অঞ্চলে তাপমানযন্ত্রের পারদ নিম্নভাগে অবস্থান করিতে হয়। শীতকালে তাপমান যন্ত্রের পারদ অত্যন্ত নামিয়া যায়, পারদ ত্রিশ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিলে জল জমিয়া বরফ হয়। কিন্তু এ অঞ্চলে শীতকালে তাপমান যন্ত্রের পারদ ত্রিশডিগ্রীর নীচে ষাট্‌ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে। পারদপূর্ণ তাপমান যন্ত্রে এই প্রদেশের পরিমাণ করা যায় না, কারণ আটান্ন ডিগ্রী শীতে পারদ জমিয়া যায়, সুতরাং স্পিরিটপূর্ণ তাপমান যন্ত্রের দ্বারা উত্তাপ পরিমিত হয়। বৎসরের তিন চারিমাস শীতের প্রকোপ এইরূপ ভীষণ, তথাপি এ সময় রৌদ্রের উত্তাপ অসহ্য।

এই দুর্গম পথে আহার্য্য দ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না, সেইজন্য প্রহরীরা সঙ্গে লইয়া যায়। যবের রুটি মাত্র তাহাদের সম্বল। এই রুটিগুলি অত্যন্ত কঠিন, এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহা নষ্ট হয় না। এক একখানি রুটি পাকা দুই হাত দীর্ঘ ও চারি ইঞ্চি স্থূল রুলের যত আকারবিশিষ্ট করা হয়। এই আকারের রুটি বহিয়া লইয়া যাইবার পক্ষে সুবিধাজনক, রুটি ফুরাইলে দূরবর্ত্তী দুরন্তরে অবস্থিত পথপ্রান্তস্থ গ্রাম হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা হয়। প্রহরীগণের দেহ উত্তপ্ত রাখিবার জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে এক এক বোতল মদ দেওয়া হয়। এই মদ্যের নাম ভড্‌কা। ইহা আমাদের বঙ্গদেশীয় "ধান্যেশ্বরীর" রুসীয় সংস্করণ। যব চোঁয়াইয়া এই মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহার বর্ণ শুভ্র ও ইহা অত্যন্ত উগ্র। রুসিয়ার নিম্নশ্রেণীর লোক যেরূপ তীব্র ভড্‌কা পান করে, আমাদের দেশের অতি উৎকট মাতালেরাও তাহা গলাধঃকরণ করিতে পারে না। অনেকদিন শিক্ষানবিশীর পর ইহাতে অভ্যস্ত হওয়া যায়—জলমিশ্রিত ভড্‌কা পানে নিদারুণ পরিশ্রমের পর ক্লান্তি দূর হয়, অবসন্ন দেহ সুস্থ হয়।

এই সকল অসুবিধার উপর নেকড়ে বাঘের ভয়—একটি প্রধান অসুবিধা। দলে দলে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে পান্থগণকে আক্রমণ করে। নেকড়ে তাড়াইবার জন্য প্রহরীরা ক্রমাগত রাইফেল চালাইতে থাকে। রাইফেলের গুলিতে অনেক নেকড়ে নিহত হয়, অন্যান্য নেকড়েরা তাহাদের মৃত দেহ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করে। কোন নিহিলিষ্ট প্রহরীগণের হস্ত হইতে পলায়নে সমর্থ হইলেও নেকড়ের কবল হইতে তাহার পরিত্রাণ লাভ করা কঠিন।

এই সুদীর্ঘ পথে ত্রিশমাইল অন্তর এক একটি 'ইটাপিস্' (etapes) 'চৌকী' আছে। এই সকল চৌকীতে দশবার জন প্রহরী থাকে। একদল প্রহরী

পথ পর্য্যটনে প্রান্ত হইলে এই সকল চৌকির প্রহরীরা তাহাদের স্থানে অধিকার করে। কিন্তু নির্ব্বাসিত বন্দীদের বিশ্রাম নাই, তিনচারিজনকে একত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, শৃঙ্খলভারে অবসন্ন হইয়া বন্দিগণ অতিকষ্টে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাদের যন্ত্রণা বর্দ্ধিত হয়। যাহারা অবসন্ন দেহে আর চলিতে পারে না, প্রহরীরা তাহাদিগকে নেকড়ে বাঘের মুখে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়। যাহারা এই সকল কষ্ট সহ্য করিয়াও যথাস্থানে উপস্থিত হয়, তাহাদের আর চিনিবার উপায় থাকে না। তাহাদের শরীর অতিশ্রমে ভাঙ্গিয়া পড়ে, অকাল বার্দ্ধক্যে তাহাদের কেশ শুক্ল ও দেহচর্ম্ম শিথিল হয়। অবশেষে তাহারা নিষ্প্রভ চক্ষু চির মুদ্রিত করে।

কিছু কাল নির্ব্বাসনে বাস করিতে করিতে নির্ব্বাসিতগণের জীবন এমন অসহ্য হইয়া উঠে যে, চির বিষণ্ণতা তাহাদের নিত্য সহায় হয়। তাহাদের মুখে ভাববৈচিত্র্য থাকে না, তাহারা ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে, সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তাহাদের শূন্য দৃষ্টি দেখিলে মনে হয় তাহারা সজীব পুত্তলিকা মাত্র। বলা আবশ্যক সাইবীরিয়ার দক্ষিণ প্রান্তস্থ নগরগুলিতে জীবন ধারণ এরূপ কষ্টকর নহে, সেই সকল স্থানে শীত অপেক্ষাকৃত কম ও জীবন যাপনের উপযোগি দ্রব্য সামগ্রী অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইলেও কোন উপায়ে তাহা সংগৃহীত হয়। সাইবীরিয়ার উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তে যাহারা নির্ব্বাসিত হয়, তাহাদের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয়।

এইরূপ ভয়ানক স্থান হইতে পলায়ন করা প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হইলেও, পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেক অসম সাহসী বন্দী পলায়নে কৃতকার্য্য হয়। গত শতাব্দীতে ছয় লক্ষাধিক নিহিলিষ্ট সাইবীরিয়ার প্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ত্রিশ বৎসরই বহুসংখ্যক লোক পারস্য ও তুর্কীস্থানের পথে পলায়ন করিয়াছে; এই দুই পথে পলায়ন অপেক্ষাকৃত সহজ। রুসীয় গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসিত অপরাধিগণের পলায়ন রহিত করিবার জন্য এই উভয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই। অধিকাংশ নিহিলিষ্ট অভিজাতবংশের সন্তান; তাঁহাদের আত্মীয়গণ সাইবীরিয়া প্রদেশের অল্প বেতনভোগী গবর্ণরগণকে প্রচুর উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়া নির্ব্বাসিত আত্মীয়গণের পলায়নের সুবিধা করিয়া দেয়। নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের ধনভাণ্ডারে অর্থের অভাব নাই, সেই অর্থবলে নিহিলিষ্টরা অনেক নির্ব্বাসিত দলপতির মুক্তি সাধনে সমর্থ হয়।

নির্ব্বাসিত বন্দিগণ উৎকোচ প্রদানে সমর্থ হইলে তাহাদের মস্তিষ্কলাভ হয় বটে, কিন্তু পথের কষ্ট সহ্য করিয়া সভ্যরাজ্যে পলায়ন সকলের পক্ষে সম্ভব নহে, পারস্যের তুর্কিস্থানের সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই শীতে ও অনাহারে অনেকের মৃত্যু হয়। বিভিন্ন কাঁড়ীতে অবস্থিত রুস প্রহরিগণের গুলিতেও অনেকের প্রাণ যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ঊনিশজন নির্ব্বাচিত নিহিলিষ্ট সাইবীরিয়া হইতে পলায়ন করিয়া রুসিয়ায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ঊনিশজনের মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক ছিল।

নির্ব্বাসিত নিহিলিষ্টগণ যে কষ্টে সাইবীরিয়ায় জীবনপাত করে, তাহা কোন নিহিলিষ্টেরই অজ্ঞাত নহে, তথাপি রাজদ্রোহে তাহাদের অরুচি নাই। প্রথমে বহু সম্রাটকে হত্যা করিবার জন্য নিহিলিষ্টরা শতাধিকবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। রুসিয়ার রাজশক্তি ধ্বংস করিবার জন্য লক্ষ নিহিলিষ্ট নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করিতেছে, অসংখ্য নিহিলিষ্ট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, এপর্য্যন্ত সাত আটলক্ষ নিহিলিষ্ট সাইবীরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে, তথাপি রুসসম্রাটের রাজশক্তি বিন্দুমাত্র ব্যর্থ হয় নাই; গবর্মেণ্টেরও কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এইরূপ নিষ্ফল রাজদ্রোহে ক্রমে দেশের শক্তিক্ষয় হইতেছে, দেশের অশান্তি বর্দ্ধিত হইতেছে, বৃথা আশায় দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের মূল্যবান জীবন নষ্ট হইতেছে। নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের ব্যর্থ জীবনের ইতিহাস সকল দেশের রাজদ্রোহিগণের চৈতন্যসঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ।

আমার স্বপ্ন।

ভাদ্রমাস। দিবা অবসান হইয়াছে। আকাশতলে অনতিপূর্ব্বে নীরদমালার গমনাগমন ছিল। এক্ষণে একখানি মেঘও দৃষ্টিগোচর হয় না। ইতিপূর্ব্বে বৃষ্টি একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অতিবৃষ্টির পর পথিমধ্যে আর কিছুমাত্র কর্দ্দম নাই। বিশেষতঃ সুরধুনীর পবিত্র পুলিনের যে স্থানে আমরা সময় সময় পর্য্যটন করিতে যাই, তথায় কিছুমাত্র কর্দ্দম হয় না, ইহা আমার বিশেষ অবগতি ছিল। এজন্য, এইসময়ে, দুইটী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎও হইবে ভাবিয়া একাকী আমি সেই স্থানে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলাম।

সুরতটিনী আজ দুকূলবসনা—বেগবতী; লতা পাতা কুটাটী সমেত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ পর্য্যন্ত যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেছেন, তাহাই লইয়া খরগতিতে সাগরে চলিয়াছেন। যতই উপাসনা কর, যতই স্তব স্তুতি কর, যতই কেন অর্ঘ্য দাওনা, সময়ের দুর্নিবার গতির ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতেছেন; কিছুতেই ফিরিবার বা স্থির হইবার নহেন। ছেলেবেলার পাঠ্য পুস্তকের কথা মনে পড়িল,—

"নদী আর কালগতি একই প্রমাণ
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।"

হায় রে, আমার জীবননদীর স্রোতও এই স্রোতের ন্যায় অনন্তকালসাগরে মিশিবার জন্য ধীরে ধীরে নীরবে ছুটিতেছে; "অনন্ত—সাগরে" মিলিতে পারিবে কি? এইরূপ বিবিধ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলাম, আমি লোকালয়ে অনেকটা আসিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখে তাকাইয়া দেখি, খানকয়েক নৌকা পালভরে অমৃতময় স্রোতের বিপরীতদিকে আসিতেছে। আমি একটু দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে তরী কয়খানা পাশাপাশি ভাবে আমার নিকটেই উপস্থিত হইল। আমিও ফিরিলাম। নৌকাও চলে, আমিও চলি। ক্রমে আমার মন্দগতিকে অতিক্রম করিয়া গরুমতী তরীগুলি অগ্রসর হইল। আমি তাহাদের পানে দৃষ্টি রাখিয়া মৃদুমন্দ গমনে চলিতে থাকিলাম। আহা, তরণি-কয়খানির কি সুন্দর ছবি! কি মনোমোহিনী শোভা! তরঙ্গিণীবক্ষে তরণীর গতি অনেক দেখিয়াছি; কিন্তু এই উজান স্রোতে তরীর গতি নিরীক্ষণ করিয়া আমার মনোমধ্যে এক

নবীন ভাবের আবির্ভাব হইল। তখন আমি নিজনিকেতন-নিকটে উপস্থিত হইলাম। তখন দিবাকর নিজকর সম্বরণপূর্ব্বক পশ্চিমগগনে বিশ্রাম জন্য আশ্রয় লইলেন। আমি হস্ত মুখাদি ধৌত ও ঈশ্বরচিন্তনের পর স্বীয় শয়নাগারে উপবেশন করিলাম।

আমার স্বভাব এই, যে কোন বিষয়—যে কোন ভাব আমার অন্তরে আসুক না কেন, আমি তাহাকে মানবজীবনের সঙ্গে তুলনা করি। বোধ হয় ঈশ্বরেরও অভিপ্রায় এই যে, আমরা স্বভাবের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার অনন্ত মহিমান্বিত অনুপম আনন্দ অনুভব করি। প্রকৃতির ভাবের বাগান হইতে দুই চারিটী পুষ্প সংগ্রহকরা এবং সেই পুষ্প বন্ধুবান্ধবকে উপহার দেওয়া আমার চির-অভ্যাস। সেই যে তরীগুলি উজান স্রোতে ছুটিতেছে, তাহার ভাবের বাতাসে আমার মানসবিহঙ্গ উড়িতেছিল। আমার মনোমধুকর সেই ভাবের মধুই পান করিতেছিল, এই সংসার—স্রোতের প্রতিকূলে জীবন-তরণী কি চালাইতে পারিব না? যে পারে, সেইত ধন্য। স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াত কাপুরুষত্ব; প্রত্যুত পরিণামে পরিতাপই আছে। উজানস্রোতে কয়জন যাইতে পারে? একজন সাধু, তাই বলিয়াছেন,—"সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে, ওপারে ও-রসিক নেয়ে।" ইত্যাদি উত্তম কথা। শীঘ্রই একথা লইয়া একদিন সহচরগণ সঙ্গে ইহার সমালোচনা করিতে হইবে। এ ভাবের কুলে বন্ধুগণ আমার কিছু আমোদিত হন কিনা দেখিব;—যদিও আমার সংগৃহীত পুষ্পে তত মধু না পান, একটু সুগন্ধও ত অনুভব করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দিত হইবেন। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে আমার তন্দ্রাবেশ হইল। আমি উপাধান অবলম্বন করিয়া একটু পার্শ্ব আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলাম। সেই তন্দ্রাযোগে আমি যে একটী স্বপ্নদর্শন করিলাম, তাহা অতি আশ্চর্য্য ও অতি আনন্দদায়ক।

তন্দ্রাদেবীর অনুগ্রহে আমি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের নানাস্থান পরিদর্শনপূর্ব্বক অযোধ্যার নিম্নবাহিনী সরযূতীরে উপস্থিত হইয়াছি এবং তথাকার 'গোপ্রতার' তীর্থের বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছি। এমন সময় জ্যোতির্ম্ময়ী শ্বেতবর্ণের বিবিধ-পুষ্পের মাল্যধারিণী বীণাপাণি এক রমণী ও তৎপশ্চাতে হস্তে কমণ্ডলু—কণ্ঠে ত্রিকণ্ঠী—পরিধানে চীরবসন—সর্ব্বাঙ্গে ভস্মাবলেপন—মস্তকে দীর্ঘ জটাভার, বিশাল শ্মশ্রুধারী এক ভীমকায় অথচ শান্তস্বভাব পুরুষ ধীর গমনে আমার নিকট আগমন করিতেছেন দেখিলাম। তাঁহাদিগকে দেখিলে স্বতঃই ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হয়। সঙ্গে আরও কয়েকজন সঙ্গী পশ্চাৎ

আসিতেছেন। তাঁহারা আমার নিকবর্ত্তী হইলে, আমি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া উভয়ের চরণ বন্দনা করিলাম। তাহার পর তাঁহারা আসন-উপবেশনে ইঙ্গিত করিলে এবং নিজে স্ব স্ব কুক্ষিস্থিত আসন বিছাইয়া উপবিষ্ট হইলে আমি সেই মূর্ত্তিযুগলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণপূর্ব্বক সাহসে নির্ভর করিয়া করযোড়ে 'ক্ষমা করুন' এইমাত্র কহিলাম। আর অধিক বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখন সেই মহাপুরুষ আমার প্রতি প্রীতিবিস্ফারিতনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'ভয় নাই, আমরা তোমার মনোগত সমস্তভাব অবগত হইয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি আমায় চিনিতে পার নাই, আমি তোমার অনেক দিনের সঙ্গী,—নাম 'বিরাগ'। ভ্রমণই আমার মুখ্য কার্য্য। এই যে দেবীকে দেখিতেছ, ইনি আমার বিমাতা,—নাম—'প্রজ্ঞা'। ইনি আমায় সম্পূর্ণ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ইঁহার সাহায্যবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য বা পাতাল মধ্যে কোনস্থান আমার পক্ষে দুর্গম নহে। প্রত্যুত ইঁহার সহায়তা না পাইলে কুত্রাপি আমার গতি কিছুমাত্র প্রকাশিত হয় না। বাস্তবিক সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার যে এত বাৎসল্য—এত সদ্ভাব, তাহা আমি কোন স্থানে কাহারও দেখি নাই। বোধ হয় ইহা হইতেই বিমাতার আর একটা নাম 'সংমা' হইয়া থাকিবে। আমি হর্ষভরে কহিলাম, 'মহাত্মন্, আপনার ভ্রমণই যদি কার্য্য হয়, এবং সর্ব্বত্র অপ্রতিহতা গতি থাকে, এবং দয়া করিয়া দর্শন ও পরিচয় প্রদানে যদি কৃতার্থ করিলেন, তবে দাসের এই প্রার্থনাটী পূর্ণ করুন, দাস যেন আপনাদের সঙ্গ ছাড়া না হয়। এক্ষণে আপনাদের কোথায় গমন হইবে?' তিনি উত্তর করিলেন,—বৎস, অধুনা আমরা নিজগৃহে গমন করিতেছি। বহুদিবস হইতে পিতামাতা পুত্রাদির অদর্শনে আমাদের অন্তঃকরণ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই যে কয়েকজন সাধারণ ব্যক্তিকে দেখিতেছ, ইহাঁদিগকে সঙ্গে লইয়া আমার পিতৃদেবসমীপে শীঘ্রই যাইতে হইবে, ইহাঁরা তথাকার যাত্রী। আমাদের ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্যই এই ইঁহাদের ন্যায় আমার পিতৃরাজ্যের যাত্রী স্থির করিয়া সঙ্গে লইয়া যাওয়া। তখন আমার অন্তর অধিকতর ব্যাকুল হইল। ভাবিলাম, এই সঙ্গে যাইতে পারিলে, আর একটী নূতনস্থান দেখিতে পাইব। হয়ত আমার ভাগ্যে অভাবনীয় ঘটনাই ঘটিবে। হয়ত যে স্থানে গমন মাদৃশজনের পক্ষে একবারেই অসম্ভব, সেইস্থানের অপূর্ব্বদৃশ্য আমার নয়ন-মনের তৃপ্তি সাধন করিবে। এই লোভের অধীন হইয়া আমি বিনয়-নম্র-বচনে কহিলাম,—'প্রভো আপনার পিতার নাম কি? কোন্ পবিত্রস্থান আপনাদের নিবাসভূমি?' তিনি উত্তর করিলেন,—

'আমার পিতার নাম ধর্ম্ম, নিবাস নিবৃত্তিপুর।' হায়রে আমার ভাগ্যে কি এমন হইবে? এই সাধুসঙ্গে কি একবার সেই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইব?—ইত্যাদি চিন্তায় আমার মন অতি উৎকণ্ঠিত হইল! চক্ষু লাসাতাড়িত হইলে, মহাত্মা বিরাগ আমার মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন,—'প্রিয়, চিন্তা কি? দেবীর পূজা-পরিচার্য্যা করিয়া প্রীতি উদ্ভাবন কর, অবশ্যই আশা পূর্ণ হইবে।' আমি এই উপদেশ বা আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ একতানমনে দেবীর পদতলে পতিত ও তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলে, তিনি সসন্তোষে কহিলেন,—'বৎস, ধর্ম্মরাজ্যে গমন জন্য বহুদিবস হইতে তোমার বাসনা আছে, তাহা আমি জানি। অতএব তোমাকেও একটি যাত্রিমধ্যে গণ্য ও সঙ্গী করিতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্যই তাহাই, আমি তোমার চিরার্জ্জিতা আশালতা সফলা করিব। কিন্তু বৎস, ধর্ম্ম-রাজ্যে গমন করিতে হইলে, কেবল বাক্‌সর্ব্বস্ব হইলে চলিবে না। কোনরূপ আড়ম্বরেরও প্রয়োজন নাই। তথায় যাইবার পূর্ব্বে তুমি এই বস্তু দুইটী অগ্রে সযত্নে ধারণ কর। নতুবা তোমার বাসনা ফলবতী হইবে না।' এই বলিয়া দেবী আমাকে দুইটি অপূর্ব্ব বস্তু প্রদান করিলেন। জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, একটীর নাম, 'প্রেম' একটির নাম—'পবিত্রতা'! তাহার পর দেবী অগ্রগামিনী হইলে, বিরাগ পশ্চাতে, তৎপশ্চাতে আমি গমন করিতে লাগিলাম।

বিরাগ কহিলেন,—'প্রিয়দর্শন, অগ্রে এই দেবীর করুণা না হইলে, কেহই এস্থানের এক পদ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই একমাত্র এখানকার পথ-প্রদর্শিকা। ইনি পথ না দেখাইলে, কেহই আমার পিতৃ-রাজ্যে গমন করিতে সক্ষম নহে। দেখিতে পাইবে, পথিমধ্যে যে প্রবল পরাক্রান্ত দুর্ব্বল দুরাত্মাবিহিত এক রাজার রাজ্য আছে, লোকে সেই রাজ্যে ধর্ম্ম-রাজালয়ে উপনীত হয়। সে রাজার কতকগুলি চর আছে, তাহারা পথিকগণকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া স্বীয় প্রভুর নিকট লইয়া যায়। ইহাই তাহাদের একমাত্র করণীয় কর্ম্ম। রাজা তাহাদিগকে আপাতমধুর নানাকার্য্যে নিযুক্ত করিলে পথিকেরা সেই সকল কার্য্যের কাল্পনিক সুখে মত্ত হইয়া আর সেস্থান পরিত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের পরিণামের কথা একবার ভাবিলেও হৃদয় শুষ্ক হয়। আমি চকিতচিত্তে কহিলাম,—প্রভো, সে রাজার ও রাজ্যের নাম কি? তিনি উত্তর করিলেন,—'সে রাজার নাম, 'অধর্ম্ম' রাজ্যের নাম 'প্রবৃত্তিপুর।' রাজা অত্যন্ত বাযাবী, তাহার কতকগুলি পোষা পশু আছে। সে সকল পথিক দুর্ব্বল,

তাহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া নিজ রাজসমীপে উপস্থিত করে। তাহাদের কর্ত্তৃক কেহ একবার আক্রান্ত হইলে, পশুবৎ হইয়া যায়। তাহার এইপ্রকার বিবিধ বিচিত্র বাক্যাবলী শ্রবণপূর্ব্বক যাইতে যাইতে অচিরাৎ এক বৃহৎ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিম্বা আমার ভ্রম হইয়া থাকিবে, আমি পূর্ব্ব হইতেই এই অরণ্যমধ্যে ছিলাম। যাই হউক, এই অটবীর প্রাকৃতিক শোভাদি সন্দর্শনে, মনে ইহা পূর্ব্বদৃষ্ট বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইবা মাত্র বিরাগ মহাশয় কহিলেন,—'প্রিয়, তোমার এ অনুমান অমূলক নয়, ইহার নাম 'ভবারণ্য'; তুমি পূর্ব্ব হইতেই এ অরণ্যভ্রমণে প্রবৃত্ত আছ। চল আমাদের 'নিবৃত্তিপুর' বেশী দূরবর্ত্তী নহে।—আমরা সঙ্গে আছি বলিয়াই তুমি এত শীঘ্র ইহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছ, 'নিবৃত্তিপুর' নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইলেও, অধর্ম্মরাজের কুহকে কেহ চিনিতে পারে না। প্রত্যুত পদে পদে ভ্রান্তি ও শ্রান্তি বোধ হয়, পদে পদে বিঘ্ন বাধা আসিয়া পড়ে। আমাদের সহায়তা বা সঙ্গ ভিন্ন তুমিও এস্থলে আসিতে পারিতে না। হয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে, নয় ভয় পাইয়া ফিরিয়া যাইতে। বিশেষতঃ এখানে একটু বিপথে পতিত হইলে, ভয়ঙ্করী এক স্রোতস্বতী দেখিতে পাওয়া যায়, সে নদী দৃষ্টতঃ নিঃশব্দে ধীরে ধীরে গমন করে। সহসা লোকের চক্ষুগোচর হয় না। তাহার নাম—'কর্ম্মনাশা।' এই নদী পার হওয়া বড়ই দুষ্কর। তবে যদি এই দেবীর অনুগ্রহ হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, নদীর উপর শূন্য দেশ দিয়া কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্রোতস্বতী পার হইয়া ঊর্দ্ধদিকে কতদূরে গিয়াছে, তাহা অনুমানেই আইসে না। তাহার নাম 'ব্রহ্মপুর মার্গ'। আর কতকগুলি সূত্রনদী উত্তরণের উপায়স্বরূপ আছে। এখানকার পথিকেরা যদি কোন প্রকারে উক্ত সূত্র অবলম্বনে গমন করিতে পারে, তবেই কৃতকার্য্য হয়, নতুবা নদীতে একবার পতিত হইলে আর পরিত্রাণ নাই। এই নদী অধর্ম্মরাজ্য হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে এ অরণ্যের অধিকাংশ স্থান বেষ্টন করিয়া আছে। চল, যখন স্বয়ং 'প্রজ্ঞা' দেবী আমাদের অনুকূল আছেন, তখন আমাদিগকে সে বিড়ম্বনায় পড়িতে হইবে না। এক্ষণে সম্মুখে ঐ যে একটি পান্থশালা দেখিতেছ, উহার তলদেশে ক্ষণেক বিশ্রাম করিবে চল।

ক্রমশঃ

শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা।

আবর্ত্ত।

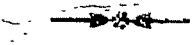

(১)

একটা দ্বিতল বাটীর এক সুসজ্জিত কক্ষে দুই বন্ধু কথা কহিতেছিল। যোগেন বলিতেছিল—"ভাই, পরেশ, আমরা দু'জনেই মাতৃপিতৃহীন। দু'জনে যদি একত্রে জীবনটা অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমরাই সুখী।"

পরেশ বলিল—"পৃথিবীতে ত' সকলের সমান যায় না। তুমি এখন বল্‌তে পার যে, এক সঙ্গে থাক্‌লেই ভাল হয়। আবার হয় ত' দু'দিন পরেই গলাধাক্কা দিবে। এই ত পৃথিবীর নিয়ম।"

যোগেন বলিল "ভাই, ছেলে বেলার ভালবাসা কি ভুলে গেলে? প্রাণ দিয়াও তোমার জীবন বাঁচাইব। ভিক্ষা করি সেও ভাল।"

পরেশ বলিল—"গোল্ড স্মিথের পদ্যটা মনে পড়ে?

যোগেন বলিল—"তুমি তোমার কবিতাগুলোকে দূরে ফেলে রাখ। আমরা কখনও ছাড়াছাড়ি হইব না।"

পরেশ বলিল—"আচ্ছা; কাল্‌কেই সব জিনিসগুলো এখানে আনিয়ে রাখবো। সরলার কি হবে ভাই?"

একটু চিন্তা করিয়াই যোগেন বলিল—"সরলা? তোমার কাছে বল্‌তে লজ্জা করে ভাই! সে আমার গৃহিণী হইতে পারে।"

বিস্ময়ে পরেশ বলিল—"সত্যি! তুমি তাকে ভালবাস?"

যোগেন মাথা নীচু করিয়া রহিল। পরেশ একটু পঞ্চমে সুর তুলিয়া বলিল "আমাদের সমাজ উচ্ছন্ন যাইতেছে। বাঙ্গালীর চিহ্ন লোপ হবে। ঘোর কলি—ঘোর কলি!

যোগেন একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল—"সে কি হে? তুমি কি উন্মত্ত হ'লে?"

পরেশ বলিল—"উন্মত্ত কি আর কেহ ইচ্ছা করিয়া হয়! তুমি আমার ভগ্নীর

উৎপল এত বড় একটা কথা বল্‌লে? আমি তোমার স্ত্রীলোকের মত বলেই কিছু বল্‌লুম না।"

যোগেন বিমর্ষভাবে বসিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। ভিতর হইতে পরেশ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—"যোগেন—আমায় ক্ষমা ক'রো। আমি তোমার পায়ে পড়ি।"

(২)

পরদিন সন্ধ্যার পর পরেশ ও ফুল্লরা একটি নিভৃতকক্ষে বসিয়াছিল।

পরেশ বলিল—"যোগেনের সঙ্গে কাল একটা তর্ক হচ্ছিল। তুমিও ত অনেক পড়েছ?"

হাসিয়া ফুল্লরা বলিল—"তা' আমার সঙ্গে কি তর্ক করবেন?"

পরেশ হাসিয়া বলিল—"বিশেষ কিছুই নয়। বন্ধুত্ব ও ভালবাসা; এই দুইটা জিনিসের মর্ম্মটা—"

বাধা দিয়া ফুল্লরা বলিল—"জিনিস দুটো যদি বি-এ পাশের মাথায় না প্রবেশ করে; তা হলে ধিক্!"

লজ্জায় পরেশ নম্র হইয়া বলিল—"বন্ধুত্ব জিনিসটা মহৎ; আর ভালবাসাটা আরও মহৎ।"

হাসিয়া ফুল্লরা বলিল—"কি রকম? এই মনে করুন, আপনি আমাকে ভালবাসেন, আমি যদি কাঁদাইয়া আপনাকে ত্যাগ করি? আরও দেখুন—আপনার দাদা ভয়ানক গায়ে পড়া বন্ধু, সে যদি কাঁদাইয়া যায়?"

পরেশ লাফাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বটে! পৃথিবীতে ভালবাসাটা মস্কার?"

সেই মুহূর্ত্তে যোগেন ও সরলা সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সরলা পরেশকে বলিল—"দাদা—তুমিও বোধ হয় যোগেন বাবুর সহিত শীকারে যাবে?"

পরেশ বলিল—"যোগেন যদি যায়, আমাকেও অবশ্য যেতে হবে।"

ফুল্লরা যোগেনকে জিজ্ঞাসা করিল—"কবে শীকারে যাবে দাদা?"

যোগেন বলিল—"পাগলী! আমরা কাল্‌কেই যাব।"

ফুল্লরা বলিল—"না, দাদা তোমার যাওয়া হইবে না। কাল্‌কে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।"

যোগেন জিজ্ঞাসা করিল—"কি দেখেছিস্? বল।"

ফুল্লরা বলিল—"অদ্ভুত স্বপ্ন। তুমি শীকারে যাইয়া একটা প্রকাণ্ড পাখী

পড়িতেছে। তাহার বাহুগুলো তোমরি চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাঁদিতেছে। উঃ কি নিদারুণ জ্বালা!"

এই শব্দের সহিত দুই-কোঁটা জল ফুল্লরার চক্ষু হইতে পড়িয়া গেল। যোগেন হাসিয়া বলিল—"কাঁদছিস্ কেন পাগলী?"

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া যোগেন ও পরেশ নিকটবর্ত্তী সহরে যাত্রা করিল।

(৩)

দুই বন্ধুতে ষ্টীমার উপরে বসিয়া কথা কহিতে লাগিল। যোগেন বলিল—"ভাই! আমাদের হাতটা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করছে; তাই ত এখানে একটা বাড়ীতে বলে নেবি?"

পরেশ বলিল—"জঙ্গলের ওপারে একটা বাড়ী আছে বোধ হয়! হ্যাঁ—ঐ যে ধোঁয়া যাচ্ছে!"

দুই বন্ধুতে সেই খড়ে ঘরটার কাছে যাইয়া দেখিল—একটি যুবক ও এক বৃদ্ধ এক বৃক্ষের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছে। বৃদ্ধ সবেমাত্র জগতের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে।

যোগেন ও পরেশ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। যোগেন যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা কি কোন উপকার করিতে পারি ভাই?"

যুবক বলিল—"পিতাকে দাহ করিতে হইবে। আপনারা অপরিচিত হইলেও বন্ধু। অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু সাহায্য করুন।"

যোগেন তাহার টাকার ব্যাগ খুলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে যুবক বলিল—"অর্থ চাই না। তুমি একবার বস। আমি কাঠ নিয়ে আসি।"

যুবক কাঠ আনিতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কাঠ হস্তে যুবক ফিরিয়া তৎপক্ষে দাহ করা হইল।

সেই রাত্রে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া সকলেই শয়ন করিল। সারাদিনের পরিশ্রমে যোগেন ও পরেশ ঘুমাইয়া পড়িল। গভীর রাত্রে যোগেন একটা স্বপ্ন দেখিল।

সে দেখিল—"একটা বাড়ীতে মহা ধুমধাম হইতেছে! সেখানে সরলা উপস্থিত ছিল। সে-সরলার কোমল হাতখানি ধরিতে গেল। তৎক্ষণাৎ সরলা হাতখানি টানিয়া লইয়া অদৃশ্য হইল।"

স্বপ্নের শেষের সঙ্গে যোগেনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিল প্রভাত হইয়াছে। তখনও সূর্য্যদেব পূর্ব্বের নীলাকাশে রাঙ্গা আভা বিতরণ করেন নাই। সে ঘরটি খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, বালিকাটি বসিয়া কাঁদিতেছে।

সে কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নামটি কি ভাই?"

বালিকা—"সরমা" বলিয়াই ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। যোগেনের মনে একটা ভালবাসা জাগিয়াছিল।

মিনিট দুই পরেই বুবকাট আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগেন জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নামটি কি ভাই? তোমাদের পরিচয়টা বলবে? এখানে কেন বাস করছিলে?"

বুবকাট বলিল—নিশ্চয়ই। তোমাকে না বল্লে আর কাকে বলব? অনেক দিন পরে মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আমার নাম বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রভা ব্রাহ্ম ছিলেন, তারপর আত্মীয়গণ তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। আমরা ভাই-বোনের বাবা, ও মা কেউ-ই নাই। পূর্ব্বাঞ্চলে আমার বাবা কি একটা চাকরী করতেন।"

যোগেন বলিল—"বেশ হিলছে। আমরাও ব্রাহ্ম। তবে আমাদের ওখানে চল। সুখে থাকবে।"

বিজয় বলিল—"তোমাদের নামটা?" যোগেন বলিল—"আমার নাম শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রায় ও আমার বন্ধুটির নাম পরেশ। আমরাও হিন্দুস্থানী।"

(৪)

কিছুক্ষণ পরে বিজয় নেত্র হইতে শাক-সব্জী আনিবার জন্য বাহির হইল। যোগেন ও পরেশ বেড়াইতে লাগিল। সরমা ভাত উনুনে চাপাইয়া দিল।

বেড়াইতে বেড়াইতে যোগেন বলিল—"ও ভাই! বড্ড ভুল হয়েছে।" পরেশ উৎসুকনেত্রে বলিল—কি? কি?

যোগেন বলিল—"আমাকেই আমাকে যেতে হ'বে।" পরেশ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসিল—"বিজয়ের সহিত আলাপ হয়েছে।"

যোগেন বলিল—"হাঁ। বোন্ সরমার সহিতও আলাপ হয়েছে। আচ্ছা! দরিদ্রের ঘরে এমন সুন্দর মেয়েও জন্মগ্রহণ করে?"

পরেশ বলিল—"চল, চল, এখন বিজয় নেতে গিয়েছে।"

যোগেন বলিল—"চল। আহা সরমা লেন কিন্নরীর মত তৈয়ারী।"

পরেশ গম্ভীরভাবে বলিল—"অমন কত মেয়ে আমার পদসেবা করতে চায়। তোমার কাব্যটাকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ কর।"

যোগেন হাসিয়া বলিল—"ইল্লি তোমার মত কালমাণিক্‌কে কে ভজনা করবে না।"

পরেশ গম্ভীরভাবে বলিল—"বটে! দেখবে—তোমার ওই সরমা ফুল্লরা একদিন এই পায়ে সেবা করবে।"

(৫)

পর্ণকুটীরে পরেশকে লইয়া প্রবেশ করিয়াও যোগেনের আশা সফল হইল না ইতিপূর্ব্বেই বিজয় আসিয়াছিল। দুই বন্ধু রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইল। বিজয় বলিল—"তোমাদের আজ এখানে থাকতে হবে।"

যোগেন বলিল—"না ভাই তোমাদের দু'জনকেই আমার বাড়ীতে যেতে হবে।"

বিজয় বলিল—"আচ্ছা। কিন্তু একটা বাধা আছে।"

যোগেন বলিল—"ও সব শুনছি না তোমাদের নিয়ে যাবই।"

* * *

বৈকালে চারিজনে যাত্রা করিল। সরমা একটি সাদা কাপড় পরিয়াছিল। কিছুদূর যাইয়াই সহরের রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল। একটি গাড়ী ভাড়া করিয়া যোগেনের বাড়ীতে সকলে পদার্পণ করিল।

ফুল্লরা ও সরমা, বিজয় ও সরমার সহিত শীঘ্রই বন্ধুত্বের প্রবল টানে বদ্ধ হইল।

সরমা ও ফুল্লরা বোধ হয় বিজয়ের পরিচয় পাইয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। বোধ হয়, তাহাদের মনের ভিতর একটা প্রবল আগুণ জলিতেছিল এবং সেই আগুণের জ্বালায় একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিজয়ের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইল।

সরমা বলিল—"বিজয় বাবু—আপনি বোধ হয় বেড়াইতে যাবেন?"

বিজয় তখন সরমার সহিত গল্প করিতে সবেমাত্র আরম্ভ করিয়াছে। বিরক্তির সহিত বলিল—"নিশ্চয়ই।"

সরমা বলিল—"তবে চলুন। আর দেরী করা উচিত নয়।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"ফুল্লরা দিদিও যাবেন বোধ হয়?"

ফুল্লরা নীরবে দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল—"না, আজ আর যাব না।"

ফুল্লরা বেগে বিরক্ত উঠিয়া ফুল্লরার হাতখানি ধরিয়া বলিল—"সত্যি। রাগ করেনি। গাড়ী করে যাবি আর আসবো চল।"

ফুল্লরা হাসিয়াই ফুল্লরা হাতখানি ছাড়াইয়া লইল।

(৬)

তিনজনে বেড়াইতে বাহির হইবার কিছুক্ষণ পরেই পরেশ দ্রুতপদে সরমার প্রবেশ করিয়া একটী সোফায় শয়ন করিল। সরমা একটী গান ধরিয়াছিল। সরমা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি না যোগেন বাবুর সঙ্গে সীকার কর্ত্তে গিয়াছ?"

পরেশ বলিল—"না। যোগেনের উপর আমি বড়ই বিরক্ত হয়েছি।"

হাসিয়া সরমা বলিল—"পরেশ করেছ। বিরক্ত হবারই কথা।"

পরেশ সরমার ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দুই একদিন সন্ধ্যার আসিয়া অনেক কথাই পাড়িয়াছিল; সরমা তাহা সাদরে গৃহীত করিয়াছিল। একটু সরিয়া সরমার পাশের একটি চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

সরমা বলিল—"তাঁর উচিত ছিল, আপনাকে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া।"

পরেশ সরমার কথার ভাবটা বুঝিতেও চেষ্টা করিল না। সে বলিল "নিশ্চয়।"

সরমা বলিল—"তিনি বোধ হয় কালকে শিকার হইতে আসিবেন।"

"বোধ হয়" বলিয়াই পরেশ সরমার হাতখানি দুইহাতে ধরিল। সরমা বলে হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—ছিঃ ছিঃ আমি তোমাকে দাদার মত স্নেহ করিতাম। দাদাকে যে ভক্তি করিতাম তোমাকে সেইরূপ ভক্তি করিতাম। তুমি অতিনীচ।"

পনের দিন পরে একদিন সন্ধ্যার পর ফুল্লরা ধীরে ধীরে সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহার পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছিল। ফুল্লরা তাহা জানিত না।

পরেশ ধীরে ধীরে আসিয়া ফুল্লরার হাতখানি ধরিল।

পরেশ বলিল—"ফুল্লরা!" সেই সুদূর প্রসারিত সমুদ্রের নির্জ্জন তটে প্রতিধ্বনিত হইল "ফুল্লরা!"

ফুল্লরা সবলে হাতখানি সরাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সফলতা লাভ করিল না। সে নীরবে বসিয়া রহিল।

পরেশ বলিল—"তুমি জান বে আজ যোগেনের সহিত সরলা ও বিনুর সহিত সরলার বিবাহ হইয়াছে?"

ফুলরা ক্রোধের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল; দুঃখে, ক্রোধে তাহার সুনির্মল মুখখানি আরক্ত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সে বলিতে চাহে বলুন। ও সব কথা—"

বাধা দিয়া পরেশ বলিল—"বলিতেছি। তুমি ছেলে বেলা হইতে আমায় আশা দিয়াছিলে। আজ তাহার এই পরিণাম?"

ফুলরা বলিল—"আপনি আমায় বিবাহ করিতে চান? সে আশা ত্যাগ করুন।"

পরেশ বলিল—"কি? তুমি অতবড় একটা কথা বল; আমি সব চুপ করে থাকবো! তুমি আমায় তবে ভালবাস নাই?"

ফুলরা বলিল—"না; এজন্মে তোমায় ভালবাসি নাই; এ জন্ম ভালবাসিব না।"

পরেশ বলিল—"তবে কাহাকে ভালবাসিয়াছ?"

ফুলরা বলিল—"যদি পবিত্রভাবে ভালবাসিয়া থাকি, তাহা হলে বিজয়—"

চকিতের মধ্যে পরেশ ফুলরার হাত ছাড়িয়া দাঁড়াইল। ফুলরা নিস্তব্ধ।

পরেশ বলিল—"তবে তুমি এতদিন এমনে আমায় ঘৃণা করিয়া আসিতেছ বেশ ভাই হোক! ফুল! আমি চিরকাল তোমায় ভালবেসেছি। কত সৌন্দর্য্য ধ্যান করিয়া কাটাইয়াছি। জীবনপ্রবাহ আবর্ত্তের ন্যায় ঘুরিতেছে আমি সরযাকে দেখিয়া তাহাকেও ভালবাসিয়াছিলাম, কিন্তু একদিনের তরে আমি তাহার আশা ছাড়িয়াছি; আজ তোমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ! ফুল! আমি চলিলাম! পরজন্মে যেন আমায় ভালবেস।"

রাত্রি হইয়াছিল, নির্ম্মল আকাশ চন্দ্রকরোজ্জ্বলিত। পর্ব্বত শ্রেণী বহু তরঙ্গমালার মধ্যে একটী মাত্র শব্দ হইল। চপলা সুন্দরী হাসিয়া উঠে প্রকৃতি রাণী হাসিতে লাগিল; কেবল বাপীতটে কাঁদিতেছিল,—

ফুলরা।

বাজীরাও ও মস্তানী।

মস্তানী প্রথম বাজীরাওয়ের উপপত্নী। তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যের কাহিনী আজিও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। কিন্তু কোথায় এই অসামান্যা সুন্দরীর জন্ম, কেমন করিয়া এই নবীনা যুবতী ব্রাহ্মণ-সেনাপতির অঙ্কে স্থান পাইয়াছিল, তাহা এতদিন পরে জানিবার উপায় নাই। কেহ বলেন, বুন্দেল খণ্ডের অভিযানের সময় রাজা ছত্রসাল বাজীরাওকে এই নবীনা রূপসী উপহার দিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ড বাহাদুর দস্তাএর বলবন্ত পারলীর এই প্রবাদ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মস্তানী ছত্রসালের কোন যবনী রক্ষিতার গর্ভজাত সন্তান। বুন্দেল খণ্ড বিজয়ের সময় বাজীরাওয়ের সহিত তাঁহার মিলন হয়। রাজা ছত্রসাল তাহাকে বিজয়ী সেনাপতির মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উপঢৌকন দিয়াছিলেন, কিম্বা মনুষ্য-বিবরণ উদ্ভাবিলাসের বশীভূত হইয়া মুসলমানী মস্তানী স্বেচ্ছায় বাজীরাওয়ের অনুগামিনী হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না, কিন্তু ইহা স্থির যে সঙ্কারিণী লতার মত লাবণ্যবতী মস্তানীর রূপে বাজীরাওয়ের যে চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবিতকালে আর দূর হয় নাই। মস্তানীর জন্য বাজীরাও পুনার শনিবার-প্রাসাদে এক স্বতন্ত্র মহল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই মহলের নাম 'মস্তানী মহল' আর সেই দিকের দরোজার নাম মস্তানী দরোজা। দ্বিতীয় প্রবাদের মতে মস্তানী প্রথম ছিল নিজামের অন্তঃপুরে, মুসলমান সুবাদার ব্রাহ্মণ পেশবার উপযুক্ত উপহার বিবেচনায় তাহাকে বাজীরাওয়ের নিকট পাঠাইয়া ছিলেন। মস্তানী সম্বন্ধীয় আর একটি বিবরণ সোহনীকৃত পেশবা বংশে পাওয়া যায়। মুজায়েত খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে দিল্লীর বাদশাহ দক্ষিণের সুবাদার নিজাম উলমুলুকের শাস্তি বিধান করিতে পাঠাইয়াছিলেন। সোহনীর মতে মস্তানী এই মুজায়েতের 'কলাবন্তীন' বা নৃত্যগীতাদি কলা-কুশলী উপপত্নী। বাজীরাওয়ের ভ্রাতা চিমণাজী আপ্পা নিজামের পক্ষ গ্রহণ করিয়া মুজায়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে মুজায়েতের পরাজয় ও মৃত্যু হয়। শত্রু শিবির লুণ্ঠনের সময় মস্তানীর সহিত চিমাণজীর সাক্ষাৎ হয়, মস্তানী তখন

বিষপানের আয়োজন করিতেছিল। মস্তানী অপরূপ-রূপবতী, আরাঠী [illegible] কার লিখিয়াছেন, তাম্বুল প্রাশনসময়ে তাহার স্বচ্ছ শ্বেতগ্রীবার উপর হইতে তাম্বুলের লোহিত রসপ্রবাহ পরিলক্ষিত হইত। তাহার দেহে লক্ষ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ছিল। সুজায়েত তাহাকে বড়ই ভাল বাসিত, বড়ই যত্নে রাখিয়াছিল। চিমণাজী এই যবনী যুবতীর আত্মহত্যার আয়োজন দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মরিবে কেন? মস্তানী উত্তর করিল; আমার আর আশ্রয় নাই, তাই আমাকে মরিতে হইবে। তবে তুমি যদি আমাকে গ্রহণ কর,—আমি মরিব না। চিমণাজী বলিলেন—তুমি মরিও না; আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিব না, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের অভিপ্রায় জানিলে তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন! আশ্বস্ত মস্তানী আত্মহত্যা করিল না। বাজীরাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে মস্তানী দেখিল, বাজীরাও তাহার কনিষ্ঠের মত সংযত বা নিষ্ঠাবান্ নহেন। এই সমরকুশল যুবক সেনানায়কের যৌবনে পূর্ণ মনস্বীতেও সেইরূপ প্রবল লিপ্সা। বাজীরাও তখন বিবাহিত, সন্তানের জনক। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বালাজীর বয়স তখন নয় বৎসর। কিন্তু মস্তানী স্নেহ বা দাম্পত্য কর্ত্তব্য তাঁহাকে পতনের পথ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। যবনীর রূপমোহে ব্রাহ্মণ সেনাপতি আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে মস্তানীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

অবৈধ প্রণয়ে জগতের ইতিহাসে বহু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ক্লিওপেট্রার কুহকে না ভুলিলে আণ্টনির ন্যায় মহাবীরের অমন শোচনীয় পরিণাম হইত না। তাঁতা প্রণয়িনীর বিলাসতরণীর অনুসরণ করিয়া আণ্টনি যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করিলে রোমের ইতিহাস কোন্ পথে চলিত, তাহা কে বলিতে পারে? ফরাসীবিপ্লবের জন্য আদাম পেম্পাদুর ও আদাম দুব্যারির দায়িত্বের পরিমাণও স্থিরীকৃত হয় নাই। দিল্লীর এক হতভাগ্য বাদশাহ লাল কুমারীর সুন্দর হাতের পিয়ালাভরা গরিবায় মত্ত না হইলে হয়ত সাম্রাজ্য ও সিংহাসনের সহিত জীবন বিসর্জ্জন দিত না। বাজীরাওয়ের সৌভাগ্য, কাশীবাঈ সতী তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী ছিল, চিমণাজীর মত স্নেহশীল কনিষ্ঠ ছিল, আর শাহুর মত হিতাকাঙ্ক্ষী প্রভু ছিল। মস্তানীর রূপোন্মাদে বাজীরাও পত্নী ও পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ আপনার কাছে রাখিয়া বাজীরাও ও চিমণাজীকে যুদ্ধে ও রাজনীতিতে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। বালাজী বাজীরাও পিতার নিকট হইতে কোন শিক্ষালাভ করেন নাই, তাঁহার

যেটুকু শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা অর্জ্জিত হইয়াছে পিতৃদেবের শিবিরে। রাজনৈতিক বিপ্লব না হইলেও কাঞ্চনী মুহকগ্রস্ত বাজীরাওয়ের পারিবারিক শান্তি অব্যাহত থাকে নাই। কেমন করিয়া থাকিবে? তিনি দিবারাত্র থাকিতেন মস্তানীর মহালে। ভ্রমেও আপনার পরিণীতা পত্নীর নাম করিতেন না। বোধ হয় রাজ্যসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যেও আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ ছিল না। পুত্র বালাজী বড় দুঃখে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন—"নাসির-জঙ্গের বিগ্রহ মস্তানীর গায়ে বিসর্জ্জিত হইয়াছে, রাজ-অনুগ্রহও আমরা হারাইয়াছি।" এই সময় হইতেই পিতা-পুত্রেও বৈমনস্য ঘটিয়াছিল।

ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্যপান মহাপাপ। পেশবাসাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণকে মদ্যপান বা বিক্রয় পর্য্যন্ত দণ্ডনীয় ছিল। কিন্তু যবনী মস্তানী ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে আসিয়াও বোধ হয় আপনার পানপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

শুনিতে পাই যে, সম্রাট ঔরংজীবের বিবেকবুদ্ধিও রমণীর কটাক্ষে দিনেকের তরে টলিয়াছিল। সেই একদিন তিনি সুন্দরীর হাতের সিরাজীর পিয়ালা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। যেখানে ঔরংজীবের কঠিন সংযম শিথিল হইয়াছিল, সেখানে বাজীরাওয়ের দুর্ব্বলচিত্ত সহজেই পরাজয় স্বীকার করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? রাও বাহাদুর দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস তাঁহার ইতিহাসসংগ্রহের দ্বিতীয়খণ্ডে একখানি সমসাময়িক পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মস্তানীর সহবাসে বাজীরাও পানপ্রবৃত্তিরও দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এই পত্রের বলে কিণ কেইড ও পারসনীস হিন্দুস্থান রেভিসিউ পত্রে তাহাদের এক প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মস্তানী মহলে অবস্থানকালে বাজীরাও উপপত্নীর সহিত মদ্যপান করিতেন। শ্রীযুত আঠলে ও শ্রীযুত রাজপড়ে, কিনকেইড ও পারসনীসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। মেঘদূতেরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কেহ কেহ করিয়াছেন, কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট চিরকালই উহা আদিরসাত্মক কাব্য থাকিবে। কিনকেইডের অনুবাদই আমাদের নিকট উল্লিখিত স্বাভাবিক অর্থমূলক বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুত গোবিন্দ সখারাম সরদেসাইও কিন্তু রাজবাড়ের সহিতই একমত। তিনি বলেন—বাজীরাও বিষয়লম্পট ছিলেন; কিন্তু মদ্যপ ছিলেন না।

বাজীরাও সাতারায় রাজদর্শনে গেলেন; কিন্তু মস্তানীর বিরহ অসহ্য বোধে তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। রাজার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ও কুশলসম্ভাষণাদির পর দুই তিন মাস তিনি সাতারায় রহিলেন; কিন্তু পূর্ব্বের মত এখন আর

তাঁহার দরবারে যাইবার সময় নাই। মস্তানীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিবার সাধ্য আর তাহার নাই। দরবারে তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না। তাহার সাম্পূর্ণ কথা ইতিপূর্ব্বেই রাজার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু এই অসৌজন্য তিনি উদাসীন দেখাইতে পারিলেন না। সে সময় সীতারাম খোসী ও নামক দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। বাজীরাওর সহিত ইঁহাদের সৌহার্দ্দ ছিল। ছত্রপতি শাহু ইহাদিগকে বলিলেন, তোমরা বাজীরাওকে লিও, চারি মাস কাল সে এখানে আছে, কিন্তু দুই একবারের বেশী আসে নাই। ইদানীং অষ্ট প্রহর কামিনী লইয়া পড়িয়া থাকে। ইহা, আমি তাহাকে পদচ্যুত করিব। যদি তাহার সুবুদ্ধি হয়, উত্তম। খোসী বাজীরাওকে রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, বহু প্রকারে তাঁহাকে বুঝাইলেন, নীতি-প্রকার উপদেশ দিলেন, কিন্তু ইঙ্গিত ফলবতী হইল না। বাজীরাও বলিলেন—পূর্ব্বের মত দরবারে যাইব; কিন্তু মস্তানীকে ছাড়িতে পারিব না। আবার তিনি নিত্য দরবারে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ সাতারায় থাকিলেন না। রাজার অনুমতি লইয়া পুনায় ফিরিয়া আসিলেন।

চিমণাজী ও বালাজী এতদিন বাজীরাওকে কিছু বলেন নাই, ভাবিয়াছিলেন তিনি ছঃখে শোকে আত্মহত্যা করিবেন। কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পারিবারিক শান্তি, লৌকিক সম্ভ্রম ত নষ্ট হইয়াছেই—অধিকন্তু দরবারের যে অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, তাহাও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। অবশেষে চিমণাজীর অনুরোধে পুরন্দর প্রভৃতি কয়েক জন ওজনদার লোক ব্যক্তি বাজীরাওকে মস্তানীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলিলেন। গীতার মহাবাক্য ব্যর্থ হইবার নহে—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

হিতবাক্য শুনিবার তত মনের অবস্থা বাজীরাও তখন হারাইয়াছেন। মস্তানী তখন তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, মস্তানীর বিরহে তিনি প্রলয় দেখিলেন, পুরন্দরের হিত বাক্যে তাঁহার ক্রোধ হইল। ক্রোধভরে তিনি [illegible] ছলনা করিয়া প্রথম কবকুম্ভে ও তথা হইতে পাটসে [illegible]। মস্তানী

পুনার প্রাসাদে রহিলেন। বালাজী বাজীরাও এতদিন যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি মস্তানীকে প্রাসাদের এক কক্ষে আবদ্ধ করিয়া বাহিরে চৌকী পাহারা বসাইলেন। কিন্তু মস্তানী কেবল রূপবতী নহেন, তিনি অসাধারণ চাতুর্য্যশালিনী। বালাজী বাজীরাও-নিয়োজিত প্রহরীদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তিনি আপনার কারারুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া পাটনা স্বীয় প্রণয়পাত্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। কিন্তু এবার আর বাজীরাও তাঁহাকে নিজের নিকট রাখিতে পারিলেন না। মস্তানীর পলায়নবার্ত্তা প্রকাশ হইবা মাত্র পেশবার শুভানুধ্যায়িগণ পাটনে আসিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকার প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া, বাজীরাওয়ের অনুমতি অনুসারে মস্তানীকে আবার পুনায় পাঠাইয়া দিলেন। মস্তানী পুনায় ফিরিলেন বটে; কিন্তু প্রিয়তমের প্রাসাদে আর তাঁহার স্থান হইল না। চিমণাজীর উপদেশে বালাজী মস্তানীকে পার্ব্বতী উদ্যানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, বাজীরাওয়ের সহিত অতঃপর আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

সেকালের নরপতিগণের অনেকেরই উপপত্নী ছিলেন। রাজানুচররক্ষিতাস্তঃ পুরে উপপত্নী সকলে বারাঙ্গনার ন্যায় আচরণ করে নাই। শুদ্ধান্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিতা গুজরাটের মহিষী রুক্মিণীদেবী হেলায় পূর্ব্ব প্রণয় বিস্মৃত হইয়া দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, পতির শত্রু, আলাউদ্দিন খিলিজীর অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন। সুন্দরী কন্যা দেবলাদেবী খিজির খাঁ ও মোবারকের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেনই, মোবারকের মৃত্যুর পর হীনবংশজাত কুচক্রী শঙ্কর পত্নীত্ব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু মালবপতি বজ্র বাহাদুরের উপপত্নী রূপবতী বিষপান করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; তথাচ আপনার সতীত্ব গৌরব বিসর্জ্জন করেন নাই। মস্তানীর শেষ জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু প্রবাদ আছে ১৭৪০ সালে বাজীরাওয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মস্তানী হিন্দু সতীর মত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। পারলগামে মস্তানীর সমাধি আছে।

ইংরাজনরপতি দ্বিতীয় চার্লসের উপপত্নীগণ, তাঁহার নিকট হইতে বিস্তৃত জায়গীর ও উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। চার্লসের জারজপুত্রও ডিউক উপাধি পাইয়াছিলেন, ব্রিটনের উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশের দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, সম্ভ্রান্ত সমাজে তিনি রাজপুত্র বলিয়া সম্মানিত হইতেন। মস্তানীও বাজীরাওয়ের নিকট হইতে কয়েকখানি গ্রাম জায়গীর পাইয়াছিলেন। তাঁহার

গর্ভজাত পুত্র কৃষ্ণের বাহাদুরকে পেশবা বাজীরাও ব্রাহ্মণের মত উপবীত দিয়া ব্রাহ্মণসমাজে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রতিকূলতায় পরাক্রান্ত পেশবার এই অভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই। সদসের বাঙ্গা-র বুণ্ডেলখণ্ডের অন্তঃপাতী বীলনা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের সার্দ্ধপদ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল মহারাষ্ট্রের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দুকুমারীর সহিত। বালাজী বাজীরাও মস্তানীর প্রতি বিরূপ হইলেও সমশেরের সহিত কোন কুব্যবহার করেন নাই। সমশের তাঁহার নিকট অনুজের আদর ও জন-সমাজে পেশবা পুত্রের সম্মান পাইতেন। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র আলি বাহাদুর নানা ফড়নবীশের নির্দ্দেশে মধ্যভারতে সহায়তা দিবার প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। ইংরেজলেখক কানলাহেব পেশবা বাজী-রাওয়ের জারজপুত্র বলিয়া ইঁহার পরিচয় দিয়াছেন। আলীবাহাদুরের বংশধরগণ বাঁদার নবাব বলিয়া পরিচিত। শেষ নবাব সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যচ্যুত হন। এখন মস্তানী ও বাজীরাও-শেখরেরা ইন্দোরে হোলকার রাজ্যে বাস করিতেছেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

ভক্ত, সাধক ও কবি।

ভক্ত :—

আমি চাই জগদীশ! তোমারি জগতে
আপনারে দিই বিলাইয়া,
তোমারি সেবায় কাজে করিয়া নির্ভর
তোমা মাঝে রহিগো ডুবিয়া!

সাধক:—

আমি চাই হে রাজন্! সবাকার সনে
তোমা লই আমার করিয়া,
তোমারি আসন রচি' মোর এ হিয়ায়
তব ইচ্ছা নীরবে পালিয়া!

কবি:—

একজন দিতে চায়, নিতে চায় আর,
আমি চাই দোঁহার মিলন;—
আমি দিব, আমি নিব, পুলক উভয়ে,
সে পুলক বুঝিব কেমন!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

পরিত্যক্তা।

ভোরের আলো অস্পষ্ট থাকিলেও অনেক জ্যোৎস্না রজত-ধারায় সমস্ত সাঁওতালপল্লীর উপর বহিতেছিল; সমস্ত রাত্রির সুপ্ত জনকোলাহল তখনও গ্রামখানি মুখরিত করে নাই। একা এক জীর্ণ পর্ণকুটীরে, কিন্তু সে সুখসুপ্তি নাই; সারারাতের নিদ্রাহীন চক্ষুদুটি কেবল এক ধ্যানে স্থির বালিকার মুখে লক্ষ্য হইয়া ভাসিতেছিল। তার যা কিছু শান্তি যা সুখ সবই এক স্থিমিত নেত্রের দিকে নিবিড় অটুটভাবে বাঁধা ছিল। তাহারই রমণী শয্যাশায়িনী,—রোগের তীব্র যাতনায় দেহ মাঝে মাঝে আকুল হইয়া উঠিতেছিল; নাড়ী ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট। প্রাণ ক্ষণিকের জন্য আসিতেছে আবার লুপ্ত হইতেছে। রমণী বর্ষীয়সী; গ্রামে সকল কার্য্যে তৎপরা ও সকলেরই সম্পদে বিপদে পরামর্শদাত্রী। সেজন্য মেয়ে পুরুষ সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। সাঁঝের আলো ঘরটিতে সন্ধ্যার এক একবার দেখিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাত্রের খবর লইতে সাঁঝের বুড়ির আর কেহই রহিল না।

অনাবৃত পর্ণকুটীরগুলিতে সমভাবাপন্ন জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। রমণীর শীর্ণ মুখখানি তাহাতে বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে. আর সেইজন্যই বুধিয়ার ম্লানমুখের কান্নিয়া আরও গাঢ় করিয়া দিতেছে। রমণীকে বাঁচাইতে পারিলাম না, এই এক চিন্তায় কেবলই তার হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে। সে ভাবে নাই, মানবের চেষ্টার বাহিরে যে অদৃষ্টলিপি আছে তাহা মুছিয়া ফেলা তাহার সাধ্যাতীত। রমণীর পৃথিবীতে আপনার বলিতে কেহই ছিল না। পল্লীর মধ্যে থাকা কালীর কেবল পাঁচজনের সেবাযত্ন সকলকেই সে তার স্নেহকণা বিতরণ করিত, কাজেই অযাচিতভাবে তাহার আদর যত্নে সে অনেক সময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত। রমণীর অন্তিমদশা উপস্থিত, অনেকক্ষণ ধরিয়া স্থিরনেত্রে বুধিয়ার মুখপানে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "বুধিয়া, সাবায়াত সমাসনি, একট্ পো"। কথাগুলি শেষ হইতেই না হইতেই নেত্রদুটী আরও ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল, কপোল বহিয়া

দুই এক বিন্দু জলও দেখা দিল, আর সেই সঙ্গে তার ক্ষীণ জীবনপ্রদীপ একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। হতবুদ্ধি বুধিয়া চিরসুপ্ত রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন চাঁদের কিনিক জ্যোৎস্না নিভিয়া গিয়া ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। পল্লী ও বনরোরের আবরণ—ক্রমশঃ মুক্ত করিতেছে। নিঃস্বার্থ ভালবাসা বোধ হয় বালিকাহৃদয়ে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। বুধিয়ার সে করুণ ক্রন্দনে মেয়ে-পুরুষ সকলেই ছুটিয়া আসিল এবং দুনিয়াটা যে মিথ্যা, তাহাই মনে মনে তোলপাড় করিতে লাগিল।

(২)

কৃষিয়া ও তুনসতিয়া ঐ গ্রাম্য সীমান্ত জমা জমি লইয়া যে কার সংসার তাদের মনের মিল ছাড়া এতদিন আর কোনও বন্ধনই ছিল না। সম্প্রতি—বুধিয়া তাদের পালিত কন্যা হইয়া আসিয়াছে। মেয়েটী কৃষিয়ার নজরে পড়িয়াছিল এবং তাহারই আগ্রহে সে আজ তাঁদের সংসারভুক্ত। কিন্তু তার নূতন গৃহপ্রবেশ হইতে তুনসতিয়ার চোখে সে কেমন কেমন ঠেকিত—অবশ্য যত্ন আদরের ত্রুটি করিত না, কিন্তু গ্রামের সকল লোকে যে কথা কয়, সেটুকু কেবল কৃষিয়ার মন রাখিবার জন্য। জানি না, কৃষিয়া কি এতদিনই বুধিয়াকে দেখিয়াছিল। বস্তুতঃ বুধিয়ার আচার ব্যবহার, প্রকৃতি সকলই মধুর ছিল; ছিল না কেবল তার রূপ। কিন্তু, তাহা হইলেও ভাল করিয়া দেখিতে গেলে ঐ ক্ষুদ্র চক্ষুস্থটির ভিতর দিয়া হৃদয়ের বিশ্বস্ততা বেশ ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। অবশ্য কথা কিন্তু বোধ হয়, বুধিয়া সাঁওতালী হইয়াও সে গণ্ডীর কিছু বাহিরে পড়িয়াছিল; তাহা না হইলে সে আজ ক্ষুদ্র খালিয়া বুধিয়ার হৃদয়ের যে পাত্র ভরিয়া আছে, তাহা কি করিয়া চিনিল? বুধিয়া নূতন বাপ মা কাছে আসিয়া তার অশেষ গুণরাশি ক্রমশঃ দেখাইতে লাগিল। কিন্তু কৃষিয়ার ঘরে এত গুণের ঠিকানা কে করে? যেখানে যাহার ব্যথা, সেখানে তাহার ব্যথি; যেখানে যাহার দুঃখ, ক্লেশ ও দৈন্য সেইখানেই বালিকার স্নেহ-প্রবণ হৃদয় ছুটিয়া যাইত। ঘরে এত ঐশ্বর্য্য থাকিয়াও কিন্তু তার মন মন উঠিত না। সে তার সকল কাজের খুঁটী নাটি ধরিত আর সুবিধা মত তাহা শতগুণ বাড়াইয়া সবল প্রাণ কৃষিয়ার কাণে তুলিত। প্রথমে বাপ কোন কথাই কাণে লইত না, মা কিন্তু তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইত। কত-কাল আর এমন করিয়া চলে, বর্ষার খরস্রোতে পাষাণও গলিয়া যায়

ক্রমে ক্রমে যাহা হইল, তাহা বিশ্বাসের যোগ্য নয়; তাহাও তাহার নিকট সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শুনমতিয়া জিৎ হইল। সে একলা যে কাজে এতদিন ধরিয়া বাধা দিতেছিল, আজ তাহার দোসর পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। উভয়ে প্রতিকার্য্যে, প্রতিপ্রেরণায় বুধিয়ার দোষ দেখিতে লাগিল। বালিকা কিন্তু, বুঝিয়াও বুঝিতে পারিল না। সে ঘরের কাজ করিয়া পাড়ার লোকের দুঃখদুর্গতির কথা শুনিতে স্থির থাকিতে পারিত না। সেজন্য প্রত্যহই আহারান্তে কে কোথায় অভুক্ত, কে কোথায় রোগক্লিষ্ট, কে কোথায় শোকাতুর পড়িয়া আছে, তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইত। এসব কর্ম্মে অনেক সময় তাহার বাড়ী ফিরিতে দেরি হইত, সেকারণে লাঞ্ছনাও তাহাকে বিস্তর ভোগ করিতে হইত। নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টাও কখনও কখনও করিয়াছে; কিন্তু, তার বিশাল হৃদয় পরদুঃখে কাঁদিয়া উঠে যে, সে কি তাহা বাধা দিতে পারে? বর্ষায় নদী যেমন দুকূল ভাসাইয়া বহিয়া যায়, কাহারও হুঙ্কার, কাহারও দণ্ডের প্রতীক্ষা করে না, পরদুঃখে বুধিয়ার হৃদয়ও কোনরূপ প্রতিবন্ধক মানিল না। সেবাই তার জীবনের মূলমন্ত্র; তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে জীবন তার অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে যে! সে কি তাহা পারে? কাজেই পিতা মাতার শত চেষ্টা তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না। সংসারে তাঁহারও অশান্তি ঘনীভূত হইতে লাগিল। ক্রমে যাহা বালিকার চপলতা বলিয়া উপেক্ষিত হইত, এখন তাহা শাসনের কঠোর গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িল। পরের ঘরে এমন করিয়া বুধিয়ার ক'দিন চলিবে। সে বুঝিতে পারে নাই, পারিলে বোধ হয় সংসারের নিগড় আরও শক্ত করিয়া পরিত।

(৩)

যখন সন্ধ্যায় বুধিয়া তার মার নিকট ছুটী লইয়া মুমূর্ষু প্রতিবেশিনীর খবর লইতে গেল, তখন শুনমতিয়া ভাবে নাই যে, সে আর সে রাত্রে বাড়ী ফিরিবে না। অনেকক্ষণ ধরিয়া তার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া শেষে যখন আর আসা সম্ভবপর নয় দেখিল, তখন উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। বার বছরের মেয়ের পক্ষে বাহিরে পরের ঘরে রাতকাটান তাহার চক্ষে বড়ই বিসদৃশ ঠেকিল। সে এক্ষণ কোন রকমে ধৈর্য্য ধরিয়াছিল, আর তাহা পারিল না। রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে নিদ্রিত স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "এমন মেয়েকে আবার দুধ কলা দিয়ে পোষে!" হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে রুষিয়া আবার

একটু বিরক্তিপূর্ণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে।" তখন শুন্মতিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না; সে তার কেরান মুখ ঘুরাইয়া ঘটনাটি বেশ করিয়া বলিতে লাগিল, এবং পদে পদে স্বামীর অসদ্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে ভুলিল না। পাড়ার লোকের মাথা খারাপ হইয়াছে বলিয়া ঘরের মেয়ে তাহার বাড়ীতে রাত কাটাইবে, এ কেমন কথা। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর শেষে মুখ নাড়িয়া রুখিয়াকে বেশ সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিল যে, মানুষ করা মেয়ের প্রতি যদি এতই স্নেহ পড়িয়া থাকে ত সে তাহার মেয়ে নিয়ে থাকুক, শুন্মতিয়া সেই দণ্ডেই গৃহত্যাগ করিতে প্রস্তুত। পুরুষ হাজার কঠিন-প্রাণ হউক, এমন কেহই নাই যে, পরিণীতা স্ত্রীর কাতরোক্তিতে উদ্বাস্ত না হয়। রুখিয়ারও তাহাই হইল। এতদিন কোন রকমে সে নিজেকে সামলাইয়া আসিতেছিল, আজ তার হৃদয়ের সকল গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল। স্রোতের-কুলের মত সে ভাসিয়া চলিল। পরিণীতা স্ত্রী, কি পালিতা মেয়ে, কোন্‌দিক্ সে বজায় রাখিবে, চিত্ত তার বিষম সমস্যায় আলোড়িত হইতে লাগিল। শেষে ঠিক করিল স্ত্রীরই পক্ষ সমর্থন করিবে। সংসারী জীব; হঠাৎ সংসার হইতে বিচ্যুত হইতে হইলে কত কষ্ট, কত সাধনার আবশ্যক; জীবনে শুন্মতিয়া ছাড়া সে ত আর কোন সান্ত্বনার কথা জানে না; কাজেই তা'কে ছাড়ে সে কি করিয়া? ক্ষুদ্র পল্লীর গণ্ডীর বাহিরে যে বিপুল জগৎ পড়িয়া আছে, তাহা ত তার ধ্যানে, জ্ঞানে একদিনও আসে নাই। ক্ষণিকের জন্যও যদি তাহার সন্ধান পাইত, তাহা হইলে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার দিকে ছুটিত। মনের মধ্যে তার ঝড় বহিতে লাগিল। সে বলিল, "তুমিই যা বলিতেছ ভাই ঠিক; আমি বুধিয়াকে আনিয়া অন্যায় করিয়াছি, এখন যা করা উচিত তাই কর।" শেষ কথাগুলি বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছিল; কিন্তু উপায় নাই, সে যে শুন্মতিয়ার হাতের ক্রীড়নক। সংসারে ষোল আনা জিৎ খুব কমই ঘটিয়া থাকে; শুন্মতিয়ার কপালে তাহাই পাঁচ কিল; সে প্রত্যুত্তরে বলিল "তবে আমার মতে তাহাকে আর ভাল হইবার অবসর না দিয়া ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হক, কি বল।" কথাগুলা তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত কোমলপ্রাণ রুখিয়ার হৃদয় বিদ্ধ করিল। সে ভাবে নাই যে নারীর প্রাণ এত নিষ্ঠুর হইতে পারে। যে ব্যবস্থা স্ত্রীর শ্রীমুখ হইতে একবার বাহির হইয়াছে, তার বিপক্ষে যাওয়া ত রুখিয়ার কোষ্ঠীতে লিখে নাই; কাজেই তাহাকে নিষ্পাপে গুরুদণ্ডেরই পক্ষপাতী হইতে হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে হতাশায় মাথা রাখিয়া অসহায়া বুধিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কোথা অন্ধকারে শুভমতিয়া দেখিতে পাইল না, সে কেবল তাহার প্রাণ জুড়াইবার জন্য বুধিয়ার আগমন ও ভোরের আলো প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৪)

দিন যায়, দিন আসে। যে প্রত্যূষে রমণীর মৃত্যু হইল, সে দিনও সূর্য্য পূর্ব্বের ন্যায় নিজ রশ্মিজালে জগৎকে ঢাকিয়া ফেলিল। হাসি কান্নার রোলের মধ্যে পৃথিবীর সকল কার্য্য অবাধে সম্পন্ন হইয়া যায়। কেউ কারুর ব্যথায় ব্যথী হইয়া দণ্ডের জন্যও অপেক্ষা করিয়া থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে যে নিয়ম চলিতেছে, মানুষেও তাহার অবিকল সৌসাদৃশ্য দেখা যায়; কারণ, মানুষ প্রকৃতি ছাড়া নয়। রমণীর মৃত্যুতে পল্লীর কোন কাজেরই ব্যাঘাত ঘটিল না; সকলেই ক্ষণিকের জন্য হা হুতাশ করিয়া নিজের কাজ-কাহাল করিতে চলিল। রাত্রি শেষে বধিরাও ক্লান্তহৃদয়ে ঘরে ফিরিল। কিন্তু হায়! সে জানিত না যে, তার চিরপ্রিয় ঘরখানি পূর্ব্বরাত্রের মন্ত্রণার ফলে ভাসিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

শুভমতিয়ার মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ হইল, অন্য দিন পাড়া বেড়াইয়া বুধিয়া যখন ঘরে আসিত, তখন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলা বকুনি দিয়া তার মা নিবৃত্ত হইত। আজ কিন্তু তাহাতে তাহার কুলাইল না; বুধিয়াকে স্পষ্টই বলিল যে, সে নীরবে এতদিন অনেক সহ্য করিয়াছে, কিন্তু তার বাড় এত বাড়িয়াছে যে, এখন আর তাহা অসহনীয়। উভয়ের মঙ্গলের জন্যই সে এই মুহূর্ত্তেই গৃহত্যাগ করুক, যেখানে তাহার ইচ্ছা। আরও বলিল যে, যদি সে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আসিয়া তাহাকে ওই স্থানে দেখিতে পায়, তবে হস্তে গলা ধরিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিবে। কথাগুলি শেষ করিয়াই সে হনহন্ করিয়া নিমেষের মধ্যে দৃষ্টির বাহিরে গিয়া পড়িল। দুর্ভাগ্য বুধিয়া আকাশ, পাতাল ভাবিতে লাগিল; আর কেবল ভয়ে বুক ভাসাইয়া দিল। সে ভাবে নাই যে, তার ভাগ্যচক্র এত শীঘ্র উল্টে যাবে। কাহার যে তার জীর্ণবাসই ভাল, সে কি সুখের আস্বাদ পাইতে পারে? পাইলেও সহ্য হইবে কেন? বুধিয়া এ অসময়ে একলাটী কি করিবে, কোথা যাইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। আবার সেই কঠোর আজ্ঞা প্রতিপালনে দেরী হইলে অন্য অনর্থও আসিতে পারে। একবার ভাবিল, বাপের কাছে গিয়া দেখি তাঁহার কি অনুশাসন। তিনিই তাহাকে ধর্ম্ম শুনেন, হয়ত সমস্ত কথা শুনিলে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইতে পারে। হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে মুখরা শুভমতিয়া দ্রুতগতিতে আসিয়া তার সে কার্য্যে বাধা দিল।

এখনও যে সে বাঁশরাই বালিকা বুধিয়ার হাত ধরিয়া গৃহ হইতে বাহির দিল। সেও নিঃশব্দে বাহিরে আসিল। অনাথিনী আজ আবার নূতন কাপড় ভিখারিণীর সাজ পরিল। দুঃখভারাক্রান্ত পৃথিবীতে ইহা অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে বলিয়া কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না। বুধিয়াও ইহাতে চিরাভ্যস্ত। সংসারের সে তো কিছুই জানে না, তবুও অল্পদিন ইহার পূর্ণচন্দ্র আসিয়া তাহার মাথা টলমল করিয়া উঠিল। বালিকা সে, একাকী কোথা যাইবে? কেহ তাহাকে চিনে না। অনাহারে অনশনে, গ্রামের মধ্যেই লোকচক্ষুর অন্তরালে কয়েকদিন রহিল। তাহার পর কোথায় সে চলিয়া গেল, কেহই তাহার খোঁজ পাইল না। সেবাই তাহার অঙ্গের ভূষণ; সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিতে সে দেশ-ত্যাগী হইল।

(৫)

সমস্ত প্রহার অলক্ষ্যে বসিয়া থাকে না, এ ঘটনার পর কত মাস, কত বর্ষ অতীতের কোলে চলিয়া পড়িয়াছে। পল্লীতে বুধিয়ার নাম আর কেহ করে না; বিস্মৃতির জালে সবই ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। বুধিয়া ও শুনমতিয়া আগের পূর্ব্বের মত মনের সুখে ঘর করা করিতেছে। কিন্তু, একভাবে চির কাল চলে না; পরিণত বয়সে মানুষ দেবতার সন্ধানে ফিরে। তাদেরও তাহাই হইল। মাটি তৈরী হইলে বীজ পাইতে দেরী হয় না; আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহার স্ফুরণও সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়। যে সময়ে তাহাদের হৃদয়ে এরূপ ব্যাকুলতা আসিল, সে সময় শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা উপলক্ষে মহাধুম। নানা দেশ হইতে বহু তীর্থযাত্রী আসিয়াছে; জনকল্লোলে তীর্থভূমি নিনাদিত। হঠাৎ ওই তীর্থ দরশনে তাহাদের মন নাচিয়া উঠিল। পল্লীতে পরিণতবয়স্কের মধ্যে অনেকেই তাহাদের সহযাত্রী জুটিল। শুভদিনে শুভক্ষণে সকলে মিলিয়া যাত্রা করিল। তখন রেলে যাওয়া সুবিধা ছিল না; কাজেই গিরিকন্দর ভেদ করিয়া অনেক পথ হাঁটিয়া রেলের পথ ধরিল। তীর্থে পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হইলে ক্ষতি নাই, কারণ, সেখানে উৎসব একমাস ধরিয়া চলিবে। গেয়ো লোক, মনে বিশ্বাস ছিল যে, কষ্ট করিলে তবে কেষ্ট মিলিবে। সে কারণে পথের কষ্ট কেহই অনুভব করিল না। যথাসময়ে তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীক্ষেত্রে এত জন সমাগম বোধ হয়, কোন বৎসর হয় নাই; সকলকার স্থান সঙ্কুলান করা পাণ্ডাদের পক্ষে বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে বিসূচিকাও দেখা দিয়াছে। এসব নানা কারণে পুলিসের অনুশাসন

মত যাত্রীদের বাসের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কোনরকমে সেই সাঁওতালী দলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সুচতুর পাণ্ডারা রথন শকুনির মত অন্য যাত্রীর উপর পড়িল, তখন এক স্বেচ্ছাসেবিকা তরুণী আসিয়া তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। মেলা বসিবার কিছু আগেই সে এখানে আসিয়াছে, এবং কাহার কি অভাব, কাহার কি অভিযোগ; তাহারই তদারক করিয়া বেড়াইতেছে; সে যে কে, তাহা কেহ জানে না; তবে কেবল জানিত যে, যাহার যেখানে ব্যথা, সে সেখানেই তার কোমল হস্ত বুলায়। হৃদয়ে তার প্রেম, চক্ষে তার ভালবাসা, মুখে তার মিষ্টবুলি, উহাই অযাচিতভাবে সহস্র যাত্রীকে বিতরণ করিতেছে। কখন খায়, কখন শোয়, কেহ তাহা জানে না। হাটে, মাঠে, ঘাটে সর্ব্বদা বাতাসের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রথম যাত্রী সমাগমে সে একটু বিশ্রাম করিবার অবসর পাইত; কিন্তু বিসূচিকার প্রাদুর্ভাবে সে অবকাশ আর তার নাই। সাঁওতালী দলভুক্ত শুনমতিয়ার ভেদ বমি হইতেছে শুনিয়া সে যখন দৌড়িয়া আসিল, তখন কেহ ভাবে নাই যে, বিদেশে এত গভীর রাত্রে তাহার সেবা পাইবে। কিন্তু কর্ম্মের প্রেরণায় সে যে আজ উন্মত্ত হইয়া ঘুরিতেছে; সে বুঝে কেবল যে তার ক্ষুদ্র প্রাণের বিনিময়ে যদি আর একটি প্রাণ বাঁচাইতে পারে ত তার বহু পুণ্য সঞ্চয় হইবে। তাই শুনমতিয়ার শয্যাপার্শ্বে সে সারা রাত জাগিয়া বসিয়া আছে। কখনও ঔষধ, কখনও পথ্য, কখনও তার মিষ্ট হাতখানি রোগীর গায়ে বুলাইয়া তাহাকে সুস্থ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, রোগের বেগ যে প্রতিরোধ করে; ক্ষীণ নাড়ী আরও সুভোর ন্যায় বহিতে প্রাণপণে মাথার কাছে রুগিয়া উপবিষ্ট। আশু বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া চিন্তায় তার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছিল। সে নিজ অবিমৃষ্যকারিতারই ফল ভোগ করিতেছে বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। বোধ হয় যেখানে না আসিলে এ বিপদ ঘটিত না; তার পাতান সংসার এরূপ ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইত না। চিন্তায় অধীর হইয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। যুবতী সংসারের অনিত্যতা দেখাইয়া তাহাকে ধৈর্য্য ধরিতে বলিল; কিন্তু বাঁধ ভাঙ্গিলে জলস্রোত যেমন প্রবাহিত হয়, কথিয়ার চোখের জলও আর বাধাসাধা মানিল না। গোলমালে শুনমতিয়া চাহিয়া দেখিল; সে চাহনিতে অপরিচিতার পরিচয় মিলিল; ভাঙ্গা গলায় স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, যাহার পরিচর্য্যায় আমার প্রাণবায়ু বাহির হইবে, সে আমাদেরই পালিতা কন্যা, পরিত্যক্তা বুধিয়া। স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখুক, আজ তাহাতে আমাতে কত

প্রত্যেক। আমি নারকীর চক্ষে সে স্বর্গের কল! তার জীবন দেবতার অর্ঘ্য, আমার কেবলই ব্যর্থ-সমন্বিত সকলের পরিত্যাজ্য!" কথাগুলি শেষ করিয়াই মুহূর্ত্ত দুইহাতে বুদ্ধিয়ার গলা জড়াইয়া নিজ বক্ষের উপর টানিল, আর সেই সঙ্গে দুটিও তার চিরমুদ্রিত হইল।

—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

বন্দিনী।

—:১:—

কাশ্মীর নরপতি—
রাণীরে আনিতে বিজনকাননে নিয়ে যান গজমতি।
সঙ্গে চলিল অযুত সৈন্য করি' নানা কল-রোল,
বাজে মৃদঙ্গ ছোটে তুরঙ্গ—চৌদিকে শুধু গোল!
জয় জয় রবে ছুটিয়া সেনানী পশিল বনের মাঝে,
দূর হ'তে রাণী হেরিল রাজারে সজ্জিত বীর-সাজে।
মদন-মোহন মূরতি তাহার—হেরিয়ে ভুলিবে রাণী,
ভেবেছিল রাজা—প্রেম-গৌরবে বক্ষে লইবে টানি।

সহসা জাগিল শঙ্কা—
কুসুম-পেলব রমণী-হৃদয় শুনি' সে রাজ ডঙ্কা!
ভাবিল আজি সে হতাশ-প্রেমের শাস্তি দানিবে রাজা—
থর-থর করি' কাঁপিয়া তরাসে কহিল "দাও না সাজা!"
রাজা কহে "প্রিয়ে! তব প্রেম-আশে এসেছি তোমার পাশ";
"জিনিবে হৃদয় দেখাইয়া ভয়?"—কহে রাণী মৃদু ভাষ!
"কি যে বল তুমি প্রেয়সি আমার?—তুমি মোর আদরিণী";
—ক্রূর হাসি হেসে কহিলেন রাণী—"আমি তব বন্দিনী।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন,
"বিকাশ"-সম্পাদক।

রামচরিত্রের সমালোচক

রামচন্দ্র রাজধর্ম্ম রক্ষার্থ সীতাবর্জ্জন এবং পিতৃসত্য পালনার্থ বনগমন করিয়াছিলেন। আমরা বুঝি, এই দুই কার্য্যে তাঁহার চরিত্রের যাহাতে যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তেমন আর কিছুতেই হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের অনেক লেখক বলেন, সীতাবর্জ্জন করা রামচন্দ্রের কর্ত্তব্য হয় নাই। সীতাকে ধরিয়া লইয়া গেল রাবণ, অপরাধিনী হইলেন অকলঙ্ক-চরিত্রা সীতা, অশিক্ষিত অমার্জ্জিতরুচি ক্ষুদ্রচেতা জনসাধারণের কথায় বিচলিত হইয়া রামচন্দ্রের ন্যায় সুশিক্ষিত ধার্ম্মিক ন্যায়পরায়ণ রাজেন্দ্রসত্তমের সাধ্বী সতীকে বর্জ্জন করা কি কর্ত্তব্য হইয়াছিল? মূর্খের নিন্দায় ভ্রূক্ষেপ করে কে মিলি, তাঁহাকে কাপুরুষ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? আবার এ সকল লেখকের মতে, পিতৃসত্য পালনার্থ বনে যাওয়াও তাঁহার কর্ত্তব্য হয় নাই। কৈকেয়ী প্রভৃতি কুচক্রীর ষড়যন্ত্রসৃষ্ট দুর্ভেদ্য দুরভিসন্ধিজালে প্রবীণ বয়সে পুত্রবিচ্ছেদরূপ কল্পনাতীত অসহনীয় মনোবেদনার অতর্কিত আক্রমণে বৃদ্ধ জরাজীর্ণ পিতার প্রাণনাশের সম্পূর্ণ আশঙ্কা, এরূপ স্থলে ক্ষুদ্র প্রতিজ্ঞার মূল্য কি এতই অধিক? পুত্রের নিকটে স্নেহময় পিতার প্রাণ কি এতই তুচ্ছ? সুতরাং তাঁহাদের মতে, রামচন্দ্রের বনগমন তাঁহার দুর্বলবুদ্ধি এবং অপরিণামদর্শিতারই পরিচায়ক।[১]

এই যুক্তিতর্কহীন যুগে ঐ সকল লেখকের এই প্রকার মন্তব্য শুনিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। স্বামী স্ত্রী পরস্পর কেহ কাহারও অধীন নহেন; ইহাই যে যুগের নীতি—বলশেভিকবাদ যে নীতির চরম পরিণতি—সেই যুগে—সেই নীতির শিক্ষাদীক্ষায় যাহারা প্রভৃতির ন্যায় মহর্ষিদের উপরেও "চেক্‌কা" মারিবার প্রবৃত্তি হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অথবা

"অলোহবলোকতে দোষান্ গুণপূর্ণেষু বস্তুষু।
বনে পুষ্পফলাকীর্ণে পুরীষমিব শূকরঃ॥"

১ "কায়স্থ সমাজ"পত্রের (কার্ত্তিক, ১৩২০) "বিবেক ব্যাখ্যায়" প্রবন্ধের সমালোচনায় বর্ত্তমান প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্য রামচরিত্র সমালোচনা ইত্যাদি প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

সুতরাং এ হেন খলের মুখ বন্ধ করিবে কে?

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার চরিত্র রঘুনাথের মলিন মুখদর্শনে ব্যথিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রস্তুত অমূল্য ভাষ্যগ্রন্থ ভাগীরথীজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৩ শ্রীচৈতন্যের ভাবপ্রবণতায় (?) সেদিন ভারতের একটি উজ্জ্বল রত্ন অতল জলগর্ভে চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গিয়াছিল। আবার মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সত্যরক্ষার্থ স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন এবং প্রজাসাধারণের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছিলেন। সামান্য একটি মুখের কথার জন্য এই অনর্থপাত! এইরূপ আরও শত শত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ সকল লেখকের মত সত্য হইলে মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণও বোধ হয় অন্যায়কারী দোষী হইয়া পড়েন।

কিন্তু সত্যই কি এই সকল মহাত্মা অন্যায়কারী ও দোষী ছিলেন?—রক্তে মাংসে দোষে গুণে গঠিত এই পার্থিব মনুষ্য।—অপার্থিব আদর্শদেবতা নহে সে। সে সীমাবদ্ধ জীব, দৃষ্টিও তাই তাহার সীমাবদ্ধ। তাহার ক্ষুদ্র দৃষ্টির সাহায্যে ভবিষ্যতের কতখানি দেখিতে সমর্থ সে? কিন্তু তাই বলিয়া মনুষ্য কি কর্ম্মই করিবে না? তাই গীতা বলেন, অনাসক্তবুদ্ধিতে কার্য্য করিবে। ফল ভাল কি মন্দ হইবে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। দেখা সম্ভবপরও নহে। যে কার্য্য করিবে, তাহা স্বার্থবুদ্ধিশূন্য বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া যাহাতে করিতে পার, শুধু তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। ফলতঃ কর্ম্ম ভাল কি মন্দ, তাহা বিচার করিবার মাপকাঠি কর্ম্মের ফল নহে, উহার মাপকাঠি ত্যাগ। স্বার্থ কে না চাহে? পিতার প্রাণ তুচ্ছ কথা, স্বর্গও স্বার্থের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। অন্তর্দর্শী রামচন্দ্রও মানবমনের এই স্বার্থপ্রবণতার কথা বুঝিতেন। সকলের প্রিয় ছিলেন তিনি। প্রজারা তাঁহাকে নিকটে পাইলে ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে পাছে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে, এরূপ আশঙ্কাও যে তাঁহার ছিল না, এমন নহে। রাজ্যের প্রধান অমাত্যগণ হইতে প্রজা সাধারণ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই তাঁহার স্বপক্ষে ছিলেন।—এমন কি লক্ষ্মণ পর্য্যন্ত দশরথ কৈকেয়ী প্রভৃতির প্রতি একান্ত বিরক্তি বশতঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলে রাজ্যপ্রাপ্তিবিষয়ে তাঁহার কোন বাধাই তখন উপস্থিত হইত না। ফলতঃ তখন এক অনর্থপাত হইবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ত্যাগী রামচন্দ্রের তাহা অভিপ্রেতও ছিল না। আর সেরূপ হইলে দশরথের কথাও রক্ষা হয় না। কৈকেয়ীর প্রার্থনানুসারে ভরত রাজা হউক; এইরূপে

যাইলেই দশরথ প্রতিজ্ঞা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। এরূপভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আর 'পাছে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ' একই কথা। সুতরাং যতক্ষণ ভরতের রাজসিংহাসন নিরঙ্কুশ না হইতেছে, ততক্ষণ দশরথের প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তি নাই, দূরদর্শী রামচন্দ্রকে একথাও ভাবিতে হইয়াছিল। তাহার পর কৈকেয়ী তাঁহার দুরভিসন্ধির জাল বিস্তার করতঃ যতই ষড়যন্ত্র করুক, তাঁহার পিতা যে তাঁহাকে অভীপ্সিত প্রদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অন্যে আমার প্রতিশ্রুতির সুযোগ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিতেছে বলিয়া আমি যদি আমার প্রতিশ্রুতি অন্ন বিস্তর রা রা সমাক্ "নড়চড়" করিয়া বসি, তাহা হইলে কি তাহা সাধুনীতির অনুমোদিত হইবে? Tit for tat. ঐ নীতি সাধারণ জনের যোগ্য। Whoever smith thee on thy right cheek, turn to him theh oter also, ইহাই মহাজনের যোগ্যনীতি। পিতার প্রাণ অপেক্ষাও তাঁহার সত্যই অধিকতর মূল্যবান্। পিতার সেই সত্যরক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করাও পুত্রের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে, পিতার কি দশা হইবে, এ কথা ভাবিবার অবসর তাঁহার হয় নাই, হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। তিনি বনে না গেলে দশরথ নাও মরিতে পারিতেন। অন্ততঃ তাঁহাকে পিতার মৃত্যু কারণ হইতে হইত না, এ সকল কথা সত্য। কিন্তু তিনি অযোধ্যায় থাকিলে ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে যদি একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে তাঁহার পিতার পক্ষে তাহা কি মঙ্গলজনক হইত? ফলতঃ রামচন্দ্র বনগমন করিয়া পিতার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পক্ষান্তরে তিনি পিতাকে অবশঃ ও অধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, রাজ্যের রাজা প্রজা প্রভৃতি অসংখ্য লোকের বিপ্লবের আশঙ্কা নিরাকৃত করিয়াছিলেন, কৈকেয়ী প্রভৃতি শত্রু-পক্ষীয়দিগকেও পরে আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের কারণ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে দেন নাই। সর্ব্বোপরি তাঁহার সমুজ্জ্বল নির্ম্মল বিবেকের নিকট আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার পিতৃ সত্যরক্ষার্থ বন গমন তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির যথাযোগ্য কর্ম্মই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার উপমা তিনিই। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে দিয়াই বুঝিতে হইবে। তাঁহার উপমান নাই, তিনিই সকলের উপমান।

এইরূপ রামচন্দ্রের সীতাবর্জ্জনও তাঁহার বীর হৃদয়েরই উপযুক্ত। সীতা তাঁহার সুখের সামগ্রী। সীতার মিলনের প্রয়াসী তাঁহার দেহমন

প্রতি-অণুপরমাণু। বুকের ধন বুকের মাঝে লুকাইয়া রাখিতে যে না চায়, রাজ্যে ধিক্, ঐশ্বর্য্যে ধিক্। তাঁহার প্রাণ চাহিতেছিল, সীতাকে লইয়া তিনি বনে চলিয়া যান। সীতাসহ বনবাস তাঁহার স্বর্গবাস, আর সীতা ছাড়া স্বর্গবাস তাঁহারি সর্ব্বনাশ। যাঁহার মাঝে কণ্ঠের হারের ব্যবধানটুকুও সহে নাই, তাঁহারই মাঝে সরিৎসাগরের ব্যবধান, এ কি প্রাণ থাকিতে সহিবার কথা? পত্নীগতপ্রাণ আদর্শ স্বামীর প্রাণের ব্যথা যে কত নিদারুণ, তাহা সহৃদয় ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে? আবার এই অনন্ত বিশ্বের কেন্দ্রই "আমি।" স্ত্রীপুত্রাদি বল, এ জগতে আমার আমিত্বের মতন প্রিয় আর কিছুই নাই। স্ত্রী পুত্রাদি সেই আমারই সুখের হেতু বলিয়াই তাহারা আমার আদরের। সেই আমারই সুখ এবং সুখের বস্তু পরিত্যাগ করা কি এতই সহজ? আত্ম বলিদান কি সুখের কথা? এই আত্ম-বলিদানে সমর্থ ছিলেন বলিয়াই তিনি সীতা বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম যাহাদের নাই, তাঁহারা তাঁহার এই ত্যাগের মাহাত্ম্য কি বুঝিবেন?

যাহা হউক, এ সকলই হইল রামচন্দ্রের দিকের কথা। কিন্তু সীতার দিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিবার কি কিছুই নাই? মহামনা তিনি, আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারেন। কিন্তু সীতাকে কেন দুঃখ দিলেন তিনি? অবশ্য ঐ সকল লেখক বলিতে চাহেন, ত্যাগ উত্তম জিনিস, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই ত্যাগ যদি অন্যের দুঃখের কারণ হয়, তবে তাহার সার্থকতা কোথায়? কিন্তু জগতে কে কবে সকলকে সুখী করিতে পারিয়াছেন। To please every body is to please no body। জগতে এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা সকল অবস্থাতেই সর্ব্বতোভাবে সকলেরই সুখকর হইতে পারে। চৈতন্য তাঁহার সংসার ত্যজিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের এরূপ আচরণে তাঁহাদের পরিজনেরা কি দুঃখ পান নাই? যীশুর নবধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া তাঁহার শিষ্যদের কি লাঞ্ছনার একশেষ হয় নাই? সামান্য লোকের কথাই নাই, যাঁহারা বরেণ্য মহাপুরুষ যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও কোনও না কোনও ভাবে কাহাকেও কাহারও দুঃখের কারণ হইতে হইয়াছে। কিন্তু সে জন্য তাঁহাদিগকে দোষী করা যায় না, কারণ তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা স্বার্থবুদ্ধিশূন্য হইয়াই করিয়াছেন। আবার কোটি কোটি নরনারীর সুখের পথও তাঁহারাই মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও, প্রজাদিগকে সুখী করিতে হইলে সীতাকে দুঃখী করিতে হয় এবং সীতাকে সুখী করিতে হইলে প্রজাদিগকে দুঃখী করিতে হয়।

এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন স্বার্থবুদ্ধিলেশশূন্য মহাপুরুষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, প্রজাদের মনস্তুষ্টি সাধন করাই তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য। সীতা তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী, হৃদয়ের অর্দ্ধভাগিনী, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন,—বুঝিতে পারিবেন, কি কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় পড়িয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছেন,—বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়া তিনি আপনার অর্দ্ধাঙ্গকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়াছেন,—ভালবাসিয়া যে বর্জ্জন, তাহাই প্রকৃত গ্রহণ, সুতরাং তিনি তাহাকে বর্জ্জন করেন নাই, করিয়াছেন তাঁহাকে প্রকৃত গ্রহণ। সীতাবর্জ্জনে রামচন্দ্রের রাজধর্ম্মই শুধু রক্ষা পায় নাই, পরন্তু তাঁহার পতিধর্ম্মও অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে, তিনি সীতাকে বনবাস দেন নাই, আপনাকেই সীতার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের এ সকল কথা সীতা অবশ্যই বুঝিবেন। মূর্খ বর্হিমুর্খ প্রজারা কি তাঁহাকে এমন করিয়া বুঝিতে পারিবেন? রাজা প্রজার বাহ্য সম্বন্ধ, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ আন্তরিক। পত্নীর প্রতি তাঁহার এতখানি বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি সকলকে সুখী করিয়া নিজে কাঁদিয়া তাঁহাকেও কাঁদাইয়াছিলেন। ভিন্ন তাঁহার অন্য উপায় ছিল বটে, সীতাকে লইয়া বনে চলিয়া যাওয়া এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার প্রাণও তাহাই চাহিতেছিল। কিন্তু তিনি যে প্রলোভন জয় করিয়াছিলেন। যিনি পিতৃ সত্য পালনার্থ করামলকবৎ সাম্রাজ্যকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন, তিনিই যে আবার সীতাহারা অভিশপ্ত জীবনকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, সেই তুচ্ছ সাম্রাজ্যেরই লোভে, একথা কদাপি বিশ্বাস্য নহে। একদিন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল একদিকে রাজ্য, অন্যদিকে পিতৃসত্য। এই দুইটির মধ্যে সাধারণের বাঞ্ছনীয় কি তাহা বলাই অনুমেয়। কিন্তু অসাধারণ তিনি সামান্য জনের ঈপ্সিত রাজ্যকে তুচ্ছ করিয়া পিতৃ সত্যকেই বড় মনে করিয়াছিলেন। আর সেবার তাঁহার সম্মুখে ছিল, একদিকে রাজধর্ম্ম, অন্যদিকে পতিধর্ম্ম। পতির পক্ষে পত্নীকে ভালবাসা যতদূর স্বাভাবিক, রাজার পক্ষে প্রজাদিগকে ভালবাসা ততদূর স্বাভাবিক নহে। আবার পত্নীও যেমন তেমন পত্নী নহেন, সতীসাধ্বী নিষ্কলঙ্কচরিত্রা সর্ব্বগুণবতী একান্তপতিব্রতা আর প্রজারা কুৎসাকারী বুদ্ধি মূর্খের দল। সুতরাং এরূপ স্থলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসামান্যতারই পরিচায়ক। অনুকূল প্রশান্ত ভাসিয়া যাইতে পারে সকলেই; কিন্তু উজান স্রোতে যিনি সাঁতার দিয়া যাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ বলবান্। ফলতঃ তিনি যদি রাজ্যভার

পরিত্যাগ করিয়া সীতাকে লইয়া বনে চলিয়া যাইতেন, তবে তাহাই তাঁহার পক্ষে ভীরুতা ও নিন্দার কার্য্য হইত। সুতরাং তিনি সে পন্থা অবলম্বন করেন নাই। আবার সীতা নিরপরাধিনী, প্রজারাই দোষী। কিন্তু তথাপি তিনি প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করিতেই বাধ্য হইয়াছিলেন। অন্যায় যে প্রজাদেরই, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু অন্যায়ের প্রতীকারের উপায় দুইটি, সাক্ষাৎ প্রতিরোধ (active resistance) ও পরোক্ষ প্রতিরোধ (passive resistance)। পুত্র অন্যায় করিয়াছে; সুতরাং পিতা তাহাকে ধরিয়া মারিয়া ধরিয়া শিক্ষা দিতে পারেন, আবার তাহাকে প্রত্যক্ষ কিছু না বলিয়া নিজেকে এমনভাবে চালিত করিতে পারেন, যাহাতে পুত্র অতি সহজেই আপনার অন্যায় বুঝিতে পারে। এই যে দ্বিতীয় পন্থা, ইহাই সাধুজনোচিত। এই নিরুপদ্রব পন্থা অবলম্বন করিলে অন্যায়ের যেমন নীরবে এবং সহজে উৎকৃষ্ট প্রতীকার হইতে পারে, সহস্র প্রত্যক্ষ প্রতিরোধেও তেমন হইতে পারে না। প্রথম পন্থা পরনিগ্রহ ও স্বার্থমূলক এবং দ্বিতীয়টি আত্মনিগ্রহ ও ত্যাগমূলক। রামচন্দ্রও তাই সজ্জনানুমত দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রজাদেরও সন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং তাঁহাদের ত্যাগের মাহাত্ম্যদর্শনে সীতা ও তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে প্রজাদের মতের পরিবর্ত্তন হইবারও আশা ছিল। সুতরাং এ কার্য্য তাঁহার সাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। এই নরজগতে যত কিছু অনর্থপাত হইয়াছে, মূর্খের মূর্খতাই তাহার অন্যতম কারণ। মূর্খ প্রজারা অসন্তুষ্ট হইতে পারিত, কালক্রমে অযোধ্যাতেও এক লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করা কি রামচন্দ্রের পক্ষে অসঙ্গত হইয়াছিল? রাষ্ট্রবিপ্লব বড় সহজ অনর্থপাত নহে। সুতরাং যেখানে অনেকের দুঃখের সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে স্থানে দুইটি প্রাণীর (সীতা ও রামচন্দ্রের) আত্মবলিদান কি গর্হিত হইয়াছিল? মূর্খের মূর্খতার জন্য কত মহাত্মাই যুগে যুগে আত্মবলি দিয়াছেন। রামচন্দ্রও তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহাই শুধু তাঁহার দোষ? সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি যে প্রকৃত সাহসীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফলতঃ মহর্ষি কবি বাল্মীকি রামচরিত্রে রক্তমাংসময় পার্থিব নর-দেবতার চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন, অবাস্তব কল্পিত কোন দেবতাকে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পান নাই। "খোদার উপর খোদ্দারি করিতে" যাঁহারা যে সকল বাল্মীকির সমালোচক, তাঁহারা যেন আদি কবির এই বস্তুতন্ত্রতার কথা ভুলিয়া না যান।

শ্রীরাখালদাস।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

—:০:—

(শাগরেদী)

প্রবাসী-ভাদ্র—কেবল গল্প আর অনুবাদ। ইংরাজী কেতাব হইতে, ইংরাজী হইতে, ইংরাজী মাসিক হইতে, ছোট ছোট নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়া প্রবাসী এখন ব্যবসায় চালাইতেছে। তাহাতেও আবার দুই দোকানে একই মাল চলিতেছে। 'ভারত বর্ষে' বিনা কুমার সরকারের 'ফরাসীদেশের মুসাফির' প্রবাসীতে ঐ লেখকেরই "প্যারিসে একশত"। ইংরাজী কাগজের কাটিং এবং ছবিতেও ভাদ্রের ভারতবর্ষে ও প্রবাসীতে অসাধারণ সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে, যেন দুই সম্পাদক একত্র কাঁচি আর গদের শিশি লইয়া বসিয়াছেন। গল্প ছাড়া আজ কাল আর কাগজ চলে না, সাহিত্যেও বণিকবৃত্তি চলিতেছে। প্রবাসীর মলাট হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই বণিকবৃত্তির পরিচয়। মলাটের উপর বড় বড় অক্ষরে সীতা দেবী শান্তাদেবীর গল্প বই ও রামানন্দের বর্ণপরিচয়ের বিজ্ঞাপন। গল্পগুলির অধিকাংশই অপাঠ্য। এ হিসাবে ভাদ্রের ভারতবর্ষ প্রবাসী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ভাদ্রসংখ্যা প্রবাসীতে পাঠের যোগ্য প্রবন্ধ মাত্র একটি—অমূল্য চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণের বাঙ্গালার ইতিহাস। বৈদিক প্রবন্ধও গুটি দুই আছে। একটি বেদের ঘুমপাড়ানো গান, বোধ হয় পাঠকদিগকে ঘুম পাড়াইবার জন্য সেটির স্থান দেওয়া হইয়াছে। আর একটির লেখক অবিনাশচন্দ্র দাস। ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সুস্থ মস্তিষ্কে হয় না। বিবিধ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আছে। রামানন্দের সমালোচনার ভয়েই নাকি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানমন্দির নির্ম্মাণে তৎপর হইয়াছেন। সূর্য্যের আত্মতৃপ্তি ও দম্ভের সারল্য হাস্যোদ্রেক করে। সম্পাদক মহাশয়ের নিতান্তই দুঃখ হইবাছে, খয়রার কুমারের দানে বিশ্ববিদ্যালয় কেন গ্রহণ করিলেন! খয়রার কুমার—ভয়ানক ভুল করিয়াছেন! রামা আশুতোষকে বিশ্বাস না করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের কাহারও হাতে টাকাটা দিয়া গেলে ভাল হইত। কিন্তু কুমারের বোধ হয় এখন পরলোকে পশ্চাত্তাপ হইয়াছে এবং প্লান চেটেই হউক বা স্বপ্নযোগেই হউক,—তিনি রামানন্দ চট্টো-

নকট অনুশোচনা জ্ঞাপন করিয়াছেন কি

সচিত্র প্রবন্ধে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র চারিটি তরুণ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের বৈদেশিক

খ্যাতির সংবাদ দিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিকচতুষ্টয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং তাহাদের কেহ কেহ বিদ্যালয়ের ব্যয়ে বিদেশে গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের কৃতিত্বের গৌরবটুকু সব মহাশয় একাই আত্মসাৎ করিয়াছেন, প্রেসিডেন্সী কলেজকেও কণা ও কি হইতে বঞ্চিত করেন নাই; কেবল বিশ্ববিদ্যালয় বাদ পড়িয়াছে। এ নিরপেক্ষ মাসিক পত্র, আর রায় মহাশয়ও নিরক্ষ-হালাল অধ্যাপক!

মানসী ও মর্ম্মবাণী—ভাদ্র—জ্ঞানদেবীর আবাহনে কবি কলম গ্রাহিতেছেন—

এখনো পল্লীবাটে জাড্য মূঢ়তা শীত
জর্জ্জর নিশাতমঃপুঞ্জ,
এখনো ঝিল্লীরত শাখে শাখে শুষ্কমুখ,
জাগ্রত নহে পিককুঞ্জ।

এ হেন চমৎকার কবিতা প্রবাসীর হাতছাড়া হইয়া মানসীতে আসিল কেন? আমাদের নৈতিক স্বাস্থ্য—সুচিন্তিত ও সুলিখিত সমালোচনার শিক্ষক ও অভিভাবকদিগের পাঠ করা উচিত। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর বিধবার একাদশীতে অনুকল্প ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাস্ত্র হইতে বিস্তর বহুল প্রমাণ সহযোগে তিনি অকাট্য যুক্তি দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি। 'সোণার চিত্ত' গল্পটি এই মাসে আরম্ভ হইল। দেশ ভ্রমণ সম্পর্কিত তিনটি প্রবন্ধই চমৎকার তিনটিই সুখপাঠ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক বোধ হয় এইবার শেষ হইল রামানন্দ দীর্ঘ পত্রে বহু ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়াছেন, এবং কায়দা মাফিক অনুশোচনাও প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি কোমর ছাড়েন নাই;—though banquished he will yet stin! অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ রামানন্দের স্বহস্তলিখিত পত্র বাহির তাহার প্রতারণা ধরিয়া দিয়াছেন। রমাপ্রসাদ চন্দও তাহার প্রতারণা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। শুনিতেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রতিবাদ প্রবাসীতে ছাপা হইত না অথচ প্রবাসীসম্পাদক দম্ভ করিয়া লিখে যে তাঁহার কথা খাঁটি, তাই তাঁহার প্রতিবাদ হয় নাই। মানসীর মর্ম্ম উভয় পক্ষের জোবানবন্দিই শুনিতেছেন। এইবার দেখা যাইবে কে সত্যনিষ্ঠ, রমাপ্রসাদ কি রামানন্দ!

ভারতবর্ষ—ভাদ্র। প্রবাসীর সম্পর্কেই—আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। গল্পের ঝুড়ি কমাইয়া প্রকৃত তথ্য জিজ্ঞাসুর মানসিক খাদ্যের অধিক জোগান দিতে না পারিলে দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শ—অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। আমাদের মনে হয়—প্রবাসীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাইয়া ভারতবর্ষ সেই লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারে নাই। প্রবাসীর একমাত্র লক্ষ্য সম্পাদকের নানা পাণ্ডি সংগ্রহ। বর্ষ প্রারম্ভে প্রবাসীসম্পাদক বিবিধ প্রসঙ্গে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তাহা স্বীকারও করিয়াছেন। অবশ্য একটা সান্ত্বনা হাতে থাকিলে সময় সময় ব্যক্তিগত বৈরনির্য্যাতনের সুবিধাও পাওয়া যায়। আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের ভক্ত ও অনুরাগী। সুতরাং জলধর ভায়াকে স্মরণ করি, প্রবাসীর ব্যবসায়বুদ্ধির অনুকরণ যেন তিনি করেন না। তিনি হিমালয়ে গিয়াও যখন নিজেকে প্রবাসী মনে করেন নাই, তখন লেকচারে থাকিয়া আর প্রবাসী হইবেন কেন?

অনুভূতি।

হয়ে কি প্রতিভু তুমি বিশ্ব-প্রসবিনী
দিয়েছিলে দেখা দেবী, কৈশোরে আমায়,
জানাতে নারীর হৃদি কেমন গভীর
কেমন অতলস্পর্শ মহাপারাবার!
অতুলন স্নেহ-প্রেম-করুণা-সুধায়
মোর প্রাণে খুলে দিলে ত্রিদিব-দুয়ার,—
হেরিনু কি মাধুরিমা সকল হিয়ায়,
লভিনু কি অমরতা মরত মাঝার!
তোমারে বাসিয়ে ভাল প্রথম জীবনে
পুজিয়ে ভকতি-ফুলে ও রাঙ্গা চরণ,
শিখিয়াছি ভক্তি-প্রেমে বিশ্ব-নারীগণে
কেমনে করিতে হয় অর্ঘ্য-নিবেদন!
বসুন্ধরা পূর্ণ আজি তোমারি ছায়ায়
বিশ্বময় তোমায় হেরি সবাতে তোমায়!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বৈঠকী।

"এ সংসার নাট্যশালা,
কেহ কারো নয়।
একদল আসে যায়,
একদল যায়॥"

শ্রীভগবানের নাট্যশালা এই জগৎ সংসারে কি ভয়ানক ও শোকসন্তাপ বিয়োগাত্মক নাটক এখন অভিনীত হইতেছে; তাহা বলা করিতেছ কি? এরূপ সর্ব্বব্যাপক উচ্ছেদের অভিনয় গত পাঁচশত বর্ষের মধ্যে এশিয়া এবং ইয়োরোপে ঘটিয়াছিল কি-না বলা যায় না।

ইহার পূর্ব্বে বহুবার পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া বিধাতা নূতন কিছু গড়িবার আয়োজন করিয়াছেন, তত্তবার ভাঙ্গার মুখে গড়নের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নবীন শোভাময় হইয়া জীর্ণ-পুরাতনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, আর সেই মুহূর্ত্তে বিভায় পুরাতন যেন প্রাতঃকালের কুজ্ঝটিকার তুল্য বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্মের অপচয় ঘটাইতে শাক্যসিংহের অবতার গ্রহণ; বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার ও সঙ্কোচ ঘটাইতে যীশুখৃষ্টের জন্ম, শেষে হজরত মহম্মদের উদ্ভব হরাম্বট পিটার হইতে চার্লস মার্টেল ও মার্টিনলুথার পর্য্যন্ত খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক ইস্লামধর্ম্ম ও সভ্যতাকে ইয়োরোপ হইতে দূরে রাখিতে পারিয়াছিলেন; চারি শতাব্দীর চেষ্টার ফলে এ কার্য্য সিদ্ধ হয়।

তাহার পর রাজনীতিক ও সামাজিক বিপ্লবে আগে নূতন গজাইয়া উঠিয়াছে, পরে পুরাতন অপসারিত হইয়াছে। রুসো, ভল্টেয়ার, ডিডেরো নূতনকে অবগুণ্ঠনমুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন, তবে পুরাতন গিয়াছে, ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়াছে। সেই ফরাসীবিপ্লবের ধ্বংসবাদের ধারা এতদিন অব্যাহতভাবে ইয়োরোপে চলিয়া আসিতেছিল। ফরাসীবিপ্লবের শিক্ষার প্রভাবে ইয়োরোপ ক্রমে ক্রমে খৃষ্টানধর্ম্ম-বর্জ্জিত হইল, ধর্ম্মশূন্য সমাজ মিলিল হইল, সাম্যবাদের মূল-বাদে মুগ্ধ হইল, অন্ধ জড়বাদের উপাসনায় প্রমত্ত হইল, ফলে মিটফেলের ও

ক্রুজটইচের বর্ত্তমান জর্ম্মণ জাতির উদ্ভব, সামাজিক শক্তির অতিমাত্রায় বিকাশ এবং পরিণামে যাদবগণের মত স্বকৃত সাম্বাস্থি মুষল ঘর্ষণের হেতু ইয়োরোপে প্রত্যেক জাতি সকলের মধ্যে অতি ঘোর আত্মদ্রোহ এবং সর্ব্বনাশ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে যদুবংশ-ধ্বংসের পরে ভারতবর্ষের যে দশা ঘটিয়াছিল, ইয়োরোপের সেই দশা—বুঝিবা তাহা অপেক্ষা হীনতর দশা ঘটিবার উপক্রম হইতেছে।

* * * *

ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, ইউরোপের শ্রীকৃষ্ণ কৈ? ভারতবাসী কোন কালে, কোন যুগে পরকালের চিন্তা ছাড়ে নাই; ইয়োরোপের যে একেবারেই পরকালের চিন্তা ঘুচিয়া গিয়াছে। রুষের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ দেখি রুষ কোন্ ভাবের ভাবুক হইয়া এমন আত্মহত্যা করিল? অমন জগৎজোড়া রাজ্য, তাহাকে হেলায় প্রদাঘাতে চূর্ণ করিল, অমন সংহতিসম্পন্ন প্রবল সমাজকে ধূলিসাৎ করিল—কিসের লোভে? সে নবীন ত নাই, পুরাতনের উচ্ছেদসাধক নূতন ত নাই। রুষে কেবলই ধ্বংসলীলা চলিতেছে, কেবলই রুদ্রশক্তির খেলা চলিতেছে। মা আমার ছিন্নমস্তা রূপে, শ্মশানকালীরূপে রুষের বক্ষের উপরে কেবল তাথেই তাথেই রবে নর্ত্তন করিতেছেন। মায়ের বৈষ্ণবী শক্তির লেশ-মাত্রও রুষে বিকশিত নহে। রুষ এখন মহাশ্মশানে পরিণত, মহারণের উৎক্ষেপ-রূপে, মহামারীর পেষণে ও বর্ষণে, মহার্ঘের শোষণে ও নিপীড়নে রুষ এখন মহাশ্মশান। পুরুষাকার শবরূপে অসাড় নিষ্পন্দ ভাবে পড়িয়া আছে, তাহার উপরে উন্মাদশক্তি—জড় শক্তি-বোলশেভী মতবাদের আকারে বিপরীত রঙ্গে নাচিতেছে; আর সর্ব্বোপরি মহামায়া—মহামেধা—মোহরাত্রি—কালরাত্রি এ দারুণা দিগম্বরী—ভয়ঙ্করীরূপে ধ্বংসের লীলা বিয়োগান্তক ধ্বংসাভিনয়ের খেলা প্রকটন করিতেছেন। একবার দেখ, বীনের ন্যায় নির্নিমেষনয়ন হইয়া বাঙ্গালী একবার দেখ, ঐ দূরে, সুমেরুক্রোড়ে মায়ের কেমন বিভীষণ ভাবরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

* * * *

রুষের এই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, এই উৎকটভাবের ছায়া জর্ম্মণী, অষ্ট্রীয়া এবং ইতালীতে যেন ছড়াইয়া পড়িতেছে;—কালাভ্রের ছায়া ক্রমে যেন বিস্তারিত হইতেছে। যেটুকু বৈষ্ণবী ভাব এই সকল দেশে এখনও বিদ্যমান, তাহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য, সব ওলট-পালট করিবার জন্য যেন শ্মশানকালীর শোণিতস্রাবী লেলিহান জিহ্বা লকলক করিয়া সম্প্রসারিত হইতেছে। জর্ম্মণীর মূঢ় সামরিক শক্তি—মুষল পর্ব্বের মুষল অধিশ সকল এখনও লবিলীন হয় নাই। যতদিন

তাহা না ঘটে, ততদিন ভবিষ্যের বেদী ইয়োরোপে অক্ষুণ্ণভাবে চলিবেই। ইয়োরোপে নূতন নাই, কেবলই পুরাতনের ধ্বংস চলিতেছে। মহানিশার নাচি বোধ বিভীষিকা চলিতেছে! যতদিন ইয়োরোপ শবে পরিণত না হয়, ইয়োরোপের শ্মশানে নরশিবার অট্ট অট্ট হাসে—খট্ট খট্ট ভাষে পূর্ণ না হয়, ততদিন মনে হয় নরমাধক ইয়োরোপে দেখা দিবেন না, ভগবানের কোটাল জাগিয়া আসনে বসিবেন না। এইটুকু ভাবিয়া বুঝিবার বিষয়!

* * * * *

কথাই ইহাই! ইয়োরোপে নবীনতার ঊষারাগ দেখা দেয় নাই, নূতন আদর্শের আকর্ষণ নাই; আছে কেবল বিয়োগ—নাশ—উচ্ছেদ। এমন ধ্বংসলীলা ইদানীং সভ্যজগতে ঘটে নাই; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে এমন ভাবে মানুষে মেপে নাই! এখনও যদুবংশ ধ্বংসের লীলা ইয়োরোপে হইবে। আবার যুদ্ধ হইবে, আবার শ্বেতাঙ্গ জাতি সকল আত্মদোহে উন্মত্ত হইবে কেন না এখনও চাতুরী, ডিপ্লমাসি (Diplomacy), সেয়ানায় সেয়ানে কোলাকুলি, মিথ্যা, বঞ্চনা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ পুরামাত্রায় ইয়োরোপে বিরাজ করিতেছে। এ সকলই ধ্বংসের ও উচ্ছেদের সহায়ক। চালবাজীতে জাতি-সৃষ্টি ঘটে না, জাতিরক্ষা সম্ভবপর হয় না। ধর্মই মনুষ্য সমাজের একমাত্র রক্ষাকবচ। ধর্মের গ্লানি ঘটিলেই সমাজের গাঢ়বন্ধ নষ্ট হয়। ইয়োরোপে ধর্মের গ্লানিই শুধু ঘটে নাই, ধর্মের অভাব ঘটিয়াছে। তাই Christendom খৃষ্টান প্রতিষ্ঠানের মূলোচ্ছেদ সম্ভবপর হইয়াছে। এ কথা আমরাই বলিতেছি না, ইয়োরোপের চিন্তাশীল এবং ভাবুক দূরদর্শী পণ্ডিত মাত্রেই বলিতেছেন।

* * * * *

আমাদের ভারতবর্ষে ইয়োরোপ যতটুকু আসন পাতিয়া বসিয়াছে, ততটুকু ধ্বংসের জ্বালা প্রকট হইতেছে। যেখানে ইয়োরোপ নাই, সেখানে কোন বালাই নাই; যাহারা ইয়োরোপের সভ্যতার ছায়ায় আশ্রয় লইতে অগ্রসর হইয়াছে, বা ছায়াসীন হইয়া আছে, তাহারাই মরিতেছে। জনন-মরণ-ময় সংসারে যাহার উৎপত্তি ঘটিবে, তাহারই নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। ইয়োপীয় সভ্যতা এত দিন জগজ্জন-কুক্ষিগা এখন চিতার উপরে চড়িয়াছে! যাহারা এই সভ্যতাকে ধরিয়া আছে, তাহাদেরই নাহ-জ্বালা হইবেই—হইতেছে।

পরন্তু এখন কেহ বিশ্বাস করিবে না, পরে তেমন ব্যাখ্যাতা আসিলে বুঝিবে যে, এই গতাগতিপূর্ণ সংসারে স্থিতি যদি চাও, মহাকালীর মহাশ্মশানে স্বীয় বিশিষ্টতাসমেত হইয়া যদি চিরজীবী থাকিতে চাও, তবে সনাতন ভারতীয় ধর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ্য শাসনের ন্যগ্রোধ ছায়ার আশ্রয় লইতেই হইবে। এমন ভীমা ভৈরবরূপা শ্মশানকালীর—ভীষণা ছিন্নমস্তার আরাধনা করিয়া শবসাধনা করিতে ভারতবাসীই জানে এবং পারে। সেই কথাটাই বলিবার জন্য এত কথার আবৃত্তি করিলাম।

উপাসনা ও সাধনা।

বহির্দেবের পূজা ও বন্দনার নামই উপাসনা। আমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক্ অধিকতর প্রতাপশালী সমধিক গুণসম্পন্ন পুরুষকে আমার অনুকূল করিবার উদ্দেশ্যে যে স্তবস্তুতি, বন্দনা-গীতি, তাহারই নাম উপাসনা। বহিস্থিত বা আত্মস্থ গুপ্ত শক্তির উন্মেষ বা উদ্রেকের চেষ্টায় যাহা কিছু করিতে হয়, তাহাকেই বলে সাধনা। তুমি প্রবল, তুমিই আমার সম্বল, আমি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তোমার আনুকূল্য যাচ্ঞা করিতেছি, তোমার শরণাগত হইতেছি;—ইহাই হইল উপাসনার মূলমন্ত্র। উপাসনা একক করা যায়, আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সংসদে সম্মিলিত থাকিয়া করা চলে। পক্ষান্তরে সাধনা একাই করিতে হয়; বহিঃশক্তিকে আত্মাধীন করিবার চেষ্টায় কখন-কখন সহচর অনুচরের প্রয়োজন হইতে পারে; পরন্তু আত্মশক্তির উন্মেষ-কার্য্যে বা আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়ে একাকীই সাধনা করিতে হয়। সঙ্ঘের বা সংসদের উপস্থিতি এমন সাধনায় বিঘ্নজনক বিবেচিত হইয়াছে।

বেদে উপাসনাই আছে। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি বাহ্যশক্তির উপাসনা আছে। বেদের উপাসনা যাগ-যজ্ঞাদি সংসদ-সম্বল—Communial,—অর্থাৎ বহুজনের সাহায্য করিতে হয়। পক্ষান্তরে তন্ত্রে কেবল সাধনা,—কেবল সাধনাই আছে। ভক্ত গান করিয়াছেন—"তুমি দেখ, আর আমি দেখি, মন যেন কেউ না দেখে।" তাই তন্ত্র বার বার বলিয়াছেন,—

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥"

হাতের কৌস্তুভ মণি হারাইয়া কাচখণ্ডের অন্বেষণে যে ব্যক্তি ব্যস্ত হয়, তাহার ব্যস্ততা ও অন্বেষণপ্রয়াস যেমন মূর্খতার পরিচায়ক, তেমনি আত্মস্থ—দেহস্থ দেবতাকে অবহেলা করিয়া যিনি বহির্দেবের উপাসনা করেন, তিনিও তেমনই মূর্খতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

তন্ত্র বহির্দেবতার অস্তিত্ব একেবারেই স্বীকার করেন না। তাঁর আছে ব্রহ্মাণ্ড, তাহাই আছে দেহভাণ্ডে—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে"—

ইহাই তন্ত্রের আর একটা মহাবাক্য। যখন এই দেহভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার, তখন দেবতার অন্বেষণে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া মরি কেন? যে দেবতা ব্রহ্মাণ্ডকে সঞ্জীবিত ও সচল রাখিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডকে অসংখ্য জীবদেহে পূর্ণ রাখিয়াছেন, সেই দেবতা আমার দেহভাণ্ডে বিদ্যমান। দেহভাণ্ড আমার আয়ত্তে আছে, ইচ্ছা করিলেই দেহস্থ দেবতার সমাচার পাওয়া যায়, এমন অবস্থায় বহির্দেবের অন্বেষণে ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া মরি কেন? ইহাই তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তন্ত্রে উপাসনা নাই, সাধনাই আছে। রামপ্রসাদ, দাশুরায় মহাশয়, কমলাকান্ত-প্রমুখ তান্ত্রিক ভক্ত সাধকগণের প্রায় সকল গানই তন্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের অনুবাদ-মাত্র; প্রত্যেক গানের প্রত্যেক পদের অনুরূপ বচন তন্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। এমন কি বিলুপ্তপ্রায় তান্ত্রিকী উপনিষদের অনেক উক্তি বাঙ্গালার শ্যামাবিষয়ক গানে রচিয়িতা সকলে সাধারণ গানে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তন্ত্র Communal Religion বা সঙ্ঘগত ধর্ম্মের প্রচারক নহে; তন্ত্র ব্যক্তিগত সাধারণ কথা লইয়াই ব্যস্ত। তন্ত্র দেহতত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন।

বেদ উপাসনা ছাড়িয়া সাধনার দিকে যে একেবারেই অগ্রসর হন নাই, তাহা নহে। "নেদং যদিদং উপাসতে"—ইনি তিনি নহেন, যাঁহার উপাসনা তুমি করিতেছ,—এই উক্তি করিয়া বেদ প্রথম মোড় ফেরেন এবং আত্মস্থ দেবতার অন্বেষণে ব্যস্ত হন। আম্ভৃণ-কন্যা বাকের দেবীসূক্তই আত্মস্থ দেবতার প্রথম প্রকাশ করিয়াছে। এই দেবীসূক্তের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন মার্কণ্ডেয় ঋষি চণ্ডীপুস্তকে। তাহা ছাড়া উপনিষদের অংশতঃ আত্মস্থ দেবতার পরিচায়ক।— প্রত্যেক উপনিষদই আত্মস্থ দেবতার আলোচনায় ব্যস্ত। তাহার বিবৃতি, তাহার বিশ্লেষণ ও পরিচয় এবং তাহার নির্দ্দেশ করিতে উপনিষদ সকল যেন প্রমত্তবৎ হইয়া আছে। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক ত এ পক্ষে রসে ভরপুর। উপনিষদের এই শিক্ষা পুরাণে সম্প্রসারিত। প্রত্যেক পুরাণে কিছু না কিছু দেহতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্বের কথা আছেই। ফলে তন্ত্রের সাধনা পরে বৈদিক শ্রৌতগণ পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্ত্রে এবং বেদে একটা সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল।

কিন্তু ধর্ম্ম কেবল ব্যক্তিগত সাধনাকে অবলম্বন করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। মানুষ সামাজিক জীব, সংহতির সাহায্যে দশে মিলে এক আয়তনে, এক গ্রামে থাকিয়া মানুষকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেই হইবে। গোত্র, প্রবর, জ্ঞাতি,

বন্ধুবান্ধব, গোষ্ঠী প্রভৃতি লইয়া মানুষকে জীবিত থাকিতে হয়। তাই সাধনাকে communal বা গোষ্ঠীগত করিতে হয়। যেমন কেবল গোষ্ঠীগত ধর্ম্মে ব্যষ্টির তৃপ্তি নাই, তেমনই কেবল ব্যষ্টির সাধনায় গোষ্ঠী সংহতি-সূত্রে বাঁধা থাকিতে পারে না। ফলে শ্রৌতগণ যেমন সাধনার অংশ উপাসনার সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন, তান্ত্রিকগণও তেমনি সাধনার সঙ্গে উপাসনাকে সহচরী করিয়াছেন। বেদের যজ্ঞাদি গোষ্ঠীগত কর্ম্ম,—তন্ত্রের উৎসব-পূজা আকারান্তরিত হইয়াছে। তন্ত্রের দুর্গোৎসবকে দশাশ্বমেধ যজ্ঞের সহিত তুলিত করা হইয়াছে।

বর্ব্বর-জাতি সকলের ন্যায় আমরা হিন্দু পৌত্তলিক বা ভূতোপাসক নহি। সাধনাকে গোষ্ঠীগত ধর্ম্মে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বেদ যেখানে যজ্ঞাদির আবিষ্কার করিলেন, তন্ত্র সেইখানে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিমা Communal religion এর বা গোষ্ঠীর উৎসবের অবলম্বন মাত্র। প্রতিমা আমাদের পূজার্হা নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে অত খরচ করিয়া মাটির প্রতিমা গড়াইয়া তাহার আবার বিসর্জ্জন করিতাম না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে যুগে যুগে সিংহবাহিনী দুর্গা প্রতিমার এতটা পার্থক্য ও বৈচিত্র্য ঘটিত না, সম্প্রদায়বিশেষের রুচি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে দুর্গা প্রতিমার আকারগত ও বর্ণগত পার্থক্য ঘটিত না। কেবল এইটুকুই নহে, চণ্ডীমণ্ডপে জোড়া ঝালর-আলো-করা প্রতিমাকে ছাড়িয়া বিরলে রোধন বসাইয়া লোক-লোচনের অন্তরালে সাধনার অংশ সিদ্ধ করিতে হিন্দু-তান্ত্রিক বাধ্য হইত না। যে প্রতিমা চণ্ডীমণ্ডপে বিরাজ করেন, তাঁহার ধ্যান করি না; ধ্যান করি ভদ্রকালীর। ফল কথা, চণ্ডীমণ্ডপের প্রতিমা সামাজিক ও সর্ব্বজনীন কল্যাণ কামনার উৎসবের অঙ্গস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত। উহা প্রতীক মাত্র; আসল আরাধনা এবং সাধনা নবম্যাদি কল্পারম্ভের সহিত আরব্ধ হয়। উহা সাধকের জন্য প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণের জন্য নহে। এই কল্পক্রিয়াও দেহতত্ত্বের দিক্ দিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহা ষট্‌চক্র সাধনার আকারান্তর মাত্র।

শতবর্ষ পূর্ব্বে এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাঙ্গালী জাতির ভাব যে কেমন ছিল, কোন্ ধারায় প্রবাহিত হইত, তাহা আজকালকার শিক্ষিত যুবকেরা বুঝেন না, বুঝিতে পারেনও না। কেন না তাঁহারা সে-ভাবের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে ভুলিয়াছেন। দাশরথি রায়ের গানের প্রকৃত মর্ম্ম আজকালকার বাঙ্গালী বুঝেন না। যে দাশরথি রায় আগমনীর এক স্থলে গান করিলেন—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল ?"

চৈতন্যরূপিণী উমা স্বপ্নে দেখা দিলেন, আবার স্বপ্নেই চৈতন্য সম্পাদন করিলেন ; পরে সহসা বিদ্যুদ্বিকাশবৎ কোথায় লুকাইলেন ! এ কেমন উক্তি ? যিনি ষট্‌চক্রভেদের রহস্য না জানেন, অন্ততঃ গুরুমুখে সে সাধনার পরিচয় কতকটা না গ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি এই আগমনীগানের মর্ম্ম কিছুতেই বুঝিবেন না। ইহা Poetry নহে Lyric নহে, Idyll নহে। দেহগত একটা ক্রিয়ার ফলে যাহা ঘটে, তাহারই অর্থবাদের আবরণে ব্যঞ্জনা মাত্র। যাহারা অর্থবাদ জানে না, রোচক বুঝে না, ব্যঞ্জনার অনুসরণ করে না, কোথায় কোন্ শব্দের কেমন দ্যোতনা এ হিসাব যাহাদের নাই, যাহারা সংস্কৃতশব্দবিশেষের অর্থ বোধ করে—অভিধানের প্রতিশব্দের সাহায্যে, কেমন করিয়া তাহাদিগকে দাশরথি রায়ের পালের মর্ম্ম বুঝাইব ? দাশরথি রায় ত ইংরেজি আমলের মানুষ ;—যখন ইংরেজের বিদ্যা ও সভ্যতার ছায়া পর্য্যন্ত এ দেশে পতিত হয় নাই, তখনকার সাধক এবং ভক্তগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম বুঝানত আরও কষ্টকর !

অকাল বোধন।

দুর্গোৎসবের কোন্ কথাটা বুঝিতে পারি। এই গোড়ার কথা, অকাল-বোধনটা বুঝি কি ? পণ্ডিত মহাশয়রা ভিজ্ঞাসিত হইলে বলিয়া থাকেন যে, উত্তরায়ণের কালে দেবগণ জাগিয়া থাকেন, দক্ষিণায়নে তাঁহারা নিদ্রিত। দক্ষিণায়নে আরাধনা করিতে হইলে দেবতাকে জাগাইবার উদ্দেশ্যে অকাল-বোধন করিতে হয়। তান্ত্রিক পণ্ডিত হাসিয়া বলিবেন, প্রত্যেক মনুষ্যদেহেই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আছে, দেবনিদ্রা এবং দেবজাগরণের কাল আছে। বাহ্য প্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতি সমসূত্রে গ্রথিত ; বাহিরে উত্তরায়ণ হইলে ভিতরেও উত্তরায়ণ হয়, বাহিরে দক্ষিণায়ন ঘটিলে দেহাভ্যন্তরেও দক্ষিণায়ন ঘটে, কুলকুণ্ডলিনী নিদ্রিতা থাকেন। অকালে তাঁহাকে জাগাইতে হইলে অকাল বোধন করিতে হয়। বুঝিলে কি কিছু ? কুলকুণ্ডলিনী কে ? তাঁহার জাগরণ ও নিদ্রাই বা কেমন ? ভক্ত গান করিয়াছেন "জাগ, জাগ কুলকুণ্ডলিনী, সহস্রদলে—মূলাধারে—ইহার অর্থই বা কেমন ? এ সকল তত্ত্ব যতক্ষণ জানা না

হইবে, প্রত্যেক শব্দের পারিভাষিক অর্থবোধ যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ কি বৈদিক, কি তান্ত্রিক কোন সাধনায় উদ্দেশ্য ও বিনিয়োগ কোন ইংরেজ বাঙ্গালী বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিবেন না।

আগমনী।

যেমন অকাল বোধন, তেমনই আগমনী। গিরিরাজকুমারী গৌরী, পতি বর্ষে এই অকাল-বোধন ঘটাইতে পারিলে, বাপের বাটীতে শুভাগমন করিয়া থাকেন। এ আবার কেমন কথা? জগজ্জননী, জগদম্বার বাপের সম্পর্ক করিয়া শেষ করা যায় না। হিমগিরি তাঁহার জনক ত বটেনই, আবার যে সাধক অকাল-বোধনের সাহায্যে তাঁহার জাগরণ সাধন করেন, তিনিই তাঁহার জনক। প্রত্যেক গৃহস্থ, যিনি মাকে ঘরে ডাকিয়া আনেন, তিনিই মায়ের বাবা, তাঁহারই গোত্র-প্রবর দেবীকে অবলম্বন করিতে হয়। মা আমাদের জগদম্বা হইলেও ঘরে-ঘরে, দেহঘটে ও পূজার ঘটে কন্যারূপে প্রকট হন। ব্রহ্মাণ্ড-ঘটে মা আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী বিশ্বজননী জগৎপ্রসূতি, আর দেহভাণ্ডে কুলকুণ্ডলিনী জগদম্বিকা কন্যারূপে বিরাজমানা। তাই রামপ্রসাদ মনের সোহাগ ফুটাইয়া গান করিয়া গিয়াছেন যে, "এবার আমার উমা এলে আমি পাঠাব না; বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না।" এই আগমনীর মাধুর্য্য, দেহতত্ত্বের ঐশ্বর্য্য কেমন করিয়া কোন ভাষায় বুঝাইব? অথচ এমন ছিল দিন, যখন দেশের আপামর সাধারণ আগমনীর মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইত, বোধে বিহ্বল হইত! এই অপর পক্ষের সময়ে ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় আগমনী গান হইত, হিন্দু নর-নারী গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া সে গান শুনিয়া চোখের জল মুছিত; শ্রীরামচন্দ্রই যদি রাবণবধের উদ্দেশ্যে অকাল বোধন করিয়া থাকেন, তবে আগমনী আসে কোথা হইতে? বাপের বাটী যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া দুর্গাই শিবের সহিত কোন্দল বাধাইয়া দেন কেন? শিবই বা দুর্গাকে পাঠাইতে এত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন কেন? শেষে নিজেই তল্পিদার হইয়া মায়ের সঙ্গে হাজির হন কেন? এ সকল কেমন কথা? কেমন করিয়া বুঝাইব এ সকল কেমন বার্ত্তা! সে ভাব-জগৎ ত দেখিলে না, সে জগতের ভাষা শিখিলে না, সে ভাব রসের আস্বাদনে মুগ্ধও হইলে না। বুঝাইব কিসের সাহায্যে? দেহতত্ত্ব যদি জানিতে, কুলকুণ্ডলিনীর পরিচয় যদি পাইতে, যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাই আছে দেহভাণ্ডে, এই গুপ্ত মহাসত্যের প্রকৃত মর্ম্ম যদি জানিতে পারিতে, তাহা হইলে

আগমনীর অর্থবাদ, অকালবোধনের ইঙ্গিত দুর্গোৎসবের সাধনার মহিমা বুঝিতে, আর এই শরৎকালে ভাবসাগরে হাবু ডুবু খাইয়া জীবন সার্থক করিতে!

শ্যাম ও শ্যামা।

বাঙ্গালীর দুই দেবতা, দুই সাধনা এবং দুই রস। বাঙ্গালীর ত্রয়ীর তৃতীয় পুরুষ হইল সাধক। সেই সাধকের ইষ্ট শ্যামা ও শ্যাম আদি ও বাৎসল্য—দুই রূপ দুই সাধনা, দুই রস। কিন্তু দুই এক, একই দুই, শ্যাম শ্যামা হয়, শ্যামা শ্যাম সাজে; প্রেম ভক্তিতে যাইয়া মিশে, ভক্তি প্রেমে যাইয়া উছলিয়া উঠে, মূল ও ফল—আদি ও বাৎসল্য অদল-বদল, বংশী বদল ঘটায়। বুঝিলে কি কিছু? ইংরেজি নবীশ এটুকু বুঝিবেন না। তাঁহারা প্রেমকে বলেন Love আর ভক্তিকে কি বলেন? ছাই আর ভস্ম—ঐ Love। বলিতে পার তরুণের তরুণীর প্রতি আসক্তিতে একটা দুর্ব্বার আকর্ষণ ঘটে কেন? তুমি বলিবে রিরংসার তৃপ্তি জন্য। বেশ কথা, পরন্তু রিরংসা হয় কেন? জীবনাত্রেরই রিরংসা কেন? জীবতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিবে রিরংসা প্রজনন চেষ্টার নামান্তর মাত্র। এক আমি বহু হইব, তাই তোমায় চাই। ইহাই মূলা প্রকৃতির অশরীরী, অনাহত ধ্বনি। ইহাই উপাসনা ও আরাধনার, সাধনার ও তপস্যার প্রণোদক। ইহারই বিশ্লেষণপদ্ধতি অনুসারে কেহ প্রেমকে সারাৎসার বলিয়া ধরিয়াছেন, কেহবা ভক্তিকে অদ্বৈত ষষ্টির তুল্য জ্ঞান করেন, কেহ আদি—কেহ বা অনাদিতে মগ্ন। এইটুকু বুঝিলে ও বুঝাইতে পারিলে বাঙ্গালার সাধনার, আরাধনার, উৎসব যজ্ঞাদির সকল মহিমা একাশ পায়। বুঝান বড় কঠিন। বুঝাও তাহা অপেক্ষা আরও কঠিন। দেহভাণ্ড যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহা কথার কথা নহে, উপমার ভাষা নহে; ইহা খাঁটি সত্য ও প্রকৃত। দেহের ভিতরে বিন্দু, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অনন্ত সিন্ধু। বিন্দু কিন্তু অনন্তের বিন্দু, বিন্দু হইলেও অসীম, তাই বিন্দুতে সিন্ধু উথলাইতে পারিলে, দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড ফুটাইতে পারিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা চলে। সে সাধনার একটু পরিচয় জানা না থাকিলে শ্যাম শ্যামার সেবক ও সাধক বাঙ্গালীর ভাষা, সাহিত্য, কাব্য গাথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। সে পরিচয় জান না, জানিবার অবসর, হয় নাই। তাই বাঙ্গালী হইয়াও খাঁটি বাঙ্গালীর ভাষা আর বুঝিতে পার না, খাঁটি বাঙ্গালীকে আর চিনিতেও পার না—তাই তোমার দুর্গোৎসবই তোমারই কাছে একটা উৎকট প্রহেলিকা।

বারবক।

—:০:—

যে সময়ে দিল্লীর সিংহাসন বেহলুল লোদী কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, যে সময় আলাউদ্দীনের শাসনদৌর্ব্বল্যে সমগ্র হিন্দুস্থান ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়—দাক্ষিণাত্য বাহমনীরাজ্য, গুজরাট, মালব, জৌনপুর এক একটি ক্ষমতাশালী স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়, সেই সময়ে বঙ্গদেশের স্বাধীন পাঠানরাজ রুকনশাহের শাসনকাল। তিনি বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে জনসাধারণ অতি সুখে কালযাপন করিত।

পাঠানরাজ রুকনশাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের জীবনে খোজাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইনি তাহাদের ক্ষমতার অনেক লাঘব করিয়া দেন। তজ্জন্য তাহারা নরপতির প্রাণবধে কৃতসঙ্কল্প হইল। পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে পঞ্চসহস্র পাইক রাত্রিকালে রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থ নিযুক্ত থাকিত। প্রাতঃকালে সুলতান ভ্রমণে বহির্গত হইলে অস্ত্রদল আসিয়া তাহাদের স্থান গ্রহণ করিত। খোজাদিগের মধ্যে বারবক নামক একজন খোজা বিশেষ চতুর ছিল; তাহাকেই সকলে দলপতি নির্ব্বাচন করিল। সেই ব্যক্তি পাইকদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া একদিবস রুকনশাহ প্রাতঃভ্রমণে বহির্গত হইলে পর, পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণসংহার করিল।

সুলতান রুকনশাহের প্রাণসংহার করিয়া বারবক কখনও মনে ভাবে নাই যে, দাসত্বের পরিবর্ত্তে বঙ্গরাজসিংহাসন তাহারই প্রাপ্য। অভাবনীয় ব্যাপারে উৎফুল্ল হইয়া বারবক সুলতান শাহজাদা নাম ধারণপূর্ব্বক রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইল।

বারবকের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হীন অবস্থায় যাহারা তাহাকে ঘৃণা করিত, তাহারা আজি তাহার কৃপাপ্রার্থী হইল। বারবকও যথাযোগ্য সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিল। ক্রমে বারবক তাহার স্বজাতীয় আত্মীয় স্বজনকে রাজসরকারে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিল। রাজ্যের হীনমতি লোকেরাও অর্থলোভে বারবকের দলে আসিয়া মিশিল এবং স্ব স্ব উন্নতি সাধনের পথ প্রশস্ত করিতে বিশেষ যত্নবান হইল।

বারবকের অত্যাচার ও অবিচারে বঙ্গের জমিদারসম্প্রদায় বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং সতত ইহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত সচেষ্ট ছিলেন। বারবক জমিদারগণের মনের ভাব অবগত হইয়া প্রথম প্রথম তাঁহাদিগকে তোষামোদ বা অর্থলোভে নিজদলে আনিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইল। জমিদারগণ যাহাকে রাজদরবারে অতি সামান্য কীটানুকীট অপেক্ষাও হেয় মনে করিতেন, আজি তাহাকে তাঁহাদের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে ঘৃণা ও লজ্জাবোধ করিলেন।

যদিও সাধারণ জনগণ বারবকের অধীনতা স্বীকার করিল, তথাপি ক্ষমতাপন্ন সম্ভ্রান্ত জমিদারগণ তাহার বশ্যতা স্বীকার না করিয়া বিদ্রোহের উদ্‌যোগ আয়োজনে সচেষ্ট রহিলেন। চতুর বারবক যখন দেখিল যে, দেশের সম্ভ্রান্ত জমিদারগণ তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল না, তখন তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে মনস্থ করিল। জমিদারদিগের মধ্যে তখন সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ জমিদার ছিলেন—আমির আন্দিল। তিনি ফতেশাহের অকারণ হত্যা-ব্যাপারে বিশেষ ব্যথিত ছিলেন এবং যাহাতে বারবককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বীয় উপযুক্ত পুত্রকে সিংহাসনে বসাইতে পারেন, সে বিষয়ে যত্নবান্ ছিলেন। সুতরাং বারবক যেমন তাঁহার বিনাশ চেষ্টায় যত্নবান্, তিনিও আবার বারবককে শমনসদনে প্রেরণ করিতে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

সহজেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। বারবক এক সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে সভায় যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। বারবক মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল যে, আমীর আন্দিলকে একবার স্বীয় রাজধানীতে আনিতে পারিলে অনুচরবর্গের সাহায্যে তাহাকে কারারুদ্ধ করিবেন। আমীর আন্দিল কিন্তু এই নিমন্ত্রণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বহুসংখ্যক অনুচর সহ বারবকের রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। বারবক দেখিল, তাহার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করা এ ক্ষেত্রে অসম্ভব; এজন্য উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য দূর করিয়া প্রীতি সম্বর্দ্ধনার্থ আমীর আন্দিলের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে যথোচিত আপ্যায়িত করিল। পরে তাঁহার হস্তে একখানি কোরান প্রদানপূর্ব্বক তাহা স্পর্শ করিয়া তাহার অনিষ্ট সাধন হইতে বিরত থাকিবার নিমিত্ত আমীর আন্দিলকে অনুরোধ করিল। আমীর আন্দিল কোরান স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত বারবক সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবে, সে পর্য্যন্ত

তিনি তাহার কোন অনিষ্ট চেষ্টা করিলেন না। বারবক অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

বারবক তাহার অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জ তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আমীর আন্দিলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকলেই বারবককে বিনষ্ট করিয়া রাজ্যের শান্তি সংস্থাপনার্থ রাজপ্রহরীদের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। আমীর আন্দিল তাহাদের নেতা হইলেন; তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না, প্রহরীরা সকলেই তাঁহার অবশীভূত হইল। প্রহরীদের দলপতি ইউগরেশখাঁ তাঁহার বিশেষ সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন।

হীনমনা অত্যাচারী বারবককে হত্যা করিবার জন্য আমীর আন্দিল সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন; দৈবক্রমে তাঁহার সে সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিবস রজনীতে আমীর আন্দিল কোনও বিশেষ প্রয়োজনে বারবকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় ইউগরেশখাঁ তাঁহার প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। আন্দিল উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অতিরিক্ত সুরাপানে মত্ত বারবক সিংহাসনোপরি নিদ্রিত। কিন্তু তাহাকে তদবস্থা দর্শন করিয়া কোরান স্পর্শ করিয়া শপথ করার বৃত্তান্ত আন্দিলের মনে জাগিয়া উঠিল। সুতরাং তিনি তদবস্থ বারবককে হত্যা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কৌশল ক্রমে বারবককে জাগরিত করিলেন। জাগরিত হইয়া বারবক মত্ততাবশতঃ সিংহাসন হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। আন্দিলও এই অভাবনীয় ব্যাপারে আনন্দিত হইয়া তরবারী নিষ্কাসনপূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

মস্তকোপরি উন্মুক্ত তরবারী দৃষ্টে বারবকের সমস্ত নেশা কাটিয়া গেল। প্রাণের ভয় তাহার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ফিরাইয়া আনিল। সে সমস্তই বুঝিতে পারিল। ক্রোধে ও ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। বারবক ক্ষুদ্র ছিল বটে; কিন্তু কাপুরুষ ছিল না। শরীরেও বিশেষ ক্ষমতা ছিল। আন্দিলের ব্যবহারে বারবক ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া পরক্ষণেই তাঁহাকে সবলে আক্রমণ করিল এবং স্বীয় শরীরের প্রাধান্য বশতঃ তাঁহাকে অচিরাৎ ভূতলশায়ী করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে উপবিষ্ট হইল। আমীর আন্দিল বারবকের কেশগুচ্ছ সবলে আকর্ষণ করিয়া গৃহের বারদেশে দণ্ডায়মান ইউগরেশখাঁকে শীঘ্র ভিতরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। ইউগরেশখাঁ কতিপয় হাবসী সহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

আমীর আন্দিলের সহিত বারবকের মল্লযুদ্ধের সময় উভয়ের হস্তপদ সঞ্চালনে গৃহস্থিত দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। সুতরাং ইউগরেশখাঁ গৃহে প্রবেশ করিয়া কিছুই স্থির নির্ণয় করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। আমীর আন্দিল তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আমি সুলতানের কেশগুচ্ছ আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছি। ইহার শরীর অত্যন্ত মাংসল ও প্রশস্ত, তজ্জন্য যদিও এ আমার উপর বসিয়া আছে, তাহাতে আমার কোন কষ্ট হইতেছে না। তুমি নিশ্চিন্তচিত্তে ইহার উপর অস্ত্রাঘাত কর; কারণ তরবারী সুলতানের মাংসল শরীর ভেদ করিয়া আমার শরীরস্পর্শ করিবে না। আমি যদি আঘাত প্রাপ্ত হই, তবে তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, কারণ আমার ন্যায় শত সহস্র ব্যক্তিও যদি স্বীয় প্রভুহত্যার প্রতিশোধ লইতে জীবন বিসর্জ্জন করে, তবে তাহাও কিছু মাত্র চিন্তার বিষয় নহে।" আন্দিলের কথা শুনিয়া ইউগরেশখাঁ বারবকের পৃষ্ঠদেশে ও স্কন্ধে পরিমিত বেগে তরবারির আঘাত করিতে লাগিল। সৌভাগ্য বশতঃ অন্ধকার থাকায় তরবারী যথাস্থানে পতিত হইল না, কেবল তাহার আঘাতে সুলতানের পোষাকের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইল। বারবকও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর ভাণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল।

আমীর আন্দিল গাত্রোত্থান করিয়া ইউগরেশখাঁ ও অন্যান্য লোকজন সহ সত্বর সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার কালে স্বীয় অনুচরবর্গের মধ্যে তওয়াচীবাসী নামক জনৈক লোককে মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিবার ভার দিয়া গেলেন।

আমীর আন্দিল প্রস্থান করিলে পর বারবক গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এখনও মদের নেশা দূর না হওয়ায় সহসা গাত্রোত্থান করিতে সমর্থ হইল না। এমন সময় তওয়াচীবাসী দীপ লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বারবকও তাহাকে দেখিয়া পুনরায় মৃত্যুর ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল। প্রবেশ কালে হস্তস্থিত দীপের ক্ষীণ আলোকে তওয়াচীবাসী সুলতানকে নড়িতে দেখিয়াছিল এবং এক্ষণে আবার মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মনে বিষম সংশয় উপস্থিত হইল। যথার্থই সুলতান মরিয়াছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য সে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "হায়, হায়, একি হইল? দুরাত্মা আমার প্রভুকে হত্যা

করিয়া সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে?" হতভাগ্য বারবক তাহা শুনিয়া তাহাকে হিতৈষী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বিবেচনা করিয়া বলিল, "ওহে, চুপ কর, আমি মরি নাই; আমীর আন্দিল কোথায়? তওয়াচী প্রত্যুত্তরে বলিল, "শাহ, আন্দিল আপনাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইয়াছে ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বভবনে গমন করিয়াছে।" বারবক তাহাকে কতিপয় রাজপুরুষের নিকট গমন করিতে আদেশ করিয়া বলিল, আমীর আন্দিলের শিরশ্ছেদন করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য আমার আদেশ তাহাদিগকে অবগত করাইবে। দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দেও, তাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সর্ব্বদা সুসজ্জিত হইয়া সতর্কভাব অবলম্বন করুক।" তওয়াচী "যে আজ্ঞা" বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া অবিলম্বে—সমস্ত বিবরণ আমীর আন্দিলের সমীপে জ্ঞাপন করিল। সেই রাত্রিতেই আমীর পুনরায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং বারবককে ইহ জগতের সমস্ত খেলা ধূলা হইতে অপসারিত করিয়া তাহার পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

হতভাগ্য বারবক যে পাপ উপায়ের সাহায্যে রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে পাপপ্রণালীর কূটজালে পতিত হইয়া তাহাকে চির-জীবনের তরে সিংহাসন হইতে অপসারিত হইতে হইল।

শ্রীসুখরঞ্জন সেন গুপ্ত

শোভান্তর।

(১)

আজি শ্রাবণ-গগন পেয়েছে শারদ-ছবি!
ওই উজল প্রভাতে কনকবরণ রবি!
ঝরিতে ঝরিতে অপার অশ্রুধারা
সহসা প্রকৃতি হাসিছে আপনা-হারা!
মেঘমালা দলে দলে
ভেসে যায় কুতূহলে
ওগো, সফল তাহার হয়েছে সকল কাজ
নগন ধরণী সরস শ্যামল আজ।

(২)

আজি গাইছে বিহগ ললিত কোমল তানে !
একি মধুর বারতা জাগিছে সকল প্রাণে !
পলকে পলকে নাচিছে তটিনী বুক,
কোথায় গোপন ছিলরে এমন সুখ !
ফুলকলি বনে বনে
উলসিত অতি সনে !
কার অলক-সুবাসে ভুবন পাগল করি'
মৃদুল সমীর বহিছে পরাগ হরি' !

(৩)

ওগো, বিরহীহৃদয় জুড়াল কাহার আজ !
তাই এমন সুষমা-এমন মোহন সাজ !
নধর অধরে আজিকে হাসি না ধরে !
আকুল-পরাণ বিপুল পুলক ভরে !
কোন্ বিরহিণী নারী
মুছিলরে আঁখি-বারি
শুধু একটু সোহাগে একটু আদরে ভুলি' !
বাদল এখনো রয়েছে দুয়ার খুলি' !

(৪)

তবু অশ্রু-সাগরে হাসির লহর জাগে !
আজি জীবন আমার কাহার মিলন মাগে !
অমনি সজল কমল মুখের ভাতি
ঘুচাবে হৃদয় গহন তিমির রাতি !
কোথা সেই শোভা—রাণী
কিছু আজি নাহি জানি !—
মোর সকল পরাণ খুঁজিয়া ফিরিছে তারে
নিখিল ধরার সুষমা-উজল দ্বারে !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

সদালাপ—দেবীচৌধুরাণী।

(১)

"দেবীচৌধুরাণী"র উৎসর্গপত্র পড়িলেই মনে হয় যে ইহা নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। "যাঁহার কাছে প্রথম নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং ধর্ম্মই ব্রত করিয়াছিলেন, যিনি পুণ্যফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র পাদপদ্মে এই গ্রন্থ ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।" এই কারণেই, 'দেবীচৌধুরাণী'র অনেকস্থলে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রফুল্ল ও ভবানীঠাকুরে কথোপকথন চলিতেছে—পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভবানী-ঠাকুর প্রফুল্লকে শিক্ষা দিয়াছেন। কথাগুলি অনেকবার বলিয়াছেন, তবুও আর একবার বলিলেন। ভবানী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "পাঁচবৎসর হইল, তোমার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আজ সমাপ্ত হইল। এখন তোমার হস্তগত ধন তোমার ইচ্ছামত ব্যয় করিও—আমি নিষেধ করিব না। আমি পরামর্শ দিব—ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিও। আমার আর আমি যোগাইব না, তুমি আপনি আপনার দিনপাতের উপায় করিবে। কয়টি কথা বলিয়া দিই, কথাগুলি অনেকবার বলিয়াছি, আর একবার বলি। এখন তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে?"

প্রফুল্ল বলিল, "কর্ম্ম করিব, জ্ঞান আমার মত অসিদ্ধের জন্য নহে।"

ভবানী বলিল, "ভাল ভাল; শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু কর্ম্ম অনাসক্ত হইয়া করিতে হইবে। মনে আছে ত, ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষম্॥"

এখন অনাসক্তি কি? তাহা জান। ইহার প্রথম লক্ষণ, ইন্দ্রিয়সংযম। এই পাঁচবৎসর ধরিয়া তোমাকে যাহা শিখাইয়াছি, এখন আর বেশী বলিতে হইবে। দ্বিতীয় লক্ষণ, নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম কৃত, তাহা আমি করিলাম, এই জ্ঞানই অহঙ্কার। যে কোন কাজই কর, তোমার গুণে তাহা হইল; কখন তাহা মনে করিবে না। করিলে পুণ্যকর্ম্ম অকর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তারপর তৃতীয় লক্ষণ এই যে, সর্ব্ব কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্।"

কর্ম্মে অনাসক্ত হইতে হইবে।...ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে, অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহরক্ষা করিবে। আর সব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর।

অর্থাৎ, আত্মরক্ষার্থ যেটুকু দরকার, তাই রাখিয়া বাকী সব শ্রীকৃষ্ণকে দিতে হইবে।—

ধর্ম্মাচরণে সুখ্যাতি খুঁজিবার আবশ্যকতা নাই। "অখ্যাতির কামনা করিলেই কর্ম্ম আর নিষ্কাম হইল কৈ? (দ্বিতীয় খণ্ড দশম পরিচ্ছেদ।) ভাই ব্রজেশ্বর ও সাগরকে বিদায় দিয়া, দেবী বেশভূষা, ঢাকাই সাড়ী, সোণা-দানা, হীরা, মুক্তা, পান্না সব ছাড়িয়া, খালি একখানি গড়া পরিয়া, হাতে একগাছি কড় রাখিয়া, ভবানী পাঠকের সহিত দেখা করিলেন। দেবী আর ডাকাইতি করিতে চাহেন না। কারণ, লোকে তাঁহাকে ডাকাইতিনী বলিয়া জানে।" এ অখ্যাতি মরিলেও যাবে না। তাই ভবানী পাঠক, দেবীকে বলিতেছেন যে, ধর্ম্মাচরণে সুখ্যাতি খুঁজিবার আবশ্যকতা নাই। অখ্যাতির কামনা করিলেই কর্ম্মে আর নিষ্কামতা থাকে না। "তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে। পরের ভাবিলে না। আত্মবিসর্জ্জন হইল কৈ?"

কথাটী হইতেছিল মহানহোপাধ্যায় ভবানীঠাকুরে আর শিষ্যা দেবী-চৌধুরাণীতে। দেবীর কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম্ম। তাই হরবল্লভ প্রকৃতির সর্ব্বনাশ করিলেও এবং দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত থাকিলেও, দেবী ব্রজেশ্বরকে বলিলেন যে, হরবল্লভের জন্য কোন চিন্তা নাই। তাঁহার অমঙ্গল সম্ভাবনা

থাকিতে দেবী আত্মরক্ষার কোন উপায় করিবেন না। ইহা ব্রহ্মত্বের অনুরোধে নহে।" তুমি বলিলেও করিতাম না, না বলিলেও করিতাম না।" ইহার কারণ, আর কিছুই নহে। "কেননা, প্রফুল্ল নিষ্কাম; যার ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ত্ব রাখে না।"

(দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

একথাগুলি সে নূতন নহে, পুরাতন, তাহা বলিবার জন্য দেবী যখন নূতন সেজে হইয়া বাসন মাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই পঞ্চাশ হাজার দিয়া অভিষিক্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিল; শ্বশুর শাশুড়ী, সকলে, এমন কি কোন্দলী নয়ান বৌ প্রফুল্লের হাতে ছেলেগুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল, তখন গ্রন্থকার পুনরায় বলিলেন, "এ সকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না, কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম, অথচ কর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী; তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোণা হইত। সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা—নিজে পরম পণ্ডিত—সে কথা দূরে যাক্, কেহ জানিল না যে, তাহার অক্ষর পরিচয়ও আছে।"

আর এই নিষ্কাম ধর্ম্ম যে ভারতবর্ষে আবহমান কাল হইতে প্রচারিত ছিল, তাই বলিবার জন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি—"আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র। কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ। তাই আবার আসিলাম।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

(২)

দেবীচৌধুরাণীতে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা ব্যতীত আরও অনেক শিক্ষা আছে। আমরা তাহার কয়েকটীর আলোচনা করিব।

(ক)

স্বামী স্ত্রী।

প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেখুন।

সাগর ও প্রফুল্লে কথোপকথন হইতেছিল। প্রফুল্ল থাকিব বলিয়াই শ্বশুর বাড়ীতেই গিয়াছিল, থাকিবার কোন আশাই ছিল না।

সাগর বলিল, "যদি শ্বশুরের মত না হয়, তবে এখনই চলে যেওনা।

প্রফুল্ল—না গিয়া কি করিব? আর কি জন্য থাকিব? থাকি যদি—

সাগর—যদি কি?

প্রফুল্ল—যদি তুমি আমার জন্ম সার্থক করাইতে পার।

সাগর—সে কিসে হবে ভাই?

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই হাসি নিবিয়া গেল, চক্ষে জল পড়িল। বলিল, "বুঝ নাই ভাই?"—

তার পরে, যখন সেই রাত্রে ব্রজেশ্বরে প্রফুল্লকে এক দিনের জন্য সন্ধ্যার পরে ঠাই দিল, "তখন পোড়ার মুখী নরান প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, অন্ধরাত্রে কোথায় শুইয়াছিলে?" তখন সাগর উত্তর দিল, "ভাই, কেহ তীর্থ করিলে সে কথা মুখে বলে না।" সেই একই কথা।

প্রফুল্ল দেবী হইতে চলিলেও স্বামীর কথা ভুলিতে পারিল না। প্রথম খণ্ডের, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে নিশির সহিত কথা হইতেছে। নিশি বলিতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের তাহার রূপ, যৌবন, প্রাণ—স্বামী; কিন্তু প্রফুল্লের এসব কথা ভাল লাগিল না। তাই প্রফুল্ল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কখন স্বামী দেখ নাই।" তাই বলিতেছে—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণেও মন উঠিত না।

বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মূর্খ ব্রজেশ্বর এত জানিত না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ব্রজেশ্বরও বুঝিত। তাই দ্বিতীয় খণ্ডের, অষ্টম পরিচ্ছেদে ব্রজেশ্বর দেবীকেই বলিতেছে, স্ত্রীর মত কোন ধন? আপনি তাই আমাকে দিয়াছেন, ইহার বেশী আর কি দিবেন?" অবশ্য বঙ্কিম-চন্দ্রই পরে লিখিয়াছেন "ও ব্রজেশ্বর! কি বলিলে? "স্ত্রীর মত ধন আর

সাহেব তাহার চৌদ্দ নিকি প্রফুল্লকে ভাড়াইল। কিন্তু যে প্রশ্ন বে-সাহেবের সহায়তা করিয়াছিল, তাহা আমরা পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

হিন্দু স্ত্রীর নিকট স্বামী যে কি বস্তু, তাহা গ্রন্থকার প্রফুল্লকে দিয়া বড় পরিষ্কার বলিয়া নিয়াছেন। পাঠক, তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখুন দিবার ও দেবীচৌধুরাণীতে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সম্মুখে ঘোর বিপদ; দেবী নিশ্চিন্ত। কাহাকেও জানিয়া শুনিয়াও এ বিপদের কথা বলে নাই। সে যে লোকজনকে সবাইকে বিদায় দিয়াছে, তাহার হাজার বরকন্দাজকে অন্যস্থানে পাঠাইয়াছে। দিবা শুনিয়া বলিতেছে, "আমরা আগে যদি জানিতাম, তা হইলে তোমার এমন কর্ম্ম করিতে দিতাম না।" তাই দেবী বলিতেছে, "তোমার সাধ্য কি দিবা? যা আমি স্থির করিয়াছি, তা অবশ্য করিব। আজ স্বামি-দর্শন করিব, স্বামীর অনুমতি লইয়া আজ জন্মান্তরে তাঁহাকে কামনা করিয়া প্রাণ সমর্পণ করিব।"

তাই সে ব্রজেশ্বরকে বলিল, "তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চনা করিতে শিখিতেছিলাম—শিখিতে পারি নাই। তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই আমার একমাত্র দেবতা।"

হিন্দুস্ত্রীর ইহাই সার কথা।

(খ)

পিতা পুত্র

ইতিপূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছি যে, ব্রজেশ্বর স্ত্রীকে তাড়াইবার জন্য হরবল্লভের সহায়তা করিয়াছিল। একথা খুব সত্য; কিন্তু ইহার কারণ আছে।

প্রফুল্লের মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইল—ব্রজেশ্বর শুকাইয়া শুকাইয়া পিছাইয়া গেল। রোগ এমন কিছু নয়, একটু একটু জ্বর হয় মাত্র। বৈদ্য দেখিল—ঔষধপত্রে কিছু হইল না—রোগ বৃদ্ধি পাইল—ব্রজেশ্বর বাঁচে-না-বাঁচে। কিন্তু ব্রজেশ্বর বাঁচিল। একদিন হরবল্লভের পিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত, হরবল্লভ শ্রাদ্ধ করিতেছেন। ব্রজেশ্বর সেখানে কোন কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি শুনিলেন, শ্রাদ্ধে পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতেছে,—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" ॥

কথাটা ব্রজেশ্বর কণ্ঠস্থ করিলেন। প্রফুল্লের জন্য যখন বড় কান্না পাইত, তখন তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন,—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥"

এইরূপে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরের পিতাই যে প্রফুল্লের মৃত্যুর কারণ, সেই কথা মনে পড়িলেই ব্রজেশ্বর ভাবিতেন,

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।"

প্রফুল্ল গেল, পিতার প্রতি তবুও ব্রজেশ্বরের ভক্তি অচল রহিল।

অবশ্য প্রফুল্ল মরে নাই। দেবীরাণী ও ব্রজেশ্বরের কথোপকথন হইতেছিল। ব্রজেশ্বর বুঝিলেন, হরবল্লভই গোয়েন্দা। ব্রজেশ্বর শিহরিল—মাথায় করাঘাত করিল। বলিল "তিনিই কি গোয়েন্দা?" প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। কথাটা বুঝিতে দেরী হইল না। হরবল্লভ জানিয়া শুনিয়াই টাকা পরিশোধের কোন উদ্যোগ করেন নাই। তথাপি ব্রজেশ্বর ভুলিলেন না যে,—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥"

সেজন্যই এই জন্যই প্রফুল্লকে বলিলেন, "আমি মরি, কোন ক্ষতি নাই। তুমি মরিলে আমার মরার অধিক হইবে। কিন্তু আমি দেখিতে আসিব না। তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।" (তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিটা খুবই বেশী—তাই যখন সাহেবে ও তাহাতে ঘুসাঘুসি হইয়া গেল, হরবল্লভ তো ভাবিয়াই আকুল, হুজুরকে বলিলেন, 'ও ছেলে মানুষ আজিও বুদ্ধি শুদ্ধি হয় নাই, আপনি ওর অপরাধ লইবেন না। মাফ করুন। হুজুর বলিলেন, "ও বদমাস! তবে যদি আমার কাছে ও যোড়হাত করিয়া মাপ চায় তবে আমি মাফ করিতে পারি।" হরবল্লভ ব্রজেশ্বরকে তাহাই করিতে

বলিলেন। জোড় হাত করিয়া সাহেবের নিকট ভাগ চাহিতে বলিলেন—ব্রজেশ্বর বলিলেন, "সাহেব প্রায়রা হিন্দু, পিতৃ-আজ্ঞা আমরা কখনও লঙ্ঘন করি না। আমি আপনার কাছে জোড়হাত করিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে মাছ দিন।"

সাহেব ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি দেখিয়া "স্যাওসেব" করিলেন।

হরবল্লভও জানিতেন যে, তিনি ব্রজেশ্বরকে যাহা বলিবেন, সে তাহাই করিবে। তাই নিশি ঠাকুরাণী যখন ঘটকালী করিতেছিলেন, হরবল্লভ তাঁহার ভগিনীকে বিবাহের অনুরোধ করিতেছিল, যেন বুড়া 'বুড়ভের' অনুরোধে ছেলে বিবাহ করিলে হয় কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। নিশি জিজ্ঞাসা করিল "তিনি রাজি হবেন?" হরবল্লভ উত্তর করিলেন, "আমি বলিলেই হইবে।" এই জন্যই ব্রজেশ্বর বাপের কথায় প্রফুল্লকে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

(গ)

আচার ব্যবহার

'দেবী চৌধুরাণী'তে আমরা বঙ্কিমযুগের আচার ব্যবহারের বেশ পরিস্ফুট চিত্র পাই। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) গৃহস্থবাড়ী লোকে উপবাসী থাকিতে পারিত না। তাহা অকল্যাণ হইত। তাই, গৃহিণী মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে, (গৃহিণী ব্রাহ্মণ-পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারীধর্ম্মের গুণে মাছি তাড়াইতেছেন), নথ নাড়িয়া কর্ত্তার প্রশ্নে "বাদী বেটী বিদায়ে" ইত্যাদি উত্তর করিলেন, "রাত্রে একটা অতিথি এলে তুমি তাড়াওনা"—ইত্যাদি।

(২) দিবসমানে যুবতীরা স্বামিদর্শন পাইতেন না (প্রথম খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

(৩)—বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে, হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা সঙ্গীষ ঝাড়ে (প্রথম খণ্ড পরিচ্ছেদ)

(৪) সাগরের ঘরে প্রফুল্ল স্বামীর সহিত দেখার আলাপ করিয়া যাবে প্রফুল্লের মনে একটী খোঁচটা ছিল—সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মত নহে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র একটীবে ঝিক্ দিয়াছেন (প্রথম, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

(৫) ব্রজেশ্বর পূর্ণবয়স্ক যুবক—তথাপি প্রফুল্লের মাতার মৃত্যুর পরে যখন শ্বশুরগৃহে নিমন্ত্রণে গেল, করিলেন না, তখন ব্রজেশ্বর মনে করিল, "একদিন রাত্রে গিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়া আসিব, সেই রাত্রেই ফিরিব।" অবশ্য একথাটা ঠিক খ্রীষ্টভক্ত পুত্রের ন্যায় হইল না, কিন্তু পুত্র যে পিতাকে ভয় করিত, তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(৬) বধূ শ্বশুর বাড়ী আসিলে দিবসে পিতার সাক্ষাৎ পাওয়া সেকালে ততটা দুরূহ ছিল, পিত্রালয়ে ততটা ছিল না। (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।)

(৭) তখন লোকেরা ব্যায়াম করিত, কারণ দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই। (প্রথম, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ) সেই লাঠির এত আদর ছিল। বাঙ্গালার জাতীয় হাতিয়ার লাঠি। বাঙ্গালী ইহার প্রকৃত ব্যবহার জানিত। ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে লাঠি না পারিত এমন কাজ ছিল না। এখন আর সে দিন নাই। এখন বংশখণ্ড মাত্র। "ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগালকুক্কুর-ভীত বাবুবর্গের হাতের শোভাকর; কুক্কুর ডাকিলেই সে মনীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়ে! তোমার সে মহিমা আর নাই।" বাঙ্গালী লাঠী ছাড়িয়াই নির্জ্জীব হইয়াছে। জানি না, লাঠীর অক্ষয় স্বর্গ হইয়াছে কি না। সে ইন্দ্রলোকে গিয়া নন্দন কাননের পুষ্পভারাবনত পারিজাত বৃক্ষশাখার ঠেক্‌নো হইয়া আছে কিনা—হে লক্ষ্মীছাড়া লাঠী তোমার যার কল্পবৃক্ষ হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ ফল সকল পড়িয়া যাইতেছে কি না? তবে এটা ঠিক যে, তাহার এক আধটা ফল ভবিষ্যতে গড়াইয়া পড়ে না। পড়িলে পৃথিবীর এ দুর্দ্দশা হইত না।

(ঘ)

শিক্ষার কথা

দেবী চৌধুরাণীতে একটা বড় উপদেশ আছে। রঙ্গরাজকে ভবানী ঠাকুর বলিতেছেন যে জিনিষের বহুদিন ধরিয়া সন্ধান করিতেছিলেন, তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু "সে সামগ্রী পাইবার নয়, তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষে কাটারি করিয়া লয়। ইস্পাত ভাল পাইয়াছি, এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া পাঁড়িয়া শাণিতে হইবে।"

তাই যখন তাঁহাতে ও প্রফুল্লতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন তিনি এইরূপ বলিলেন, সর্ব্বভূতসংক্রামক দানের জন্য অনেক কষ্ট, অনেক শ্রমের প্রয়োজন।

আমরা আজ যে দেশমাতৃকার দেবার জন্য লালায়িত হইয়াছি, তাহাতে অনেক শ্রমনয়-প্রয়োজন। তবে চন্দ্রিমচন্দ্রের কথা ধরিতে গেলে বলিতে হয় যে, ইহা ২।১ বৎসরের-কার্য্য নয়। পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া ইস্পাত গড়িয়া কাটাই করিতে হইবে।

'দেবী চৌধুরাণী'র একটি কথা বড় অমূল্য—প্রাণ কথার এক কথা। হরবল্লভ যখন নিশ্চির কথায় বুঝিলেন যে, তাঁহাকে শূলে যাইতে হইবে, তখন তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সাহেব তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিল,—

"রোও মৎ উল্লুক্! মরণা একরোজ আলবৎ হ্যায়।"

সাহেবেরা একথা খুব বুঝেন, তাই তাঁহারা সসাগরা-পৃথিবীর মালিক।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। পাটনা

ব্রাহ্মণ। *

—: :—

হে ব্রাহ্মণ!—হে ভূদেব!
হে মহর্ষিবংশের নন্দন;
ছিলে কোথা, এলে কোথা,
পুনঃ কোথা করিবে গমন।
শুভ্র-প্রভাসনে যবে,
প্রতিষ্ঠিলা সভ্যতে তোমায়;
কত ঊর্দ্ধে ছিলে তুমি
আপনার গৌরবপ্রভায়!

* শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনীর ২য় দিবস ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।—লেখক কর্ত্তৃক পাঠিত।

মনে কি পড়ে না দেব,
অতীতের সে গৌরব-স্মৃতি ;
প্রাণে নাকি বক্ষ মাঝে,
মুহূর্ত্তেও' সে স্বর্গীয় প্রীতি !
হৃদয়তন্ত্রীতে আর
বাজেনা কি সেই "সাম" গান ;
কোথা সে সম্পদ আজি,—
কোথা দেব-বাঞ্ছিত সম্মান !

২

হে ব্রাহ্মণ ! হে ভূদেব !
হে মহর্ষিবংশের নন্দন !
কোথা তব ললাটের
ললাটিকা সে হরিচন্দন ?
দেবতা, গন্ধর্ব্ব-আদি
রক্ষ, রক্ষ, ত্রিলোকের জন ;
উপযুক্ত বুঝি দিলা
যাজ্ঞিকের অত্যুচ্চ আসন।
কেন তবে নিম্নে আজি,—
কেন তবে লুণ্ঠিত ধূলায়।—
মুকুটের মধ্য মণি
পদতলে পড়িয়া লুটায় !
কোন্ গ্রহ প্রতিকূল ?—
কা'র শাপে এ পরিবর্ত্তন ?
হ'য়ে তবু মনে রেখো,
জগতের বরেণ্য ব্রাহ্মণ !

৩

তোমরা বিশ্বের গুরু,—
মুক্ত কৈলে বিদ্যার ভাণ্ডার ;
জনক ও নিয়ামক,
তোমরাই আদি সভ্যতার।

অজ্ঞতার কুয়াসায়,
ঢাকা যবে ছিল এ ধরণী।
জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিয়া,
দেখাইলে সত্যের সরণি।
মানব-গন্তব্য পন্থা,
দিলে শেষ করি' নির্দ্ধারণ;
তৃষিতে সন্তান হিলে,
অমৃতের কোথা প্রস্রবণ।
প্রচারিলে ব্রহ্মতত্ত্ব,—
চিনাইলে আত্মার স্বরূপ;
ব্রাহ্মণ-বিবৃত বাণী
চির সত্য, অমৃতের কূপ!

৪

সর্ব্ব শক্তি গাঢ় করি,—
ধন, রত্ন, ধান্য, পরিচ্ছদ;
অনিত্য বুঝিয়া মনে,
বর্জ্জিলে এ পার্থিব সম্পদ।
প্রাসাদ করিয়া তুচ্ছ,
তৃণগুচ্ছ করি আহরণ;
কুটীর বাঁধিলে বনে,
হে বিশ্বের নমস্য ব্রাহ্মণ!
ত্যাগের উন্নত চিত্ত,
সংযমের মূরতি মহান্;
নিঃস্ব তুমি, হে আচার্য্য!
শিষ্যে করি সর্ব্বস্ব প্রদান!
স্মরিয়া সে তপোধন
পুলকে পূর্ণিত হয় প্রাণ,—
ভাবিলেও ধন্য হই,
আমি সেই ব্রাহ্মণের জাতি!

৫

হে ব্রাহ্মণ! একদিন,
রাজপাট করি' অন্যে দান ;
কুশের আসনে বসি'
করপাত্রে কেবে জলপান।
বল্কলে নিবারি' লজ্জা—
তেয়াগিলে পার্থিব বিভব ;
মস্তকমণ্ডন লয়ে,
দারিদ্র্যের বাড়াইলে গৌরব!
কিন্তু আ'জ কোথা তুমি,—
কোথা তুমি ব্রেণ্য ব্রাহ্মণ ;
অন্নমুষ্টি লভিবারে—
দ্বারে দ্বারে করিছ ভ্রমণ।
ত্যাগের মহান্ মন্ত্র,
ভুলে আজি; একি সর্ব্বনাশ ;
ভোগ-মগ্ন সে ব্রাহ্মণ,—
সে ব্রাহ্মণ বিষয়ের দাস!

৬

ভুলে যাও বর্ত্তমান
স্মরিয়া সে অতীত গৌরব ;
সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়া
জাগাও এ শ্মশানের শব
আবার জাগিতে হ'বে
সবিতায় করিয়া স্মরণ ;
আবার উঠিতে হ'বে
বেদ মন্ত্র করিয়া গ্রহণ।
আবার বসিতে হ'বে,
শূন্য সেই পৈতৃক আসনে ;
আবার শাসিতে হ'বে,
এ পৃথিবী জ্ঞানের শাসনে।
হে ব্রাহ্মণ!—হে ভুদেব!
হে মহর্ষিবংশের নন্দন!
হে নমস্য! এ দীনের
নমস্কার করুন গ্রহণ।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত ইতিহাসের উপাদান।

ভারতের প্রকৃতীয় ইতিহাস নাই বলিয়া বিজ্ঞজন সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে। কথাটা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। বহুপূর্ব্বে এ প্রসিদ্ধ—ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন যে, মেকেন্দর শাহের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতে কোন ঘটনার যথাযথ কালের নির্ণয় হয় না এবং মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন অসম্ভব বিষয়। আধুনিক পণ্ডিতগণের গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম-উপলব্ধ বাক্যের অসারতা কতকটা পরিমাণে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইলেও ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতগণ ও আর, জি, ভাণ্ডারকর প্রমুখ দেশী ঐতিহাসিকবর্গ ৩২৭ পূঃ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকার মধ্যে আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইতিহাস এখন লোকলোচনের অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মক্‌সমুলর ব্রুমফিল্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ বৈদিকযুগের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ভারতীয় সভ্যতাসম্বন্ধে নিজেদের মত প্রকাশ করিয়া বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মত একদেশদর্শিতা-দোষ-দুষ্ট হইলেও তাঁহারা ভারত ইতিহাসের দেশী পণ্ডিতগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতীয় সভ্যতার মূল উৎস অতীতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। এক বগ্‌বেদেই এই পুরাতন সভ্যতার বীজ দৃষ্ট হয়। পরে কালক্রমে ইহা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ বিকাশ হইয়া ভারতীয় হিন্দু-সমাজরূপ এক প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বে তাহা বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে যদিও এই বৃদ্ধ-সমাজ-শরীরে শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। ঔষধের সাময়িক উত্তেজনা প্রভাবে সমাজে কোন সাড়া দিয়াছিল—ইহার শীর্ণ ধমনীতে নূতন রক্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, সমাজে কিছু নূতন শক্তি দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সেই শক্তি—সেই নিদারুণ অসুস্থতাকে স্থায়ী হইয়াছিল। হিন্দুসমাজ পুনরায় ধীরে ধীরে

হইয়া পড়িল। সম্পূর্ণ মৃত্যু হয় নাই—শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয় নাই—কিন্তু ঘোর তামসিকতায় নিচোল হইয়া পড়িয়াছিল—জীবন আছে, কিন্তু চেতনা নাই, প্রজ্ঞা নাই, উদ্দীপনা নাই, আছে শুধু—নৈরাশ্যের হাহুতাশ, অতীতের শূন্যগর্ভ গর্ব্ব ও দাসজাতি-সুলভ রুদন ও স্বদেশদ্রোহিতা।

হিন্দুসভ্যতার ইতিহাস নাই যাঁহারা বলেন, ইতিহাসসম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্তিমূলক। যদি ইতিহাস বলিতে রাজ-রাজড়ার সিংহাসনারোহণ, কোন যুদ্ধজয় কিম্বা কোন বিশেষ ঘটনার কাল বুঝায়, তাহা হইলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নাই। কিন্তু ইতিহাস বলিলে যদি সাধারণ লোকের সামাজিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ, তাহাদের চিন্তা ও ভাব, ভাষা ও ভরসা, তাহাদের আদর্শ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ, তাহাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক রীতি নীতি ও প্রথা, তাহাদের সাহিত্য, ধর্ম্ম, দর্শন, ললিতকলা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও উন্নতি বুঝায়, তাহা হইলে হিন্দুর অতীত ইতিহাস লিখিবার উপকরণের অভাব নাই। বরং এই উপকরণ এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিত আছে যে, জগতের কোন জাতির তাহা নাই। সভ্যতার যে আলোক প্রাচীন হিন্দুগণ গঙ্গাতোয়া সরস্বতী ও সিন্ধুনদীতীরে জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও উৎপীড়কদের ঝঞ্ঝাবাত—একেবারে নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রদীপের বাতি পুড়িয়া পুড়িয়া নিভিয়া যাইতেছে, অস্পষ্ট আলোক বিতরণ করিতেছে, তৈলাধারে তৈলের অভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয় নাই। মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি বিশ্বতির অতল গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে—তাহারা কেবলমাত্র নামে, পর্য্যবসিত হইয়াছে; দুরন্তকাল তাহাদের অতীত কাহিনী মৃত্তিকাগর্ভে চিরবিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে—সামাজিক ও রাজনৈতিক কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে—তথাপি হিন্দুসভ্যতার জীবধারা এখনও প্রবাহিত হইতেছে। অতীতের তমসাচ্ছন্ন যুগে যে পবিত্র সঙ্গীত পঞ্চনদীর তীরে উদাত্ত স্বরে গীত হইয়াছিল—সোমরসপরিতৃপ্ত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যে সামচ্ছন্দে হৃদয়-দেবতার আরাধনা করিতেন—যে মোহন মন্ত্রের রাগ ও মূর্চ্ছনা স্তব্ধ গগন মুখরিত করিত, তাহা অবনত ভারত এখনও ভুলিতে পারে নাই।

ভারতে ইতিহাসের ধারা এখনও লুপ্ত হয় নাই। যথাযথ ইতিহাসগঠন করিবার মালমসলা বর্ত্তমান আছে। চিরদিন আমরা একটু ভাবপ্রবণ

জাতি—অতিরঞ্জন আমাদের স্বভাবগত। আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাব পূরণীভূত উপকরণরাশির মধ্য হইতে ইতিহাস-গঠন যাদৃশে সার বুঝিয়া লইতে হইবে; কিন্তু সমস্তই কবিকল্পনা, ভুয়ো বলিয়া উড়াইয়া দিতে চলিবে না।

খ্রীষ্টীয় কাল হইতে ৩২৭ খৃঃ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদিগকে সাহিত্য ও দর্শনের উপর নির্ভর করিতে হইবে। প্রধানতঃ বেদ-বেদাঙ্গ সমূহ। বেদে বিশেষতঃ ঋগ্‌বেদে প্রাচীনতম কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়, সংহিতাসমূহ; উহাদের সংখ্যা নিতান্ত অধিক। রাজনৈতিক ইতিহাসের উপকরণ সংহিতাসমূহে পাওয়া যায়। কিন্তু আইন কানুন, সামাজিক জীবনে কর্ত্তব্য, ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ, ও ধর্ম্মানুষ্ঠান রীতি নীতি প্রভৃতি বহুবিধ আবশ্যকীয় তথ্য এই সমস্ত পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। তৃতীয়, রামায়ণ ও মহাভারত। এই দুই বৃহৎগ্রন্থের পুরাতন আকার পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাভারত "হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বকোষ" নামে অভিহিত। বিশ্ব-সাহিত্যে এই মহাভারত এক অপূর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে। ধর্ম্ম, দর্শন, রাজনীতি, যুদ্ধ-শাস্ত্র, সমাজনীতি, পরিবারনীতি প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়া এই মহাভারত এক প্রকাণ্ড মহীরুহের ন্যায় প্রাচীন কাল হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার শীতল ছায়ায় কত সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারী শোক-দুঃখ অপনোদন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার অনন্তকাল ধরিয়া সৎশিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞান বিতরণ করিয়াও এই কল্পতরুরূপী মহাগ্রন্থের পূর্ণতার স্বল্পমাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। ঐতিহাসিকের চক্ষে মহাভারত ঐতিহাসিক উপাদানের অনন্ত খনিরূপে প্রতিভাত হয়। ইহাতে যে কেবলমাত্র তদানীন্তন অবস্থার কথা জানিতে পারা যায়, তাহা নহে, মহাভারত যুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু বিষয়ও জানিতে পারা যায়।

আদি কাব্য রামায়ণ সম্বন্ধে অনেকটা পরিমাণে ইহাই খাটে। রামায়ণও তাৎকালিক সামাজিক অবস্থার নিখুঁৎ চিত্র যথেষ্ট লিপি-কৌশলতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। তবে ইতিহাসের উপাদান রামায়ণে অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায়। রামায়ণে ভাষা, ভাব, চরিত্র-অঙ্কন, লিপি চাতুর্য্য প্রভৃতি

বিধ গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহাতে হাস্যোদ্দীপক, অত্যাশ্চর্য্য ও বীভৎস ঘটনা বিবৃত হওয়ায় কবিজনসুলভ কল্পনা নগ্নমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ধর্ম্মসূত্র, শ্রৌতসূত্র, ও গৃহ্যসূত্রসমূহে হিন্দুজীবনের প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড নিয়মবদ্ধভাবে উল্লিখিত ও বিধিবদ্ধ হইয়া সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া সংহত করিয়াছে।

বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহ, অশোকের কীর্ত্তিস্তম্ভ, জাতক গল্প লহরী, মেগাস্থিনিস্ কর্ত্তৃক মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন প্রণালীর বিবরণ, প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তরফলক ও লিপিলিপি প্রভৃতির সাহায্যে বৌদ্ধযুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইতেছে। খৃঃ পূঃ খ্রীঃ হইতে বহুবিধ রকমের মুদ্রা ভারত ইতিহাসের উপাদান যোগাইতেছে তক্ষশিলা। অযোধ্যা, দিল্লি, মথুরা প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহ খনন করিয়া নূতন নূতন উপাদান সংগৃহীত হইতেছে এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের ক্লান্তি পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে।

গ্রীক ও রোমকদিগের লিখিত বিবরণ হইতে ভারতের তদানীন্তন অবস্থা জানিতে পারা যায়। টিসিয়স্, পেরিপ্লস্ অব্ দি ইরোথ্রিয়ান সি, টলেমিকৃত ভূগোল, ফাহিয়েন, ইয়ানুচাঙ্গ, ইচিং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণ অত্যন্ত মূল্যবান্। গুপ্ত রাজগণের শাসনকালে ব্রাহ্মণধর্ম্মের পুনরুত্থানে সংস্কৃত সাহিত্যের মৃতশরীরে নব জীবনের আবির্ভাব হইয়াছিল, গতিহীন শাহিত্রয় সমাজকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, জাতীয় জীবনে নূতন স্রোত প্রবাহিত হইয়া এক প্রবল উদ্দীপনা আনয়ন করিয়াছিল, এই যুগ পুরাণ ও কাব্য। সমন্বিত আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্ম সম্পদপূর্ণ জাতীয় আদর্শগুলি লোকমধ্যে প্রচার করিয়া প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল। এই পুরাণে ও কাব্যে জাতীয় কর্ম্মধারা—জীবনযাত্রার প্রথা-পদ্ধতি পরিস্ফুট; অতএব ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস জানিতে হইলে, বিশিষ্টতা, লক্ষ্য ও আদর্শ জানিতে হইলে আমাদিগকে পুরাণ ও কাব্যরূপ জাতীয় চিন্তার দুই বিশাল শাখার অনুসন্ধান রাখিতে হইবে।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল।

ছোট গল্প।

(মোপাসা হইতে অনুবাদিত)

পারিসের অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে—লোকজন অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছে। ছোট চড়ুই পাখীগুলি পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পায় না। দেখিতে পাইলেই লোকে তাহাদের মারিয়া ফেলে। মানুষে যাহা পায়, তাহাই খাইয়া ফেলে।

মঁসিও মরিসট ঘড়ীর কারবার করিতেন। উপরোক্ত অবরোধের সময়, ওভারকোটের পকেটে হাত দিয়া, জানুয়ারীর শীতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দোকানের দিকে চলিয়াছেন। অকস্মাৎ পথে অন্য একজন পথিকের সঙ্গে তিনি ধাক্কা খাইলেন। চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহারই বন্ধু মঁসিও সোঁভেজ।

যুদ্ধের পূর্ব্বে মরিসট প্রতি রবিবার খুব ভোরে ছিপ ও আধার লইয়া, অঁতুয়ঁতা মাবান্তা দ্বীপে পৌঁছিয়া মাছ ধরিতে বসিতেন। প্রতি রবিবারেই এইখানে তাঁহার সহিত কাটাকাপড়ওয়ালা সোঁভেজের সহিত দেখা হইত—মঁসিও সোঁভেজও প্রতি রবিবারে এই স্থানে ছিপ লইয়া আসিতেন।

প্রথমে, একের সহিত অপরের আলাপ পরিচয় ছিল না। পরে, ধীরে ধীরে বন্ধু হইলেন। প্রথমে, একে অপরের দিকে মধ্যে মধ্যে চাহিতেন মাত্র; পরে ১।১টী কথা হইত; অবশেষে বন্ধুত্বটা পাকিয়া গেল।

এখন পারিস অবরুদ্ধ—আর ছিপ লইয়া যাওয়া চলে না—একের সহিত অপরের দেখা হয় না। তাই যখন অকস্মাৎ একজন অপরের সহিত ধাক্কা খাইলেন, তখন প্রথমে দুইজনে খুব হাত নাড়ানাড়ি করিলেন। মঁসিও সোঁভেজ দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিলেন, "কি আপদেই পড়া গিয়াছে!" মঁসিও মরিসটও মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিলেন "যা বলেছ! এমন সুন্দর প্রাতঃকাল—রবিবার, আর পহেলা জানুয়ারী। কোথায় ছিপ লইয়া যাই, তা না, কি আপদ!"

মঁসিও সোঁভেজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দিনই ভাই গিয়াছে! আর ছিপ লইয়া দিন কাটিবে না।" তাঁহারা নিকটস্থ "কাফী" গৃহে গমন করিয়া একটু গরম হইয়া আবার চলিতে লাগিলেন।"

হঠাৎ সোঁভেজ বলিলেন, "আমরা আবার যদি যাই?"

"কোথায়?"

"বিলক্ষণ! ছিপ লইয়া?"

"আহা, তাহাত বুঝিলাম। কিন্তু যাইব কোথায়?"

"বিলক্ষণ! মাগ্রাহাঁপে!"

"ঘাঁটী যে আটকান রহিয়াছে!"

"তা হোক! সেনাপতি দুমোরি আমার বন্ধু। সুতরাং আমরা ছাড় পাইব।"

আহ্লাদে মরিসট যে কি করিবেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না। দুই জনে বাড়ী যাইয়া সরঞ্জাম ও ছিপ সহ ঘাঁটীর নিকট পৌছিলেন। সেনাপতি দুমোরি বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিলেন—আর ছিপ সহ বন্ধুদ্বয়, আটখানা হইয়া দ্বীপে পৌছিলেন।

দ্বীপে পৌছিয়া মঁসিও সোঁভেজ নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালার দিকে চাহিলেন—পর্ব্বতমালায় জার্ম্মাণসৈন্য তাঁবু ফেলিয়াছে। এতদিন তাঁহারা জার্ম্মাণদের কথাই শুনিতেছিলেন। তাহারা তাঁহাদের প্রিয় পারিস অবরোধ করিয়াছে; স্বদেশকে লুণ্ঠন করিয়াছে; তাহারা অপরাজেয়, কিছুতেই তাহাদের গতি প্রতিহত করা যাইতেছে না। মরিসট বলিলেন, "যদি উঁহাদের সহিত দেখা হয়!" সোঁভেজ উত্তর করিলেন, "বেলত! তাহাদের আহারের জন্য কিছু মাছ দেওয়া যাইবে।"

দুইজনে মাছ ধরিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহাদের আর অন্য চিন্তা থাকিল না; বেলা বাড়িয়া যাইতে লাগিল; ছিপ ফেলিতেছেন, মাছ উঠাইতেছেন—আর অন্য কথা নাই।

অকস্মাৎ কামানের শব্দ শোনা গেল। মরিসট দেখিলেন যে, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালার উর্দ্ধ হইতে একটি কামান গোলাবর্ষণ করিতেছে—পরক্ষণেই পারিসের দুর্গপ্রাচীর হইতে অন্য কামানে প্রত্যুত্তর দিতেছে। সোঁভেজ বলিলেন, 'তাহারা আবার আরম্ভ করিয়াছে।' মরিসট বলিলেন, কি ভয়ানক! এক একবারে একজনকে মারিতেছে। সোঁভেজ বলিলেন, "ঠিক যেন পশু।"

হঠাৎ তাঁহাদের বোধ হইল যে, কে যেন তাঁহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ফিরিয়া দেখিলেন যে, চারিটি লোক চারিটী বন্দুক তাঁহাদিগের দিকে লক্ষ্য করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাদের হাত হইতে ছিপ পড়িয়া গেল।

মধ্যে ঐ চারিজন জার্মাণ সৈনিকের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া লইয়া গেল। বাঁচের ওপিঠে লইয়া তাহারা ছুটিল।

বন্ধুরেই অবসন্ন জার্মাণ সেনাপতি বসিয়া ছিলেন। তাঁহার পদতলে মাছের পলিটা রাখিয়া জার্মাণচতুষ্টয় আদেশ প্রতীক্ষায় অভিবাদন করিল। সেনাপতি একবার মরিসট ও সোঁভেজের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা ফরাসী গুপ্তচর। যদি জরুরী গোপনীয় কিছু আমাকে বলিতে পার ভাল। নতুবা এক্ষণেই তোমাদিগকে হত্যা করা হইবে।

দুইবন্ধু কোন কথা কহিলেন না। জার্মাণ-সেনাপতি বলিতে লাগিলেন, "অন্য কেহই একথা জানিতে পারিবে না। বলিবা মাত্র আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব এবং তোমরা স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে। অন্যথা করিলে নিশ্চিত মৃত্যু।

তবুও দুই বন্ধু কোন কথা কহিলেন না—তাঁহারা বিন্দুমাত্র নড়িলেনও না।

সেনাপতি ধীরভাবে নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বিবেচনা করিয়া দেখ—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হয় তোমরা ঐ নদীর তলদেশ শোভা করিবে অথবা গৃহাভিমুখে যাইবে।" তবুও তাঁহারা নির্ব্বাক্, নিশ্চল।

সেনাপতি জার্মাণ ভাষায় কি বলিলেন। কুড়ি জন জার্মাণসৈন্য বন্দুক লইয়া বন্ধুদ্বয়ের দিকে লক্ষ্য করিল। সেনাপতি কি ভাবিয়া, সোঁভেজকে এক-পার্শ্বে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমাকে এখনই গুপ্তশব্দটী বল। তোমার বন্ধু কিছুই জানিতে পারিবে না। এখনই বল।" কিন্তু সোঁভেজ পূর্ব্বেরই ন্যায় নির্ব্বাক্, নিশ্চল রহিলেন।

তখন সেনাপতি মরিসটকে লইয়া সেই প্রশ্ন করিলেন,—মসিও মরিসও নির্ব্বাক্, নিশ্চল রহিলেন।

তখন আবার দুই বন্ধু একস্থানে আনীত হইলেন। সেনাপতি দ্বিতীয় আদেশ দিলেন। সৈন্যেরা বন্দুকগুলি বন্দীদের প্রতি ঠিক করিয়া লক্ষ্য করিল। মরিসটের দৃষ্টি সেই মাছের পলিটার উপর পড়িল। তিনি সেই দিকে চাহিয়া বন্ধুর হস্তগ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ভাই বিদায়।" সোঁভেজেরও দৃষ্টি ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই মাছের দিকে পড়িয়াছিল—একই মুহূর্ত্তে তিনিও বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই বিদায়।"

সেনাপতি আদেশ দিলেন, গুলি কর। একই মুহূর্ত্তে দুটী বন্দুকের আওয়াজ হইল। সোঁভেজ ও মরিসট ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

সেনাপতি অন্য একটী আদেশ দিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা ইনি গোণা করিয়া রজ্জু ও প্রস্তর সহ প্রত্যাবর্তন করিল। মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তরগুলি বন্ধু-গণের পায়ের সহিত বাঁধিয়া—তাঁহাদিগকে নদীতীরে লইয়া গেল।

সেনাপতি এক্ষণে মাছের থলির দিকে চাহিয়া তাঁহার পাচককে ডাক দিলেন। "দেখ, মাছগুলি তাজা থাকিতে থাকিতে আমার জন্য ভাজিয়া আন।"

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

মূক।

ছিল মোর একদিন উষা-কোলে মেলিয়া নয়ন
নিঝুম নীড়ের বুকে আগু-জাগা পাখীর মতন
গানে গানে সুরে সুরে খেলিতাম ছাইয়া ভুবন
আকুল-পুলকে কিবা বিকশিত জীবন যৌবন!

ঘুচে যেত ধীরে ধীরে ধরণীর জড়িমা-আঁধার,
ফুটিত ফুলের হাসি, বহিত সমীরসুধা তার!
আসিত কিরণ-শিশু পায় পায় নামিয়া ধরায়,
গাঁথিত শিশির-মালা, বিহরিত বীচির দোলায়!

সুনীল আকাশ আর বসুধা এ শ্যাম-আভরণা,
অমিয়া-বিলাত মোরে মায়া-ডোরে বাঁধিয়া কত না!
মনে হ'ত চারি পাশে শুধু হাসি শুধু খেলা গান
উছলিছে উথলিয়া কি আবেগে ভরি সারা প্রাণ!

আজি যেন সব কিছু হয়ে গেছে 'দূর' আর 'পর'
উদাস হৃদয়-মন চেয়ে আছে বিরহ-কাতর!
আননে সরে না বাণী কোনখানে নাহি পায় ঠাঁই,
হায়রে! দোণার কাঠি জাগিবার আশাটুকু নাই!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

আমার স্বপ্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দেখিলাম এক মহাবৃক্ষ বৃহৎ বৃহৎ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া অরণ্যের বিস্তীর্ণ স্থান আচ্ছন্ন করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, অন্যান্য সকল বৃক্ষই ইহার বিধ্বস্ত ও একভাবাপন্ন। আরো চমৎকার—এই বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে। ইহার অবলম্বিত স্থান যে কত উর্দ্ধে, তাহা চক্ষুর গোচরীভূত নহে। আরও এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার দৃষ্ট হইল,—অনন্যস্থ বৃক্ষের মূল শেষে এক আকার ধারণ করিয়া অনন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। অনেক ক্ষণ ধরিয়া আমি এই বৃক্ষসংক্রান্ত অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু অবধারণ করিতে পারিলাম না। তখন দেবী আমায় কৃপাপূর্ব্বক কহিলেন—'বৎস, বুঝিতে পারিতেছ না,—এই তরুর নাম 'সংসার'। এই যে অঞ্জন দিলাম, চক্ষুতে ধারণ করিয়া দর্শন কর, ইহার সকল তত্ত্বই বুঝিতে পারিবে। তাঁহার নিকট শুনিলাম, সেই অঞ্জনের নাম 'জ্ঞানাঞ্জন'। জ্ঞানাঞ্জন-যোগে দর্শন করিলাম, এ বৃক্ষের সকলই অদ্ভুত। অজ্ঞান ইহার বীজ; অহঙ্কার অঙ্কুর; মমতা ইহার স্কন্ধ, ক্ষেত্র ইহার উচ্চশাখা; পুত্রকলত্রাদি ইহার পল্লব; ধন ধান্য পত্র; পাপ ও পুণ্য পুষ্প; সুখ ও দুঃখ ফল; মোহাচ্ছন্নতা সহ যে বিবিধ সম্বন্ধবন্ধন, তাহাই ইহার আলবাল; বিবিধ ভোগলিপ্সা-ভূরুগণ ইহাতে সতত উড্ডীয়মান; মনুষ্যগণই পক্ষী; তাহারা ইহার উচ্চশাখায় অবস্থিতি করিয়া ফল-ভোগ করিতেছে। দেখা গেল, অধিকাংশ পক্ষীর ভাগ্যে দুঃখফল ভিন্ন কিছুই ঘটে না। দেবীর নিকট শুনিলাম, সে ফলভোক্তা সকল পক্ষীই দোষী; তাহারা আপনাদিগ দোষেই এই ফলভোগরূপ দারুণ দুর্দ্দিশাকে পতিত হয়। তথাপি ইহারা এমনি অবোধ যে, বীয় স্বভাবের সুব্যবহার করে না। সুখফলের প্রত্যাশী হয়। যদিও সুখফলের জন্য তাহারা লালায়িত সত্য, কিন্তু স্বপ্রকৃতিকে কিরূপ পরিচালনা করিলে যে তাহা লাভ হয়, তাহা তাহারা বুঝিতে চায় না। ইহাও শুনিলাম, এ বৃক্ষের মূলে এক পক্ষী

যদিও আপাত বেশ সুখরোচক, কিন্তু পরিণামের পক্ষে পীড়াদায়ক। এই এই বৃক্ষ বহুদিবস বর্দ্ধিত ও ঘনপল্লবিত হইয়া সকলের নিবৃত্তিপুরের পথ রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। যাহারা ক্ষণভঙ্গুর অনার সুখলাভ-লালসায় লালায়িত, তাহারাই এ তরুর ছায়া আশ্রয় করে। অধর্ম্মরাজের মহাপ্রলোভনে কেহই বুঝিতে পারে না, ইহার সুখ,—কুপিত ফণি-ফণাচ্ছায়াসদৃশ ক্ষণবিধ্বংসী অথচ ধ্বংসকর। যদি প্রজ্ঞাদেবীর উপদেশস্বরূপ মহৌষধ সেবন করিতে পারে, তবেই মঙ্গল।

"তোমরা পথশ্রান্ত হইয়াছ, এইস্থানে ক্ষণেক বিশ্রাম কর, আমি একবার অন্য যাত্রীর সন্ধানে যাইব। বৎস বিরাগ, তুমি ইহার নিকট এই দুইটী দণ্ড ধারণ করিয়া সাবধানে অবস্থিতি কর।" এই বলিয়া দেবী চলিয়া গেলেন।

মহাত্মা বিরাগ কহিলেন,—"দেখ বৎস, আজকাল অধর্ম্মরাজের প্রতাপ এখানে অদম্যরূপে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আমার পিতা মহাশয় বহুদিবস হইতে অধর্ম্মরাজকে শাস্তি দিবার জন্য সতত সচেষ্ট আছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কতদিনে যে দুর্ম্মতির দুর্গতি ঘটাইতে পারিবেন, তাহা জানি না। সেই দুষ্টের জন্যই আমার পিতার রাজ্যে প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি পায় না। আমরা প্রণপণপূর্ব্বক অনেক যাত্রীরে বলদ্বারা লইয়া আসিলেও দুরাত্মার গুপ্তচরেরা কিরূপ মোহিনীমন্ত্রে তাহাদের চিত্ত বিকৃত করিয়া দেয় ও আপন প্রভুর রাজ্যে লইয়া যায়। পাপিষ্ঠ অধর্ম্মরাজ স্বয়ং যেমন কঠিন ও পরশ্রীকাতর, তাহার অনুচর সকলেরাও তদ্রূপ বা তদধিক দুঃশীল। তাহারা কেহই পরের ভাল দেখিতে পারে না। অধিকন্তু পদে পদে অনিষ্ট করিয়া যেন কৃতার্থ হয়।" এই রূপে অধর্ম্মরাজের নিন্দা প্রত্যুত ধর্ম্মরাজের প্রশংসার কথা হইতেছে, এমন সময়, কে রে? কোন্ নষ্ট দুষ্ট আমাদের মহারাজের অনিষ্ট চেষ্টা ও গ্লানি করিতেছে? আজ তাহার নিস্তার নাই।" এই বলিয়া গগনভেদী কর্কশস্বরে দশদিক্ পূর্ণ করিয়া আরক্ত নয়নদ্বয় আবর্ত্তন করিতে করিতে কম্পিতকলেবরে এক ভীষণাকার পুরুষ উপস্থিত হইল। তাহার পর আমাদের উভয়ের মধ্যে বিরাগ মহাশয়কে অধিকতর ভয় প্রদর্শন ও ভৎর্সনা করিতে লাগিল। তিনি কোন কথাই না কহিয়া স্বীয় হস্তস্থিত দণ্ড দুইটী বাহির মাত্র দুরন্ত চীৎকারপূর্ব্বক স্বীয় গর্ব্বসহ ভূমে পতিত হইল।

সেই শব্দানুসারে তথায় আর একজন বিকট বেশধারী পুরুষ আসিয়া 'কই' বলে ইতস্ততঃ কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পরে প্রকাশ করিল, কহিল,—"কই ক্রোধ মহাশয় যে এইদিকে কোন যাত্রীর পেটি বাঁধিলেন, দেখিতেছি না কেন? এই দিকেইত তাঁহার কণ্ঠস্বরসদৃশ শব্দ শুনিতে পাইলাম! তিনিত গুপ্ত থাকিবার ব্যক্তি নন!" সেই পতিত ব্যক্তির নাম ক্রোধ। এমন সময় আর একজন ভয়ঙ্করপ্রকৃতির পুরুষ আসিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কহিল,—পাপ মহাশয়, অনর্থ ও উদ্বেগনামক আমাদের দুইজন লোক গিয়া আমাকে সংবাদ দিল,—তাত মহাশয়, আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বুঝি এতদিনে দুরাত্মা বিরাগ মহাত্মা ক্রোধকে বিনাশ করিয়াছে; আপনি শীঘ্র আসুন।" প্রভো, পাপ, তাকি সত্য? ক্রোধ গেলে আমাদের অধর্ম্মরাজের রাজ্য আর কে রক্ষা করিবে? তিনিই আমাদের মহারাজের একমাত্র ভরসাস্থল, তিনিই আমাদের অধর্ম্মরাজ্যের প্রধান পরিত্রাণ, তিনিই আমাদের বল বিক্রম বুদ্ধি সকলই। সহসা 'শোক' নামধারী এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল। সে তাহাদের নানারূপ আলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিল,—'তোমাদের আজ এ প্রকার ভাব দেখি কেন? তাহার নিকট শোক আগন্তুক শোকনামক ব্যক্তিকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাইলে পর, সে উত্তর করিল,—কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! তোমাদের এত ভয়! ক্রোধ মহাত্মার কি মৃত্যু আছে? বিশেষ করিয়া দেখ হয় ইনি নিদ্রা গিয়াছেন, নয় কাহারও সহিত যুদ্ধ বিশেষ আঘাত পাইয়া কাতরদেহে পতিত আছেন! যাহা হউক, যখন পাপ মহাশয় উপস্থিত, তখন আর ভয় কি? ইহাঁর স্পর্শমাত্রেই ত ক্রোধ মহাশয়ের বল পূর্ব্ববৎ প্রবল হইবে।" আশ্চর্য্য,—অগ্নিকণা স্পর্শে বারুদ যেমন অচিরাৎ উদ্দীপ্ত হয়, যাহার নাম শুনিলাম পাপ, তাহার সংস্পর্শ মাত্রে ক্রোধও তদ্রূপ দ্রুত গাত্রোত্থান করিয়া নয়নাগ্নিতে যেন দশদিক্ দগ্ধ করিতে লাগিল। "তোমরা সকলেই আসিয়াছ? উত্তম হইয়াছে। কই সে রাজ-দ্রোহী দুর্ব্বৃত্ত বিরাগ কোথায় গেল? বিনাশ ব্যতীত আমাদের কার্য্যান্তর নাই। কুশলে সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবার বাসনা থাকে, তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিতে বলিতে দুর্ব্বাশয় ক্রোধ যেমন আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অমনি বিরাগ মহাশয় সেই দণ্ডদ্বয় পুনর্ব্বার প্রদর্শন মাত্রেই তাহারা কোন্ দিকে অন্তর্হিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! এই ত

ঘটনা পলকের মধ্যে ফুরাইল। দেখিতে দেখিতে মহাশৃঙ্গধারী এক বৃহৎ ছাগ বৃক্ষের পত্রসমূহ উৎকীর্ণ ও ভক্ষণ করিতে করিতে 'মে' 'মে' শব্দসহ উপনীত হইল। দেখিলে বোধ হয়, সে অরণ্যের সমস্ত প্রাণীকে অনায়াসে দমিত করিতে পারে। শৃঙ্গাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে পারে। কিন্তু হইলে কি হয়, বিরাগ মহোদয়ের হস্তস্থিত দণ্ডদ্বয়ের তেজঃ-পুঞ্জপ্রভাবে সেও তৎক্ষণাৎ পলায়মান হইল। তদনন্তরে রক্তাক্ষ বিপুল-বিক্রম প্রকাণ্ডকায় এক মহিষ সমস্ত বন বিত্রাসিত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে আগমন করিল। তাহার পশ্চাতে এক ললিতজিহ্ব কুক্কুর, তৎপশ্চাতে এক ভয়ানক অজগর; তৎপশ্চাতে এক ভীষণ আশীবিষ। তৎকালে যদিও আমার হৃদয় মধ্যে ভয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু প্রজ্ঞাদেবীর নিকট হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যদ্বয় আমার অভয়ের অনেক কারণ ছিল। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের ভাবগতি অবলোকন করিলাম;—সেই অজগরের আকৃতিও যেমন ভয়ানক, প্রকৃতিও তদ্রূপ ভয়ানক। সে তাহার সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণী মাত্রকেই উদরসাৎ করিতে লাগিল। সেই বিষধরের দন্ত ও পুচ্ছাঘাতে কত জন্তু যে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল, কত প্রাণী যে প্রাণ হারাইল, তাহার সংখ্যা নাই। সে অতীব ভীতিপ্রদ। অন্যান্যের নিকটে বরং অব্যাহতি পাইতেছি, কিন্তু সে যে কখন কোন্ ছিদ্রে সকলকে পীড়া দিতে লাগিল, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই পরমপূজ্যা প্রজ্ঞাদেবী স্বীয় দলবল সহ প্রত্যাগত হইলেন।

দেবী আমাকে কথঞ্চিৎ ভয়ব্যাকুল অনুমান করিয়া অভয়দান করিলে আমি ভক্তিগদ্গদ-চিত্তে প্রণিপাত করিয়া কহিলাম,—"মাতঃ! এখনি কতগুলি হিংস্র পশু আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, আপনার শ্রীচরণপ্রসাদেই পরিত্রাণ পাইয়াছি।" তিনি কহিলেন, বৎস, সমস্ত আমার অবগত আছে। আমার সাক্ষাতে তাহাদের আবির্ভাব হইবে না বলিয়াই তোমাদের নিকট হইতে কিছু অন্তরিত হইয়াছিলাম। এখানকার এই সকল আভ্যন্তরিক তত্ত্ব তোমাকে বিদিত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এস চিনিতে পার নাই, যাহা ছাগরূপ দর্শন করিয়াছ, সে বস্তু ছাগ নহে—কাম। উহার ঐ একটি মাত্র আকার নয়। উহার অনন্ত আকৃতি। সে ক্ষণে রূপ পরিবর্ত্তন করে। একবার মহাদেব উহাকে ভস্ম করিয়াছিলেন, তথাপি উহার মৃত্যু হয় নাই। উহার এক অদ্ভুত প্রকৃতি; উহার

একটী অণু হইতেই প্রকাণ্ড তনুর গঠন হয়। যাহাকে কুক্কুররূপে অবলোকন করিয়াছ, সে বস্তুতঃ কুক্কুর নহে—'লোভ'। তাহার পর যে মহিষ দৃষ্ট হইল, সেটা বাস্তবিক 'মদ'। অজগর নহে, সে 'মোহ'। যাহাকে আশীবিষরূপে দেখিলে, সেও যথার্থ 'আশীবিষ' নহে—'মাৎসর্য্য'। ইহাদের পূর্ব্বে যে ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিলে, তাহারা এই অরণ্যের প্রধান দস্যু। ইহারা সকলেই কামরূপী। অধর্ম্মের একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য বা মোসাহেব। রাজবাড়ী কিছু অবসর পাইলে, ইহারা পথিকদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। যে দণ্ডধরের প্রভাবে পশুদের পরাভব দেখিলে, তাহা 'ন্যায়' ও 'সত্য'। দেখ, যে স্থানে প্রেম, পবিত্রতা ও সত্য বিদ্যমান, সেখানে অধর্ম্ম কোন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না। বৎস, ঐ সুবিস্তৃত পুষ্পসমাকীর্ণ মনোহর পাদপরাজি-পরিশোভিত সুন্দর একটী পন্থা পরিদৃষ্ট হইতেছে, উহাই অধর্ম্মরাজ্যগমনের পথ জানিবে। ঐ পথের নাম 'প্রেয়ঃ পথ'। আমরা সঙ্গে আছি বলিয়া, তুমি পথশ্রান্তি অনুভব করিতে পার নাই, নতুবা জানিবে—আমাদের অতিক্রান্ত রাস্তাটি আসিতে যত 'প্রেয়ঃ' পথ আপাততঃ তেমনি সুগম। অতিক্রান্ত পন্থার নাম 'শ্রেয়ঃপথ'। আমরাই এই 'শ্রেয়ঃপথে'র পথিক। আমি কহিলাম, 'দেবি, আমার যেন বোধ হইতেছে, পূর্ব্বে আমি কয়েকবার এই শ্রেয়ঃপথের অনেকদূর আসিয়াছিলাম, কিন্তু নানারূপ বিঘ্নবাধা ও ভয় প্রযুক্ত ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সত্য এক্ষণে বুঝিলাম, শ্রেয়ঃপথটি প্রথমে যত কুটিল ও দুর্গম বোধ হয়, তত যাওয়া যাইবে, ক্রমশঃ ততই সুগম ও সুপ্রকর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আর্য্যে! শ্রেয়ঃপথের বিঘ্ন বহুতর। সেই প্রতিবন্ধকতাগুলি কোনরূপে দূরীভূত করিতে পারিলে প্রচুর মঙ্গল। নতুবা ইহাতে শুভাশা একেবারেই নাই। দেবী কহিলেন,—'বৎস, তুমি যথার্থই স্থির করিয়াছ, ইহার বিঘ্নগুলি বিদূরিত করিতে না পারিলে ধৈর্য্য ধরিয়া সাধু-সঙ্গ, সাধুসেবা ও সাধুজনের সৎপরামর্শ গ্রহণ না করিলে ক্রমক্রমে লোক ঐ শ্রেয়ঃপথের পথিক হয়। পরিশেষে অধর্ম্ম রাজ্য উপস্থিত হইয়া অনুতাপের বিষম প্রতাপে তাপিত—ব্যথিত হইতে থাকে। শ্রেয়ঃপথে চলিতে হইলে, দেহরথের ধৈর্য্য-সারথিকে বড়ই দৃঢ় ও অধ্যবসায়ী হইতে হয়। চল, অধর্ম্মরাজ্যের অধিবাসীদের কিরূপ দুঃখ-দুর্গতি, কিরূপ পরাধীনতা, কিরূপ পরিণাম পরিতাপ, তাহা তোমাকে একবার দেখাইব। সাবধান, তথায় উপস্থিত হইলে, মদস্ত এই বস্তুদ্বয় পরিত্যাগ করিতে কত জনে তোমায় কত পরামর্শ দিবে তাহাদের সে সকল শিষ্ট কথায় কর্ণপাত করিয়া আপনার অধঃপাতের পথ

পরিষ্কার করিও না। সেস্থানের কাহারও সহিত আলাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। ভাবিবে না—তজ্জন্য কেহ তোমাকে বাগ্‌বিলাসে অপটু বলিয়া অপ্রশংসা করিবে। তাহারা মৌখিক রুষ্টতা বা অসন্তোষ দেখাইলেও মনে মনে তোমাকে ধন্যবাদ দিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্ম মণ্ডল

মা।

মায়াপুরী।

নীল নভোনীলে কার সুষমা প্রকাশ!
নীল সিন্ধুজলে কার প্রেমের উল্লাস!
অনিলে কাহার আহা জগত জীবন!
আলোয় উজল কার এ তিন ভুবন!
কচি শিশুমুখে কার চারু ফুল হাস!
বিকচ কমলে কার মকরন্দ বাস!
জননীর বুকে কার অমৃতের খনি!
অন্তরে অন্তরে কার প্রজ্ঞা চিন্তামণি!
এ বিচিত্র তরুলতা পশু পক্ষী আর
প্রজাপতি ইন্দ্রধনু বিদ্যুল্লতা কার!
শিশীর কলাপপুচ্ছ বসন্ত পবন
পূর্ণিমার নিশাপতি নক্ষত্র তপন
অমিয় জোছনা আর তমো অমানিশা—
কার ওই শৈলমালা সৃষ্টি দশ দিশা!
অণু পরমাণু আদি বিশ্ব চরাচর
কাহার কাহার করে মহিমা প্রচার!
মায়ার খেলনে রহি, (মন)—চাহিলনা আর
কার এই ইন্দ্রজাল ভোর চারিধার!
ভুলধিকল্লোল ওরে (কেবা) ডাকে আয় আয়!
তবু তুই শুনিলি না, ফিরিলি না হায়!!

শ্রীযোগেশচন্দ্র লালা এম-এ-বি-এল।

কবিবর ৺ রাধামাধব মিত্র।

(২)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কবি রাধামাধব কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। গুপ্ত কবির লোকান্তর গমনের পরে তাঁহার অতি প্রিয় 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদনভার প্রিয় শিষ্য রাধামাধব গ্রহণ করেন। আমরা এক্ষণে কবি ঈশ্বরচন্দ্র এবং 'সংবাদ প্রভাকর' সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা প্রকাশ করিয়া পাঠক মহোদয়গণের কৌতূহল নিবারণ করিব।

ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা ১২১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে জ্ঞেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র মহেশচন্দ্র গুপ্তের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার লড়াই হইত। মহেশচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র উভয়েই প্রথম বয়সে খুব উৎসাহের সহিত জেদাজিদি করিয়া কবিতা লিখিতেন। কবির লড়াইয়ের হিসাবে এ ওকে কবিতা লিখিয়া পাঠান, ও আবার একে তাহার উত্তর দিতেন। ইহাতে উভয়েরই কবিতা লিখিবার স্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরে মহেশচন্দ্র কবিতা লেখা ছাড়িয়া দেন। তখন ঈশ্বরচন্দ্র বলেন,—"দাদা, লেখা ছাড়া কেন?"

মহেশচন্দ্র জবাব দেন যে,—

"ওরে, দুই ভাইয়ের দুই থাকলে লেজ
থাকত না সংসার।
একা তোমার লেজ গেছে মজে
সোণার লঙ্কা ছার খার॥"

১২৩৭ সনে ৺ গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র ৺ যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে ঈশ্বরচন্দ্র "সংবাদ প্রভাকর" পত্র প্রকাশ করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' তখন সাপ্তাহিক ছিল। যোগেন্দ্রমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকরে'র জন্মের তিন বৎসর পরে যোগেন্দ্রমোহন অকাল কালকবলে নিপতিত হইলে 'সংবাদ প্রভাকর' বন্ধ হইয়া যায়। অনন্তর ১২৫১ সালে ৺ কানাইলাল ঠাকুরের সহায়তায় ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় 'সংবাদ প্রভা-

প্রকাশ করেন। ১২৪৫ সালে সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক আকারে প্রবর্ত্তিত হয়। বলা বাহুল্য যে, 'সংবাদ প্রভাকর'ই বাঙ্গালার আদি দৈনিক সংবাদ পত্র। ৺ কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' 'সংবাদ প্রভাকরে'র পরে জন্মলাভ করিয়াছিল; সুতরাং "সুলভ সমাচার" বাঙ্গালার দ্বিতীয় দৈনিক পত্র। অনেকে 'সুলভসমাচার'কেই বাঙ্গালার আদি দৈনিক বলিয়া ভুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ১২৩৭ সালে 'সংবাদ প্রভাকরে'র অভ্যুদয় হয়। সুতরাং আজ পর্য্যন্ত 'সংবাদ প্রভাকর' জীবিত থাকিলে তাহার বয়স ৯১ বৎসর হইত। আর ইং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের 'সুলভ সমাচার' প্রকাশিত হয়। 'সুলভ সমাচার' আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে তাহার বয়স ৫১ বৎসর হইত।

১২৬৫ সালের ১০ ই মাঘ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অকালে স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৬ বৎসর হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর ৺ রামচন্দ্রগুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক হইলেন। কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকরে'র ধারা বজায় রাখিয়া তাহাকে সুপরিচালিত করিতে পারেন, তেমন যোগ্যতা রামচন্দ্রের ছিল না। ইহা লক্ষ্য করিয়া মহেশচন্দ্র তখন গান বাঁধিয়াছিলেন,—

"সাত মেড়াতে জড় হয়ে নষ্ট করলে প্রভাকর।
জন্মে কলম ধরেনিকো রাম হল এডিটর॥"

এই সময় হইতেই রাধানাথ 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। সম্পাদকরূপে রামচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নাম থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে রাধানাথই সম্পাদক ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের 'সংবাদ প্রভাকর' তৎকালে বিশেষ শক্তিশালী কাগজ ছিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের আলোচনাই 'সংবাদ প্রভাকরে' স্থান পাইত। 'সংবাদ প্রভাকরে'র আমলে বাঙ্গালা গদ্য বিশেষ উন্নতি লাভ না করিলেও গদ্য পদ্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া স্বীয় অধিকার বিস্তারের বিশেষ প্রয়াস পাইতেছিল। পদ্যও আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র কবি ছিলেন, সুতরাং 'সংবাদ প্রভাকর' গদ্যে লিখিত হইলেও পদ্যকে গুপ্ত কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' বিশেষ সম্মানের আসন দিয়া রাখিয়াছিলেন। লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদের মত তখন গদ্য পদ্যের ঘোর চলিলেও 'সংবাদ প্রভাকরে' গদ্য পদ্যকে একেবারে হঠাইয়া দিয়া পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। 'সংবাদ প্রভাকরে'র কোন কোন সংখ্যা

আগা গোড়া পদ্যে লিখিত হইত। কেবল বিজ্ঞাপন ভিন্ন ঐসকল সংবাদ পত্রের বিষয় সমস্তই কবিতায় বিকসিত হইত। বলা বাহুল্য যে, গুরু ঈশ্বরচন্দ্রের তিরোধানে শিষ্য রাধামাধবও গুরুনির্দ্দিষ্ট-পথে চলিয়া 'সংবাদ প্রভাকরে' পদ্যকে বিশেষ সম্মানের আসন দিয়া রাখিয়া ছিলেন।

১২৭১ সনে কবি রাধামাধব যখন 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ছিলেন, তখন ঐ সনের ১লা পৌষ বুধবারের কাগজে এইরূপ একটি প্যারা প্রকাশিত হয় যথা :—

"আমাদের সহযোগী শ্রীযুত বাবু রাধামাধব মিত্র, যিনি অধুনা ৺ বাবু মতিলাল শীল মহাত্মা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত শীলস্ ফ্রি কলেজনামক বিদ্যা-মন্দিরে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত আছেন, এবং যিনি এই প্রভাকর পত্রের সম্পাদাতা, কবিকুলচূড়ামণি-৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এক প্রিয়তম ছাত্র, তিনি উক্ত কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু মধুনাথ ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে বহু শ্রেণীস্থ ছাত্রবৃন্দকে সদুপদেশ প্রদানার্থ শীলস্ ফ্রি কলেজের সমূহ ছাত্রের সমক্ষে বঙ্গভাষায় কবিতাপূরিত যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমরা তাহা সর্ব্ব সাধারণ বঙ্গীয় বালকগণের অবগত করণাভিপ্রায়ে এই পত্রে প্রচারিত করিলাম ইত্যাদি।"

ইহার পর রাধামাধব ছাত্রগণকে পদ্যে যে বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা 'সংবাদ প্রভাকরে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ উপদেশাবলীর প্রারম্ভটী এইরূপ যথা :—

"কর প্রিয় ছাত্রগণ! কর প্রণিধান।
তোমাদিগে উপদেশ করিব প্রদান॥
বহুদিনাবধি মনে কোরেছি বাসনা।
সাধিব বিশেষ হিত দিয়া সুমন্ত্রণা॥

ইত্যাদি।

ঐ উপদেশবাক্যের অন্যত্র আছে,—

"তোমরা অলস হ'য়ে যদি কাল হর।
বিদ্যারূপ বিভূষণ, যদি নাহি পর॥
কুসঙ্গে থাকিয়া মাত্র ক্ষয় কর দিন।
বাল্যাবধি যদি হও কুক্রিয়া অধীন॥

তাহা হ'লে তোমাদের কিসে হবে শিব।
তোমাদের অশিবেই দেশের অশিব॥
অতএব দেশের মঙ্গল যদি চাও।
সুস্থভাবে সাথী করি বিদ্যাপথে ধাও॥

অন্যত্র :—

যে সকল গুণে হয় প্রকৃত মানব।
সে সকল পেতে যত্ন কর ছাত্র সব॥
ধরাতলে যত লোক দেখিবারে পাই।
মানব নামের যোগ্য না হয় সবাই॥
কর পদ থাকিলেই যদি নর হয়।
শাখামৃগচয় তবে মানব কেন নয়॥
কহিতে পারিলে কথা যদি হয় নর।
তবে কেন নর নয় শুকপক্ষিবর॥
স্থূল হোলে যদি পায় মানবের পদ।
মানব না হয় তবে কেন বা দ্বিরদ॥
সুন্দর হইলে যদি নর নাম পায়।
তবে নর শিখীকে কেন না বলা যায়॥
যদি হয় মানব থাকিলে দেহে বল।
তিমি মীন নয় কেন নর অবিফল॥
নর যদি হয় লোক হইলে ভীষণ।
শার্দ্দূল মানব তবে নয় কি কারণ॥
সক্ষমী হইলে যদি নর বল তাকে।
মনুজ না বলে কেন মধুমক্ষিকাকে॥
নর যদি হয় গায়ে দিলে যোড়াশাল।
কেন না মানব হয় তবে মেষপাল॥
রাজা হোলে যদি হয় মানব প্রধান।
পশুরাজ না পায় কেন বা নরাখ্যান॥
গোঁপ দাড়ি থাকিলেই যদি নর হবে।
অজা কেন মানব না হোতে পারে তবে॥

[illegible] ... [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... দত্তক পুত্র। এই সম্ভ্রান্তবংশের বংশকুলের বিষয় [illegible] আছে।

প্রভাকর,—৯ই শ্রাবণ, ১২৫৫

"প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল বোম্বাইনিবাসী বিখ্যাত মহাজন ৺প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য নিমিত্ত দুইলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকা গভর্ণমেণ্টের হস্তে আছে। কিপ্রকারে তাহা ব্যয় হইবেক, বদান্যবর ধনদাতা তাহার কোন উপায় নির্দ্দেশ করেন নাই। তদ্বিষয়ের সম্পূর্ণভার গভর্ণর জেনেরল বাহাদুরের প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন।

এদেশের বিশেষ হিতচিকীর্ষু প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ গভর্ণমেণ্টের নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন যে, ঐ সমর্পিত টাকা গভর্ণমেণ্ট এমত কোন উপায় অবধারণ করিবেন, যাহাতে এদেশের কোন প্রধান কার্য্যের কিয়দংশ সম্পন্ন হইতে পারে। আমরা অবগত হইলাম গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর ঐ প্রদত্ত টাকার বিষয়ে আপনার কোন অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য (সেনেট) গণের অভিমত জানিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। কিরূপে ঐ অর্থ ব্যবহৃত হইলে বদান্যতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, সভ্যমহাশয়েরা তাহা বিবেচনা করণে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছেন। একবার তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, দুই সহস্র টাকা করিয়া ৫টী ছাত্রবৃত্তি ৫ বৎসরের নিমিত্ত এবং এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যে বৎসর যিনি প্রধান হইবেন, তাঁহার নিমিত্ত একটি ব্যয়িকবৃত্তি-স্থাপন করা হইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।"

প্রভাকর,—৯ই শ্রাবণ, ১২৫৫

"আমরা শুনিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম, ৺রাম রামলোচন ঘোষ বাহাদুরের পুত্র বাবু মনোমোহন ঘোষ বিলাতে যথারীতি পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক ব্যারিষ্টারের কার্য্যকরণে উপযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ৺রাম ব্যারিষ্টারদিগের যে এক প্রকাশ্য ভোজ হইয়াছিল, তাহাতে ইহাঁর মনোমোহন বাবুকে আহ্বানপূর্ব্বক সমাদর করণে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বর্ত্তমান জুলাইমাসের শেষে বাষ্পীয় জাহাজারোহণে বোম্বাই নগরে আগমন করিবেন। তথায় বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রেলওয়ের শকটারোহণে মধ্যভারতবর্ষ পরিভ্রমণপূর্ব্বক কলিকাতায় আসিবেন।

মিস কারপেণ্টার নাম্নী সুশীলা বিদ্যানুরাগিণী কুমারী; যাহার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তিনি এতদ্দেশীয় রমণীগণের বিদ্যানুশীলনার কোন বিশেষ সদুপায় করিবার মানসে বাবু মনোমোহন ঘোষের সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন। এই সংবাদটী এদেশের পক্ষে পরম শুভকর তাহার সন্দেহ নাই।"

প্রভাকর—৬ই শ্রাবণ,—১২৭৩।

"আমাদিগের দ্বিতীয় ব্যারিষ্টার * শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন ঘোষ ইংলণ্ড হইতে বোম্বাইয়ে আগমন করিয়া আহম্মদাবাদে শ্রীযুত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। এই মাসের শেষ অথবা নবেম্বরের প্রথমে কলিকাতায় আসিবেন। কুমারী মেরি কারপেণ্টার তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন।—"

প্রভাকর,—২৬ শে আশ্বিন, ১২৭৩।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাজকুমার সেনগুপ্ত।

* বাঙ্গালী প্রথম ব্যারিষ্টার ক্রিয়ার সাহেবের মধুসূদন দত্ত। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ইনি ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় আসেন। দ্বিতীয় ব্যারিষ্টার মনোমোহন এবং তৃতীয় বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লু, সি, বানার্জ্জী)।

শ্রীদুর্গা প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবে অনেক ব্যাপার; অনেক সামাজিক আচার ব্যবহার, অনেক লুপ্তপ্রায় আচারপদ্ধতি জড়ান-মাখান-লুকান আছে। উহাতে বৈদিক তান্ত্রিক, পৌরাণিক এবং বৌদ্ধতন্ত্রের অনেক কর্ম্মপদ্ধতি জড়ান আছে। তিনটা পুরাণ অনুসারে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে, (১) কালিকা পুরাণ, (২) দেবীপুরাণ (৩) বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ। দুই তান্ত্রিক নিবন্ধকারের ব্যবস্থানুসারে কল্পক্রিয়া বা বোধন ও সাধন হইয়া থাকে। (১) কল্যাণি গিরির শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী, (২) কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃহৎ তন্ত্রসার। ইহা ছাড়া চাণ্ডালিনী ডোম্বিনী পদ্ধতি আছে। এই দুই পদ্ধতি বৌদ্ধতান্ত্রিক পদ্ধতি। ইহার প্রচলন এখনও যে বাঙ্গালায় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না।

দুর্গোৎসব সম্বন্ধে এই কয়টি কথা সকলকে সদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

(১) তিনটি পুরাণ অনুযায়ী মায়ের ধ্যানের আবৃত্তি করিয়া ঘটে পটে যে পূজা করিতে হয়, সে ধ্যান অনুসারে প্রতিমা গড়া হয় না। এখন যে প্রতিমা সম্মুখে থাকে, তাহা ধ্যানানুসারিণী নহে, তন্ত্রের বীজানুগামিনীও নহে। উহা খাঁটি Dummi মাত্র, দালান-জোড়া ঘরসাজান পুঁতুলমাত্র; ভাবের আলম্বন হিসাবে কতকটা ব্যবহৃত হয়।

(২) মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ সকল পুরাণোক্ত পূজাতেই করিতে হয়; পরন্তু মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর মহামায়ার পূজা এবং আমাদের দুর্গোৎসব এক নহে। রূপে গুণে আধুনিক বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব সম্পূর্ণ পৃথক্। তথাপি চণ্ডীপাঠ করিতেই হয়, উহা পূজার অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

(৩) মূলতঃ আমাদের দুর্গোৎসব সিংহবাহিনীর পূজা। সিংহবাহিনীর যাহা ধ্যানের রূপ, আমাদের দুর্গার সে রূপ কুটান হয় না। আমরা আট-রকমের সিংহবাহিনী মূর্ত্তি কষ্টিপাথরে খোদা দেখিয়াছি। দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ দশভুজ, এবং অষ্টাদশভুজ সিংহবাহিনী মূর্ত্তি দেখিয়াছি। অনেক-গুলি সিংহবাহিনী অনুসন্ধানসমিতির যাদুঘরে আছে। তাহার মধ্যে একটা মূর্ত্তি

মার অনুরূপ। পূর্ব্বে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি থাকিতে না। মহিষাসুর মহিষের অসুর নহে, একটা ভীমকায় অসুর, তাহার স্কন্ধের উপর শূল বিদ্ধ করিয়া জটাজুটধারিণী ভৈরবী সিংহের উপরে বসিয়া শূল টানিতেছেন। কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী সরস্বতী কোনটাই ধ্যানের অনুরূপ গড়া হয় না।

(৪) গণেশের কলা-বৌ টা কি? উহা নবপত্রিকা, উহার মধ্যে বোধ হয় অনেক কাণ্ড লুকান আছে। ভাবুক বাবু মহলে উহাকে কলাবধূ বলা হইয়াছে, চতুঃষষ্টি কলা যেন সাবয়বা হইয়া গণপতির বামে আছেন। কিন্তু উহা নবপত্রিকা, কল্পকার্য্যের প্রতিনিধিরূপে প্রতিমার পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। বামমার্গী সাধক যাঁহারা, তাঁহাদের বাটীতে কলা-বৌ প্রতিমার দক্ষিণদিকে থাকে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একবার পূজার নারায়ণে কলা-বৌয়ের একটু ঘোমটা খুলিয়া দেখাইয়াছিলেন।

(৫) দুর্গোৎসবে জাতিবিচার নাই। সকল জাতীয় হিন্দুই দুর্গোৎসব করিতে পারে। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সকল জাতীয় হিন্দুর বাটীতে দুর্গোৎসব দেখিয়াছি। পূর্ব্বে (বোধ হয় এখনও) পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে মুসলমানের পরগণা ও বাটীর বহির্বঙ্গণে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। সঙ্কল্প গৃহকর্ত্তা মুসলমানের নামেই হয়।

(৬) এখন ত ঘরে ঘরে ঘড়ি ও পঞ্জিকা বিদ্যমান। পূর্ব্বে এমনটি ছিল না। গ্রহবিপ্র তিথি নক্ষত্রের পরিচয় দিয়া যাইতেন, আর সূর্য্যের গতিবিধি দেখিয়া সময় নিরূপণ হইত। কিন্তু পূজার সময়ে বোধন এবং সন্ধি পূজার ক্ষণ নিরূপণ হইত চণ্ডালবাড়ীর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া। চণ্ডালগৃহে কল্পারম্ভ হইলে, নবম্যাদি বা প্রতিপদাদি বোধন বসিলে তবে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাটীতে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিত। সন্ধিপূজাও চণ্ডাল-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া হইত। পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রভৃতি প্রতাপ বাড়িলে তাঁহাদের কাছারীর তোপ শুনিয়া সন্ধিপূজা হইত। উগ্রচণ্ড-বিঘাতিনী মহামায়া যে মূলে চণ্ডালজননী। মহামায়ার মহাপূজার চণ্ডালই যে বাস্তবিকীর গুরু, চণ্ডালপদ্ধতি প্রশস্ততম।

(৭) রাবণবধের উদ্দেশ্যে, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের ইতিহাস ধরিয়া অকালবোধনে আদর্শে যদি সিংহবাহিনীর পূজা হয়, তবে আগমনী কেন? আগমনীটা কি? উহা কোন্ ভাববিকাশের আধারস্বরূপ? সিংহবাহিনীর আগমনী ত হইতে পারে না। উমা—শিবানী—শৈলজা—পার্ব্বতীর আগমনী হইতে পারে।

আগমনী ও নিজ্জমনে হইবে—বাঙ্গালায় কেন? এই আগমনী বুঝিতে হইলে সহজ মতের দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। দেহতত্ত্বের কথা স্পষ্টাইয়া বলিতে না পারিলে আগমনীর মর্ম্ম বুঝা যাইবে না। সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত স্থানান্তরে করিয়াছি। দেহতত্ত্ব বুঝিলে কল্প ও বোধন বুঝিবে।

দেহতত্ত্ব।

তন্ত্র কত পুরাতন, তাহা বলিতে পারি না। অনেকে বলেন, উহা বেদের সমসময়ের। অনেকে বলেন, উহা বেদ অপেক্ষা পুরাতন। সে বিতণ্ডা এখন তুলিব না। তবে তন্ত্র গ্রন্থসকলের আলোড়ন ও আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, উহা তিনটা স্তরের বা তিনটা পদ্ধতির সমবায়ে পুষ্ট। প্রথম পুরাতন—অতি পুরাতন মাতৃ-শক্তির সাধনা আছে, দ্বিতীয় বৌদ্ধযুগের শক্তিবাদ এবং শেষে আছে, তৃতীয় অভিচারপ্রধান নিম্নস্তরের মারণ উচাটন বশীকরণ প্রভৃতি ভূতাদির আরাধনা আছে। পুরাতন ও আদিম মাতৃবাদ বা শক্তিবাদ এবং বৌদ্ধের বা সহজ মতের দেহতত্ত্ব সাফ Philosophy অতিনিগূঢ় তত্ত্বে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। অভিচার ও উপচারাদি তন্ত্রের বহিরঙ্গ মাত্র। আদি তন্ত্র বলেন, বিষ ও অমৃত প্রভৃতি কিছু নাই, সকলই শক্তির খেলা। আধার বা সাধকবিশেষের অধিকার এবং যোগ্যতা অনুসারে কোনটা বিষ কোনটা অমৃতবৎ। এই শক্তিই সর্ব্বময়ী, এই শক্তির সন্ধানই প্রকৃত সাধনা। ভালমন্দ নির্ব্বিশেষে যেখানে ও যাহাতে শক্তির বিকাশ সেইখানেই লইয়া শক্তির অন্বেষণ করিতে হইবে। এই মূল সূত্র ধরিয়া তন্ত্র প্রথমে বসায়নচর্চ্চা করেন। নাগার্জ্জুন তান্ত্রিক এবং রস প্রসাধনতত্ত্ববিদ্ আবিষ্কর্ত্তা।

সহজমতের সিদ্ধাচার্য্যগণ শেষে আসিয়া বলিলেন,—ওগো, কেন মিছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া বেড়াও, পাতি পাতি করিয়া বহিঃশক্তির খোঁজ-খবর লও এবং একটা কিছু পাইলেই তাহার আরাধনা কর। ঈশ্বরসিদ্ধে—মানবযুক্তির দ্বারা মনুষ্যের অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে ঈশ্বর কি ও কেমন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সৃষ্টি অনাদি, কবে হইয়াছিল—কে জানে? তবে তোমার দেহটাত তোমার কবায়ত্ত; উহা যে ব্রহ্মাণ্ডের Epitome বা সংক্ষিপ্তসার। যে শক্তির দ্বারা উহা সঞ্জীবিত পরিচালিত, যাহার অস্তিত্ববিধায় তোমার মেধা-মনীষা, বুদ্ধি, মতি-গতি-তুষ্টি পুষ্টি শ্রী শ্রী প্রভৃতি বিভূতি, সেই দেহগত শক্তির অন্বেষণ

কর না। দেহসৃষ্টির পদ্ধতি কতকটা জান, দেহের পুষ্টি এবং বিকাশ কতকটা লক্ষ্য করিতে পার। একবার দেহটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখ না, উহার ভিতরে কে বিরাজ করিতেছেন? তোমার দেহ তোমার পূর্ণায়ত্তে, তোমার জনকজননীর খবর তুমি জান, তোমার সামাজিক পারিপার্শ্বিক সঙ্গতির—এবং প্রতিযোগপ্রভাবের পরিচয় তুমি অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পার, তোমার মন—তোমার কর্ম্মশক্তি তোমাতেই আছে। এতগুলি Data বা জানা খবর যখন হাতে আছে, তখন একটা অজ্ঞেয়ের পরিচয় তুমি কেন না সংগ্রহ করিতে পারিবে? অতএব "ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে" তোমার দেহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া একবার দেখ দেখি, তোমার ঈপ্সিত পাইলেও পাইতে পার। যে রিয়াময়ী মহাশক্তি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, সেই মহাশক্তিই তোমার চৌদ্দপোয়া দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই মূল-কুণ্ডলিনী। তাঁহাকে চিনিতে পারিলে জগন্ময়ী এবং দেহময়ী এক হইয়া যাইবেন।

ইহাই দেহতত্ত্বের মোটা কথা। দেহতত্ত্ব তাই সর্ব্বাগ্রে কাম-শক্তির বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কামই যখন জীবসৃষ্টির মূল, তখন বুঝিতে হইবে—এই কাম শক্তিটা কি ও কেমন? বেদও বলিয়াছেন, কামই এক আমি বহু হইবার প্ররোচক। বেদের কামস্তুতি এই তত্ত্বটাকে বেশ ফুটাইয়া দিয়াছে। আমাদের ব্রাহ্ম বিবাহ পদ্ধতিতে কামস্তুতি অনুশুণ্ঠ্য। তাই তন্ত্রের একটা অঙ্গ কামচর্চ্চায় ব্যস্ত ও ব্যাপৃত। তন্ত্রের প্রথম প্রশ্ন, কেন নর-নারীর সঙ্গমে জীব-সৃষ্টি ঘটে? সে সৃষ্টিতে এত প্রহেলিকাই বা কেন? এই প্রহেলিকার সমাধান-চেষ্টাতেই দেহতত্ত্ব পূর্ণ। শিব-দুর্গা, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি, উমার হিমালয়ে জন্ম, মদনভস্ম, শিবের বিবাহ প্রভৃতি অর্থবাদের ও রোচকের আবরণে পুরাণ দেহতত্ত্বের অনেক কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেক পুরাণের গোড়ার সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা ঋতুস্নানান্তে ভ্রূণের আস্থানের বর্ণনার আকারান্তর মাত্র। দেহতত্ত্বের যে দিক দিয়া যে পৌরাণিক সৃষ্টিপ্রহেলিকা বুঝিয়াছেন, তিনি সেইদিক দিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বা জন্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। কোন একটা পুরাণের গোড়ার সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা পড়িলে অভিজ্ঞ মাত্রেই বুঝিবেন, সে পুরাণ জীব-প্রহেলিকার কোন্ অংশটা অর্থবাদের সাহায্যে বুঝাইতে চাহে। দুর্গোৎসব দেহতত্ত্বের কামচর্চ্চার একটা অংশমাত্র, ষট্‌চক্রভেদের একটা পদ্ধতির নির্দ্দেশ মাত্র। যে বুঝে, সে ইহার মহিমা জানে।

দেহাত্মবোধ এবং দেশাত্মবোধ।

দেশাত্মবোধ শব্দটা খুব চলিয়াছে বটে, পরন্তু দেশাত্মবোধটা যে দেহাত্ম-বোধের ফলস্বরূপ, তাহা অনেকে জানেন না। তন্ত্র সবিস্তরে এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন। "যা আছে দেহভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে" এই উক্তি তন্ত্রের মহাবাক্যস্বরূপ। তাই শাক্তানন্দতরঙ্গিণী স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং পুরাতন তন্ত্র-শ্রুত-বচন দিয়া বুঝাইয়াছেন যে,

(১) প্রত্যেক ভারতবাসীর দেহ সংক্ষেপে ভারতবর্ষ। ইহাতে হিমালয় আছে, বিন্ধ্যাচল আছে, সপ্তসরিৎ আছে—গঙ্গা যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী নর্ম্মদা, কাবেরী, সিন্ধু প্রভৃতি প্রবাহিতা, এই দেহে সকল তীর্থ বিদ্যমান এই দেহেতেই বাহান্নপীঠ—দক্ষ দুহিতা জগন্মাতার দেহের বাহান্ন খণ্ড বাহান্ন তীর্থে পরিব্যাপ্ত। কুলকুণ্ডলিনী এই দেহস্থ দক্ষ প্রজাপতির গৃহে প্রথমে পদ্মা হন, তাহার পর হিমগিরির ক্রোড়ে উদ্ভূতা হন। এই দেহেতেই উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন ঘটে, দেবনিদ্রা ও দেবজাগরণ হয়। এই দেহ লইয়াই মায়ের—কুলকুণ্ডলিনীর অকাল বোধন করিতে হয়। দেহতত্ত্বটা ঠিকমত বুঝিতে পারিলে বাঙ্গালীর শক্তিপূজার প্রকৃত মর্ম্ম ও মহিমা বুঝা যাইবে।

তন্ত্র বলিতেছেন, প্রত্যেক জীবের—প্রত্যেক মনুষ্যের দুই জননী। গর্ভধারিণী জননী; তিনি স্বদেহস্থ রস-শোণিত-মেদাদি দিয়া জীবের সর্ব্ব নিষ্পন্ন করিয়া দেন,—দ্বিতীয়া দেশমাতৃকা, যে দেশে জনক-জননী পুরুষানুক্রমে বাস করেন, যে দেশের পত্র পুষ্প ফল, ক্ষীর-নীর উপভোগ করিয়া জনক-জননীর দেহে রেতাদির পুষ্টি ও সঞ্চয় ঘটে। দেহস্থ আত্মাকে চিনিতে পারিলে দেহস্থ আত্মার পরিচয় পাইবে। দেশস্থ আত্মার পরিচয় পাইলে আদ্যন্ত তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্তা মহামায়ার খবর পাইবে। তাই দেহাত্মবোধ হইলে দেশাত্মবোধ স্বতএব ফুটিয়া উঠে। তাই গর্ভধারিণী জননীকে জানিতে পারিলে দেশমাতৃকাকে জানা ও ধরা চলে। যিনি দেহাত্মবুদ্ধ, তিনিই সর্ব্বাগ্রে দেশাত্মবুদ্ধ। এই হেতু বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব দেশাত্মমূলক এবং দেশাত্মবোধের পরিচায়ক। কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাও, তুমি নিজকে চিনিতে পারিবে, যে দেশে জন্ম তোমার, সেই দেশকে চিনিবে,—শেষে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী আদ্যাশক্তিরূপা মহামায়া মহেশ্বরকে চিনিবে-জানিবে-দেখিবে। এই হেতু বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব সকল ধর্ম্মের সমবায়-স্বরূপ। এই উৎসব করিলে সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে

উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত সকলেই উদ্‌বুদ্ধ হইবে,—সকল জাতি, সকল বর্ণ, সকল কারিকর, সকল হুনরী, সকল ব্যবসায়ী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, আচণ্ডাল সবাই উদ্‌বুদ্ধ হইবে। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব বাঙ্গালার মহামহোৎসব। ইহাতে নবরাত্রের উৎসব আছে, অকাল বোধনের ব্যাপার আছে, সিংহবাহিনীর আরাধনা আছে, কুলকুণ্ডলিনীর সাধনা আছে, সামাজিক নানাবিধ উল্লাস-আনন্দ আছে, আগমনী আছে, বিসর্জ্জন আছে, ভাব বিকাশ আছে, ভাবোন্মাদও আছে। এমনটি ভারতবর্ষের কুত্রাপি নাই,—ছিল না, হইবেও না। বাঙ্গালী হেলায় ইহাকে হারাইয়াছে।

ভাব।

এই যে ভাবের কথা, ইহা যে কি ও কেমন, তাহা কেমন ভাষায় বুঝাইব? ভক্তিসূত্রে আছে, মানবদেহে একাদশ আসক্তি আছে। এই আসক্তি হইতে ভাবের উন্মেষ ঘটে। তিনগুণে—সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের প্রভাবে তেত্রিশ রকমের আসক্তি এবং এই তেত্রিশ আসক্তি হইতে তেত্রিশ কোটি ভাবময়ী দেবতা। এভাব আজকালকার ভাষায় বুঝান কঠিন। এই ভাবের বাৎসল্য অংশ লইয়া দুর্গোৎসব। মা আমার কন্যা—আত্মজা—সহজা-তনয়া। আমি তাঁহার তনয়, তিনি আমার তনয়া। এই মেয়েটিকে আদর করিয়া পিতৃকক্ষে আনিতে হইবে, গিরিসার মহাশ্মশান হইতে স্নেহের নন্দনকাননে বসাইতে হইবে। তাই মায়ের আগমনী। পুরাণ এক মজাদার গল্পের আকারে এই অগমনীর ভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা বঙ্গালী বৌদ্ধযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ভাব লইয়াই পাগল—আত্মহারা হইয়াছিলাম। প্রেম এবং ভক্তির ভাবে বাঙ্গালী সহস্র বৎসর কাল ভরপুর ছিল। সহজিয়া সিদ্ধাচার্য্যগণ এই ভাবধর্ম্মের বোধ হয় প্রথম প্রচারক। লুইপদের দোঁহাবলীতে ভাবের ব্যাখ্যা প্রথম পাই। তাহার পরে এই ভাব মহা-মহীরুহে পরিণত হইয়া বাঙ্গালীর তনু ও মনকে সহস্রাধিক বর্ষকাল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। দুর্গোৎসব সেই ভাবের ভক্তিগত বিকাশ। ভাব আছে বলিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুগামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তান্ত্রিক দুর্গোৎসবকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কত আর বলিব, জীবনের প্রায় অর্দ্ধেকটা এই দুর্গোৎসবের বিশ্লেষণে কাটাইয়াছি, বাঙ্গালার হিন্দুয়ানী বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহার

অনেক করিলাম, অনেক করিয়াছি; এখন যদি আধুনিকগণের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে তবে সহস্র বৎসরের বাঙ্গালার সাহিত্য, কাব্য, ধর্ম্মগ্রন্থ, গান, পদ, পাঁচালী প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিয়া বাঙ্গালীকে চিনিবার ও জানিবার চেষ্টা করুন। পিতৃপরিচয় পাইলে, আত্মপরিচয় হইবে। মায়ের ছেলে তোমরা মাকে চিনিতে পারিলে, মাটিকে বুঝিতে জানিতে পারিলে, এদেশের মাটিকেও যে চিনিবে এবং জানিবে। জান না—আমাদের মা শ্রীদুর্গা—দশভুজে যে মৃণ্ময়ী রূপশালিনী! আগে মৃন্ময়ীকে কোলে করিতে শিখ, পরে চিন্ময়ীকে চিনিবে ও জানিবে।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।"

সঙ্গীহীন।

১

একটী পাখী শুধু পড়েছে শরাঘাতে
যজমান বাবা আজি পায়,
একটী ফুল শুধু ঝরেছে ছড়া হতে
শিথিল মালাগাছি তার।
ফেটেছে ঘট ওগো ঝরিয়া পড়ে জল
পড়েছে নোয়াইয়া শোভার শতদল,
একটী ছবি গেছে থাকাটী সাজে না যে
মলিন হত মহিমায়।

২

ভাঙ্গিয়া শাখাটীরে ছায়া সে পরিপাটী
ছিন্ন করে দিলে কে?
ঘুখেরি 'এস্‌রাজ' কে দিল তার কাটি'
বেসুরা করি' তিলেকে।
গুচ্ছে ডাকার ধরেছে আহা পাক
মণির এ ঝালরেতে পড়েছে আজি ফাঁক
যেতেছে ক্ষয়ে চাঁদ, কে রাখে দিয়ে বাঁধ
ভাটা যে এলো যমুনায়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব।

১

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব বড়ই বৃহদ্ ব্যাপার। বালক-কাল হইতে যে নিত্য ক্রিয়ার মত, দিবাকরের উদয়াস্তের মত এই দুর্গোৎসব আমরা দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতেই দুর্গোৎসবের প্রকৃত গৌরব আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না।

শারদীয়া মহাপূজার প্রতিমায় সার্ব্বকালিক উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি-সমষ্টি আছে, পদ্ধতিতে সকল সম্প্রদায়ের প্রণালী অন্তর্নিবিষ্ট আছে, এবং স্থানে কালে কাজে যত প্রকার উপকরণের আয়োজনে দেব-ভক্তি-পরিপোষণের চেষ্টা করিয়াছে,—দুর্গোৎসবের উপকরণে তাহার সকলগুলিরই প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব সকল কালের সকল প্রকার পূজার সঙ্কলন বা synthesis. শারদীয়া পূজা—প্রকৃতই মহাপূজা। এরূপ পূজা আর কোন দেশে নাই। ইহা পূজার কল্পদ্রুম বা encyclopædia. স্বার্থ-চালিত জুবাট সাহেবের প্রয়োচনায় যেমন জনকতক সাহেবস্থবো কলিকাতার বাড়ের মাঠে নানা দেশের শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেরূপ ভাবে জন কতক মুনিঋষি বা যাজ্ঞে, বা জন কতক স্বার্থপর পুরোহিতের প্রয়োচনায় এক সময়ে একেবারে এই মহানুষ্ঠান সংগৃহীত হয় নাই। যে ভাবে মহাকাল এই বিশাল ধরণীপৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন, যে ভাবে কালমাহাত্ম্যে স্তরের উপর স্তর উঠিয়াছে, সেই ভাবে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবে নানারূপ উপাসনা এবং নানারূপ উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে; অতীত ভক্ত বঙ্গবাসী অতীত সাক্ষীর পরামর্শ মত সেই সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। যে বিবর্ত্তন বিকাশ জড় জীবজগতের মূল নিয়ম, সেই নিয়মবলেই সেই বৈদিক কালের শক্তিরূপা অতসীবর্ণময়ী উজ্জ্বলা অনলশিখা আজি এই অধঃপতনের দুর্দ্দিনে সর্ব্বদেব-পরিবেষ্টিতা মহাশক্তিতে চণ্ডী-মণ্ডপ মণ্ডিত করিতেছেন। বেদের সেই দীপ্তি শক্তি, উপনিষদের শব্দ শক্তি, পুরাণের দেব-শক্তি, কাব্যের শোভা-শক্তি, তন্ত্রের মাতৃ-শক্তি, বাঙ্গালীর কল্পা-শক্তি, আর কত কালের কতরূপ শক্তি আজি ইতিহাসের মহারাসায়নিক

নানাযোগে ত্রিগুণীভূত অনন্ত বিবর্ত্তন বিকশিত হইয়া ভূগোলকের কেন্দ্রীভূতা শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। বলশক্তি, জ্ঞানশক্তি—গণশক্তি, ধনশক্তি—পাশবশক্তি, দানবশক্তি,—বৃক্ষশক্তি, শিলাশক্তি—অগণিত দেবশক্তি সেই মহা শক্তির শক্তিপোষণ এবং শোভাময়ীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এমন দালান-ভরা ঠাকুর, এমন হৃদয়ভরা প্রতিমা, এমন কালভরা পদ্ধতি, এমন জগৎভরা উপকরণ, এমন মানসভরা পূজা, এমন প্রবৃত্তিভরা উৎসব আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব মানবের হৃদয়োৎসবের চরমোৎকর্ষ এবং বাঙ্গালীর পরম গৌরবের পরিচয়!

২

নিতান্ত অসভ্য মানবমণ্ডলী হইতে পরিস্ফুট-চিত্তবৃত্তি সভ্যজাতি পর্য্যন্ত সকল জাতিই সকল সময়ে, সকল দেশে নিখিল বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বা একটি নিখিল শক্তিকে ভূত জগতের জীবন বলিয়া মনে করিয়া ভয় ভক্তি, সান্ত্বনা রঞ্জনা আরাধনা উপাসনা করিয়া থাকে। প্রথমে মানবের কিরূপে শক্তিজ্ঞান হয়, প্রথমে কোন্ শক্তির আরাধনা করিতে আরম্ভ করে, পরে কালক্রমেই বা কোন্ শক্তির সত্তা মনুষ্য উপলব্ধি করে,—এ সকল কথার আলোচনা করার আমাদের অদ্য কোন প্রয়োজনই নাই; মানব-হৃদয়ে দেবোপাসনার ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক তত্ত্বের অদ্য আমরা প্রবৃত্ত নহি। উপাসকগণ সময়ে সময়ে যে যে পদার্থে যে ভাবে জগজ্জীবনী শক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং যে ভাবে সেই শক্তির উপাসনা করিয়াছেন, তাহারই কতক কতক বুঝা অদ্য আমাদের আবশ্যক।

সকল দেশেই বোধ হয় উপাসনার প্রথম অঙ্কুর ভীতি-জড়িত। ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, সিংহ-শার্দ্দূল, শস্ত্র-সর্প—এই সকল সেই সময়ের উপাস্য দেবতা অথবা দেবতার জীবন্ত প্রতিমা। এরূপ দেবতার রঞ্জনা বা সান্ত্বনা করাই সেই সময়ের উপাসনা। শারদীয়া মহাপূজার এই ভীতিভর উপাদানের সকলরূপ উপাদানই আছেন, সকলরূপ আলম্বনই ইহাতে বিদ্যমান। আর সেই অসভ্য কালের উপাসনাই কি আমরা ছাড়িতে পারিয়াছি? এই বিশাল সভ্যসমাজে অগণিত ভূতপ্রেত আজিও বীভৎসভাবে, বিকট মূর্ত্তিতে আমাদের অজ্ঞানান্ধ গৌরবের অন্ধকার মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিদ্যুৎ করিতেছে, এবং স্থানে স্থানে চিত্তাকর্ষিত সুসভ্য আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় ভীষণকে আরও ভীষণতর বোধ হইতেছে, প্রেতাগারের বিকট মূর্ত্তি, অট্টহাস্য, বীভৎস লীলা, বৈশাচিক ব্যবহারে আমরা সকলেই ভীত, ত্রস্ত, আকুলচিত্ত। কাজেই ভয়জড়িত-হৃদয়ে নিতান্ত অসভ্য

মত আমরা সেই প্রেতগণেরই উপাসনা করিতেছি। তাহার উপর ঐ সকল দৈত্যদানবের দারুণ দলন, সিংহ-শার্দ্দূলের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, এবং রক্তমাংসলোভে নিয়ত পরিভ্রমণ, বিরাট্ শস্ত্র সকলের প্রতিনিয়ত রক্তলালসার ঝঞ্ঝনা, আর ঐ তীব্রচক্ষু কণ্টক-জিহ্ব খল সর্পের কালকূট বিস্তারণা। কাজেই আমরা পিশাচপীড়িত, দৈত্য-দলিত, সিংহ-হিংসিত, শস্ত্রশাসিত এবং সর্পবিষে জর্জ্জরিত হইয়া ভীতিভরে গলবস্ত্রে গলদশ্রু হইয়া এই প্রেত-পশু-দানবসর্প-শক্তির নিয়ত উপাসনা করিতেছি। অসভ্যের দেবপূজা আমাদের নিত্যক্রিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

৩

এক সময়ে একটু উন্নত মনে মানব পর্ব্বত, বৃক্ষ, নদ, নদীর উপাসক বাল্যক্রীড়ারত অর্দ্ধোলঙ্গ মানব দেখিল—সম্মুখে মহান্ হিমালয় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ রহস্য লইয়া অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান। সূর্য্যরশ্মিতে মস্তকের কিরীটপুঞ্জ ঝকমক করিতেছে; মেঘের পর মেঘ আসিয়া বিশাল স্কন্ধদেশে আশ্রয় লইতেছে, পর্ব্বতের বিরাগ নাই, বিকল্প নাই। সহসা পর্ব্বত ভ্রূকুটি করিল, ঘুলিঝড় ছুটিল, পরক্ষণেই ভীষণ গর্জ্জন। গুড় গুড় শব্দে আকাশ পাতাল সেই গর্জ্জনে প্রতিধ্বনি করিতেছে। মানব তখন বুঝিল, পর্ব্বত রাগে, পর্ব্বত গর্জ্জায়, পর্ব্বত হাসে, পর্ব্বত কাঁদে, পর্ব্বত তাহারই মত? তবে তাহার অপেক্ষা প্রভূত বলশালী এবং বিশাল আয়ত। মানব বলিল—ঐ দেবতা। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ঝঞ্ঝার সময় আশ্রয় দেয়, রৌদ্রে ছায়াদান করে, কত পাখী ডাকিয়া আনিয়া গান শোনায়, কত জটা ঝুলাইয়া দিয়া দোল খাওয়ায়,—মানব বুঝিল এই এক দেবতা। নদী—তৃষ্ণার সময় শান্তিদায়িনী, রৌদ্রের সময় অবগাহনে স্নিগ্ধকারিণী, কিন্তু রাগিলে খরস্রোতে কূলপ্লাবনে সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া লইয়া যায়,—মানবের চক্ষে নদী আর এক দেবতা।

আরি একটু সভ্য হইলে মানব শস্য পূজা করে। যাহা জীবনের অবলম্বন, তাহাই উপাসনার সামগ্রী। ক্রমে সকল বৃক্ষেরই উপকারিতা মনুষ্য উপলব্ধি করিতে থাকে, কাজেই উদ্ভিদ্-উপাসক হয়। দুর্গোৎসবে ইহার সকলগুলিই আছে। দুর্গোৎসবে পর্ব্বতের প্রতিনিধিরূপে শিলাখণ্ডের পূজা করিতে হয়, নদ নদীর পূজা করিতে হয়, বিশেষ করিয়া শস্যের পূজা করিতে হয় এবং সাধারণভাবে সমস্ত উদ্ভিজ্জ জাতির প্রতিনিধি লইয়া উদ্ভিদের উপাসনা করিতে হয়; ইহার নাম নবপত্রিকা পূজা।

"রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্ব-দাড়িমৌ।
অশোকো মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা।"

নবপত্রিকার এই পরিচয় শুনিলে মনে হয়, এত গাছপালা থাকিতে এই নয়টিরই বা কেন পূজা হয়?

ঐ প্রশ্নের তিন প্রকার উত্তর আছে,—ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক। ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য এই যে, কালে কালে মানব যত প্রকার উদ্ভিদের পূজা করিয়াছে, তাহার সকল প্রকার ঐ নয়টিতে আছে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই যে, যে যে কার্য্যে মানবের উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়, তাহার সর্ব্ব কার্য্যের উপযোগী এক এক উদ্ভিদ নমুনার মত ঐ নয়টিতে আছে। কলার জন্য ধান্য আছে, তরকারির জন্য কচ্চী আছে, মসলার জন্য হরিদ্রা আছে, মণ্ডের জন্য মান আছে, মিষ্টের জন্য দাড়িম্ব আছে, ঔষধের জন্য বিল্ব আছে, শোভার জন্য অশোক আছে, উৎসবের জন্য জয়ন্তী আছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অন্যরূপ। এক এক প্রকার উদ্ভিদ্ দর্শনে মনে এক একরূপ ভাবের উদয় হয়। উদ্ভিদ্ অবলম্বনে মনে যে-কয়প্রকার ভাবের উদয় হইতে পারে নবপত্রিকার তাহার সকলগুলিই হয়।—এস্থে আছে, রম্ভা শান্তিপ্রদায়িনী। আমাদের সত্য সত্যই বোধ হয় কলাগাছগুলির বড়ই ঠাণ্ডামূর্ত্তি। কেমন জলভরা ভাব, সুগোল বলোন, মসৃণ ত্বক্, শীতল স্পর্শ, ঠাণ্ডা সবুজ চওড়া পাতাগুলি যেন চিরদিনই ধীরে ধীরে দুরন্থিত আর্ত্তজনকে বীজন করিতেছে,—কোথাও যেন রুক্ষ ভাবের একটু ছায়াও নাই, যথার্থ শান্তমূর্ত্তি। জয়ন্তীর জয়শ্রীতে কদলীর শান্তিময়ী শোভা জয়ন্তীতে এক বিন্দু নাই, অথচ জয়ন্তীতে শোভার অভাব নাই,—ছোট ছোট পাতাগুলি যেমন সাজান গোছান, অল্প বাতাসে ঝুর্ ঝুর্ করিয়া উড়িতেছে, তাহার সকলগুলিই চঞ্চল, সকলগুলিই ঐশ্বর্য্যশ্রী এমনই বটে। অশোকে শোক শান্তি হয়। সেই যে ফুলের গুচ্ছ নত হইয়াছে শোভা ধরে না,—তবু অহঙ্কার নাই, গর্ব্ব নাই—অশোকার্ত্তের শোকশান্তি হয় কি না, আমরা জানি না, কিন্তু প্রাচীনেরা ঐ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের সকল ব্যাখ্যার অনুশীলন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে, এইরূপে ফুল পত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবে সকল বিষয়ের সমষ্টি নানাভাবে বিন্যস্ত আছে।

৪

মনুষ্য আবার সময়-বিশেষে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহনক্ষত্রাদির উপাসক। এমনও অনেকে অনুমান করেন যে, এক সময়ে পৃথিবীর সভ্য-স্থানের সর্ব্বত্র সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল; আসিরি, মিসর, য়ুনানী, রোমক সর্ব্বত্রই সূর্য্যোপাসনা [illegible], আসিয়ার আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষরূপেই ছিল।

অতি প্রাচীনকালে আর্য্যঋষিগণ হিমালয়ের সানুদেশে দণ্ডায়মান হইয়া [illegible] নভোমণ্ডলে নয়নক্ষেপ করিয়া সূর্য্যাগমন-প্রতীক্ষায় ভূর্ভুবস্ব রবে দিক্ [illegible] করত সূর্য্য-স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন; মধ্যকালে তমসাচ্ছন্ন হইয়াও সূর্য্য-মহিমা ভুলিতে পারেন নাই,—দিল্লীর নিকটস্থ যমুনা-পুলিনে [illegible] দণ্ডায়মান হইয়া তানসেন ভৈরববাগে সূর্য্য-বন্দনা করিয়াছিলেন,—

"প্রভাকর ভাস্কর, দিনকর দিবাকর,
ভানুপ্রকট বিহান।
তোর উদয়িতে, পাপতাপ ছুটে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ম হোয়, গুরুজ্ঞান ধ্যান॥
ঋকযজুসাম জগতপর জগচ্চক্ষু জ্যোতিরূপ,
কশ্যপসুত, জগতেকি প্রাণ।
কহে তানসেন, প্রভু, জগত-কপাট খুলত
দিয়ে বিদ্যা দান॥"

ইদানীন্তনকালে ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বল্টেয়ার একবার সূর্য্যোপাসনা দেখিয়াছিলেন, সেই জগচ্চক্ষুঃ জ্যোতিতে তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল, তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল, হৃদয় গলিল; বল্টেয়ার ধীরে ধীরে বলিলেন,—"যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে ঐ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি; আমি ঐ মূর্ত্তিকে নমস্কার করি।"

এইরূপে দেখা যায় যে জগচ্চক্ষুর্বিধ উজ্জ্বল শোভাকেন্দ্র চিরদিনই কোন না কোন মনুষ্যের উপাসনীয়। নবগ্রহপূজা দুর্গোৎসবের অন্তর্গত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের পদ্ধতি ভিন্ন, উপকরণ স্বতন্ত্র। এরূপ বিভেদের ঐতিহাসিক, বৈষয়িক বা আধ্যাত্মিক কোন যুক্তি আছে কি না, তাহা আমাদের বুঝিবার কথা, বিচারের কথা। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা যাঁহাদের পণ্ডশ্রম বলিয়া ধারণা নাই, তাঁহারা যদি এইরূপ সকল বিষয়ে আপনার বুদ্ধি বিবেচনার ব্যায়াম করেন,

তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, বাঙ্গালীর এই বিষম ব্যাপার দুর্গোৎসব বাস্তবিক কি প্রকাণ্ড কাণ্ড। আপাততঃ ভাসাভাসা আমরা যতদূর বুঝিয়াছি তাহাই পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি আমাদিগের এই ক্ষীণ চেষ্টায় এই উৎসবের প্রকৃত গৌরব বাঙ্গালীহৃদয়ে কিছুমাত্র প্রতিভাত হয়, তাহা হইলেই আমাদের যত্ন সফল হইবে।

৫

মনুষ্যকর্ত্তৃক মনুষ্যপূজা দুই প্রকারের—অবতারে মনুষ্যপূজা, ও নারীপূজা। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে অবনীতে অবতীর্ণ হন। পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারাই নরজাতির আদর্শ। এই সকল আদর্শ-চরিত্রে ভারতভূমি উজ্জ্বলীকৃত আছে। এই সকল অবতার-মূর্ত্তি দুর্গোৎসবের চালচিত্রে চিত্রিত থাকে এবং তাঁহাদের পূজা হয়।

আমাদের তন্ত্রে নারীপূজা; বিদেশের কোরাণে নারীপূজা। নারীই সাক্ষাৎমূর্ত্তিতে প্রকৃতি-শক্তি, প্রবৃত্তি-শক্তি এবং নিবৃত্তি-শক্তি। নারী জন্মদাত্রী, স্তন্যদাত্রী, গৃহকর্ত্রী। নারী ভবসাগরের তরণী, জীবনের বন্ধনী। নারী হইতেই হৃদয়ের শিক্ষা এবং মনের বল। নারী ইহলোকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপা। নারীর মধ্যে কুমারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। কুমারী শান্তির প্রতিমা, সরলতার ছবি, পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী। অনন্তকোটি-মানবের প্রসবিনী-শক্তি কুমারীতে অন্তর্নিহিত, কুমারী জগদম্বা-শক্তি। কুমারী সরমের সরলতা, আদরের কোমলতা। কুমারী লজ্জাশক্তি, দয়াশক্তি—শ্রদ্ধারূপা, ভক্তিরূপা। কুমারীপূজা, কুমারী ভোজন দুর্গোৎসবের অঙ্গ। সকলরূপ পূজাই দুর্গোৎসবে আছে।

সকল দেবতার পূজাও দুর্গোৎসবে আছে। ঈশ্বরের সৃজন-পালন-লয়-মূর্ত্তিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ধনশক্তি, জ্ঞানশক্তি, রণশক্তি, গণশক্তি—ইঁহাদের সকলেরই পৃথক্ চিত্র বা মূর্ত্তি আছে; পৃথক্ পূজা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, সাবিত্রী গায়ত্রী, ত্রিসন্ধ্যা প্রভৃতি সকলেরই স্থান আছে, ধ্যান আছে, অর্চ্চনা আছে, আরাধনা আছে। আর সকল শক্তির সমষ্টিভাবে কেন্দ্রীভূতা মহাশক্তির মহাপূজা আছে।

মহাশক্তি অনন্তমূর্ত্তিতে অনন্তসংসারে বিরাজিতা; এই কথাটা তাঁহারা কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন,—

"সা বাণী সাচ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে॥
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্যপ্রসূতিশক্তিশ্চ ধরিণা চ ধরাসু সা॥
ব্রাহ্মণ্যশক্তির্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা।
তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহিণাং গৃহদেবতা॥
মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানাং মায়া সাংসারিকস্য সা।
মদ্ভক্তানাং ভক্তিশক্তির্নৃণাং ভক্তিপ্রদা সদা॥
নৃপাণাং রাজলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধূনাং তরণীস্তারতারিণী॥
সৎসু সুবুদ্ধিরূপা চ মেধাশক্তিস্বরূপিণী।
বাখ্যাশক্তিঃ শ্রুতৌ শাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃষু॥
ক্ষত্রাদীনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তিঃ সতীষু চ।
এবংরূপা চ যা শক্তির্ময়া দত্তা শিবায় সা॥"

এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তিসমষ্টির সহিত সমগ্র জড়শক্তি এবং দৈবশক্তি মিলিত হইলে তবে দুর্গা প্রতিমা হয়। জড় জগতের দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেত, সিংহ-শার্দ্দূল, শত্রু-সর্প, ময়ূর-মূষিক, বৃক্ষ-গুল্ম, নদ-নদী, শিলা-মৃত্তি, গ্রহ-নক্ষত্র, সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি; আর আধ্যাত্মিক জগতের প্রভা-শোভা, ধন-পণ, জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি, ধৃতি-ক্ষমা, দয়া-লজ্জা, শৌর্য্য-বীর্য্য, স্থৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি; আর দেবজগতের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। দুর্গোৎসবের প্রতিদানে এই ত্রিজগতের জাজ্বল্যমানা মহামূর্ত্তি। দুর্গোৎসব বিশ্বপূজা।

৬

এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালী তাহার অনুমান হৃদয়ে কি মহতী কল্পনার ধারণা করিয়াছে। অন্য কোন দেশের কোন কবি, কোন দার্শনিক, কোন শাস্ত্রকার এরূপ ত্রিজগতের সমষ্টিতে জগজ্জীবনের পূজা কখন কল্পনাতেও আনিয়াছেন কি? সকল দেশেই ত ধর্ম্মোপাসনায় যুগের পর যুগান্তর হইয়াছে, স্তরের পর স্তর উঠিয়াছে, পড়িয়াছে; পশুপূজা, বৃক্ষপূজা, নরপূজা, দেবপূজা—সকল দেশেই ত হইয়াছে, কিন্তু দুর্গোৎসবের মত এমন অতুল্য museum এবং অমূল্য laboratory আর কোথাও আছে কি?

বঙ্গবাসী মহাকালের মস্তকে চড়িয়া ঐ অপূর্ব্ব মানুষের জগতের [illegible] সকল স্তবগুলি একত্র করিয়াছে, আপনার প্রতিভাময়ী কল্পনার [illegible] দাহনে তাহার অনেকগুলি গলাইয়াছে,—গলাইয়া এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গড়িয়াছে। যেগুলি গলে নাই, সেগুলিকে সেই মূর্ত্তির অলঙ্কাররূপে বড়ই মুন্সিয়ানার সহিত সাজাইয়াছে। ধন্য বলি—এই বিশ্বময়ী ধরিণী, আর ধন্য বলি—এই বিশ্বময়ী কল্পনা।

যেমন বিশ্বময়ী কল্পনাপ্রসূতা ঐ বিশ্বময়ী মূর্ত্তি,—পূজার প্রকরণ [illegible] তদুপযোগিনী। ঘট, পট, গঠনে মূর্ত্তির কল্পনা; জ্ঞানে, ধ্যানে, মননে ধারণা মহাপূজা 'সত্ত্বরজস্তমোময়ী' এবং ত্রিবিধা।—"সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি ত্রিধা স্মৃতিঃ।" সকল ভাবেই দেবীর পূজা হইতে পারে;—

"লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্দেবীং মণ্ডলস্থাং তথৈবচ।
পুস্তকাস্থাং মহাদেবীং পাবকে প্রতিমাসু চ।
চিত্রে চ বিশিখে খড়্গে জলস্থাপি পূজয়েৎ॥"

সর্ব্বকালেই দেবীর পূজা হইবে;—

"যাবদ্ভূর্বায়ুরাকাশং জলং বহ্নিশশিগ্রহাঃ।
তাবচ্চ চণ্ডিকাপূজা ভবিষ্যতি সদা ভুবি॥"

পূজায় সকল প্রকরণই আছে,—শুদ্ধি সিদ্ধি, আচমন প্রাণায়াম, মুদ্রা ন্যাস, বলি হোম—সকলই আবশ্যক। অধিবাস অধিষ্ঠান আবাহনা—সকলই করিতে হয়। ধূপ জ্বাল, দীপমাল—সকলই অনুসঙ্গ। বিশপূজার [illegible] করণ বিশ-সংগ্রহ। ফল জল, পত্র পুষ্প, ত্রিফলা সিন্দুর, গন্ধ চন্দন, কষায় [illegible] শঙ্খ গব্য, মণি রত্ন, ভোজ্য ভোগ, নৈবেদ্য পীতল—সকল পূজার সকল উপকরণ আহরণ করিতে হয়। মালীর মাসক, বণিকের বিপণী,—মণিহারীর মণিহার, গোলদারের গোলা আহরণ করিলে তবে দুর্গোৎসব হয়। বিশ্ব ভাণ্ডারের নমুনা লইয়া বিশ্বপ্রচলিত পদ্ধতিমত বিশ্বশক্তির পূজা।

হা ভগবান্! আমার দরিদ্রের অদৃষ্টে তবে কি তোমার বিশ্বশক্তি পূজা হইবে না? না, এমন কখন হইতে পারে না,—আমাদের শাস্ত্র ত পক্ষপাতের শাস্ত্র নহে। শাস্ত্রের বিধান বড়ই উদার;—

"সম্যক্ কল্পোদিতাং পূজাং যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে।
উপচারান্ তদা দাতুং পঞ্চৈতান্ বিতরেৎ তদা॥"

কি কি?

"গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেবচ।"

তাও যদি না জুটে?—"অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং"

তাও যদি আহরণ করিতে না পারি?—"তদভাবে জলেন চ।"

এমন কল্পনাও কখন হ'বে না, এমন উদার শাস্ত্রও আর কোথাও পাব না। কিছু না পারি, আজি শুভদিন এস ভাই! একবার ভক্তিভরে বিশ্বশক্তি ব্রহ্মময়ীর ধ্যান করি।

"ফনেট"।*

নেহাৎ যদি আস্‌বি শিবে ও পাহাড়ী মেয়ে,
আসিস্ বাঙ্গালিনীবেশে পান দোক্তা খেয়ে!
তোর হাতের সে অস্ত্রগুলো আনিস্ না এবার—
"Non violence passive" নীতি এখন বাঙালার!
বাঙলাদেশে আস্‌বি যখন—ও সব লাঠি কেন?
আসিস্ স্বদেশভয়ে ভীতা বঙ্গবধূ যেন।
আর একটা কথা মাগো বল্‌তে হ'ল তোরে—
আস্‌বার আগে খেয়ে দেয়ে আসিস্ ভাল করে'।
হয়ত তোরে থাক্‌তে হবে উপবাসের ক্লেশে—
যে তিন দিন থাক্‌বি হেথা—উপরন্তু, শেষে
Influenza Epedemic কিন্‌বি নিয়ে সাথে—
বাঙলা দেশে আসার মজা পাবি হাতে হাতে।

* * *

কেই কেই কর্‌বে মা তোর দুর্দ্দশারি শেষ,
তোরে শুধু খাড়া করে' খাবে দাবে বেশ
নিজেরাই—আর যত 'ইন্নীবের' দল—
উড়্‌বে কত 'নিধুর টপ্পা'—'নিধুর' পায়ে মল
বাজ্‌বে কেমন তালে তালে—বল্‌বেরে বাহুরা—
দিবারাত্র গমগম রবে তাদের "ছোট" সভা!
তোর পানে মা চাইবে না কেউ—
কিছু পড়্‌বে না তোর ভাগে—
কেবল দুটো চাল আর কলা—
বুঝি—তাও প্রসাদী নিবেদনের আগে!

কবিভূষণাকর—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ।

* "ফনেট"—'Funnyit' (=নিগাতনে সিদ্ধ)।

চুটকী।

১। Cod Liver Oil সুগন্ধ করিয়া খাইবার নিয়ম, অথচ উপকার ঠিক হইবে ঃ—

যত পরিমাণে Cod Liver Oil খাইবার আবশ্যক বিবেচনা করিবে, কিছু পরিমাণ Extract of Malt মিশাইয়া খাইলে, খাইতে কোন কষ্ট অনুভব হইবে না; বা Cod Liver Oil এর সহিত এক চায়ের চামচের মাপে Cinnamon water মিশাইয়া খাইলে কোন গন্ধ অনুভব করিতে হইবে না অথচ ঔষধের উপকার ঠিক হইবে।

২। পায়ের কড়া সারিবার নিয়ম ঃ—

এক টুক্‌রা গরম কাপড় উত্তমরূপে Lanoline দ্বারা ভিজাইয়া কড়ার উপর রাখিয়া উহা নরম করিবে, পরে হাতের নখ দিয়া সহজেই উঠিয়া যাইবে। কড়া কোন রকমে ছুরী বা শাণিত ধুর ইত্যাদির দ্বারা কাটা কোন একারে যুক্তিসঙ্গত নহে, উহা হইতে বিশেষ মন্দ ফল হইবার সম্ভাবনা।

৩। চক্ষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হইলে ঃ—

চায়ের চামচের মাপে এক চামচ Green Tea লইবে ও তাহাতে এক Pint আন্দাজ ফুটন্ত জল দিবে ও যতক্ষণ অবধি ঠাণ্ডা না হয়, এরূপ ভাবে রাখিবে; পরে কিছু গোলাপ জল উহাতে মিশাইয়া একটি পরিষ্কার বোতলে রাখিবে ও উহাতে দুইবার চক্ষু ধুইয়া ফেলিবে, বা চায়ের চামচের এক চামচ পরিষ্কার ফটকিরী, আন্দাজ এক Pint ফুটন্ত জলে দিবে ও উহা একটি পরিষ্কার বোতলে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবে ও দিনের মধ্যে ২।৩ বার চক্ষু উহাতে ধোত করিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

৪। Solution for damp wall :—

1 lb. Resin, 1 lb. Russian Tallow, 1 quart Raw Linseed Oil উত্তমরূপে গালাইয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে, এবং Damp স্থানটীতে বুরুষ দ্বারা লাগাইয়া দিবে। গরমের সময় যখন Damp স্থানটী কতক পরিমাণে শুষ্কভাবে থাকে, সেই সময় উহা ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত। বেশী পরিমাণে

আবশ্যক হইলে উক্ত মাপ মত করিলেই হইবে, বা একটি পাত্রে উত্তম চূণ ছই সের আন্দাজ রাখিবে এবং তাহাতে দুই কোয়ার্ট ফুটন্ত গরম জল দিবে, এবং উহা নাড়িতে থাকিবে ও সেই সময় এক পাইন্ট Linseed oil মিশাইবে। পরে এক কোয়ার্ট Tar গরম করিয়া লইবে, এবং উত্তম Russian Tallow এক সের উত্তমরূপে গালাইয়া লইবে, এক্ষণে উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশাইবে ও বুরুষ দ্বারা Damp স্থানটীতে উত্তমরূপে লাগাইবে। Tar এবং Russian Tallow অতি সাবধানের সহিত গরম করিবে ও গলাইবে, এ বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক জানিবে।

৫। পিপীলিকার উৎপাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে :—

কিছু Camphor, Sprit of wine এ ফেলিয়া দিবে, উহা গলিয়া যাইলে, পিপীলিকার বাসস্থানে কতকটা পরিমাণ ছড়াইয়া দিবে, বা বিশেষ বড়া হুঁকার জল, যাহা লাল রং হইয়া গিয়াছে, উহাতে উপকারী : বা ৪ আউন্স কোয়াসিয়া (quassia chips) এক গ্যালন জলে ১০ মিনিট জ্বাল দিবে, তাহাতে ৪ আউন্স Soft soap মিশাইয়া পিপীলিকার বাসস্থানে ছিটাইয়া দিবে।

৬। কাচের শিশির, কাচের ছিপি সহজে খুলিতে না পারিলে,—উহাতে বল প্রয়োগ করিও না, কারণ ছিপি ভাঙ্গিয়া যাইলে, শিশিটী আর কোন ব্যবহারে আসিবে না, বরং যদি ঐরূপ দেখ তাহা হইলে শিশিটীকে দাঁড় করাইয়া ছিপির নিকট কিছু Sweet এবং Paraffin oil দিবে ও শিশির গলায় একটি সরু দড়ী জড়াইয়া উহা টানিতে থাকিবে এবং ঐ দড়ীর ঘর্ষণে শিশির গলাটী গরম হইয়া ছিপি খুলিয়া যাইবে। যদি উক্ত উপায়ে ছিপি না খুলিয়া যায়, তাহা হইলে ছিপির নিকট কিছু পরিমাণ Glycerine দিবে ও দুই এক ঘণ্টাকাল ঐরূপ ভাবে রাখিবে, দেখিবে Glycerine ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, তখন শিশিটীকে বেশ জোরপূর্ব্বক ধরিয়া ছিপিটী ঘুরাইবে, ইহাতেও না খুলিলে ঐ শিশি খুব গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবে ও ছিপিটী জোরপূর্ব্বক ঘুরাইলে খুলিয়া যাইবে।

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

(শাগ্‌রেদী)

প্রবাসী—আশ্বিন,—রবীন্দ্রনাথের "নিষ্কার মিলন" প্রবাসীকে ধন্য করিয়াছে। তাঁহার কথা এখন সকলেরই শোনা কর্ত্তব্য। তিনি বলিতেছেন,—ভারত আজ সমস্ত পূর্ব্বভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধন সম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধ্য সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্ত্তে বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে।" কথা খুবই খাঁটী, কিন্তু পণ্যশালা সার সত্য প্রচারের স্থান নহে। বাঙ্গালীর এখন ব্যবসায়ের নেশা হইতেছে। সাহিত্যক্ষেত্রেও ব্যবসায়ীর দৃষ্টি সাধনার স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মহাবাণীও ব্যবসায়ী সম্পাদকের বিচারে তাঁহার পত্রে গৌরবের স্থান লাভ করিয়াছে,—প্রণা হিসাবে কিনা, বলিতে পারি না। প্রফুল্লচন্দ্ররায় "অন্নসমস্যার ও তাঁহার "সমাধান" প্রসঙ্গের পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটিয়াছেন, কতকগুলি বাঁধা বুলি আওড়াইয়াছেন! রজনীগন্ধার গন্ধ কোন পথে ছুটিবে, তাহার আঁচ পাওয়া যাইতেছে। হরি হরি! যুবক-যুবতী একত্র হইলেই তথাকথিত প্রেম ও আসঙ্গলিপ্সা ব্যতীত কি আর কোন ভাবের উদয় হওয়া অসম্ভব? "দুঃস্বপ্ন" একটা গল্প, মনো-বিজ্ঞানের প্রবন্ধ নয়। গল্পের ভিত্তি একটা ভয়াবহ অপরাধের কুৎসিত সন্দেহ। গল্পলেখক এই সন্দেহের এমন একটা জঘন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আমরা তাহাতে শিহরিয়া উঠিয়াছি। শুক্লকেশবিশিষ্ট সম্পাদকের পত্র আজকাল বুঝি এই প্রকার অশ্লীলতার রঙ্গভূমি হইয়া দাড়াইয়াছে? শ্রীশান্তা চট্টোপাধ্যায় কন্যাকামনা প্রবন্ধে সংস্কারবাদের ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক বারাণসী হইতে প্রবাসীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সুবিধা এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের প্রতিবাদ ছাপা না ছাপা এখন "প্রবাসীসম্পাদকের ইচ্ছাধীন"। তিনি রবেন্দ্রনাথের কথার জবাব দিতে পারেন নাই, কেবল কৃতকৃতা অবান্তর কথা বলিয়াছেন মাত্র। 'পুস্তকপরিচয়' ভাড়াটিয়া সমালোচকের অজ্ঞতার অহঙ্কার

ও কল্পাবুদের জিঘাংসার পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিবিধ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ অবশ্য এবারও আছে। মিথ্যা অভিযোগের আলোচনা কাহারও পক্ষে প্রীতিকর নহে। এই অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য যে কবে শেষ হইবে, বলিতে পারি না। যুক্তির ও তথ্যের এত ভুল কোন আদালতে গ্রাহ্য হইত না। কিন্তু নির্জ্জলা মিথ্যা প্রচারে "প্রবাসী" সম্পাদকের কৃতিত্ব অনুকরণীয়। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনসম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত ও পরে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের বহুদিন পত্রালাপ চলে, পরে তাঁহারা সেনেটে একটা প্রস্তাব উপস্থিত করেন; কিন্তু কার্য্যবাহুল্যে এই প্রস্তাবের সহিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নাই; সুতরাং স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাবিত কমিটিও এই কমিটির উদ্দেশ্য এক নহে। কিন্তু "প্রবাসী" সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার প্রস্তাব গৃহীত হইবার আগে করিলে সেনেটের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারিত না।" কেন? ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশে সন্দিগ্ধচিত্ত ও মিথ্যাবাদী লোকের সংখ্যা কম ছিল? বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতন্ত্রপ্রসঙ্গে রামানন্দ বলিতেছেন—"গ্রাজুয়েট অনেক হাজার আছে। ১৯২০-২১ সালের কলেণ্ডারে দেখিতেছি যে, তাহার মধ্যে কেবল ২৯৩ জন রেজিষ্টরীভুক্ত গ্রাজুয়েট। ইহাঁদের মধ্যে আবার অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের অধ্যাপক।" সে দোষ কাহার? আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রত্যেক গ্রাজুয়েটের নিকটই কিছু বড় রকমের দান প্রত্যাশা করেন ও পাইয়াও থাকেন। দেশের কেরাণী গ্রাজুয়েটদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু যাহারা মোটা মাহিনায় চাকুরী করেন বা—পেট্রিয়টিক পত্রের সম্পাদকতা করেন, তাঁহারা যে দশটা টাকা দিয়া রেজিষ্টারীভুক্ত গ্রাজুয়েট হন না, ইহা কি পোষ্ট গ্রাজুয়েটের অধ্যাপকদের দোষ? ইহাতে বুঝা যায় যে তোমরা কেবল "কুকথায় পঞ্চমুখ" কাজ করিবার ইচ্ছা ও শক্তি তোমাদের নাই। তোমরা শিক্ষিত সমাজের রুগ্ন অঙ্গ বা উপগ্রহ মাত্র! দুরভিসন্ধির ইঙ্গিত করিতে "প্রবাসী" সম্পাদক মহাশয় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইতেছেন। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেনকে সাহিত্যাচার্য্য উপাধি দিবার প্রস্তাবেও তিনি একটা উদ্দেশ্যের গন্ধ পাইয়াছেন। তাঁহার আঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল হইলেও তাহা যে, কখনও তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, তাহা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন? দীনেশ বাবু এখন তাঁহার অপ্রীতিভাজন; কিন্তু ২২ বৎসর পূর্ব্বে যুবক রামানন্দ

সুবক দীনেশের পাণ্ডিত্যের ও কৃতিত্বের যে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় এখনকার সাবালক ও তখনকার নাবালক পাঠকদের জানা নাই। ১৩০৩ সালের ফাল্গুনের প্রদীপে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সমালোচনা হইয়াছিল। সমালোচনা করিয়াছিলেন—স্বয়ং রামানন্দ বাবু। তিনি লিখিয়াছিলেন—"দীনেশবাবুর গ্রন্থখানির পরিচয় দেওয়াই আমাদের পক্ষে শোভা পায়, সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা-মাত্র।" অন্যত্র—"তিনি এরূপ একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যাহা বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয়। এই পুস্তকে যেমন তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা শক্তি, তেমনই তাঁহার গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে প্রকারে অনেকগুলি গ্রন্থের কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তাঁহার ভাষার মনোহারিত্ব, রচনানৈপুণ্য ও শিল্পীর মত নানা বিষয়ের যথাস্থানে সমাবেশ সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমরা পাঠ্যশায় টেন-প্রণীত ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়িয়াছিলাম, দীনেশবাবুর গ্রন্থও প্রায় আদ্যোপান্ত তদ্রূপ আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি।" হায় রামানন্দ! তখন তুমি জানিতে না যে, ভবিষ্যতে এই দীনেশের সহিত তোমার মনান্তর হইবে এবং তোমার কুৎসার বিরুদ্ধে তাহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিবে—তোমার প্রশংসা!

ভারতী, আশ্বিন। ভারতী আজ ৪৫ বয়সের প্রৌঢ়া, কিন্তু তাহার তাহার রূপ সম্পদের হানি হয় নাই তাহার বীণার-ঝঙ্কার এখনও পূর্ব্ববৎ মনে হয়। আশ্বিনসংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'শিকার মিশ্রন' প্রবাসীর ন্যায় ভারতীতেও ছাপা হইয়াছে। এতদ্ভীত—রবীন্দ্রনাথের আরও দুইটি গল্প, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদ, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের যমের বাড়ীর বর নামক একটি চিত্তাকর্ষক গল্প আছে। অধ্যাপক নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "ব্রিটিশ শাসনের একযুগ" প্রবন্ধে চেৎসিংহ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিগ্রহের বিষয় আলোচনা করিতেছেন। নিরুপদ্রব সহযোগিতাবর্জ্জন সুখপাঠ্য। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, ভারতীর বিষয়বৈচিত্র্য আছে, প্রবন্ধনির্ব্বাচনে নৈপুণ্য আছে এবং তরুণ সম্পাদকদ্বয় ভারতীর পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

ভারতবর্ষ, আশ্বিন,—"গীতায় পুরুষোত্তম তত্ত্ব" লেখক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ। সুলিখিত, বহু তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ লেখকের লিপিকুশলতার ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। বিমলা চরণ লাহার 'ভারতীয় পরিব্রাজক' ও নলিনী

কান্ত [illegible] ঐতিহাসিক [illegible]। 'ভারতবর্ষের [illegible] আলোচনা করিব না। ছোট গল্পের নিপুণ-নে জলধর বাবু দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, 'ভারতবর্ষে যেরূপ মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—মাসিকীর কোন সংখ্যাতেই তাহা হয় না। এ ক্ষেত্রে বিচিত্রার আদর্শ ক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। গল্প ও উপন্যাস কমাইলে বাজার কমাইতে পারে—কিন্তু প্রকৃত পাঠকের নিকট ভারতবর্ষের মূল্য নিশ্চয়ই বাড়িবে। প্রত্যেক পত্রেরই একটা বিশিষ্টতা থাকা চাই। 'প্রবাসীর' বিশিষ্টতা—বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধ, 'ভারতবর্ষের' বিশিষ্টতা হওয়া উচিত—মৌলিক প্রবন্ধ। 'প্রবাসীর' চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক কিরূপ রেলপথযাত্রীদের বিনোদন করে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে—আশ্বিনের ভারতবর্ষে পুরান পথে"। কাশ্মীরযাত্রার সুন্দর ভ্রমণবৃত্তান্ত। আজকালকার অনেক পাঠকই ভুলিয়া যান যে, ভ্রমণবৃত্তান্ত ঐতিহাসিক বিবরণ নহে। এরূপ প্রবন্ধে পারিপার্শ্বের পরিচয় দিবার সুযোগ অন্বেষণ করা অনুচিত। দেখিয়া সুখী হইলাম, লেখক গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এতথ্য অবগত নহেন। প্রবন্ধের শেষে তিনি লিখিয়াছেন—"একজন বেহারী ভদ্রলোকের সহিত জনৈক বাঙ্গালী যুবক বঙ্গের [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ঘোর তর্ক করিয়াছিলেন। বেহারী ভদ্রলোকটি স্বপক্ষে, আর বাঙ্গালী বাবু বিপক্ষে যুক্তি তর্ক দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমটি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, এবং বলিলেন যে, তিনি proud of being a student of that University। প্রতিবাদীও নিজেকে তথাকার গ্রাজুয়েট বলিয়া পরিচয় দিলেন, কিন্তু তাঁহার শেষোক্ত মত মোটেই সমর্থিত করিতে রাজী নহেন,—বরং নিজেকে unfortunate বলিতে ইচ্ছুক। কোন্ কারণে জিজ্ঞাসা করি নাই; তবে সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটীকে কিছুদিন পরে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কোন অফিসগুলিতে চাকুরীর উমেদারী করিতে দেখিয়াছি।" মন্তব্য অনাবশ্যক। শুনিয়াছি তৃতীয় বিভাগেরও এম এ পাশ, পড়াশুনা ছোকরা উমেদারদিগেরও এদিকে আগ্রহাতিশয্য আছে।

পাখীর কথার সমালোচনা।

সমালোচক দ্বিজেন্দ্র বাবু বৈজ্ঞানিক। তিনি অবৈজ্ঞানিক গ্রন্থকারের অজস্র ভুল দেখাইবার আগ্রহে বোধ হয় বিচারকের ধৈর্য্য অটুট রাখিতে পারেন নাই। তাই তিনি নিজেও গুটি-কয়েক ভ্রম করিয়াছেন এবং গ্রন্থকারের প্রতিও অযথা অবিচার করিয়াছেন। সকলগুলির আলোচনা না করিয়া কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"এই জন্য আমিষভোজী পাখীরা আপনাদের সংখ্যা অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িতে দেয় না।" সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "শুধু আমিষভোজী পাখীর ঘাড়ে এ দোষ চাপান কেন? সব পাখীই ত ঐরূপ করে (Bird Life 162 p.)।" গ্রন্থকার সর্ব্বত্র উল্লিখিত Life-এর অনুসরণ করেন নাই। তিনি সকল পাখীর ঘাড়ে এ দোষ চাপাইয়া ভুল করিতেন, কারণ অন্ততঃ একটি বঙ্গীয় পক্ষী আরণ্য জালালী পারাবত শাবকদিগকে গ্রাম হইতে চিল ও বাজের মত তাড়াইয়া দেয় না। পৃথিবীর নিতান্ত অসভ্য কয়েকটি জাতি ব্যতীত সকল মনুষ্যই খাদ্যবিষয়ে প্রতিযোগী, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর পাখী, শ্রেণী হিসাবে, এই বিষয়ে প্রতিযোগী নহে। ইহা বলিয়া গ্রন্থকার ভুল করিয়াছেন কি? সকল শস্যভোজীও সকল শস্যভোজীর এবং সকল আমিষাশীও সকল আমিষাশীর প্রতিযোগী নহে। প্রতিযোগিতা হয় অনেক সময়—যাহারা একই প্রণালীতে খাদ্যসংগ্রহ করে, তাহাদের মধ্যে। টিয়া ও চড়ুইর মধ্যে, চিল ও শকুনির মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই। হামিং বার্ডের প্রসঙ্গের (৬পৃঃ) গ্রন্থকার সমালোচক উভয়েই ভুল করিয়াছেন। গ্রন্থকার করিয়াছেন—দেশের নামের ভুল, সমালোচকের ভুল—প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক। শুনিয়াছি গ্রন্থকার সমালোচনার জন্য বই পাঠাইবার পূর্ব্বে—'মানস দ্বীপ' কাটিয়া পেন্সিলে 'আমেরিকার' লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সমালোচক লিখিয়াছেন—লেখক সম্ভবতঃ বার্ড অব প্যারাডাইজের শব্দের ভুল করিয়াছেন। লেখক ও ঐ পৃষ্ঠায়ই বলিতেছেন যে, এই ক্ষুদ্রকায় পাখীটি swift-এর নিকট জাতি ঈগল of Paradise। swift-এর জ্ঞাতি নয়,—কাকজাতীয় পাখী; ইহা বৈজ্ঞানিক

সমালোচক নিশ্চিন্ত আছেন। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী দুই তিনটী অধ্যায়ে লেখক যে হেমিং বার্ডের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে এ ভুল হওয়া উচিত নয়। বিভিন্ন প্রকারে Bird of Paradise কোনটিই হেমিং বার্ডের মত ছোট নয় এবং গ্রন্থকার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহাকে স্পষ্টই আমেরিকার পাখী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সমালোচক বেশী খাপ্পা হইয়াছেন—নেকড়ে প্রতিপালিত মানবশিশুর দেহ ও মনের পারিপার্শ্বিক জীবনোপযোগী বিকারের প্রসঙ্গে। তিনি লিখিয়াছেন "এইরূপ আষাঢে গল্প বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এত সহজে চট করিয়া দেহের ও মনের পরিবর্ত্তন হয় না। তাহা হইলে গোছগ্ধে পালিত মানবশিশুও গোস্বভাবাপন্ন হইত।" গোকালয়ে পিতামাতার নিকট থাকিয়া গোদুগ্ধে প্রতিপালিত হওয়ার সঙ্গে বন্য অরণ্যে নেকড়ের সহবাসে প্রতিপালিত হওয়ার তুলনা সঙ্গত নহে। সমালোচক যাহাকে 'আষাঢে গল্প' মনে করেন তাহা 'আষাঢে গল্প' নাও হইতে পারে। আমি নেকড়ে-পালিত মানবশিশু দেখি নাই। বোধ হয় সমালোচক বা গ্রন্থকারও দেখেন নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের লিখিত বিবরণ অগ্রাহ্য কেন হইবে? ঠগীদমনকারী বিখ্যাত শ্লীমান সাহেব ১৮৫২ সালে এই সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইহাতে কয়েকটি wolfboyবা নেকড়ে-বালকের বিবরণ দিয়াছেন। যে কয়েকটি বিবরণ সাধু লোকের নিকট শোনা, তাহা না হয় অগ্রাহ্য করিলাম। কিন্তু ইহার একটী Captain Nicoletts নামক সৈনিক পুরুষ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই মানবশিশুর বিবরণ এইরূপ,—

The boy to cut on all fours . . . They took the boy to the village but had to tie him for he was very restive, and struggled hard to rush into every hole or den they came near. They tried to make him speak, but could get nothing from him but an angry growl or snarl. . . . when a child came near him, he rushed at it, with a fierce snarl, like that of a dog, and tried to bite it. When any cooked meat was put near him, he rejected it in disgust; but when any raw meat was offered, he seized it with avidity, put it on the

ground under his hands like a dog, and ate it with evident pleasure. He would not let any one came near while he was eating, but he made no objection to a dog's coming and sharing his food with him.

এইটুকু তাহার মৃত হওয়ার সময়ের বিবরণ। শ্রীমান এই বিবরণ রাজার পুত্রের নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন নিকোলেট বহুযত্নে ইহা কতটুকু উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, দেখা যাউক ;—

He is very inoffensive except when teased, and will then growl surlily at the person who teases him. He has come to eat anything that is thrown to him but always prefers raw flesh, which he devours most greedily. He will drink a whole pitches of butter-milk, when put before him, without seeming to draw breath. He can never be induced to keep any kind of clothing, even in the coldest weather. A quilt stuffed with cotton, was given to him, * * * but he tore it to pieces and ate a portion of it. He is very fond of bones, particularly uncooked ones, which he masticates apparently with as much ease as meat. He has eaten half a lamb at a time, without any apparent effort, and is very fond of taking up earth and small stones and eating them. His features are coarse, and his countenance repulsive and he is very filthy in his habits। মৃত্যুর পূর্ব্বে এই বালক কথা কহিতে শেখে নাই, কাহারও প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে নাই, কখনও কখনও মানুষের মত সোজা হইয়া হাঁটিত, কিন্তু খাদ্য দেখিলেই—Would run to it on all fours like any four footed animal. আর একটি বালক লোকালয়ে আনীত হইবার পর তাহার শরীরের ক্ষত দেখিয়া তাহাকে তাহার মাতা চিনিতে পারিয়াছিল। মাতা কর্ত্তৃক যত্নে পালিত হওয়ার গল্পও—He continued to dip his face in the water to drink * * His body continued to smell offensively. * * He used to mutter some things but could never be got to articulate any thing distinctly. The front of his knees and elbows had become hardened from going on all fours with the wolves. * * He still prefers raw flesh to cooked and feeds on carrion, wherever he can get it. The boys of the village are in the habit of amusing

themselves, by catching frogs, and throwing them to him, and he catches and eats them." আর একটী নেকড়ে বালককে Colonel Gray দেখিয়াছিলেন—এই বালকের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লিখিয়াছেন—saw a boy trotting along upon all fours by the side of a wolf. এই বালকটী অল্প দিন পরেই জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছিল, ইহাকে সভ্য করার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার 'জীবজন্তু' নামক গ্রন্থে রাজা হরদেব সিংহ কর্ত্তৃক ধৃত একটি নেকড়ে বালকের বিবরণ দিয়াছেন। আশা করি, তাহা 'আষাঢ়ে গল্প' নহে। কিন্তু ঐ বালকটীর পরিণাম কি হইল, তাহা তিনি বলেন নাই। শ্রীযুক্তের গ্রন্থে দেখিলাম, বালকের স্নেহ ভুলিয়া সে বনে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের কথার গ্রন্থকারকে গালি দিবার লোভে সমালোচক দ্বিজেন্দ্র বাবু নিজের ঐ নেকড়ে বালকদের সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—"এই সকল বালককে কখনও সোজা হইয়া অনেকক্ষণ দাড়াইতে বা চলিতে দেখা যায় নাই। ইহারা শূকরের মত সম্মুখের পায়ে হাড় ও মাংস চাপিয়া ধরিয়া দাঁতে টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইত * * *। বাহ্যিক চেহারা ছাড়া ভাব গতিক, কার্য্যে ও ব্যবহারে কিছুতেই বুঝা যাইত না যে, ইহারা মানুষ।" ইহা হইতে কি বুঝিব যে, এই সকল বালকের মনের বিকার হয় নাই, তাহাদের মনোবৃত্তিও অন্যান্য মানবশিশুর অনুরূপ? ইহাদের করতল থাবা হয় না সত্য, কাণ, মাথা, মুখ লম্বা হইয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের হাঁটু এবং কুনুই হাঁটিবার জন্য নহে। অথচ এই মানবশিশুরা হাঁটু ও কুনুইতে ভর দিয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়া যায়। ইহা অঙ্গবিশেষের বিকার নহে কি? সমালোচক বলিতেছেন, চট করিয়া দেহ ও মনের পরিবর্ত্তন হয় না অথচ এক জীবনেই বিবর্ত্তনের ফল আশা করেন। গ্রন্থকার জানেন যে, চট করিয়া তাহা হওয়া সম্ভব নয়, তাই অন্যস্থলে বিবর্ত্তনের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন মনে রাখিবেন এত গুলি পরিবর্ত্তন এক, দুই বা তিন পুরুষে হয় নাই (পৃঃ ৭৮) কিন্তু এই বালকদের মুখের চেহারার পরিবর্ত্তন হয় কি না তাহা Mervyn Smithএর Sport and Adventure in the India Jungle নামক গ্রন্থে ৯৬ পৃষ্ঠায় সম্মুখে যে Wolfboyএর ফটো দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে। Smith ইহার দাঁতের কথা লিখিয়াছেন—His

teeth were more to stumps in front but the canines and molars were well developed.

শালিকের বাসায় প্রতিপালিত কোকিলশাবকের সহিত [illegible] পালিত মানবশিশুর তুলনা অসঙ্গত। পক্ষিশাবকের মত মানবশিশুর [illegible] প্রবল নহে। পক্ষিদের শিক্ষার প্রয়োজন নাই, মানবশিশুর আছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক মহাশয়কে Douglas Dewar কৃত Jungle Folklore একটি অধ্যায় পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

সমালোচক মহাশয়ের অভিচার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাই যথেষ্ট। পুস্তিকাখানি সাধারণ লোকের জন্য লেখা। কাজেই মোটামুটি সকল কথা বলা হইয়াছে।

আদর্শনে।

এস!
হৃদয়ে তোমারে নিরখিব।
জীবনে মরণে,
শয়নে স্বপনে,
তৃষিত নয়নে চাহিব।
সুখের ধন!
এস হে হৃদয়ে,
হৃদয় ত্যজিয়ে,
যেন হে লুকায়ে;
এস নাথ হরি!
হৃদয়-বিহারী,
অনন্তের পদে মিলিব।

ধন-জন চিত্ত!
যা' ছিল বিভব
তব নাম সনে,
ভুলেছি তা সব
দেশে দেশে ধাই,
খুঁজিয়ে না পাই,
কোথা গেলে তোমা পাইব।
দিনে দিনে দিন,
হ'ল অবসান,
বিরহে তোমার,
আকুলিত প্রাণ;
এস সুধাকর!
সুধা কর দান,
তাপিত পরাণ জুড়াব।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
(নবসঙ্ঘ-সম্পাদক)

এই পুস্তিকাটি কলিকাতা প্রাবোকোন কোম্পানী-প্রতিষ্ঠিত [illegible] বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

[সম্পাদক

বৈঠকী।

—পূজা আসিল, আফিস-কাছারি বন্ধ হইল, বাবুদের গ্রাম-নগর ছাড়িয়া গৃহদ্বার ছাড়িয়া পলায়ন আরম্ভ হইল। এই পলায়ন এক হিসাবে বড় দোষের, অন্য হিসাবে হিতকর এবং অনেক ক্ষেত্রে অবশ্যকর্ত্তব্য। কথাটা একটু খুলিয়া বলিব।

—পূর্ণমাত্রায় নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিয়া আনা হয়, চণ্ডীমণ্ডপে বসান হয়, মায়ের সেবা আরতি দেখিবার জন্য, ভোগ প্রসাদ ভোজন করিবার জন্য আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি গোষ্ঠিকে খবর দাও, বাড়িতে আসিতে অনুরোধ কর;—অথচ তুমি গৃহকর্ত্তা, তুমি ঘর ছাড়িয়া পালাও! এ কেমন সভ্যতা। শিষ্টাচারের হিসাবে এ পলায়ন অতি দোষের,—পৃথিবীর সকল সজ্জনসমাজ-বিগর্হিত ও নিন্দার্হ কাণ্ড। কোন খৃষ্টান বড়দিনে বা ইষ্টারে, কোন মুসলমান ঈদে বা মহরমে, কোন বৌদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমায় এমনভাবে গৃহ ও সমাজ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া যায় না;—যাইলে তাহাদিগকে সমাজে অতিমাত্রায় নিন্দিত হইতে হয়।

—যদি দুর্গোৎসবকে জাতির মহামহোৎসব বলিয়া জ্ঞান করিতে, যদি এই সামাজিক মহামহোৎসবে সমাজের ইতর ভদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ ধনী-দরিদ্র সকলের মিলিবার মিশিবার বলবতী বাসনা তোমাদের হৃদয়ে সদা জাগরূক থাকিত, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে বিশ্বাস এবং ভক্তি যদি থাকিত, সমগ্র জাতিটাকে নিজ জন্মভূমি—গ্রামটিকে আমার বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার প্রবৃত্তি যদি থাকিত, তাহা হইলে এমনভাবে পলায়ন করিতে কিছুতেই পারিতে না। বাপ ঠাকুরদার উদ্দেশে গাঁথা পূজা না করিলে নয়, তাই দরিদ্র পুরোহিতের উপর সকল ভার ন্যস্ত করিয়া তোমরা পালাও। Boy-nature-building মুখে বল, দরিদ্র, হীন দীন কদাকার Nation এর সাহচর্য্য করিতে না—কেমন করে? অত সুবিধা নহে কে? বড় মানুষের ছেলে তুমি বিলাস উপভোগে পটু, প্রস্তুত। ধনগর্ব্ব তোমাকে দরিদ্রের ছায়া মাড়াইতে নিষেধ করে।

আচার-ব্যবহারে নাই। টাকা তেমন পর্য্যাপ্ত থাকিলে আমাদের অনেকে পুরাদস্তর সাহেব সাজিতে পারে—সাজেও;—পুত্রকন্যাদিগকে ষোল আনা সাহেব বিবি বানাইবার আশায় তাহাদিগকে বিলাতে পাঠাইয়া দিই! এমন মজ্জাগত শূদ্রত্ব থাকিতে কি হিন্দুয়ানী গজায়? এমন অশুচিকীর্ষু শূদ্রসম্প্রদায়ের জন্য দুর্গোৎসব নহে।

গোড়ার সন্দর্ভেই বলিয়াছি; বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব বুঝাইব কোন্ ভাষার সাহায্যে। যে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে দুর্গোৎসব বুঝান চলে, সে ভাষা তোমরা বে বুঝ না। তোমরা যে বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা কর। গোলত ঐখানেই। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব বুঝাইবার যে ভাষা, তাহাকে ইংরেজির ছাঁচে ঢালা চলে না। তাই "উপাসনা ও সাধনা" এবং "শ্রীদুর্গাপ্রসঙ্গ" লিখিয়া, ব্যাপারটা একটু খুলিয়া বুঝাইবার চেষ্টায় ৺ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এক পুরাতন সন্দর্ভ ছাপিলাম। এতদ্ভেও কি বুঝিবার সুবিধা হইবে? কথাটা কি জান? বাঙ্গালীর এখন দুইটা স্তর হইয়াছে। প্রথম, ইংরেজী নবীশের স্তর। ইহারা সাফ বাঙ্গালা ভাষা জানে না, বুঝেও না। এমন কি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলটাও ইহারা রীতিমত পড়ে না। বৈষ্ণবসাহিত্যের তাত্ত্বিক সাহিত্য ত ঈশ্বর গুপ্ত হইতে হেমচন্দ্র পর্য্যন্ত আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য না পড়িলে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি হইতেই পারে না। খাঁটি বাঙ্গালা না জানিলে খাঁটি বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব বুঝা ও বুঝান কঠিন,—বুঝিবা অসম্ভব। বাঙ্গালার দ্বিতীয় স্তর,—ইংরেজি বিদ্যা ও সভ্যতাবর্জ্জিত খাঁটি বাঙ্গালীর নিম্নতম স্তর। পূর্ব্বে এই স্তরের মানুষ কেবল উচ্চতম স্তরের কথক, ব্যাখ্যাতা, পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালার দ্বারা প্রভাবান্বিত থাকিত এবং তাঁহাদের ভাষা ও ভাব গ্রহণ করিত। সে পুরাতন বিশিষ্টতা এই নিম্নস্তরের মধ্যে এখনও কতক পরিমাণে আছে, পরে থাকা হয়, ভবিষ্যতে বুঝি আর সে ভাবসম্বন্ধ বজায় থাকে না। কারণ সে কথকতা, যাত্রা, কবি, পাঁচালী লোপ পাইয়াছে। তথাপি বলিব হিন্দুয়ানার গুঁড়া যাহা কিছু আছে, ইহাদের মধ্যেই আছে। এখনও আগমনী ত ইহারাই শুনে, দুর্গোৎসবের আমোদ উল্লাস-উপভোগ ইহারাই করে। ইহারা যে চাকুরে নহে, গোলাম নহে, দশটা পাঁচটা আফিসে গতায়াত করে না। তাই ইহাদের মধ্যে পৌষ পার্ব্বণ আছে, দোল আছে, চরকের সং আছে, বাসি মাসে তের পার্ব্বণের একটু-আধটু আছেই। এখনও যে সর্ব্বে সর্ব্বে দুর্গোৎসব হয়, সেটা কেবল ইহারা আছে বলিয়াই। বাঙ্গালার সবাই বাবু

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

ভাবিতেছ কি, এমন ভাবে আর কতদিন কাটাইবে? এই কি উদ্দাম যুবা সৌদামিনীর জীবন,—এই সমাজের নিম্নতম স্তরের সহিত জীবন কতদিন অতিবাহন করিতে পারিবে? সে কালে জাতিবিচার ছিল বটে, পরন্তু এমন কাঞ্চন-বেলীচের বৃশ্চিক ছিল না, এমন বাবুয়ানার "একাল্সেঁড়েমী"—ইংরেজি শিক্ষাগত স্পর্শ ছোটলোক প্রতি অশ্রাদ্ধের ভাব ছিল না। তখন ধনী—দরিদ্র সহরহঃ ধনী কলিত, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এক আসবে বসিয়া কীর্ত্তন-যাত্রা ইত্যাদিতে মিলিত মিশিত। এই দুর্গোৎসব আমোদের সাধারণ একটা বড় অবসর। এই অল্পকয়টি ইংরেজি কিতাব আর যারাইতে ছাই জিনিষ হইতেছি, এমন নিরক্ষভাবে কাপুড়ে বাবু হইতে আর কি হইতে পারে। সেই ছ কোন পরিশ্রম, কোন সদ্ব্যবহার নাই, কোন বুদ্ধি-ভদ্ধী চলিবে কেমনেই বা, এখন ডাগ্যাবিটিজ—টিস্পাটিস্ কলকাতার এবং পল্লীর পচাচিতে না পচিতে সমাধী হইল কে জানে ঐশ্বরিক কার্য্য চলিবে না; চলিবে না—চলিতে পারে না বলিয়াই সমাজের উঠিতেছে। আর সেই হেতু দুর্গোৎসবের [illegible] হইতেছে।

আমাদের কথা,—যদি বাড়িতে চাও তবে আবার [illegible] হও, [illegible] ধুতি-পাতু-জামছা-সর্ব্বস্বহীনা জন্মে পূর্ব্ব [illegible] হইতে হইবে। মাকে আমল বাসানী, মা থাকিতে ছেলে কি মরে? কিন্তু মরিতেই [illegible] [illegible] হইবে। অসল কথায় যি জান? [illegible] [illegible] [illegible] হইতেই হইবে। বাবু বিবানী হইয়া, [illegible] [illegible] [illegible]

ভাবের প্রাচুর্য্যে ধনকুবের হইলেও উৎকট ত্যাগী—সন্ন্যাসী ছিলেন। তাই প্রামাণিকদের বাড়ীর দুর্গোৎসবের সেকালে একটা প্রতিষ্ঠা ছিল। তেমনটি হইতে হইলে বাঙ্গালী হওয়া চাই, বাঙ্গালীর সাধনা ও ভাব থাকা চাই। এবং বাঙ্গালী না হইতে পারিলে দুর্গোৎসব বুঝা চলিবে না।

* * * * *

হায় মা! যখন বাঙ্গালী দুই বাহু তুলিয়া—

"আয় মা আয়, সতী আয়,

আমার কোলে আয়"—

আগমনী গান করিয়া তোমার আবাহন করিত, আর দুই নয়নের ধারায় তাহার বিশাল বক্ষ ভাসিয়া যাইত, তখনকার কেমন বঙ্গভূমি দেখিয়াছ? আর এখনকার কেমন Bengal Province দেখিতেছ? যখন নিতাক্ত বোধে বাঙ্গালার সকল গৃহস্থই, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসাইত, পত্রপুষ্পফলতোয় যাহার যেমন শক্তি, তেমনই দিয়া তোমার পূজা করিত, তখন কেমন বাঙ্গালী দেখিয়াছিলে, আর এখনই বা কেমন বাবু-বাঙ্গালী দেখিতেছ? গল্প আছে যে, মায়ের প্রকৃত আবির্ভাব কোথায় হইয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেন, প্রতিমার লক্ষণ দেখিয়া মায়ের অধিষ্ঠান বুঝিতেন। একবার এক চণ্ডালের গৃহে মায়ের মুখে চণ্ডালদত্ত কাঁচা মোচার কুটনা দেখিয়া ব্রাহ্মণ-মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চণ্ডালের অঙ্গনে গড়াগড়ি দিয়া মা—মা শব্দে রোদন করিয়াছিলেন। সেই বাঙ্গালী কেমন বাঙ্গালা ছিল, আর বাবুর বাঙ্গালা এখন কেমন? তখন যে দুঃখ দারিদ্র্য ছিল না, রোগ শোক-মরণ জরা যে ছিল না, তাহা নহে। সে দুঃখের এবং দারিদ্র্যের কাহিনী কবিকঙ্কণ অতুল্য ভাষায় ও ছন্দে লিখিয়া গিয়াছেন। ছিল সব, আছে সব, থাকিবেও সব; পরন্তু এমন সর্ব্বব্যাপী-অভাবের হা হা রব ছিল না, এমন ধোপদস্ত কাপড়ের অন্তরালে অভাবের ও অতৃপ্তির পুটপাকের জ্বালা ছিল না। তখন যেমন দুঃখ ছিল, দারিদ্র্য ছিল, তেমনই হাসি ছিল, উল্লাস ছিল, আমোদ-প্রমোদ ছিল, পংক্তি-ভোজন ছিল—ভোজন বিলাস ছিল। সুখটুকু গিয়াছে; কেবল 'নির্জ্জলা' দুঃখই রহিয়াছে। আর দুঃখের সহচর কপটতা, চাতুরী-জুয়াচুরী প্রভৃতি আসিয়া জুটিয়া বাঙ্গালী চরিত্রকে অধিকতর ম্লান করিয়া তুলিতেছে। এ বাঙ্গালায় আনন্দময়ীর স্থান নাই, তাই এখন মহাগ্রাম-দুর্গোৎসব-বর্জ্জিত, সে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি নাই,—ঢাক-ঢোলের সাড়া নাই, ব্যায়ামবলবতনিতার আনন্দ নর্ত্তন নাই। তোমার সার্থক আবাহন যাহারা করিত, তাহারা যে নাই মা! তাই তোমার বোধন হয় না, বিল্বকরণ হয় না, প্রতিষ্ঠাও হয় না। আজন্ম অভ্যাস তাই তোমায় ডাকি, তাই তোমার পরিচর্য্যা করিতে এত ব্যস্ত। কিন্তু এটুকুও বুঝিয়া থাকে না। যায় যে সব!